No. 389. June, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৯ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪—জুন, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জুবিলী-মূর্ত্তি—হীরক জুবিলী উপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাতী কারীকর দ্বারা ইহা খোদিত হইতেছে।

জুবিলী মহোৎসব—২২এ জুন উৎসবের দিন মহারাণী স্বজন, অমাত্যবর্গ ও সৈন্যসামন্ত সহ লণ্ডনের প্রধান গির্জায় গিয়া উপাসনা করিবেন। যে পথ দিয়া যাইবেন, তাহার দুই ধারের বাড়ী সকল দর্শনার্থীরা ভাড়া করিয়াছেন। একটা জানালার ভাড়া ৫০ গিনি বা প্রায় হাজার টাকা।

জুবিলী উৎসবে রাজপ্রতিনিধি—রুসীয়েশ্বরের প্রতিনিধি সার্জের—গ্রাণ্ড ডিউক ও তৎপত্নী; পারস্য সাহের—নাসর-অল-মল্‌ক; চিন সম্রাটের—চ্যাং-ইউ-হোয়ান; জাপানের—চিন-জাপান যুদ্ধের সুবিখ্যাত প্রোটেক্ষ ইয়ামাগটা; শ্যামরাজের—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জুবিলী ভোজ—যুবরাজ-পত্নী জুবিলী সপ্তাহে লণ্ডনের গরিবদিগের ভোজের প্রস্তাব করিয়া নিজে ১০০ পাউণ্ড বা প্রায় ১৮০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জুবিলী প্রদর্শন—জুনের প্রথমে লণ্ডনের কাচময় প্রাসাদে বিক্টোরিয়া প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে ভারতীয় বিভাগের স্থান বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জুবিলী অলঙ্কার—জুবিলী উপলক্ষে বার্ম্মিংহামের মণিকারগণ ১ কোটী ৫০ লক্ষ মেডাল এবং ৬০ লক্ষ ব্রোচ প্রস্তুত করিয়াছে।

জুবিলী স্মরণার্থ কীর্ত্তি—(১) কাশ্মীরের মহারাজা এক বড় হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবেন। (২) পুঁটিয়ার রাণী

হেমন্ত কুমারী রাজসাহীতে এক শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দুর্ঘটনা—(১) মিশিসিপি নদীর জলপ্লাবনে ১১০ কোটী মূল্যের তুলা নষ্ট হইয়াছে। (২) পারিস নগরে এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সখের বাজারে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ১২ মিনিটের মধ্যে সমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ১৪৬টী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের অনেক প্রগণ্যমান্য পুরুষ ও মহিলা মারা গিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে দান—যে ফিজীদ্বীপে কিছু দিন পূর্ব্বে নরমাংসভক্ষক রাক্ষস ছিল, তত্রত্য অধিবাসিগণ ভারত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ প্রায় ১৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৯৭ সালের পরীক্ষায় অন্যূন ৩৫ জন বালিকা প্রবেশিকা, ৯ জন বালিকা এফ এ এবং ১ জন সম্মানসহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। প্রবেশিকা ও এফ্ এ পরীক্ষায় কোন কোন বালিকা অতি উচ্চ স্থানীয় হইয়া ১ম শ্রেণীর ছাত্রীবৃত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। ডাক্তারী পরীক্ষাতেও ২ জন স্ত্রীলোক উত্তীর্ণা হইয়াছেন। উত্তীর্ণাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রবেশিকা।

নাম	বিদ্যালয়	বিভাগ
বিভুবালা দত্ত	বেথুন	১ম
রাজকুমারী বসু	ঐ	,,
কামিনী বসু	ঐ	২য়
সরযূবালা রায়	ঐ	,,
সাবিত্রী সরকার	ঐ	৩য়
শৈললতা চক্র	,,	,,
মৃণ্ময়ী সেন	ব্রাহ্ম বালিকা	১ম
কুমুদিনী মিত্র	,,	২য়
লীনা ঘোষ	লোরেটো	১ম
অমীয়া রায়	,,	,,
মিনী রায়	,,	,,
আনা জোয়াব	,,	,,
মাকফার্সন আডা	ঐ দার্জিলিঙ	১ম
ওব্রায়েন কাথলিন	,,	,,
ওথিলিয়া ওয়ার্নিগ	,,	,,
যোজেফাইন	,,	,,
লিওনোরা গ্রেণন	লামার্টিনিয়ার	১ম
ইলিওনোর মার্টিন	,,	,,
ক্লারা পার্সলা	মিস্ ওব্রায়েন্স	১ম
এস্ সিনক্লেয়ার	ডবটন	২য়
সি পেরিয়া	,,	২য়
রথ ওয়েলকিন	সেণ্টযোজেফ	২য়
ইসাবেল মোরে	,,	,,
বেলা এণ্টনি	,,	,,
বোলান বন্দ্যো	,,	,,
ন্যান্সী মার	,,	,,
ফ্লোরেন্স মেরী	মেথডিষ্ট	২য়
ইয়ং এষ্টন	,,	,,
এলেন ওয়াকার	ইংরাজ বালিকা	,,
এলেন কারী	রেঙ্গুণ	,,
এডিথ হানে	,,	,,
সুরেন্দ্রবালা পাল	চৌধুরী প্রাইবেট	২য়
বসন্তকুমারী বসু	,,	৩য়
স্যার্লট রাম্‌সডেন	,,	,,

এফ, এ।

স্নেহলতা মজুমদার	বেথুন	১ম
সমুয়েল ইসাবেলা	,,	,,

সৌদামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	৩য়
ডি সুজা জোসেফাইন	,,	,,
সুপ্রভা গুপ্ত	,,	,,
সরোজিনী ঘোষ	,,	,,
কুসুমকুমারী ঘোষ	,,	,,
শৈলবালা হাজরা	ডবটন	২য়
সিলবিয়া লাপলাস	প্রাইবেট	২য়

বি এ।

সরলা সেন	বেথুন কলেজ	ইং অনর ২য়

২য় এম বি।

কোহেন রাচেল	মেডিকেল কলেজ	১ম

পি এস্, এম্ বি।

অভয়বালা সিংহ মেডিকাল কলেজ।

প্রাদেশিক সমিতি—জুনের ১০ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত নাটোরে এই সমিতির অধিবেশন হইবে। ইহা জাতীয় সমিতির শাখা। ইহাতে বঙ্গের সকল স্থানের প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং অনেক হিতকর বিষয়ের আলোচনা হইবে।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

অভিষেচন।

(ভারতেশ্বরী আলেকজান্দ্রিণা বিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে)।

১

কনক-অচলে জাগে দিনমণি,
জাগ মা, আমার ভারতজননি!
চারি দিকে উঠে আনন্দের ধ্বনি,
ভাঙ মা ঘুমের ঘোর;
শুভ দিন এ যে বিধাতার দান,
আনন্দ-তরঙ্গে উছলিছে প্রাণ,
উথলিছে সিন্ধু তুলি নব তান,
গৌরবের দিন তোর!

২

ষাটি বর্ষ আজি সুখে রাজ্য করি,
ভারতের রাণী—রাজরাজেশ্বরী,
"হীরক জুবিলী" আনন্দ বিতরি,
করিছেন মহোৎসব;
রাজ-ভক্তি-মাখা তব অই হিয়া,
কেমনে র'বি মা, নীরব হইয়া,
যা' কিছু বিষাদ, আজি পাসরিয়া,
গাও অভিষেক স্তব!

৩

মনে পড়ে আজ, তোমার সন্তান,
যবন পরশে বিকৃত পরাণ,
হারাইয়া নিজ ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান,
হয়েছিল পশু মত;
তাই ইংরেজেরে সাধিয়া আনিল,
রাজ-সিংহাসনে সুখে বসাইল,
ভারতের হিতে বৃটন খাটিল
অবিরাম, অবিরত!

৪

আজি যে লভিছে ভারতনন্দন,
ঊষার আলোকে নবীন জীবন,
চিনিছে পৈতৃক অমূল্য রতন,
বৃটনেরি শিক্ষা-ফল;

ভারতে যে নারী "ঘৃণ্য" নহে আজ,
তাদেরো উন্নতি চাহিছে সমাজ,
তাও শিখাইছে সুসভ্য ইংরাজ,
চাহে সদা সুমঙ্গল !

৫

তাই ডাকি উঠ, জননি আমার,
ভুলে যাও ব্যথা যত আপনার,
ভক্তি কৃতজ্ঞতা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াও সুখের ঠাঁই ;
দেখি এক দিন, আনন্দের ভরে,
"বিজয়ী বিজিত" ভুলি পরস্পরে,
"ভিক্টোরিয়া" নামে স্নেহ সমাদরে,
মিলে যা'ক ভাই ভাই !

৬

"ভারত-সাম্রাজ্ঞি ! হও চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা, পৃথিবী,
তোমার সুখ্যাতি পরশিছে দিবি !"
গাও গীতি খুলি মন ;
রাণীর চরণে কি দিবে জননী,
নাই আর তব "কোহিনুর মণি"
বুকে নাহি আর রতনের খনি,
নাই "শিখি-সিংহাসন !"

৭

কি দিবে মা আজি রাজ-উপহার,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, নিত্য ঘরে যার.
নিত্য মহামারী, নিত্য হাহাকার,
কি দিবে সে রাজ-করে ?
তা ব'লে কেন বা সঙ্কুচিত-মতি,
তোর রাণী যে মা' বড় দয়াবতী,
অনাথ কাঙালে স্নেহের সন্ততি,
চির দিন মনে করে !
ও পোড়া কপালে ছিল বুঝি জোর,
দীন দয়াময়ী তাই রাণী তোর.
তোরি দুখে তাঁর নেত্রে বহে লোর,
বেশী কি বলিব আর—
হেন জননীর অভ্যুদয়-দিন,
ভাঙা বুকে জাগে উদ্যম নবীন,
দিয়ে তপ্ত রক্ত—রাজভক্তি চিন্,
গাঁথ মা, রুদ্রাক্ষ-হার !

৮

পঞ্চ বিংশ কোটী শিশুর হৃদয়,
হোক নিরমল-রাজভক্তিময়,
"ভূদেবতা রাজা" আর্য্য ধর্ম্মে কয়—
"প্রতিনিধি দেবতার" ;
নিরাপদ ভূপে, রাখিবার তরে,
ধন প্রাণ প্রজা, সুখে পরিহরে,
এ দৃশ্য ভারতে প্রতি ঘরে ঘরে,
ইতিহাস সাক্ষী তার ! ৯

১০

যদি এ ভারত আজি শত হেয়,
প্রীতির উচ্ছ্বাস তবু অপ্রমেয়,
রাজ-ভক্তি তার অসীম অজেয়,
(কেই বা বুঝিবে হায় ;)
সেই ভক্তিভরে গাও মা ভৈরবী,
"ভারত-সাম্রাজ্ঞী, হয়ে চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা পৃথিবী,
বিধাতার করুণায়।"

জুন, ১৮৯৭। শ্রীমা—

মতিমালা।

১। দয়া রাজমুকুটের স্বর্গীয় ভূষণ।

২। প্রেম দ্বারা যে ব্যক্তি হৃদয়কে জয় করিতে পারে, সেই বিশ্বজয়ী।

৩। ন্যায়ের পক্ষে আর কেহ না থাকুক, ঈশ্বর ও আমি আছি।

৪। ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয়।

৫। ঈশ্বরের সহিত এক জন লক্ষ জনের অপেক্ষা বলবান্।

৬। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও।

৭। যে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া জানে, সেই মূর্খ ; যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞ বলিয়া জানে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

৮। ঐশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ হইলে তৃণ বজ্র হয় ; ঐশ্বরিক শক্তি-বিহীন হইলে বজ্র তৃণ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

ডাক্তার রামগোপাল ঘোষ

বা

যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ।

১

বিগত পাদ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে আমাদের দেশে নানাবিধ রোগের এপিডেমিক্ হইয়াছে। যে সকল রোগ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট স্থানের মধ্যে সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করে, তাহাকে এপিডেমিক কহে, যেমন মেলেরিয়া জ্বর, বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি। এ দেশে রেলওয়ে লাইন ও পুলিস লাইনেও ঐরূপ একটী নব এপিডেমিকের সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং উহা ঐ দুই লাইনের বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করিয়া এক প্রকার বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। রোগটীর প্রকৃতিও অতি বিচিত্র। অন্যান্য রোগ, যার হয়, সেই মরে, বা অনেক দিন ভোগে ; এ রোগ হয় একজনের, মরে অন্যে। রেলওয়ে ও পুলিস লাইনের কি ছোট, কি বড়, প্রায় সকল কর্ম্মচারীই ঐ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ রোগে মরিতেছে দেশের অন্যান্য লোকে।

প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট, যে কোন বিষয়ে প্রজার দুঃখ দূরীকরণে সর্ব্বদাই উন্মুখ ; কিন্তু ঐ দুই লাইনের এপিডেমিক নিবারণে তাঁহাদিগেরও বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। যাহা হউক, যখন রেল ও পুলিস লাইনের রোগে মরিতেছি আমরা, তখন উহার উপযুক্ত ঔষধ অনুসন্ধান করা আমাদেরই কর্ত্তব্য। আমি দৈবাৎ ঐরূপ একটী অপূর্ব্ব ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য অদ্য তাহা প্রকাশ করিলাম। ইহার ফলাংশে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না; কারণ উহা পরীক্ষিত ঔষধ। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরীক্ষাফলও প্রকাশিত হইবে।

কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, আভিজাত্য ইত্যাদির সন্ধান করা আবশ্যক হয়। আমি নদীয়া জিলার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, ঐ জিলার কোন প্রধান জমীদারের জামাতা এবং আমার নাম হীরালাল প্রামাণিক,জাতিতে তিলি। প্রথমে দেশীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া পরে কোন সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপকের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করি। অনন্তর কৃষ্ণনগর কালেজে, পরে প্রেসিডেন্সি কালেজে কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করি এবং কয়েকটী পরীক্ষা দিয়াও উত্তীর্ণ হই। পরে বড় বড় সওদাগরী আফিসে চাকরী করি এবং কিছু কাল কোন ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজারী পদেও কার্য্য করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কোন কাজ কর্ম্ম করি না; কিন্তু নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া থাকিতেও ভাল লাগে না। তজ্জন্য রেল ও পুলিস লাইনের ভীষণ এপিডেমিক্ রোগের দৈবলব্ধ ঔষধটী, বিনামূল্যে সাধারণকে বিতরণ করিবার কার্য্যে আপাততঃ ব্যাপৃত হইয়াছি। এই ঔষধের প্রয়োগ ও সেবনে ক্রমে ক্রমে উক্ত রোগের প্রতীকার হয়, ইহাই আমার বাসনা।

যখন কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যয়ন করি, তখন একদা কোন সতীর্থ বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলাম। ঐ বন্ধুর বাটী ই, বি, এস্, রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী 'মাটিয়ারি' গ্রামে। তখন ঐ গ্রামের ষ্টেশনটি নূতন খুলিয়াছে। ষ্টেশনের ঘর দ্বার কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই,—একখানি ক্ষুদ্র খড়্যা চালায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কেবল পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি পাকা প্লাটফরম্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চালাখানির আশ পাশে কয়েকটি বড় বড় আমের গাছ ছিল। আমি বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া একদিন প্রত্যূষে কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন বাসনায় ঐ ষ্টেশনে উপস্থিত হই। তখন বগুলার দিকে গাড়ী আসিবার অনেক বিলম্ব ছিল। ষ্টেশন সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং তখন তথায় একখানিও দোকানঘর হয় নাই। আমার একটু বিশ্রাম করিবার এবং একবার ধূমপান করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। ষ্টেশন-চালার সম্মুখভাগে একটী বাবু উপবিষ্ট ও দুই একটী খালাসী তাঁহার আদেশ পালনে ব্যাপৃত থাকায় সহজেই অনুমান করিলাম, ঐ বাবুটীই ষ্টেশনমাষ্টার; কিন্তু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমার সাহস হইতেছে না। কেননা ষ্টেশনমাষ্টার, বা বড়বাবু, বুকিং বাবু, তারের বাবু, গুডসের বাবু প্রভৃতি বাবুগণের এবং চাকর, চাপরাসী, খালাসী প্রভৃতি ষ্টেশনের ভৃত্যগণের স্বভাব চরিত্র অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল এবং স্থানে স্থানে ঘটনাসূত্রে তাহাদিগের

কর্ম্মজীবনের বিষময় ফলও বিলক্ষণরূপে উপভোগ করা ছিল। কত স্থানে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত বিড়ম্বনা, তাহাদিগের দ্বারা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাও মনে জাগিতেছিল। ষ্টেসনের চাকর ও আমলাগণের দ্বারা কত স্থানে, কত ভদ্রলোকের অবমাননা ও বিড়ম্বনা হইয়াছে, তাহাও আমার অনেক জানা ছিল। সুতরাং সেই বাবুটীর দিকে অগ্রসর হইতে, কি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমার সাহস হইতেছে না। এদিকে রৌদ্রের উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় একটু ছায়া পাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ধূমপিপাসাও ক্রমশঃ বলবতী। দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া বাবুজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সে দিকে অগ্রসর হইবার সাহস আর কিছুতেই হইতেছে না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি বাবুজীর দৃষ্টি পতিত হইল। ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ হইল, বুকের ভিতর ঢেঁকির পাত পড়িতে লাগিল। আবার সেই সময়ে হঠাৎ চৈতন্য হইল যে, অসাবধানতাবশে আমি তখন ষ্টেসনের চৌহদ্দীর মধ্যগত হইয়া পড়িয়াছি। ভয় দ্বিগুণিত হইল, ভাবিতে লাগিলাম, আজ প্রাতঃকালে, না জানি, আমার অদৃষ্টে কি আছে! বিশেষতঃ এই সময়ে রেল ষ্টেসন সংক্রান্ত একটী অভিনব ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, বাস্তবিকই আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সে ঘটনাটীও এই স্থানে সংক্ষেপে বলিয়া যাই। আমি যখন মাটিয়ারি গিয়াছিলাম, তখন সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস। কারণ তখন গ্রীষ্মাবকাশে কালেজ বন্ধ হইয়াছিল। এই জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বগত আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরবর্ত্তী দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যাকালে তিনটী ভদ্রলোক বাঁশবেড়িয়া হইতে গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে কাঁচড়াপাড়ার ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনটীই ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। তন্মধ্যে একটী প্রাচীন ও অসুস্থ। তিনটীই পথশ্রান্তিতে বিশেষ ক্লান্ত। কাঁচড়াপাড়া হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিবেন। গাড়ীর সময় আর দৌড়াদৌড়ি করিতে না হয়, এই জন্য একেবারে ষ্টেসনের মধ্যে প্ল্যাট্‌ফরমে সাধারণ ভদ্রলোকের বসিবার জন্য যে সকল বেঞ্চি পাতা আছে, তাহার এক সারিতে তিন জনে উপবেশন করিলেন। তিন জনের নিকটই রিটার্ন্ টিকেট্ ছিল, এবং গাড়ী আসিবারও অধিক বিলম্ব ছিল না। ইতিমধ্যে তারের ঘর হইতে একটী তরুণবয়স্ক বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপবিষ্ট পথিক তিনটীকে রুক্ষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কারা?" পথিক ভদ্রলোক তিনটী কহিলেন,—"আমরা পথিক, বগুলা যাইব।" এই কথা শুনিবামাত্র বাবুজী ক্রোধে অন্ধ হইয়া—"বগুলা যাইবে ত এখানে কেন? বাহিরে গিয়া গাছতলায় বইস,—এ তোমাদের মত বাবুর বসিবার স্থান নয়।" পথিকের অন্যতর কহিলেন,—"আপনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে কি এইরূপ ভাষায় কথা কহিতে হয়?"

বাবু,—বিকৃত স্বরে,—"আর ভদ্রলোক হতে হবে না,—চলে যাও।" পথিকগণের মধ্যে একজন কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনার আদেশমাত্রে আমাদের গায়ে ত পাখা উঠিল না যে, উড়িয়া যাইব;—জিনিস পত্রগুলা গুছাইয়া লইয়া যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া বাবুজী কহিলেন,—

"হুঁ, আবার রসিকতা দেখ্‌ছি,--নিকাল হিঁয়াসে, কই হায়্‌ রে।" ভদ্রলোক তিনটী খালাসীর হস্তে 'অর্দ্ধচন্দ্র' লাভ করিয়া অধিকতর অপমানের শঙ্কায় সত্বর প্রস্থান করিলেন।

ঐ তিনটী ভদ্রলোকের মধ্যে একজন আমার বন্ধু। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম।

(২)

মাটিয়ারি ষ্টেসনের চালা-ঘরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে স্বগণপরিবেষ্টিত কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট বাবুটী আমার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে আমার যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত অভিনব ঘটনাটী স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমার রেল-বাবু-ভীতি যে দ্বিগুণিত হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি। উক্ত বাবুটী কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া ছাড়িলেন না,—সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া আমার নিকটস্থ হইলেন, এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"মহাশয়,আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথা যাইবেন? আপনাকে একটু ক্লিষ্টও বোধ হইতেছে। এখনও গাড়ীর অনেক বিলম্ব আছে, একটু বসিয়া কেন বিশ্রাম করুন না।" আমি মনে মনে (এটী রেল-বাবু নহে,—রেল-বাবুর মুখে এমন কথা কখনই হইতে পারে না) এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মহাশয়, আমি কে, কোথায় যাইব,—সে কথা পরে বলিব;—অগ্রে আপনি দয়া করিয়া বলুন,—আপনি কে?" তখন বাবু আপনাকে মাটিয়ারির ষ্টেসনমাষ্টার বলিয়া পরিচয় দিলে আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম—

"মহাশয়, এপারে রেলের সৃষ্টি হইয়া অবধি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং রেলের ছোট বড় অনেক বাবু দেখিয়াছি। প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, গর্ব্বিত, অসৎ, দুর্বৃত্ত, দুরাচার ও নিষ্ঠুরের একশেষ। কাহারও হৃদয়ে এক বিন্দু মানুষের রক্ত আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় নাই। আপনার ন্যায় ভদ্রলোক, পূর্ব্ব ভারত, কি পূর্ব্ব বঙ্গ রেলের কোথাও আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না।" বাবুজী আমার কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি রেল-বাবুদিগের যেরূপ চরিত্র বর্ণন করিলেন, আমিও ঠিক্ ঐরূপ ছিলাম,—এখন দায়ে ঠেকিয়া ভদ্রলোক হইতে হইয়াছে।"

"দায়ে ঠেকিয়া ভদ্রলোক হইতে

হইয়াছে।" কথাটী বড়ই সরস বোধ হইল, এবং ব্যাপারটা কি শুনিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। বাবুকে ধরিয়া বসিলাম। এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাবুটী আমাকে লইয়া গিয়া একাকী গাছতলার শীতল ছায়ায় চেয়ারে বসাইলেন,—হুঁকার জল বদলাইয়া স্বহস্তে আমের পাতার নল তৈয়ার করিয়া চাকর দ্বারা তামাক দিলেন। আমার উপবেশনের পরও অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন,—আমার বিশেষ অনুরোধে একখানি ক্ষুদ্র টুলে আমার বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ শুনিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় কহিতে লাগিলেন—

"মহাশয়, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি দুঃখিনীর সন্তান। বাল্যকালে পিতৃহীন হই। মা আমার অনেক দুঃখে আমাকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইলেন। তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর উপরে পড়াশুনা করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই সময়েই কিছু কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টায় আমাকে স্কুল ছাড়িতে হয়। আমার বাড়ী হুগলী জেলার কোন গ্রামে। নিকটবর্ত্তী কোন বড় রেল ষ্টেসনে কয়েক মাস কার্য্য শিখিলাম। কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রেল-বাবুদিগের ধরণ ধারণটাও অনেকটা শিখিয়া ফেলিলাম। ক্রমে ১০৲ দশ টাকা বেতনে সেই ষ্টেশনেরই টিকিট্ বাবুর সহকারী (Assistant) হইলাম। বেতনের কিছু মাকে দি, কিছু খরচ করিয়া নিজের সক্‌ মিটাই। এইরূপে কিছুকাল গেল। এই সময়ে মগরায় নূতন ষ্টেসন খুলিল। এই মাটিয়ারির ষ্টেসনের এখন যে অবস্থা দেখিতেছেন, তখন মগরা ষ্টেসনের ঠিক্ সেই অবস্থা। এক খড়ের চালা ও দুই প্লাট্‌ফরম ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আমাকে সেইখানকার 'ষ্টেসনমাষ্টার' করিয়া পাঠাইল। বেতন ছিল দশ টাকা, হইল পঁচিশ টাকা, ছিলাম ছোট টিকিট বাবু—হইলাম ষ্টেসনমাষ্টার। সেখানে কয়েকটী বড় বড় বাবু, মাথার উপর সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করিতেন,—এখানে আমি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীন রাজা। আট দশ জন চাকর আমার হুকুমে খাটে। চাকর চাকরাণী কাহাকে বলে, পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। বাড়ীতে আধ পয়সা,—বড় জোর এক পয়সার চুনো মাচ আসিত, মা তাহা শাক পাতাড় দিয়া রাঁধিতেন। আমিও তাহা খাইয়া কৃতার্থ হইতাম। মগরায় রোজ রোজ বড় মাচ, হাঁসের ডিম, মধ্যে মধ্যে পাঁঠা,—ঘি,—দুধ, মহাশয়, বলিব কি, মাথা গরম হইয়া উঠিল। শুধু আমি নই,—রেলের বাবুমাত্রেরই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে; কেননা রেল-বাবুদিগের শিক্ষা ও পূর্ব্বাবস্থা প্রায়ই আমার মত। সেই জন্যই রেলের নাম (অধম-তারিণী)। যাহা হউক, এইরূপে মনের আনন্দে রাজত্ব করি। ধরাকে সরা বোধ হইতে লাগিল। কত ভদ্রলোকের অপমান করিলাম। কত রেল-ভ্রমণকারিণী রমণীকে বেপরদা করিলাম।

ছলে বলে কত অবগুণ্ঠনবতী কুল-ললনার রূপযৌবন সন্দর্শন করিলাম।”

বাবুটীর সরলতা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেছি এবং ক্রমাগত সাধুবাদ দিতেছি। বাবুটীও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া এবং তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণে আমাকে নিতান্ত প্রীত ও অবহিত দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাহা শুনিয়া আমার বড়ই সুখ হইতেছিল। কহিলাম,—

“তার পর ?”

“তার পর ঐরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমা অপেক্ষা বড় কেহ আছে, কি আলাপ পরিচয় করিবার উপযুক্ত কোন লোক আছে; তখন এরূপ চৈতন্যই ছিল না। একদিন প্রাতঃকালে, যেমন আপনি অদ্য আসিয়াছেন, তেমনি একটী বাবু ঠিক্ আপনার মত পরিচ্ছদে (কাটা পোসাকে) পূর্ব্ব দিকের বেড়া পার হইয়া প্লাটফরমে আসিলেন। এদিক ওদিক পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তখন গাড়ী আসিবার একটু দেরি আছে। তথাপি ভাঙা বেড়া ডিঙ্গান ও নবাবপুত্রের ন্যায় প্লাটফরমে বেড়ান দেখিয়া জ্বলিয়া গেলাম। ত্বরিতপদে তাহার নিকটস্থ হইয়া হাত মুখ ঘুরাইয়া বলিলাম, ‘আপনার ভারি বে আদবি,—এখানে এরূপে বেড়াইবার নিয়ম নাই, শীঘ্র বাহিরে যাউন ?’ মহাশয়, বলিব কি, এই কথা যেমন বলা, বাবুর ছিল মোটা পিচের সোটা, আমার গায়ে একদিক হইতে প্রহার আরম্ভ হইল। তার এক এক আঘাতে আগুন ছুটিতে লাগিল। মহারাণীর দোহাই দিয়া কত চীৎকার ও কত রোদন করিলাম,—একটী প্রাণী সে দিকে অগ্রসর হইল না। যতক্ষণ খাড়া ছিলাম, ততক্ষণ সোটার আঘাত চলিল। যখন আর যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া ‘পপাত ধরণীতলে’ হইলাম, তখন সবুট পদাঘাতে প্লাটফরম হইতে লাইনে নিক্ষেপ করিয়া বাবুটী পূর্ব্ববৎ পায়চারি করিতে লাগিলেন। গাড়ীও আগতপ্রায় হইল। সুতরাং তখন খালাসীরা আসিয়া আমাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী আসিল। সবুট সোটাধর বাবু গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিন দিনের মধ্যেই আমার জবাবের হুকুম আসিল। পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, বাগাটীনিবাসী সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ, যাঁহার খাতিরে মগরার ষ্টেসন হইয়াছিল, আমি তাঁহারই হস্তে পড়িয়াছিলাম। সেই প্রহারের বেদনা সারিতে ৩।৪ মাস লাগিয়াছিল। তাহার পর আরও বৎসরাবধি উমেদারী করিতে করিতে হাড়ে দুর্ব্বা গজাইল, অন্নকষ্টের একশেষ হইল। তথাপি ও লাইনে আর চাকুরী পাইলাম না। সম্প্রতি ২।৩ মাস মাত্র এই লাইনের এই চাকুরী পাইয়াছি। এ ষ্টেসনটীও নূতন, আপনিও প্রায় সেই ভাবে সমাগত। কাহাতে কি আছে, মহাশয় কিছুই জানা যায় না। আপনার সঙ্গে অভদ্রতা করিয়া কি আবার মুখের অন্ন হারাইব ? তাই মহাশয় এখন ভদ্রলোক হইয়াছি।”

“কিল খাইয়া কিল চুরি করে” এদেশের একটী সাধারণ প্রবাদ এবং প্রায় সকল লোকেই ঐ প্রবাদ অনুসারে চলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বাবুটী আপনার নিদারুণ অপমান ও বিষম বিড়ম্বনা লাঞ্ছনার বিন্দু বিসর্গ গোপন না করিয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন। আমি তাঁহার অসাধারণ অমায়িকতা ও সরলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যথাকালে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম রামগোপাল ঘোষ যথার্থ ডাক্তার এবং রোগীর বিষম রোগের উপযুক্ত ঔষধ দিয়া তাঁহাকে বেশ আরোগ্য করিয়াছেন। এক্ষণে রেল কর্ম্মচারীদিগের এপিডেমিক রোগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব দর্শনে তাঁহাদিগের আরোগ্য কামনায় ঐ দুষ্প্রাপ্য ঔষধটী সাধারণ সম্পত্তিরূপে প্রকাশ করিলাম। ঔষধটী অব্যর্থ। কিন্তু আমরা আশা করি, এই ঔষধের নিদান পাঠেই অনেক রোগীর রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ফিন্‌লণ্ডদেশীয় প্রবচন।

১। সুজন এক মুষ্টি শস্য হইতেও অপরকে দান করিবে, কিন্তু দুর্জ্জন ছালা-পূর্ণ শস্য হইতেও এক মুষ্টি কাহাকেও দিবে না।

২। জ্ঞানী ব্যক্তি কি করিতে হইবে জানেন, কিন্তু নির্ব্বোধেরা কেবল হাতড়াইয়া বেড়ায়।

৩। অশ্রুপাতে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, দুঃখ করিলে অমঙ্গল নিবারিত হয় না।

৪। জ্ঞানীরা সর্ব্বস্থান হইতে জ্ঞান শিক্ষা করেন, নির্ব্বোধদিগেরও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা উপকার লাভ করেন।

৫। প্রভাতকাল দেখিলেই দিনটা কিরূপ যাইবে, বুঝা যায়। ভদ্র লোকের আকৃতি দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়।

৬। যে কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল শেষ হইল। “আমি কি করিব” এ কথা বলিতেও সময় নষ্ট হয়।

৭। পরিশ্রমী লোকের হাতের যন্ত্র সর্ব্বদা সুশাণিত, কিন্তু অলসের অস্ত্র ভোঁতা, কেবলি শাণাইতে হয়।

৮। বিদেশী লোক আমাদের ভাই ; যে বহুদূরদেশ হইতে আইসে, সে আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব।

জলজন্তুদিগের যুদ্ধ।

আমরা মনুষ্য, স্থলরাজ্যে বাস করি—মনে করি এখানকার অধিবাসীরাই বিবাদ কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে সতত রত ; এবং সময় সময় জলযুদ্ধ হইয়া সমুদ্র যে রক্তাক্ত হয়,

সেও স্থলবাসীদিগের কার্য্য দেখিতে পাই। কিন্তু জলরাজ্যে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারাও নিরাপদ শান্তি ভোগ করিতেছে না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার সেখানেও সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে। তবে আশ্চর্য্য এই, জলরাজ্যে প্রবলে দুর্ব্বলে যুদ্ধ হইয়া অনেক সময় প্রবল পরাজিত ও হত হয়, তাহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে কতকগুলি ইংরাজ আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদে ভ্রমণ করিতে যান। এই নদের মুখ বহুদূরবিস্তৃত সাগরের ন্যায়। জাহাজে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পান, তিমি ও খড়্গী মৎস্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। পাঠিকারা জানেন, তিমিঙ্গিল বা তিমি মৎস্য পৃথিবীর সমস্ত জন্তু অপেক্ষা বৃহদাকার ও মহাবলশালী। ইহা দীর্ঘে ৭০।৮০ হাত হইয়া থাকে। ইহা সমুদ্রে একখানি পোতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। জলরাজ্যের রাজা হইয়া এরূপ প্রাণী সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে অবশ্যই আশা করা যায়, কিন্তু ইহার অনেক শত্রু এবং তাহাদিগের জন্য ইহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এখানে খড়্গী মৎস্য যুদ্ধে এক সহচর পাইয়াছে, সে একটী (Thresher) থ্রেসার মৎস্য, দীর্ঘে ১০।১১ হাত হইবে। ইহা রাঘব-বোয়াল জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ, এবং উদর সাদা। খড়্গী এবং এই থ্রেসার মৎস্যের কেহই তিমি-মাংস ভক্ষণ করে না, সুতরাং কেবল বিদ্বেষবুদ্ধিতে উভয়ে মিলিত হইয়া যে মৎস্যরাজকে জব্দ করিতে আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মৎস্যদিগের বুদ্ধি কম বলিয়া সচরাচর লোকের সংস্কার, কিন্তু যাহারা মহাকায় সাধারণ শত্রুকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য এক যোগে ও এক পরামর্শে কার্য্য করিতে পারে, তাহাদের বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

তিমিকে আক্রমণ করিবার সময় থ্রেসার জলের উপর ভাসিয়া থাকে, আর খড়্গী মৎস্য জলে ডুবিয়া তিমি মৎস্যের পেটের তলায় গিয়া সবলে খড়্গ প্রহার করে। তিমি প্রহারে ব্যথিত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে, সেখানে থ্রেসার লাঙ্গুল দ্বারা ক্রমাগত তাহাকে আঘাত করে। ঘটনাখ্যায়ক গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি দেখিলাম তিমি তাহার বৃহৎ পৃষ্ঠদেশ ভাসাইয়া বার বার জলের উপর উঠিল, এবং সেখানে থ্রেসার যষ্টি প্রহারের ন্যায় ক্রমাগত লাঙ্গুলাঘাত করিয়া তাহাকে অস্থির করিল। তিমি মুখ গুঁজিয়া সজোরে জলগর্ভে প্রবেশ করিল এবং লাঙ্গুলাস্ফালনে জলের উপরিভাগ তোলপাড় করিতে লাগিল, তাহার এক ঘা খাইলে থ্রেসারকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শত্রু বুদ্ধিপূর্ব্বক লাঙ্গুল এড়াইয়া মস্তকের দিকে সরিয়া পড়িল। অন্য দিকে খড়্গী প্রস্তুত হইয়াছিল, আবার জলমধ্যস্থ তিমি-শরীরে তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। তিমি অস্থির হইয়া আবার

জলপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, সেখানে থ্রেসার ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত করিতে লাগিল। তিমি লাঙ্গুল গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল, থ্রেসার সরিয়া পড়িল। তিমি ডুবিতে যায়, খড়্গীর খড়্গাঘাত খায় এবং ভাসিতে যায়, থ্রেসারের লাঙ্গুলাঘাত পায়। এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বার বার ডোবা ওঠা করিতে করিতে সে ক্লান্ত হইতে লাগিল, তাহার বিপক্ষদ্বয় ঠিক সুযোগ বুঝিয়া দুই দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিরুপায় করিল। তিমি উষ্ণশোণিত জন্তু, বহুক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। নিঃশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে উপরে উঠিতে হয়; বিশেষতঃ খড়্গীর ঘন ঘন তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সে না ভাসিয়া থাকিতে পারে না। তখন সে মস্তকের ছিদ্র দিয়া গভীরগর্জ্জনে জলরাশি ফুৎকার করিয়া প্রস্রবণ উৎপাদন করিতে লাগিল, লাঙ্গুল তাড়নে তুফান ছুটাইয়া সমুদ্রে যেন প্রবল ঝটিকা তুলিল—মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল, তথাপি শত্রুরা তাহাকে ছাড়িল না। এক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তিমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। কানাডাবাসীরা বলে খড়্গী ও তিমি মৎস্যে অনেক সময় এইরূপ মহাযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে তিমি মারা গিয়া থাকে। খড়্গী একা কিন্তু কিছুই করিতে পারে না, সময় সময় তাহার অস্ত্র তিমিশরীরে বিদ্ধ হইয়া সে আটকাইয়া যায় এবং মারা পড়ে। থ্রেসারও তিমি দ্বারা কবলিত হয়। যাহাহউক জলজন্তুগণ এইরূপে পরস্পরে বিবাদ করিয়া মারা গেলে মানবেরাই লাভবান্ হয়, কারণ তাহারা এই মৃত মৎস্য সকলের শরীর হইতে সহজে প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব।

(৩৮৮ সংখ্যা—২০ পৃষ্ঠার পর)

সার রবার্ট পিলের মন্ত্রিত্বকালে স্কট্লণ্ড প্রেসবিটিরিয়ান্ সম্প্রদায় হইতে ফ্রি চর্চ্চ নামক নূতন দলের সৃষ্টি হয়। আয়র্লণ্ডে রোম্যান ক্যাথলিক কলেজের গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইহার বিরোধী ছিলেন বলিয়া তিনি মন্ত্রিসভার পদ পরিত্যাগ করেন। সার রবার্ট পিল রাজস্বব্যবস্থা বিষয়ে পিট্ এবং হাসকিসনের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

ইংলণ্ডে বিদেশীয় শস্য আমদানীর অনুকূল ও প্রতিকূল দুই দল ছিল। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইহাঁরা আপনাপন মত জয়যুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার উপায় অনুসন্ধান করেন। কব্ডেন ও ব্রাইট স্বাধীন বাণিজ্যের সাপক্ষ ছিলেন

এবং শস্য আইন এককালে রহিত করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৪৫ সালে আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ ঘটনা তাঁহাদের সহায় হইল। আয়র্লণ্ডবাসী-দিগের প্রধান খাদ্য গোল আলু; গোল আলুর চাষ না হওয়াই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। আয়র্লণ্ডে বিদেশীয় শস্য আমদানীর সুবিধা করিতে না পারিলে পর বৎসরও দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পিল স্বয়ং শস্য আইনের বিরোধী হইলেও রক্ষণশীলদলের অনুরোধে কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৮৪৬ সালে স্বাধীন বাণিজ্যানুরাগী গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার সহকারী হইলে উভয়ে মিলিয়া শস্য আইন রহিত করিলেন। ইহা দ্বারা শস্য স্বল্প-মূল্য হইল এবং সাধারণতঃ দেশের মহো-পকার সাধিত হইল। কিন্তু কৃষিজীবীরা এই ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কমন্স সভায় একটী পৃথক্ দল সংগঠিত করিল। লর্ড জর্জ্জ এবং ডিসরেলী তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। ইহাঁরা যে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, তাহাতে রবার্ট পিলকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল। লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া লর্ড পামারষ্টোনকে বিদেশীয় সেক্রেটারী করিলেন।

১৮৪৮ সাল একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজ-ধানীতে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। ফ্রান্সে লুই ফিলিপের রাজত্ব ধ্বংস করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন। জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশেও প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের আন্দোলন হয়। আয়র্লণ্ডে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ ৩।৪ বৎসর চলিয়াছিল। গবর্ণ-মেণ্টের কঠোর শাসনে তাহার শান্তি হয়। লণ্ডনে চার্টিষ্টগণ পার্লামেণ্টে এক বৃহৎ আবেদনপত্র অর্পণ করিতে এবং বিদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য ডিউক অব ওয়েলিংটনকে সৈন্য সসজ্জ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল; কিন্তু চার্টিষ্টদিগের চেষ্টা "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হওয়াতে অচিরে ইংলণ্ডে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ সালে পার্লামেণ্ট অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধি-কার দেন, তাহা দ্বারা অচিরকাল মধ্যে উপনিবেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই বৎসর নাবিকতা আইন রহিত হয়। ১৮৫০ সালে সার রবার্ট পিলের মৃত্যু হয়। লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ একবার ত্যাগ করিয়া আবার তাহা পুন-র্গ্রহণে বাধ্য হন।

১৮৫১ সালে প্রিন্স আলবার্টের যত্ন ও চেষ্টায় লণ্ডনে মহাপ্রদর্শনীর সৃষ্টি হয়। এতদুপলক্ষে যেরূপ জনতা ও সমারোহ হয়, পৃথিবীতে কস্মিন্‌কালে আর কোনও মেলাতে বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। ইহার দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে আশা হইয়াছিল যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ অন্তর্হিত হইল এবং

বাণিজ্য-যোগে পৃথিবীর সকল জাতি এক মহাজাতিতে পরিণত হইল।

১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিয়ন সেনাবল এবং কৃষিদলের সাহায্যে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনার হস্তে সমুদায় রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন পরে সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হন। নেপোলিয়নের এই কার্য্যে ইংলণ্ড ভয়াক্রান্ত হইয়া আপনার সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। এই সময়ের আন্দোলনে লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করাতে প্রথমে লর্ড ডারবি এবং তৎপরে লর্ড এবারডিনের মন্ত্রিদল ইংলণ্ডের রাজকার্য্যের পরিচালক হন।

১৮৫৪ সালে রুষীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় জার নিকোলাস্ রুষিয়ার সম্রাট্। তুরুস্কবাসী খৃষ্টীয় প্রজাদিগকে আশ্রয়দানে তাঁহার অধিকার আছে এই কথা স্বীকার করিবার জন্য তিনি তুরস্কের সুলতানকে লিখিয়া পাঠান। রুষিয়া এই অধিকার পাইলে তুরুস্কে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে ভাবিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সুলতানের সপক্ষ হইয়া রুষিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তুরুস্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সিবাষ্টপুল নগর অবরোধ করেন। এখানে রুষীয়-দিগের প্রধান অস্ত্রাগার ছিল। আমা ও বালাক্লাভাতে দুইটী যুদ্ধ হয়, উভয় যুদ্ধেই রুষিয়ার পরাজয় হয়।

১৭৫৫ সালে এবারডিন মন্ত্রিদলের স্থানে লর্ড পামারষ্টোনের মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হয়। সিবাষ্টপুল শত্রুদিগের হস্তগত হয়, কিন্তু রুষিয়া তুরস্কের কার্সনগর অধিকার করেন। যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ লাভ না হওয়াতে ১৮৫৬ সালে পারিসে সন্ধি স্থাপিত হয়। রুষিয়া সিবাষ্টপুল পুনরায় গড়বন্দী করিবেন না এবং কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধজাহাজ রাখিবেন না বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৭০ সালে সন্ধিপত্রের এ নিয়ম অগ্রাহ্য করেন।

১৮৫৬ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। ১৮৩৯ সালে চীনের সহিত ইংলণ্ডের প্রথম যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংলণ্ড জয়ী হওয়াতে হংকং নগরে ইংরাজদিগের অধিকার স্থাপিত হয়, এবং চীনের আরও কয়েকটী নগরে ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার অধি-কার পান। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ ইংরাজদিগের দোষেই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলিতে চলিতে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহের অনেকগুলি কারণ ছিল, তন্মধ্যে এই কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়—(১) লর্ড ড্যালহাউসির পররাজ্য গ্রহণ; (২) জনরব যে বন্দুকের টোটা গরু ও শূকরের চর্ব্বি দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা দাঁত দিয়া কাটিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর জাতি যাইবে; (৩) ভবিষ্যদ্বাণী—১৮৫৭ সালে পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজেরা যে রাজ্য পান, ১০০ শত বৎসর পরে তাহার বিলোপ হইবে।

বিদ্রোহের লক্ষণ প্রথমে বঙ্গদেশে বারাক-পুরে প্রকাশিত হয়, পরে ইহা সমুদায় বঙ্গদেশ, বেহার ও উত্তরপশ্চিমে ব্যাপ্ত হইয়া

পড়ে। সিপাহীরা মোগল সম্রাটের এক বংশধরকে সিংহাসনে বসাইয়া চারি দিকে মহামারী আরম্ভ করে। লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে বিদ্রোহীদিগের আর দুইটী প্রধান আড্ডা হয়। কানপুরে সাহায্য আসিতে না আসিতে তত্রত্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ইংরাজ হত হন। শিখ সৈন্যদিগের সাহায্যে পঞ্জাবের কমিশনর সার জন (পরে লর্ড) লরেন্স দিল্লী নগর পুনরুদ্ধার করেন। অবশেষে সার কোলিন কাম্বেল ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিয়া লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করেন এবং দেশময় শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষ মহারাণীর খাস রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ইংলণ্ডস্থ ষ্টেট সেক্রেটরী এবং ভারতীয় রাজপ্রতিনধি বা গবর্ণর জেনারেল দ্বারা ভারত শাসিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)।

কেদার ও অমলা।*

সুখময় আরব † প্রদেশের ইমান বা অধীশ্বর য়ারব অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং প্রজাদিগকে সন্তাননির্ব্বিশেষে পালন করিয়া অতিশয় সুখে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে এক পর্ব্বতশিখরে একটী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার নাম মালী। তিনি ইমানের পরম বন্ধু ছিলেন। মালী জ্ঞানের অবতার ছিলেন, এই জন্য ইমান উপদেশ গ্রহণ ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমন করিতেন।

য়ারবের একমাত্র পুত্র, তাঁহার নাম কেদার। বাল্যকাল হইতে তাহার স্বভাব এপ্রকার বিকৃত যে, পিতা তাহার জন্য সর্ব্বদা দুর্ভাবিত থাকিতেন। য়ারব তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টায় কোন ফল দর্শে নাই। কেদার নীচ লোকদিগের সংসর্গে মিশিত এবং তাহাদিগের তোষামোদে সে নষ্ট হইয়াছিল। য়ারব দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন এই সন্তান ভবিষ্যতে দুরাচারী হইবে এবং অনেক ক্লেশ ভোগ করিবে। পাছে কুসন্তান পৈতৃক ধন সম্পত্তি সকল উড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের নিম্নদেশে এক গভীর গহ্বর খনন করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রভূত ধনরাশি লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। তিনি

* কিডার ও এমিলা নামক আরবীয় উপন্যাস, হইতে সঙ্কলিত। এখানে কিডার 'কেদার' ও 'এমিলা' অমলা।

† আরব দেশ তিন ভাগে বিভক্ত—পার্ব্বত্য, মরুময় ও সুখময় আরব। এই শেষোক্ত প্রদেশ অতি উর্ব্বর ও সর্ব্বপ্রকার সুখের আধার।

সেই গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে তাহার চাবী দিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, যতক্ষণ সন্তানের এক পর্য়সা থাকিবে, ততক্ষণ এ সঞ্চিত অর্থের কথা তাহাকে জানাইবেন না এবং ইহার এক কপর্দ্দকও তাহাকে দিবেন না। যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় ও বিপদাপন্ন হইয়া চৈতন্য লাভ করিবে, তখনই এই গুপ্তধনের বিষয় তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন।

কিছু দিন পরে সাধু য়ারবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে সন্ন্যাসী মালী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁহার অনুরোধের কথা পুনরায় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কেদার ইমান হইলেন। যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা সকলই তাঁহার জুটিল এবং তিনি সদস্যগণের কুপরামর্শে সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার হস্তগত সমুদয় অর্থ নিঃশেষিত হইল। তিনি প্রজাদিগের উপর অতিরিক্ত করস্থাপন করিয়া তাহাদিগের বিরাগভাজন হইলেন।

কেদার শিকার-প্রিয় ছিলেন। এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া তাঁহার নয়নপথে হঠাৎ একটী পরমা সুন্দরী মেষপালিকা পতিত হইল। দরিদ্র বালিকা নির্জন প্রদেশে একাকিনী মেষ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কেদারের চক্ষে সে বড় রূপবতী বলিয়া বোধ হইল; এবং তাহার নিকটে গিয়া যুবক ইমান তাহার রূপের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বালিকা সলজ্জ ও বিনম্র ভাবে যেরূপ উত্তর দিল, তাহাতে কেদার অপ্রতিভ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গরিব বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া যে সরিয়া যাইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু তাহার বিনম্র ভাবে তিনি অধিক মুগ্ধ হইলেন। সে দিন চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার আকর্ষণ ছাড়িতে পারিলেন না। প্রতিদিন সেই বনদেশে সেই মেষপালিকার সহিত কথোপকথন করিতে আসেন। এই বালিকার নাম অমলা। ইমান কেদার তাহার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাহাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও অন্তঃপুরবাসিনী করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মেষপালিকা এ গৌরবাকাঙ্ক্ষা করিল না, প্রত্যুত শিকারীকে ইমান বলিয়া জানিয়া ভয়াক্রান্ত হইল। কেদারের প্রকৃতির মূলে সাধুভাব ছিল। বালিকার মধুর জ্ঞানগর্ভ কথায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

সে দিন কেদার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া আপনার প্রিয়পাত্র (আমরু) অমরকে অমলার কথা খুলিয়া বলিলেন। অমর নষ্ট প্রকৃতির লোক। রমণীর ধর্ম্মভাব ও গুণের কথা শুনিয়া সে হাস্য করিতে লাগিল। কেদারকে বলিল "তুমি নির্ব্বোধ, তাই সে তোমাকে ছলনা করিয়াছে।" বলিল "আমার পরামর্শ শুন। বালিকাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া অন্তঃপুরে রুদ্ধ

করিয়া রাখ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি দুই দিনের পর তিন দিন যাইবে না, সে তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইবে।”

কেদার বয়স্যের পরামর্শে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন অমলার সহিত একবার শেষ আলাপ করিয়া দেখি, তাহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, অমরের উপর কার্য্যোদ্ধারের ভার দিব। কেদার মেষপালিকার সহিত দেখা করিতে গেলেন। এবার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি কোমল ব্যবহার করিলেন না। বালিকা তাহার অশিষ্ট ব্যবহারে রোষ প্রকাশ করিল। কেদার বিদায় লইবার সময় ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া গেলেন “তোমাকে কে রাখে? কল্য তুমি আমার হইবে।” প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া অমরকে আদেশ করিলেন, “যাও, সেই সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আইস।”

অমর ইমানের আজ্ঞাপালনার্থ লোকজন লইয়া সেই বনপ্রদেশে গমন করিল, কিন্তু তথায় বালিকার দর্শন পাইল না। অমলা পলাইয়াছে। চারি দিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার পর্ণকুটীর শূন্য, তথায় মেষপালন-দণ্ড ও মেষ সকল রহিয়াছে, কিন্তু অমলা নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় একখানি চিঠি পাওয়া গেল, ইহা বালিকা কেদারকে লিখিয়া গিয়াছে। ইহা যেমন ধর্ম্মভাবপূর্ণ, তেমনি রমণীচরিত্রের গৌরবব্যঞ্জক। অমর লজ্জাবনতমুখে রাজবাটীতে ফিরিলেন, ইমান তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং মেষপালিকার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। অমর নূতন নূতন আমোদ প্রমোদ যোগাইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিল।

দরিদ্র বালিকা কেদারের শেষ সম্ভাষণে শঙ্কাকুল হইয়া ঘরে মেষগুলিকে রাখিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। তাহার পিতা মাতাকে সে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কিন্তু আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কেদারের প্রতি অমলার প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উচ্চপদস্থ ইমান এবং দুশ্চরিত্র, ইহা জানিয়া হৃদয়কে সংযত ও দৃঢ় করিল। সে আপনার অবস্থা ভাবে, আর অশ্রুপাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। বালিকা অবশেষে সন্ন্যাসী মালীর আশ্রম-পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইল। ঋষিবর সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সমুদায় শুনিয়া তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, “এখানে আমার আশ্রমে থাক, কেহ তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।” তিনি আরও বলিলেন “য়ারবের মৃত্যুর পর কেদার এ আশ্রমে একবারও পদার্পণ করেন নাই।” সন্ন্যাসী অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিতে কোনও আশঙ্কা নাই জানিয়া অমলা তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার জন্য অমলার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের জন্য

অর্থ সাহায্য পাঠাইবার অঙ্গীকার করাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। য়ারব সন্ন্যাসীর নিকট যে অর্থ রাখিয়াছিলেন, সৎকার্য্যে ও দরিদ্রের সাহায্যার্থ তাহা হইতে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অমলা সেখানে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের একটী মাত্র দুঃখ এই যে, কেদার রাজ্যেশ্বর ও দুশ্চরিত্র!

(ক্রমশঃ)

আশীর্ব্বাদাষ্টকম্।*

প্রাচীনকালের আর্য্যগণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং সংসারকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে কায়মনোবাক্যে প্রাণগত যত্ন করিতেন। গার্হস্থ্য তাঁহাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রমস্থল, এবং যে বিবাহ এই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের সোপান, তাহা তাঁহাদের নিকট একটী ধর্ম্মময় ব্যাপার ছিল। “সহোভে চরতং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎকৃতমানসৌ”—ব্রহ্মের সহিত চিত্তের একতা স্থাপন করিয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যাকর্ত্তা বরের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতেন, এবং বর কন্যাকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত গৃহধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতকে পুনরায় পুণ্যভূমি করিতে হইলে বিবাহের এই উচ্চ ভাবের উপর প্রত্যেক গৃহকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য, প্রত্যেক দম্পতীকে তাহা বুঝিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা “আশীর্ব্বাদাষ্টকম্” অর্থাৎ নব দম্পতীর প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক ৮টী শ্লোক সানুবাদ নিম্নে প্রকটিত করিলাম। আশা করি, ইহা দ্বারা সকল দম্পতী, বিশেষতঃ নব দম্পতীগণ আপনাদিগের জীবনের লক্ষ্য অবধারণে সহায়তা লাভ করিবেন।

পুণ্যদাম্পত্যসূত্রেণ বদ্ধৌ যস্যেচ্ছয়া বিভোঃ।
সহোভৌ চরতং ধর্ম্মং যুবাং তস্যৈব তুষ্টয়ে॥ ১।

তোমরা উভয়ে আজি যাঁহার ইচ্ছায় পবিত্র দাম্পত্য-সূত্রে পরস্পর বদ্ধ হইলে, একমাত্র সেই ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় তোমরা একসঙ্গে ধর্ম্মসাধনা কর। ১।

জীবতং শাশ্বতং কালমবিচ্ছিন্নৌ পরস্পরম্।
ব্রহ্মার্পিতমনঃপ্রাণৌ বিশ্বকল্যাণদীক্ষিতৌ॥ ২॥

তোমরা উভয়ে পরম ব্রহ্মে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বকল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্তকাল জীবিত থাক। ২।

তৎসর্ব্বসাক্ষিণশ্চক্ষুর্জ্বলদন্তর্বহিঃ সদা।
লক্ষয়ন্তৌ সাবধানৌ কুরুতং সকলাঃ ক্রিয়াঃ॥৩॥

সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের চক্ষু সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিয়ত জ্বলিতেছে, তোমরা

* কোনও ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতীকে এই ৮টী আশীর্বচন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করা হয়।

তাহা লক্ষ্য করিয়া সাবধানে সকল কার্য্য করিও। ৩।

সিন্ধাবিব নদীবারি প্রেমসিন্ধৌ পরেশ্বরে।
পতিতং যুবয়োঃ প্রেম যাত্বমেয়াং বিশালতাম্ ॥৪॥

নদীর জল মহাসাগরে পতিত হইয়া যেরূপ অসীম বিশালতা প্রাপ্ত হয়, তোমাদের পরস্পরের প্রেম সেইরূপ প্রেমসাগর-পরমেশ্বরে পতিত হইয়া অসীম বিশালতা প্রাপ্ত হউক। ৪।

অনন্তকারুণ্যনিধিঃ স ঈশঃ
'বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা'।
দদাতু বাং সর্ব্বসুমঙ্গলানি
সর্ব্বত্র বাং রক্ষতু সর্ব্বদৈব ॥ ৫।

বিশ্ববিধাতা বিশ্বপাতা অনন্তকরুণানিধি ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্ব সুমঙ্গল দান করুন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫।

হৃদা চিদানন্দসুধাং নিপীয়
জরা-রুজা-মৃত্যু-ভয়-প্রমুক্তৌ।
অনন্তকীর্ত্তের্জগদীশ্বরস্য
বিরাজতং শাশ্বতকীর্ত্তিকেতূ ॥ ৬ ॥

হৃদয় ভরিয়া চিদানন্দসুধা পান করতঃ জরা-রোগ-মৃত্যু-ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমরা দুটীতে অনন্তকীর্ত্তিশালী জগদীশ্বরের দুইটী অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান হও। ৬।

যদেব কল্যাণময়ঃ করোতি।
তদেব কল্যাণমিতি স্মরন্তৌ।
সুখেষু দুঃখেষু চ নির্ব্বিকারৌ
ধর্ম্মে যুবাং তিষ্ঠতমপ্রকম্প্যৌ ॥ ৭ ॥

'সেই মঙ্গলময় যাহাই করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য'—এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও এবং সুখে দুঃখে নির্বিকার হইয়া উভয়ে ধর্ম্মপথে অটল থাকিও। ৭।

কৃতাঞ্জলির্বিশ্বপিতঃ! প্রযাচে
ত্বয়ৈব রক্ষ্যৌ তনয়াবিমৌ তে।
বধূবরৌ দর্শয় নাথ হে! ত্বং
সংসারদুর্গেঽমৃতধামমার্গম্ ॥ ৮।

হে বিশ্বপিতঃ! এই নবদম্পতী তোমারি পুত্র-কন্যা, তোমারি রক্ষণীয়। হে নাথ! করযোড়ে প্রার্থনা করি,—এই সংসার-সঙ্কটে ইহাদিগকে তুমি অমৃতধামের পথ দেখাইয়া দেও। ৮।

ওঁ স্বস্তি-স্বস্তি-স্বস্তি।

উদাসীনের চিন্তা।

'মহেন্দ্র বাবু' একজন স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিবিৎ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এতদর্থে যথোচিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। নানা স্থানে যাইয়া দেশের লোকদিগকে মহাসমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন। যাহাতে মৃত ভারতের বিবিধ জাতি এক ভ্রাতৃবন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তাঁহার গৃহ রাজনীতিবিৎ স্বদেশহিতৈষীদিগের সম্মিলনের প্রধান স্থান। রাত্রিকালে বিষয়-

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর তাঁহার গৃহে অনেক বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হন, এবং সকলে মিলিয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনা করেন, কিন্তু তথায় ধর্ম্ম ও সমাজনৈতিক বিষয়ের কোনও আলোচনা হয় না। রাজনীতির দিকে সকলের মনের ঝোঁক। মহেন্দ্র বাবু রাজনীতি বিষয়ে উদারতার পক্ষপাতী হইলেও সমাজনীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রক্ষণশীল। স্ত্রী স্বামীর বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বাক্যালাপ করেন, ইহাও তাঁহার মতবিরুদ্ধ। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না; সুতরাং সহধর্ম্মিণী কোমলকুমারীকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুশিক্ষার আলোক পাইয়া কোমল কুমারীর হৃদয়কুসুমটী সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রসারিত হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। তাই তিনি স্বদেশবাৎসল্যের সঙ্কীর্ণ খাতে বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন না। স্বামী যখন বন্ধুজন সহ রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন কোমলকুমারী গৃহান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক সমস্ত কথা শুনিতেন এবং বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলে পর যখন মহেন্দ্র বাবু শয়নপ্রকোষ্ঠে গমন করিতেন, তখন পত্নীর সহিত রাত্রিকালীন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেন। একদিন মহেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বন্ধু শ্যাম বাবুর মধ্যে ইংরেজ জাতির ভারত অধিকার-সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ হইতেছিল। কোমলকুমারী অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন। পতি মহেন্দ্র বাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে কোমলকুমারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ তোমাতে ও তোমার বন্ধুতে যে কথা হচ্ছিল, তাহাতে আমি সায় দিতে পাল্লেম না।"

ম। কত কথাই হচ্ছিল, তুমি কোন্ কথার বিষয় বল্‌ছ?

কো। তোমাদের স্বদেশ-হিতৈষণার কথাটা আমার আদবেই ঠিক্ বলে মনে হয় না। যাঁদের মনটা ছোট; তাঁদেরই আত্ম-পর স্বদেশ-বিদেশ বিচার আছে; যাঁদের মন আকাশের মত প্রসারিত, তাঁদের আর এ বিচার থাকে না। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" উদারচরিত্র ব্যক্তিদের পৃথিবীর সমস্ত লোক আপনার।

ম। ইংরেজ জাতি এসে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিবে, আর আমরা সকলে শুকিয়ে মর্ব্ব, এটা কি তুমি ঠিক্ মনে কর?

কো। তোমার স্বদেশেই কি সকল লোক সমভাবে আহার পায়? জমিদারগণ প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটান, আর প্রজালোক শুকিয়ে মর্চ্ছে; এটা কি ঠিক্?

ম। না, আমি তাও ঠিক্ মনে করি না।

কো। কই তোমার জাতীয় মহাসমিতিতে এ বিষয়ে কেহ কোন কথা তুল্‌ছেন না? স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণও এজন্য বড় একটা কিছু কর্ত্তেছেন না।

ম। সকলই আস্তে আস্তে হবে। ইংরেজ

জাতি ভারতবর্ষের অর্থকোষ শোষণ ক'রে সর্ব্বনাশ কল্লে, আগে তারই একটা প্রতিবিধান করা চাই।

কো। তোমার দেশে শিক্ষিত লোকগণ কৃতী ব'লে যেমন জীবন সংগ্রামে জয়লাভ কচ্ছে, আর অশিক্ষিত লোকগণ ক্রমশঃ উচ্ছিন্ন যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষে নিরন্ন ও বস্ত্রহীন হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, তেমন ইংরেজ জাতিও তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে জয়লাভ কচ্ছে, এতে এত গাত্রজ্বালা কেন?

ম। ইংরেজ জাতি না এলে আমাদের দেশে এত দুর্ভিক্ষ হত না, লোক সকল অকালে মরত না।

কো। একি তুমি শাস্ত্রের কথা, না যুক্তির কথা বল্‌ছ? দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, তাতে ইংরেজ জাতির দোষ কি? ইংরেজ জাতি এদেশে এসেছে বলে কি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হচ্ছে? অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি শস্যহানির কারণ। এদিকে লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়্‌ছে। মুখের সংখ্যা বাড়্‌ছে, আহার্য্যের পরিমাণ না বেড়ে বরঞ্চ কম্‌ছে, তাই দুর্ভিক্ষ যেন লেগেই রয়েছে, তবে ইংরেজকে দুষ্‌ছ কেন?

ম। ঈষৎ বিরক্ত হইয়া—তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এ সকল কথা ঢুক্‌বে না।

কো। কেন বুঝিয়ে বল্‌লেই ঢুক্‌তে পারে, তবে গায়ের জোরে কোন কথা বল্লে ঢুক্‌বে না সত্য।

ম। কেবল অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিই কি শস্যের অল্পতার কারণ? পূর্ব্বে যে যে ভূমিতে ধান্য রোপণ করা হত, আজ কাল সে সকলের অনেক ভূমিতে পাট রোপণ করা হচ্ছে। ইংরেজ জাতি ভারতে আসিয়া এদেশ হইতে বহুল পরিমাণ পাট রপ্তানি কর্‌ছে, তাই কৃষকগণ টাকার লোভে ধানের চাষ ছেড়ে দিয়েছে। এতদ্ভিন্ন অনেক চাল বিদেশে রপ্তানি হয়। ইংরেজগণই এই সকল চাল ক্রয় করিয়া লইতেছে। এখন দেখ ইংরেজ জাতি ভারতে শস্যাল্পতার কারণ কি না? ইংরেজ জাতি ভারতের পাট ও চাল রপ্তানি না কল্লে এরূপ আহার্য্যের অল্পতা ঘটিত না।

কো। এখন বুঝলেম তুমি বহির্বাণিজ্যের বিরোধী।

ম। আমি বহির্বাণিজ্যের বিরোধী নহি। ভারতবর্ষ হইতে সোণা রূপার অলঙ্কার বিদেশে রপ্তানি হউক, ক্ষতি নাই। ভারতবর্ষ হইতে কোটি কোটি টাকার চা বিদেশে চলে যাক্, আপত্তি নাই। কিন্তু যে বহির্বাণিজ্যে খাদ্যের অল্পতা জন্মে, আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। পাঠাব ধান চাল, লব মদ; পাঠাব পাট, লব গণি ব্যাগ ইত্যাদি; ইহা কি ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য নহে?

কো। তোমার কথা মেনে নিলেও ইংরেজ জাতিকে দোষী কর্ত্তে পারি না। যে পাট বিদেশে রপ্তানি হয়ে বিদেশের কলে রূপান্তরিত হয়, সে পাট দেশে থাকিয়া দেশের কলে রূপান্তরিত হ'লে তুমি কি মনে কর্ব্বে?

ম। সে ত ভাল কথা, কারণ তখন

কেবল পাটোৎপাদনকারী কৃষকগণই উপকৃত হবে এমত নহে, কল কারখানায় ভারতবাসী শ্রমজীবিগণও উপকৃত হবে। দেশের পাট বিদেশে চলে গেলে কৃষকগণ সমভাবে উপকৃত হয় সত্য, কিন্তু বিদেশের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হচ্চে, অথচ ভারতের শ্রমজীবী কর্ম্মাভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে।

কো। এজন্যই আমি বলি যে, তোমাদের স্বদেশবৎসলতার নীতিটা স্বার্থপরতারই রূপান্তর মাত্র। বিদেশের শ্রমজীবিগণ কি মানুষ নয়? তারা কি ঈশ্বরের সম্পর্কে আমাদের ভাই নয়? স্বদেশ বিদেশ ত কেবল দেশের সীমারেখা লইয়া। স্বদেশের সীমারেখাটা একটু প্রসারিত ক'রে বিলাতকে তার মধ্যে পূরে নিলেই ত বিলাতও স্বদেশ হয়ে গেল। বোম্বাই যদি বঙ্গবাসীর স্বদেশ হয়, বঙ্গদেশের উৎপাদিত পাটে বোম্বাই দেশের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হলে যদি তোমার আনন্দের কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশের পাটে বিলাতের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হলে আনন্দ হবে না কেন?

ম। এ জন্যই ত কথায় বলে মেয়ে মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে কাছা! বঙ্গবাসীর পক্ষে বিলাত আর বোম্বাই বুঝি এক হল?

কো। আমরা ত নিন্দার ভাজন আছিই, আমরা অন্তঃপুরে থাকি, আমাদের বুদ্ধিই বা কত? তবে তুমি একবার বুঝিয়ে বল না।

ম। আরে, বোম্বের লোকও যাঁকে কর দেয়, আমরা তাঁকেই কর দিয়ে থাকি, সেই করে দেশ সুশাসিত ও সুরক্ষিত হচ্চে। বোম্বের লোক দরিদ্র এবং করবহনে অসমর্থ হলে ব্যয়ভার অধিক পরিমাণে বঙ্গের ঘাড়ে পড়বে, এবং সেই ব্যয়ভার সকলকেই বহন কর্ত্তে হবে। বিলাতের সঙ্গে সে সম্বন্ধ নাই। বিলাতের শ্রমজীবিগণের অবস্থা সচ্ছল হলেই বা কি না হলেই বা কি?

কো। এজন্যই ত আমি বলেছিলেম যে, তোমাদের স্বদেশহিতৈষণা স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে, এখন তুমিও তর্কমুখে তাহা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হলে। আমি এ নীতি ল'য়ে তুষ্ট থাক্‌তে পারি না। বিলাতের লোক সকল বুঝি এক রাজার প্রজা নয়? হউক না হউক যখন আমরা এক পিতার সন্তান, তখন তাঁহাদের উন্নতি ও সুখেই আমার আনন্দ। আমি তাঁহাদের কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করি না, ইহা করাও অন্যায়, কেবল মানুষ বলিয়াই তাঁহাদিগকে ভালবাসি। তাই আমার অনুরোধ, তুমি তোমার সঙ্কীর্ণ নীতি ছেড়ে দাও, উদার বিশ্বজনীন প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হও।

ম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Charity begins at home"—গৃহই উদারতা শিক্ষার প্রথম স্থল। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গৃহে, তৎপরে স্বদেশে উদারতা শিক্ষা করিয়া বিদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তুমি তাহা না ক'রে লাফ দিয়ে সকল পৃথিবীকে আপনার কর্ত্তে চাও, তা হবে কেন?

কো। তুমি কি ক'রে জানলে আমি লাফ দিয়ে পৃথিবীকে আপনার কর্ত্তে যাচ্ছি? তোমার সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমি তোমাকে কি স্বামীর মত ভাল বাসি না, ভারতের দুঃখেও কি কাঁদি না? অথচ জগৎকেও আপনার কর্ত্তে প্রয়াসী—জানি না, কোন্ দিন সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হব!

শ্রীচঃ।

পবিত্রতা।

১

প্রবীণ ব্রাহ্মণ করি গঙ্গা-স্নান
ভক্তি-আর্দ্র চিতে পড়ি গঙ্গাধ্যান,
ত্বরিতগমনে পথ দিয়া যান;
পথেতে চণ্ডাল দাঁড়ায়েছিল।

২

ছাড়্ পথ চাড়্ বেলা হ'ল মোর,
দাঁড়াস্ পথেতে কি আক্কেল তোর?
কহিল ব্রাহ্মণ ক্রোধেতে বিভোর;
প্রণমি চণ্ডাল তাঁহাকে কহিল—

৩

কে ছাড়িবে পথ? কিসের কারণ?
কাহারে আপনি করেন বারণ?
ব্রাহ্মণ আপনি সুমহান্ জন,
কি ক্ষতি তোমারে স্পর্শিলে চণ্ডাল?

৪

অপবিত্র তুমি, স্পর্শিলে তোমারে
প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয় শাস্ত্রকারে,
তবু নাহি পথ ছাড়িছ আমারে,
পথমাঝে ভাল ঘটালে জঞ্জাল।

৫

কেবা আমি বল, আত্মা কি শরীর?
কে ছাড়িবে পথ, শরীর ত স্থির।
আত্মা কি সরিবে? ব্রাহ্মণ স্থবির!
হাসিয়া চণ্ডাল উত্তরিলা তাঁয়!

৬

যেই পঞ্চভূতে শরীর আমার,
সেই পঞ্চভূতে শরীর তোমার,
এ দেহ কেবলি আত্মার আধার,
একি পরিণাম অন্তিমেতে হায়।

৭

অপবিত্র তবে আত্মা কি আমার,
বল তারে পথ ছাড়িতে তোমার?
বিদ্বান্ আপনি, অজ্ঞান আঁধার
হৃদি কিন্তু তব ঘেরিয়া রয়।

৮

নাহি ভেদাভেদ পবিত্র আত্মার,
এক আত্মা দ্বিজ তোমার আমার?
তুমি আমি এক হইব আবার
নশ্বর দেহের হইলে লয়।

৯

পবিত্র যে জন স্পর্শিলে তাহায়,
পবিত্রতা তার দূরে নাহি যায়;
জাহ্নবীর নীর স্পর্শিলে মলায়
অপবিত্র কভু না হয় তায়!

১০

চণ্ডালের কথা শুনিয়া তখন
খুলিল দ্বিজের জ্ঞানের নয়ন
অধম চণ্ডালে দিতে আলিঙ্গন
দ্বিজবর ত্বরা ধাইয়া যায়।

১১

আয়রে চণ্ডাল! ধার্ম্মিক সুজন,
দয়া ক'রে মোরে দেহ আলিঙ্গন;
যেই তত্ত্ব কথা করালে শ্রবণ,
জ্ঞানের নয়ন ফুটালে তায়।

১২

চণ্ডাল তখন করি নমস্কার
বলে ক্ষম দেব দুষ্কৃতি আমার,
ভক্তিভরে লয়ে পদধূলি তাঁর
লুণ্ঠিত হইল দ্বিজের পায়।

১৩

করে ধরি দ্বিজ চণ্ডালে তখন,
উঠায়ে যতনে দিয়ে আলিঙ্গন,
বলিল চণ্ডাল বুঝেছি এখন—
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে প্রভেদ নাই।

১৪

জাতীয় গৌরব আত্ম-অহঙ্কার
সকলি অলীক, সকলি অসার;
বিশ্ব-প্রেমে মন নাহি মজে যার,
ধর্ম্ম কর্ম্ম তার সকলই ছাই।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি কথাটা আপাততঃ কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দুর্ব্বলা রমণীর আবার এমন কি শক্তি থাকিতে পারে, যাহা শক্তিময় জগতের প্রবলশক্তির নিকট অপরাজেয়া? রমণীত পুরুষমণ্ডলীর ক্রীড়ার পুতুল, তাহাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের বস্তু! অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহাদের চলিবার শক্তি নাই, তাহারা আবার কোন্ শক্তিতে অপরাজেয়া? কিন্তু রমণীর যে এইরূপ শক্তি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ চিরকাল এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। প্রেমময় পরমেশ্বর দুর্ব্বলা রমণীর মধ্যে এমন কিছু শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর কোনও শক্তির নিকট পরাজিত হইবার নহে।

আমরা অন্যের রক্ষণাধীন না থাকিলে নিজকে অরক্ষিতা মনে করি। কিন্তু নিজে নিজের রক্ষক না হইলে কি অপরে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? আমরা ত আর জড়বস্তু নহি যে, অন্যের রক্ষণাধীন থাকিয়া রক্ষা পাইব? যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তবে রক্ষক থাকিতেও আমাদের এই দুরবস্থা কেন? আমরা যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতাময় আত্মা। আমাদের সেই জ্ঞান, সেই প্রেম, সেই পবিত্রতা কোথায়? আমাদের সেই অপরাজেয়া শক্তি, সেই জ্বলন্ত, জীবন্ত, বিশ্বমোহনী কল্যাণদায়িনী শক্তি

কোথায়? আমাদের সেই জ্যোতি,সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কোথায়? অন্যের রক্ষণাধীন থাকিয়া এমন হইয়াছি যে, জগৎ আমাদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করিতেছে, আমরা সম্মান, শক্তি, বিশেষত্ব প্রভৃতি সমস্তই হারাইয়াছি। আমাদের সামাজিক অধীনতা থাকে থাকুক, সে অধীনতা, অন্তঃপুরাবদ্ধাবস্থা তত গ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। আমরা জড়পদার্থ নহি যে, জড় প্রাচীর আমাদের জীবনী শক্তি বন্ধ করিবে, জীবনের উন্নতি-প্রবাহ রুদ্ধ করিবে। এমন কোনও অবস্থা হইতে পারে না, এমন কোন অন্ধতম কূপে মানবজীবন নিপতিত হইতে পারে না, যে স্থানে মানবের অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত ও বিকসিত হইতে পারে না। যদিও লোকসমাজ ও সমাজগত শিক্ষা আমাদিগকে জড়প্রায় করিয়াছে, তথাপি আমরাই আমাদের অধিক শত্রু। আমরা আপনারা আপনাদের মৃত্যুর কারণ না হইলে কে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে? প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"আত্মাই আত্মার পরম মিত্র, আত্মাই আত্মার পরম শত্রু।" আমাদের পক্ষেও ইহা ধ্রুব সত্য। অপর কোনও শক্তিই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। অবশ্য এ বিষয়ে রমণীর কোনও বিশেষত্ব নাই। ইহা ব্যতীতও রমণীর বিশেষ কোন অপরাজেয়া শক্তি আছে।

জনৈক ইংরেজ কবি বলিয়াছেন,"রমণী! ঈশ্বর তোমাদিগকে পুরুষের উগ্রতা প্রভৃতি দূর করিয়া তাহাকে স্থির ধীর প্রকৃত মানুষ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের অভাবে আমরা পশু হইতাম।" এই বাক্যের মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকিলে, রমণীশক্তি কোন মতেই সামান্য নহে।" "গৃহধর্ম্ম" নামক পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "রমণী গৃহের লবণস্বরূপ।" রমণীকে লবণস্বরূপ বলিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। লবণের এই কয়টী বিশেষ গুণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ—খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু করিতে লবণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ—কোন কোন বস্তু অল্প সময়ে নষ্ট না হইয়া যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—ইহা মারাত্মক বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম।

চতুর্থতঃ—ইহা দৈহিক পুষ্টিসাধনপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

রমণীই গৃহরূপ রাজ্যের রাণী। গৃহকে মধুময় করিতে, প্রেম ও শান্তির লীলাক্ষেত্র করিতে রমণীশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। পরিবারস্থ সকলের শরীর, মন ও চরিত্র রক্ষার ভার রমণীর উপর। মাতা ধর্ম্মশীলা হইলে সন্তানগণ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক না হইয়া থাকিতে পারে না। মাতা ধর্ম্মহীন ও চরিত্রবিহীন হইলে সন্তানের চরিত্র রক্ষা হওয়া সুকঠিন। মাতা রোগের সময় স্নেহগুণে সন্তানের কষ্ট যেরূপ দূর করিতে পারেন, অপর কেহ সেরূপ পারে না। চরিত্রে কীট প্রবেশ করিলে মাতা স্বকীয় অতুল প্রেম দ্বারা যেরূপ সহজে সেই কীট বিনাশ করিতে পারেন, পিতা সেরূপ পারেন না। মাতা দ্বারা সন্তানের দেহ যেরূপ পুষ্ট হয়, তাহার হৃদয় এবং মনও সেইরূপ পরিপুষ্ট হয়। সন্তানের চরিত্র গঠন প্রধানতঃ মাতার উপরেই নির্ভর করে। সমস্ত পরিবারের চরিত্রগঠনও বহুপরিমাণে রমণীর উপরেই নির্ভর করে। তাহাদের প্রভাব পরিবারে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী—রমণীর এই কয়টী গুণ আছে বলিয়াই নারীজাতিকে গৃহের লবণস্বরূপ বলা হইয়াছে।

মাতার স্নেহ-প্রণোদিত শিক্ষাই মানবশিশুকে গঠিত করে। ভাবী উন্নতির বীজ শিশুজীবনেই উপ্ত হয়। তাহা হইতেই শিশু ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করে। ইহাতে মাতারই শক্তি অপরাজেয়া। কোনও শক্তিশালী মানুষের সাধ্য নাই যে, এই দুর্ব্বলা রমণীর শক্তি—মাতৃশক্তি অতিক্রম করে। প্রত্যেক জীবনের মূলে অনুসন্ধান করিলে মাতৃশক্তির জীবন্ত প্রভাব অনুভূত হইবে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেবহৃদয়ের মূলে তাঁহার কোমলহৃদয়া মাতা ভগবতী দেবীর কত প্রভাব ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সত্যনিষ্ঠাবলে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলেও নিষ্ঠাবতী মাতা ফুলঠাকুরাণী। এক দিবস রামমোহনকে তাঁহার শিবভক্ত মাতামহ পূজোপকরণ বিল্বদল দ্বারা খেলিতে দিলে তিনি তাহা চর্ব্বণ করেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণীর এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি ইহা দেখিয়া তখনই বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেন এবং পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন।

অপর একটী ঘটনা এই:—

"রামমোহনের জন্মভূমি রাধানগর গ্রামে সর্ব্বসাধারণ জ্ঞাতির একটী দেবালয় ছিল। তখনকার এইরূপ নিয়ম ছিল, ঠাকুরবাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে হইলে প্রত্যেককে বিনামা বা কাষ্ঠপাদুকা উন্মোচন করিয়া এবং গোময়ে পাদস্পর্শ করিয়া প্রবিষ্ট হইতে হইত। একদা রামমোহন বিদেশ হইতে আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য রাধানগরের বাটীতে গিয়াছিলেন। তিনি ইজার চাপকান পরিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং পাদুকাসহ দেবমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশোদ্যত হইলে তাঁহার জননী স্বীয় দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন "তুমি বিধর্ম্মী হয়েছ, অমন ছেলের মুখ দেখতে নাই, আমি তোমার প্রণাম লইব না।" এই সময়ে রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। বহুদিনের পর সন্তানদর্শনের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও স্নেহময়ী মাতার নিকট পুত্রমুখ দর্শন সুখ অপেক্ষা দেবালয়ের নিয়ম রক্ষা অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল! এইরূপ মাতার সন্তানও কি দৃঢ়চিত্ত না হইয়া থাকিতে পারে?

সেণ্ট অগষ্টাইন তাঁহার মাতার জন্যই

পাপে ডুবিয়াও ডুবিতে পারিলেন না। মাতার প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া পাপের সেবা করিতে তিনি কতই না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই মাতৃপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরিশেষে মাতারই জয় হইল। মাতৃপ্রভাবই সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া পাপীকে সাধুতে পরিণত করিল। এমন মাতা না থাকিলে তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না হইত! আর জগতে এই মাতৃশক্তির অভাবে কত লোকই না পাপে ডুবিয়া মরিতেছে!

আবার ভক্ত প্রহ্লাদ মাতা হইতেই তাঁহার জীবন্তভক্তি ও অবিচলিত অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী কয়াধুর প্রভাবেই দুরন্ত হিরণ্যকশিপুর গৃহে এই ভক্তের জন্ম, বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার জন্যই অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এই অমূল্য রত্নকে বিকৃত করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি সন্তানকে মৃত্যুর মুখে প্রদান করিবার জন্য স্বহস্তে ধীরভাবে সাজাইয়া দিতেন, কিন্তু ভগবান্‌কে অস্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে কখনও বলিতেন না। এরূপ মাতার সন্তান কি অসুর-সংসর্গে নষ্ট হইতে পারে? এই প্রভাবের নিকট আর সমস্ত প্রভাবকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

জেনারেল বুথের পিতা ঘোর বিষয়ী ও মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা কোমলপ্রকৃতি দেবী ছিলেন। বুথ সাহেব বলিয়াছেন, পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমা মাতৃদেবীর জীবনই "মানুষ যে স্বভাবতঃ পাপী"* এই দূষিত মত গ্রহণের প্রধান অন্তরায় ছিল। কোমলপ্রাণা ধার্ম্মিকা মাতার শক্তিতেই তিনি বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন। অগষ্টাইন-মাতা মনিকাদেবীর জীবন-প্রভাবেই তাঁহার ক্রীড়ামোদমত্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত স্বামী প্রিট্রিলিয়াসও ধর্ম্মের ও পবিত্রতার পথে চালিত হইয়াছিলেন। মনিকাদেবীর মধুর স্বভাবই তাঁহার শ্বশ্রূ মাতার কর্কশ ব্যবহার ও নির্যাতনের স্থলে কোমল ব্যবহার ও ভালবাসা আনয়ন করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দাস দাসী সকলের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া গৃহকে মধুময় এবং ধর্ম্ম ও পবিত্রতার আলয় করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণা এক ইংরেজ রমণী ২০ বৎসরেরও অধিক কাল ক্রমাগত প্রার্থনা ও চেষ্টা দ্বারা পাপাসক্ত স্বামীর জীবনস্রোত ধর্ম্মের ও পবিত্রতার দিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এরূপ আরও কত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। ইহা হইতেই দেখিতে পাই, গৃহপরিবারে সত্য সত্যই রমণীশক্তি অপরাজেয়া। এরূপ কোনও শক্তি নাই যাহা রমণীর এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

* আদি পিতা মাতা আদম ও ইব পাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাপের উত্তরাধিকারী হইয়া মনুষ্যমাত্রেই জন্মপাপী, অনেক খ্রীষ্টানের এইরূপ বিশ্বাস আছে। এখন উদারচিত খ্রীষ্টানগণ এ মত ও অনন্ত নরকভোগের মত পরিত্যাগ করিতেছেন।

উভয় ভারতী।

(৩৮৭ সংখ্যা—৪০৫ পৃষ্ঠার পর)

এ দিকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিজয়-ভেরী ধ্বনিত হইল। নাস্তিকতা পাপাচার প্রভৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ ভগ্ন করিবার জন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সমুত্থিত হইলেন। এক দিন পণ্ডিতবর ভট্টপাদ কথা প্রসঙ্গে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন—

অয়ং চ পন্থা যদি তে প্রকাশ্যঃ
সুধীবরো মণ্ডনমিশ্রশর্ম্মা।
দিগন্তবিশ্রান্তযশা বিজেয়ো
যস্মিন্ জিতে সর্ব্বমিদং জিতং স্যাৎ॥
সদা বসন্ যোগপদঞ্চ সাম্প্রতং
স বিশ্বরূপঃ প্রথিতো মহীতলে।
মহাগৃহী বৈদিককর্ম্মতৎপরঃ
প্রবৃত্তিশাস্ত্রে নিরতঃ সুকর্ম্মতঃ॥
নিবৃত্তিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং
কেনাঽপ্যুপায়েন বশং স নীয়তাং।
বশং গতে তত্র ভবেন্মনোরথ
স্তদন্তিকং গচ্ছতু মা চিরং ভবান্॥

যদ্যপি বৈদান্তিক পথ প্রকাশ করিতে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সেই সুধীবর মণ্ডনমিশ্রকে* জয় করুন্। ইহাঁর কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা দিগ্‌বলয় সমাচ্ছন্ন জানিবেন। অধিক কি, ইহাঁকে জয় করিতে পারিলে, আপনার নিখিল ভুবন জয় করা হইবে। সেই বিশ্বরূপ সম্প্রতি কর্ম্মযোগের পদ সকল প্রকাশ করিয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এক জন মহান্ গৃহস্থ, বৈদিক কার্য্যে তৎপর এবং সৎকর্ম্মসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্তিশাস্ত্রনিরত জানিবেন। নিবৃত্তিশাস্ত্রে তাঁহার আদর নাই। আপনি স্বয়ং কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করুন।

বিশ্বরূপ সকল প্রকার শাস্ত্রপথে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মদীয় শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে মণ্ডনমিশ্র আমার অতিশয় প্রিয়তম। হে শমনি! আপনি তাঁহার শ্রেয়সী উভয় ভারতীকে সাক্ষী বা মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত করুন এবং বেদে বিশ্বরূপকে জয় করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করুন্। হে পরিব্রাজকগণের অগ্রগণ্য! আপনি সত্বর তথায় গমন করুন্। গমনকালে আপনি তারকব্রহ্ম নাম দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। ভট্টপাদ এই কথা বলিলে কৃপানিধি শঙ্করাচার্য্য প্রদীপ্ত সুখপ্রকাশাত্মক তারকব্রহ্ম নামোপদেশে তাঁহার বাহ্য ও আন্তরিক মোহ বিনাশ করিয়া প্রয়াগ হইতে অবিলম্বে মণ্ডনপণ্ডিত-সমলঙ্কৃত মাহিষ্মতী নগরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা শঙ্কর রেবা নদীতটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ বনে দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিয়া মণ্ডনমিশ্রের ভবনে উপনীত হইলেন। শ্রাদ্ধ-

* বিশ্বরূপের অন্য নাম মণ্ডনমিশ্র। শঙ্করবিজয় পাঠে জানা যায়, লোকে মণ্ডনমিশ্রকে উম্বেক বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তদীয় পত্নী উভয়-ভারতী বা দ্বয় ভারতীকে বন্ধুজনে উম্বা বলিয়া ডাকিত।

কার্য্যনিরত মণ্ডনমিশ্র মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, এবং বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি জৈমিনি ও বেদব্যাস † তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদিগের চেষ্টায় মণ্ডন ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের অর্চ্চনা করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা শঙ্কর তখন বলিলেন, হে সৌম্য! আমি তর্কভিক্ষা বাঞ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি বিবাদে পরাস্ত হইবে, সেই শিষ্য হইবে, এবম্প্রকার পণ করিয়া আমাকে সেই তর্কভিক্ষা দান করুন। অন্য ভিক্ষার আমার প্রয়োজন নাই। আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে, বৈদান্তিক পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন বস্তু বাঞ্ছনীয় নহে। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিচার করিলে সকল লোকের উপকার করা হইবে। আপনি যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী হইয়া সেই ভবতাপহারী বেদান্ত পথের প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। আপনাদিগের ন্যায় যে সকল মহৎ লোক বেদান্তকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জগতে সেই বেদান্তমার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিব। অতএব আপনিও বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া হয় আমার উত্তম মত গ্রহণ করুন, না হয় বিচারে আমাকে পরাজয় করুন। আমি যে তর্কে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। পরন্তু আমাদের দুই জনের মধ্যে এই ব্যক্তি বিজয়ী ও এই ব্যক্তি বিজিত এবম্প্রকার কথা বলিবার নিমিত্ত কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন দেখি না। যেহেতু, আমাদের বিবাদের ফল যে কেবল কণ্ঠ শুষ্ক করা তাহা নহে, কিন্তু পরস্পর জয়েচ্ছু হইয়া বিচার করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাদে বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়েই বিপক্ষ ও স্বপক্ষের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই বাদের পদ্ধতি জানিবেন। অতএব আমরা দুই জনে যে বিবাদ করিব, আমাদিগের প্রতিজ্ঞা কি? এবং সেই প্রতিজ্ঞা বিষয়ে প্রয়োজনই বা কি? নিজ নিজ অভিপ্রায়ই বা কি? আমাদিগের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবেন? আপনি গৃহস্থের মধ্যে প্রবীণ, আমিও পরিব্রাজকগণের মধ্যে অগ্রণী। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের জয় ও পরাজয়ের একটী পণ করা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা সহাস্যবদনে বিবাদ করিতে পারিব। অনন্তর মণ্ডন বলিতে লাগিলেন, আমরা পর দিন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইব। সম্প্রতি আমি মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সকল করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাঁহার কথা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যবদনে বলিলেন, আচ্ছা, বাদকথা আগামী কল্য হইবে। ইহা শুনিয়া মণ্ডন মহর্ষি জৈমিনি ও বেদব্যাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা দুই জনে আমাদিগের এই বিবাদে সাক্ষী হউন। তাঁহারা বলিলেন হে সুধীবর!

† ইহাঁরা প্রাচীন জৈমিনি ও ব্যাস হওয়া সম্ভব নহে, তাঁহাদের নামধেয় অন্য লোক হইবেন।

তুমি তোমার পণ্ডিতা ধর্ম্মপত্নীকে এই কার্য্যে সাক্ষী রাখিয়া বাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শঙ্করাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর নিশা প্রভাতে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাপ্ত করিয়া প্রধান প্রধান শিষ্যসহ পণ্ডিতপূজিত মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহে আগমনপূর্ব্বক সভামধ্যে তর্কের নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। তৎপরে মণ্ডন পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন। উভয়ের বাক্যের তারতম্য বিচার করিবার জন্য সভায় শোভনদন্তা ও পতিপরায়ণা উভয় ভারতী মধ্যস্থ কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তর্কের বিষয় অবতারণাপূর্ব্বক স্বীয় জয় বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মণ্ডন! যদি আমি পরাভূত হই, তাহা হইলে আমি হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত শুক্ল বসন পরিধান করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। বাদ করিবার কালে এই উভয় ভারতী জয় এবং পরাজয়ের বিচার করিবেন। তখন মণ্ডন পণ্ডিত বলিলেন, এই বিষয়ে তর্ক করিয়া যদি আমি পরাজিত হই, তবে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আমিও শ্বেত বস্ত্র ও গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিব এবং যেমন ভবদীয় সাক্ষ্য কার্য্যে উভয় ভারতী নিযুক্ত হইবার কথা হইয়াছে, তেমনি মদীয় সাক্ষ্যকার্য্যেও আমার পত্নী নিযুক্ত থাকিবেন। যে জন এই বাদে পরাজিত হইবেন তিনি জেতার যে আশ্রম সেই আশ্রম গ্রহণ করিবেন। এবম্প্রকার পণ করিয়া শঙ্কর ও মণ্ডন উদারবুদ্ধি উভয়-ভারতীকে সাক্ষ্যকার্য্যে অভিষিক্ত করিয়া কিরূপে জয় হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় উপবিষ্ট হইলে, উভয় ভারতী তাঁহাদের গলদেশে এক এক গাছি পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। বলিলেন, যে সময়ে যাঁহার গলে এই পুষ্পমালা মলিন হইবে, তৎকালে তাঁহারই নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে। এই কথা বলিয়া গৃহকর্ম্মনিরতা উভয়-ভারতী গৃহধর্ম্মরত আপনার স্বামীর নিমিত্ত ভোজন এবং ভিক্ষুকের নিমিত্ত ভিক্ষা খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও শাস্ত্রযোদ্ধাদিগের কথার প্রতি তাঁহার কর্ণ উন্মুক্ত রহিল। উভয়-ভারতী প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে পতিকে ও ভিক্ষুক শঙ্করকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিবার সময় বাদকথা বিষয়ে উভয় পক্ষের যুক্তির দোষ গুণ দেখাইয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ পাঁচ ছয় দিবস অতীত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকাল বাদানুবাদের পর মণ্ডন পরাজিত হইলেন এবং শঙ্কর তাঁহাকে শিষ্য করিতে ব্যগ্র হইলেন।

অনন্তর উভয় ভারতী শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মতিমৎশ্রেষ্ঠ! বেদে আছে "আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী"—আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী; সুতরাং আমি আমার স্বামীর

অর্দ্ধভাগ। আপনি আমাকে জয় করেন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে না পরাজয় করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সমগ্র জয় সিদ্ধ নহে। অতএব হে পণ্ডিত বর! আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে শিষ্য করুন। তখন শঙ্কর বলিলেন, হে অবলে! মহাযশস্বী পণ্ডিতগণ কখনই কামিনীজনের সহিত বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না। তখন উভয়-ভারতী বলিলেন, এই জগতে নিজ মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকেন, সে জন রমণীই হউক, অথবা অন্য কেহই হউক, তাহাকে জয় করিতে হইলে, যাঁহারা নিজ পক্ষ সমর্থনে উৎসুক, তাঁহারা যে যত্ন করিবেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে আমি প্রাচীন মত দেখাইতেছি। মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীনাম্নী এক কামিনীর সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিলেন। ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি জনক সুলভা নাম্নী রমণীর সহিত যথেষ্ট তর্ক বিবাদ করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আপনি কি করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন না বলেন? তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রমণীগণের সহিত বিবাদ করিয়া যশোভাজন হইতেন না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত বিদুষী রমণীর এবম্প্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে উভয় ভারতীর সহিত পণ্ডিত সভায় পুনর্ব্বার বাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শঙ্করবিজয়ে উল্লিখিত আছে, ইহাঁদের বাদে ক্রমাগত সপ্তদশ দিবস অতীত হইল। কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর উভয় ভারতী মনে করিলেন, পণ্ডিতপ্রবর শঙ্কর বাল্যকাল হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং কঠোর নিয়মেও কখন তাঁহার চিত্ত ক্লিষ্ট হয় নহে। যেরূপ নিয়মে কালযাপন করিতেছেন, কখনই সেই নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব ইনি বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে অপারগ, এক্ষণে আমি ঐ শাস্ত্রের তর্ক করিয়া ইহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিব। ঐ শাস্ত্রের তর্ক উপস্থিত হইলে শঙ্কর আপনাকে অপ্রস্তুত বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক মাস সময় দিন, আমি ইহার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া বিচার করিব। তিনি আরও বলিলেন যে, বাদিমাত্রেই প্রতিবাদীর দিন স্থির স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনই এক দিবসে সমাপ্ত হয় না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বহু দিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কথিত আছে, অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উভয় ভারতীর নিকট প্রত্যাগমন করিলে পর তিনি আর বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বামীর সহিত আপনারও পরাজয় স্বীকার করিয়া লইলেন। তদীয় স্বামী শঙ্করের অনুগামী হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে উভয় ভারতী ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হন। ভারত

রমণী এক দিন জ্ঞানবিজ্ঞানে কতদূর সমুন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, উভয় ভারতীর জীবনী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশ্বজীবন-সম্পাদক।

হেঁয়ালি।

১৩০৪ বৈশাখ মাসের "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর।

১। "কনক" তাহার নাম বড় ভালবাসি;
কাছ ছাড়া করিনাক তাই দিবানিশি।
২। আমি বলি শুন দিদি নামটী "জবা" তার;
লাল টক্ টক্ দেখতে ভাল প্রিয় কালীমার।
৩। তৃতীয় উত্তর "বামা" বামায় প্রচারে—
আগেকার নাম তার ভালবাসিবারে।
(বামাবোধিনী)।
৪। "আলতা" নামটী করি যদি,
তা হলে সুখী কি হবে দিদি?
শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী।*

জ্যৈষ্ঠের হেঁয়ালি।

তিনটী অক্ষরে জন্ম পূজিত সবায়,
মস্তক কাটিলে অতি প্রিয় অবলার।
যা ছিল বুঝায় তারে ত্যজিলে পশ্চাৎ,
উত্তর করহ ভগ্নি! ভেবে দিন রাত॥ ১।

মাকে রাখে মাথায় করে—তাকে রাখে পাছে
যারে দেখ্‌লে ছেলে পুলে পুলকেতে নাচে।
কি নাম তাহার বল ভগিনী সকল।
শুনিতে অন্তর বড় হয়েছে চঞ্চল॥ ২।

মাতা বণ্ডা পিতা বণ্ড পুত্র সলাঙ্গুল,
থাক বাছা কিছু দিন ভাঙিবেক ভুল॥৩।

শতেক লক্ষের মধ্যে আমার গণন,
আমার রাজ্যেতে বসে রুসীয় সম্রাট্;
তিন বর্ণ যোগে জন্ম অদ্ভুত কথন,
শেষ বর্ণ ছাড়িলে পতিত মাঠ ঘাট।
শেষ দুই বর্ণ ছাড়ি করিবে চিৎকার,
পাবে ছাড়ি সবা বর্ণ দিবা অলঙ্কার॥ ৪॥

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ৭৮ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৯ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

২। ইউরোপীয় ক্ষমতাপুঞ্জের মধ্যস্থতায় গ্রীক-তুরুষ্ক যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। কি নিয়মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

* শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ও সত্যবতী দেবীও ঠিক্ এই উত্তরগুলি দিয়াছেন। বা, বো, স।

৩। অন্তর্জাতীয় ডাকের সৃষ্টিকর্ত্তা, ডাক্তার ভন্ ষ্টিফেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর নিকট জগৎ মহা-ঋণে ঋণী।

৪। সার্ আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী পীড়া প্রযুক্ত বিদায় গ্রহণে বাধ্য হওয়াতে বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি সি ষ্টিবেন্স সাহেব ছোট লাট পদে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৫। বিজয়নগরমের মহারাজার হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ইনি স্বদেশহিতৈষী ও মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন।

৬। বঙ্গদেশীয় মুসলমান রমণীরা হীরক জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীকে অভিনন্দন প্রদান করিবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফার্দ্দস নাহাল্ ইহাঁদের নেত্রী-স্থানীয়া।

৭। ১৮৯৮ সালে লণ্ডনে যে নারী-মহাসভা হইবে, তাহাতে মার্গারেট হোয়াং এবং ডাক্তার হুকিং ক্র নাম্নী দুইটী খ্রীষ্টীয় রমণী চিনের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন। ইহাঁরা যুক্তরাজ্যে সুশিক্ষা লাভ করেন।

৮। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ গ্রীষ্মাবকাশে নেপালে গিয়াছেন।

৯। মহারাণীর পরিবার এক বৃহৎ পরিবার। ইহাঁর পুত্র কন্যা বর্ত্তমান ৭টী, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী ৩৩ জন, এবং প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রী ২০ জন। বধূ, জামাতা ও অন্যান্য পরিজন ধরিলে আরও কত হইবে!

১০। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১ একাধিক অশীতিতম জন্ম-দিনের উৎসব হইয়াছে।

১১। ইণ্ডিয়ান্ মিররের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ছেলেদের রামায়ণ—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিএ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গল্পচ্ছলে অতি সহজ ভাষায় রামের জন্ম হইতে অযোধ্যায় রাজা হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছেলে মেয়েরা আমোদের সহিত পাঠ করিয়া রামায়ণের উপাখ্যানভাগ বেশ শিখিতে পারিবে। অনেকগুলি চিত্র দ্বারা পুস্তকখানি আরও মনোহর হইয়াছে! সকল ছেলের পড়া উচিত।

২। দুলালী—উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সুন্দর বাঁধান, মূল্য বার আনা মাত্র, শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। কলিকাতা ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

আমরা এই উপন্যাস পাঠে একান্ত প্রীত হইয়াছি। ইহাতে প্রকৃতির এক অতি নিগূঢ় রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। কোমল ও কঠোরে মিলাইয়া যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, এই উপন্যাসে সেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। "ত্রিবক্র"—অতি ভীষণ সৃষ্টি, "কমলা"—দয়াময়ী করুণারূপিণী, এবং "দুলালী"—স্নেহময়ী, ভাবময়ী, স্বপ্নময়ী। হারাণ বাবু ইতিপূর্ব্বেই কৃতী উপন্যাস-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভাব ও ভাষার কথা নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবে না। আমরা সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি!

৩। পাণ্ডবচরিত—শ্রীহৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্ এ প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ একখানি গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল। হৃদয় বাবু সে অভাব পূর্ণ করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও আড়ম্বরশূন্য।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

কিসের হরষ কোলাহল?
আজি এ আনন্দধ্বনি, গগন ভেদিয়া শুনি
উঠিতেছে কেন গো কেবল?

নবীন বরষ বুঝি, ওই আসিতেছে আজি,
লয়ে কত নব সাধ আশ!
নবীন উৎসাহবলে, ওই আসিতেছে চলে,
তাই এত হরষ উচ্ছ্বাস।

পুরাণ বরষ আর, লয়ে কত দুঃখভার
কত অশ্রু বিষাদ বহিয়া,
কাহারে কিছু না বলি, নীরবে যেতেছে চলি,
শত বাধা চরণে ঠেলিয়া!

কাহার আশার ফুল, না ফুটিতে নিরমূল,
দহে প্রাণ শোক হুতাশনে।
কা'রু হৃদি শতদল, ছিঁড়িয়া শতধা হল
সংসারের দারুণ পীড়নে।

কাহার প্রাণের মাঝে, জ্বলিছে দিবস সাঁঝে,
ধূ ধূ করি চিতার অনল,
কারে না কথাটী কয়ে, কারু মুখ না চাহিয়ে,
অতিদ্রুত ওই চলে গেল।

যাক্ বর্ষ গেছে যাক্, ভাঙ্গা প্রাণ পড়ে থাক্,
চিরদিন রবে কি এমন?
নবীন বরষ সনে, নব আশা উদ্দীপনে,
পুরাণ বরষ সহ, ভুলে যাব মর্ম্মদাহ,
বিষাদের অতীত কাহিনী;
ভুলিব স্নেহের ছল, নিরাশার অশ্রুজল,
দুঃখময় হাহাকারধ্বনি।

খুলিয়া হৃদয়দ্বার, এস আজি একবার,
গাহি দু'টী আনন্দ-সঙ্গীত,
মুছিয়া নয়নবারি, হাসি এস প্রাণ ভরি
আজি নব বরষ সহিত।

ভুলে গিয়া আত্মপরে, বাঁধি এস প্রেম-ডোরে
জগতের যত নারীনরে,
ভুলে গিয়ে সব দুঃখ, নবীন উৎসাহে বুক
বাঁধি আছি নব আশা ভরে।

পুরাণ বরষ মত, পায়ে ঠেলে বাধা শত,
আমরাও দৃঢ় করি প্রাণ;
নব বলে বলী হয়ে, নব ব্রতে দীক্ষা লয়ে,
কর্ম্ম-পথে হই আগুয়ান।

শ্রীসরোজিনী দেবী,
বনহুগলি।

সখীবিয়োগান্তে।

অসময়ে প্রিয়সখি! কেন প্রাণ ত্যজিলে?
এত ভাব ভালবাসা কেমনে লো ভুলিলে?
আহা বালিকার মত কহিতে যে কথা কত,
মনে হলে সব কথা, ভাসি অশ্রুসলিলে।
কেমনে পশিল কীট ও সোণার কমলে ॥১।

তোমার জীবনলীলা পড়ে যবে স্মরণে
নীরে ভাসি একাকিনী বসে থাকি বিজনে।
সখি! তুমি আসি হেথা বাড়ালে মরমব্যথা
কহিয়ে প্রণয়কথা মমতার বাঁধনে
বাঁধিলে আমায় সখি! কেন তুমি যতনে?২।

রবে না অধিক দিন এ মরত ভুবনে—
রহিবেক মনে চিরদুঃখ তোমা বিহনে—
তাই কি আসিয়ে হেথা বাড়ায়ে স্নেহ মমতা
অদৃশ্য হইয়া গেলে ছাড়ি সব স্বজনে?
কোথা সখি, দেখা তব পাবনা কি জীবনে? ৩

বিবিলিপি বল সখি! কে বুঝিতে পারিবে,
কে জানে মানব তার কখন কি হইবে?
এই ছিল এই নাই—কোথায় গিয়েছ ভাই!
আর কি কখন এসে মোর কথা শুনিবে?
ক্ষণকাল তরে মোরে দেখা দিয়ে যাইবে? ৪

মরমে যে ব্যথা সখি! কেমনে তা জানাব,
কোন স্থান আছে হেন যথা গিয়ে জুড়াব?
কাঁদিলে জুড়ায় হিয়া, কাঁদিব যে কোথা গিয়া,
এমন নির্জ্জন স্থান কোথা গেলে পাইব,
তোমার বিয়োগদুঃখ যথা গিয়ে নাশিব? ৫॥

তোমার মরণ শুনে—শুন প্রাণ স্বজনী!
অন্ধকার শূন্যময় দেখি এই অবনী।
সংসারে বাঁধিতে মন ভালবাসি কোন জন?
নাহি সাধ নাহি আশা ভাবি দিবা রজনী।
কিসের বন্ধনে বাঁধে? চলে যাব এখনি ॥ ৬

কে আমার আমি কার কারে ভাল বাসিরে?
কালেতে সে মহাকাল সব যাবে নাশিরে।
কার দুঃখ সুখে কাঁদি কিসে বা ভরসা বাঁধি?
উদাসীনী নিরবধি নিরজনে বসিরে
বিরস বদনে থাকি মুখে নাহি হাসি রে।৭

যাও সখি পতিব্রতা! স্বরগের আলয়ে,
পতি রাখি পতিকোলে ধন্য প্রাণ ত্যজিয়ে,
স্বরগবাসিনী হয়ে দেখিও পতিরে চেয়ে
আর যত নিজ জন আছে হেথা পড়িয়ে,
দেখিও সবার দুঃখ নয়নেতে চাহিয়ে। ৮।

শ্রীমতী নীথরকুমারী দেবী।

বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি।*

ভগ্নি!

ডুবে গেছে সে সাধের চাঁদ!
আর তাহা চাই না পাইতে,
অই দেখ পূরবে উজলি
উদে রবি ধরা হাসাইতে। ১

নিভেছে যা' নিভে যাক্ তাহা,
এবে আর কি কাজ স্মরিয়া,
সেই ক্ষুদ্র সুখস্মৃতিটুকু
হৃদি হ'তে ফেলাও মুছিয়া। ২

আঁধারি উজল গৃহ তব
প্রদীপ নিভিয়া যদি যায়,
তা' হলেই বিষাদ আসিয়া
হৃদি তব ঘেরিয়া দাঁড়ায়। ৩

যে ক্ষুদ্র প্রদীপ এত দিন
ছিল তব গৃহ আলোকিয়া,
নিভে গেছে—কিবা ক্ষতি তায়?
একবার দেখ না চাহিয়া। ৪

ধীরে ধীরে উঠিতেছে জ্বলি
দীপ এক উজলি ভুবন,—
উহাতে কি ঘোচে না আঁধার,
খোলে না ক মূর্খতাবরণ? ৫

তবে কেন—কেন এ বিষাদ,
কেন এ নিরাশা এই ভয়?
জান না কি উন্নতির পথে
পাষাণও হয়ে যায় ক্ষয়? ৬

কার পানে রয়েছ চাহিয়া
করুণ নয়নে তুমি বোন্?
কেবা দয়া করিবে মোদেরে,
কে শুনিবে মোদের ক্রন্দন? ৭

টেনে দিয়ে সুদীর্ঘ ঘোম্‌টা
(পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে),
কত আর কাঁদিব নীরবে
আপন কর্ত্তব্য পাসরিয়ে! ৮

আমাদের পিতা ভ্রাতা স্বামী
সবাই আপনহিত খোঁজে,
আমাদের দুর্দ্দশা নেহারি
সবারি নয়ন আসে বুজে। ৯

হায়রে এ বঙ্গভূমিমাঝে
অভাগিনী আমাদের সম
কেহই নাহিক বুঝি আর,
মোরা হায় হীন—হীনতম। ১০

চেয়ে নীল গগনের পানে
ভাবি এ যে "লৌহ-আবরণ,"
মেঘেতে বিজলী হাসি দেখে
ভাবি এ যে অশনি-পতন। ১১

সারাদিন ধীরে ধীরে চলি
রবিদেব ডুবে যবে যায়,
আকাশের বাতায়ন খুলি
সুধাংশু পৃথিবী পানে চায়। ১২

"সূর্য্য বড় এ পৃথিবী হ'তে"
ছাই পাঁশ—এও কি সম্ভবে?
ভাবি সে যে থালার মতন,
সে আবার বড় কিসে হবে! ১৩

* মুসলমান রমণীর লেখাটী আমরা আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম। রচনাটি সুন্দর হইয়াছে। ইহা বিশেষ উৎসাহলাভের যোগ্য। বা, বো, স।

কত কি যে ভাবি এইরূপ
কারও ত নাহিক অজানা,
একমাত্র জগদীশ বই
মোরা এবে অনন্যশরণা। ১৪

ফোটে বিম্ব বক্ষে বারিধির,
ফোটে তারা আকাশের গায়,
ফোটে স্মৃতি হৃদয়মাঝারে
ফোটে ফুল বিটপিশাখায়। ১৫

তারা কি লো রহে বহুক্ষণ
দেখিতে দেখিতে চলে যায়—
এক ভিন্ন সবি জগতের
এইরূপ মুহূর্ত্তে ফুরায়। ১৬

সেই এক আর কিছু নয়
কীর্ত্তি রূপ অমূল্য রতন,
তাই শুধু অচল অটল,
তাই শুধু অপার্থিব ধন। ১৭

ভগ্নি!
নিঃসহায় হইয়াও যদি
সেই ধন লভিবারে চাও,
আত্মোপরি করিয়া নির্ভর
ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। ১৮

শ্রীলতিফন্‌নেসা—সাহাজাদপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সাবেক।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	কুচবেহার	২৷৷৵০
নন্দলাল কুণ্ড	উলুবেড়িয়া	৫৷৷৵১০
রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর	তাহেরপুর	৷৷০
শ্রীমতী চারুবালা দেবী	ঠাকুরগাঁ	২৷৷৵০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	কলিকাতা	১৩৵০
ডাঃ চুনিলাল দাস	,,	৪৲
মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	,,	৮৵০
গোবিন্দ লাল শীল	,,	৩৷৷০
দ্বারিকানাথ সরকার	কৃষ্ণনগর	৮৲
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,	১৷৵০
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	,,	১৲
শশিশেখর দত্ত	,,	২৲
মিসেস আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	রাণাঘাট	৫৲
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	হুগলি	২৷৷৵০
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাগলপুর	৪৵০
হরিমোহন দত্ত	নওয়াদা গয়া	৪৲
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	পুরী	৫৮৵১০
বিপিন বিহারী গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
কিরণ চন্দ্র দে স্কোয়ার	রাণাঘাট	৭৵১০
বঙ্কু বিহারী সিংহ	,,	৷৷০
শ্রীমতী রাজবালা ভাদুড়ি	কৃষ্ণগঞ্জ	৩৷৵০
অমূল্য কুমার গাঙ্গুলী	কুড়ুলগাছি	৩৷০
শ্রীমতী সত্যবতী দেবী	বড়িষাবেহালা	২৷৷৵০
মিসেস জে, বি, নাইট	লণ্ডন	২৷৷৵০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ	হোসঙ্গাবাদ	২৷৷৵০
কমল চন্দ্র দত্ত	ঢাকা	২৮০
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	১৷৷১০
কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চাঙুলি	১৲
পূর্ণচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	১৷৷১০
শ্যামাচরণ মিত্র	,,	১৲
জগৎচন্দ্র সরকার	পাবনা	৮৵০
যোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	১৲
ঈশান চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	১৷১০
এ, সি, সেন স্কোয়ার	বর্দ্ধমান	২৷৷৵০
শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী গুপ্ত	ঢাকা	৯৲
হরিনারায়ণ রায়	কলিকাতা	১৷১০
মুনসি ইমাজুদ্দিন মিঞা	,,	১৷৷১০

গোবিন্দ লাল দত্ত	কলিকাতা	১৲
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	,,	১৲
অক্ষয়কৃষ্ণ ঘোষ	হাজারিবাগ	২৲
শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী সিংহ	গোপালগঞ্জ	৪৮৵০
কিশোরীমোহন সিকদার	ঠাকুরগাঁ	৫৲
শ্রীমতী মন্দাকিনী সরকার	মেদিনীপুর	৪৷৷৵০
কেদার নাথ বিশ্বাস	কৃষ্ণনগর	৫৷০
বিনোদ বিহারী	গোরখপুর	৪৷৷৵০
বিশ্বেশ্বর সেন	সিলেট	৪৲
দ্বারিকানাথ মিত্র	ফরিদপুর	২৲

অগ্রিম।

ব্রজেন্দ্র নাথ শীল	কুচবেহার	২৷৷৵০
কালীপ্রসন্ন আচার্য্য	রামপুরবোয়ালিয়া	২৷৷৵০
নবীনকৃষ্ণ গুপ্ত	মুরশিদাবাদ	২৷৷৵০
কেদারনাথ মজুমদার	বর্দ্ধমান	২৷৷৵০
হরকুমার মিত্র	কলিকাতা	২৷৷৵০
ডাঃ সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য	ভবানীপুর	২৷৷৵০
চারুচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	২৷৷৵০
নকুলাল সরকার	হাওড়া	১৲
যজ্ঞেশ্বর সেন	কলিকাতা	২৷৷৵০
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মহাদেবপুর	২৷৷৵০
কালিদাস রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৷৵০
ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ মিত্র	,,	২৷৷৵০
বাবু যোগীন্দ্র নারায়ণ রাহা	,,	১৷৵০
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মজঃফরপুর	২৷৷৵০
গোবিন্দচন্দ্র মিত্র	বাঁকিপুর	২৷৷৵০
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর	২৷৷৵০
কুলদাকিঙ্কর রায়	ভবানীপুর	২৷৷৵০
অনরেবল আনন্দ মোহন বসু	কলিকাতা	২৷৷৵০
মহারাজা রাধামাণিক্য দেব বর্ম্মণ বাহাদুর	আগড়তলা	২৷৷৵০
রাজকৃষ্ণ চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৷৵০
ধীরেন্দ্র নাথ সেন	,,	২৲
মিসেস জে, বি, নাইট	লণ্ডন	৩৷৷৵০
মহারাজা আটমল্লিক	আটমল্লিক	২৷৷৵০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাশিমবাজার	২৷৷৵০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ	হোসঙ্গাবাদ	২৷৷৵০
,, সরলা কামিনী গুহ	হাওড়া	২৷৷৵০
রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	২৷৷১০
অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৷৷৵০
রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব	দিনাজপুর	২৷৷৵০
সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২৷৷৵০
ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ	,,	২৷৷৵০
হেমলতা রায়	,,	২৷৷৵০
জগৎ চন্দ্র সরকার	পাবনা	২৷৷০
পণ্ডিত ভুবনমোহন কর	দিনাজপুর	১৷৵০
হরিনারায়ণ দাঁ	বরাহনগর	২৷৷৵০
বসন্ত কুমার চৌধুরী	,,	২৷৷৵০
শ্রীমতী গিরিজাকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়	বরাহনগর	২৷৷৵০
এ, সি, সেন স্কোয়ার	বর্দ্ধমান	৩৷০
কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয়	ভোগরাই	২৷৷৵০
নন্দলাল গোস্বামী	শ্রীরামপুর	২৷৷৵০
গিরীন্দ্র নাথ গুপ্ত	হাজারিবাগ	২৷৷৵০
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	ফরিদপুর	২৷৷৵০
কুমার মন্মথ নাথ মিত্র বাহাদুর	কলিকাতা	২৷৷৵০
ডাঃ বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২৷৷৵০
শ্রীমতী ইন্দুবালা ঘোষ	যশোহর	২৷৷৵০
কে, এম্ চাটার্জি স্কোয়ার	কলিকাতা	২৷৷৵০
ললিত মোহন দাস	,,	১৷৵০
শ্রীমতী ব্রজভামিনী চৌধুরাণী	,,	২৷৷৵০
রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	,,	২৷৷৵০
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	,,	১৷৵০
প্রিয়নাথ দাস শুভৈড্যা	(ঢাকা)	১৷৵০
চন্দ্রকুমার পাল	ভাগলপুর	১৲
করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়	মুঙ্গের	১৷৵০
নীলমণি দাস	মজঃফরপুর	২৷৷৵০
বিনোদ বিহারী ঘোষ	গোরখপুর	৷৷৵০
বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৷৷৵০
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঝান্সী	২৷৷৵০

আয়ুর্ব্বেদীয় সিরাপ আবিষ্কারক ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এক্‌জিবিসন হইতে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত
ও স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ছাত্র—

কবিরাজ শ্রীহৃদয়নাথ রায়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,

৮০ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রোগ দুঃসাধ্য বলিয়া হতাশ হইবেন না। অনেকানেক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সহরের সুযোগ্য ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় প্রতীকার না পাইয়া, এই নববিধান মতে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ অনেক প্রশংসাপত্র ও মেডেলাদি দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটীমাত্র স্বর্ণের মেডেল ও চেন সহিত ঘড়ির চিত্র প্রদত্ত হইল। রোগের বিবরণ লিখিলে ব্যবস্থাসহ ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠান হয়।

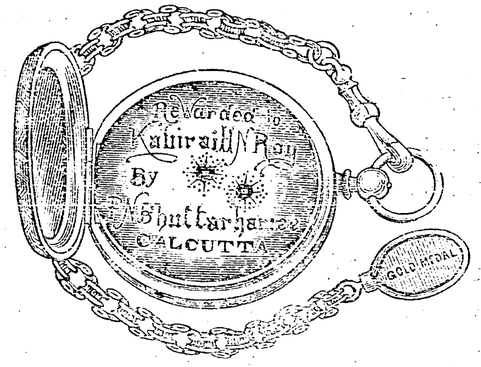

অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে ১৩০৪ সালের পুস্তক পাঁজি ও সিট পাঁজিখানিও পাঠান হয়।

অভয়াদি বটিকা।

যকৃৎ বিকার হেতু কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ; এবং অম্লপিত্ত রোগের ইহা অমোঘ ঔষধ। ইহার পরিপাকশক্তি এত প্রবল যে ভুক্ত অন্ন সহজে জীর্ণ হইয়া যায়। এইটীই একমাত্র পরিপাকশক্তির সহিত কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ। মূল্য ৩০ বটিকার কৌটা ।৵০ ছয় আনা, প্যাকিং ৵০ দুই আনা।

ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে ধার্ম্মিকপ্রবর স্বদেশহিতৈষী পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয় স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছেন দেখুন—"আমি অভয়াদি বটিকা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাতে বেশ কোষ্ঠ সাফ হয়। ইহা খাইতে সুস্বাদু; বোধ করি ইহা উদরস্থ বায়ু দমন করিয়া কোষ্ঠ সাফ করে, সুতরাং কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর পক্ষে উপকারী। ইহাতে সহজ দাস্ত হয় ও ইহার কোন প্রকার মন্দ ফল দেখা যায় না। ইহা কোষ্ঠ-পরিষ্কারক অথচ রেচক নহে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা।"

কবিরাজ মহাশয়—আপনার অভয়াদি বটিকা আমি সেবন করিয়া থাকি। ইহা অতি সুস্বাদু ও কোষ্ঠ শুদ্ধি এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। বায়ুকুপিত ও অম্লপিত্ত বা পেট গরম ইত্যাদি রোগের ইহা একটী অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ। এমন কি নিয়মিতরূপে অধিক দিন ব্যবহার করিলে ইহা দ্বারা অম্লশূল পর্য্যন্ত আরাম হয়, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমার জন্য আর এক কৌটা পাঠাইয়া দিবেন। ২৪—১—৪

বেণীমাধব সেন, ২০নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হীরক জুবিলী উপহার।



ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া।

বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
সন ১২৯৩ সালে
প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

No. 390. July, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৯০ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩০৪—জুলাই, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হীরক জুবিলী উৎসব—২২ এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বজনগণ সহ সেণ্টপল ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনা করেন। তিনি এই দিন এই সংবাদ ইংরেজজাতি, ভারতবাসী ও ইংরেজ উপনিবেশিগণের জ্ঞাপনার্থ প্রচার করেন, "From my heart I thank my beloved people and may God bless them"—আমি হৃদয়ের সহিত আমার প্রেমাস্পদ প্রজাবর্গকে ধন্যবাদ করিতেছি। ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সাম্রাজ্যের অনেক স্থানের অনেক কয়েদী মুক্ত হইয়াছে, এবং বহুসংখ্যক সম্মানসূচক উপাধি বিতরিত হইয়াছে।

জুবিলী অভিনন্দন—ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য অভিনন্দন মহারাণীর চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। সুরাটের পারসী এবং বঙ্গদেশের মুসলমান রমণীগণ ভারতবাসিনীদের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। মুরসিদাবাদের দানশীলা নবাব সামসিজিহান বেগম মুসলমান রমণীদের অভিনন্দনের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

জুবিলী স্মৃতিচিহ্ন—(১) রেঙ্গুণে এক পশু-বিদ্যালয় হইবে। মাড়ওয়ারী ধনী ভগবান দাস মহোদয়ের স্ত্রী এতদর্থে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (২) আসামের চিফ কমিসনর কটন সাহেব হীরক জুবিলী স্মরণার্থ আসামের ছাত্রগণের জন্য ১৬টী জুবিলী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। (৩) বড়-লাট-পত্নী ১০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন, তাহা হইতে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে।

প্রাদেশিক সমিতি—গত ১০ই হইতে ১২ই জুন তিন দিবস নাটোরে প্রাদেশিক

সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন। দেশহিতকর বহুতর প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গ্রীক তুরুস্ক যুদ্ধ—থেসালিতে গ্রীকেরা পরাজিত হইলে ইউরোপীয় ক্ষমতাপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ স্থগিত আছে। সন্ধির নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত হইতেছে। তুরুস্কের জয়ে ভারতবাসী মুসলমানগণ সভাসমিতি করিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতেছেন। দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমানেরা সুলতানকে এক অভিনন্দন দিয়াছেন।

ভূমিকম্প—গত ১২ই জুন (৩০এ জ্যৈষ্ঠ) শনিবার যেরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে, ভারতে কখনও এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আসাম, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইহার স্বতন্ত্র বিবরণ অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

স্ত্রী ডাক্তার—কাম্বেল মেডিকাল স্কুলের শেষ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় ৪৪ জন উত্তীর্ণের মধ্যে ৫ জন মহিলা। তাঁহাদের নাম কুমারী সুশীলা, বিবী রোজ ডিয়ার্স, শ্রীমতী আর্ণাকালী দেবী, বিন্ধ্যবাসিনী ফ্রান্সিস দত্ত, হেমপ্রভা মিত্র। বসন্তকুমারী গুপ্তা কটক মেডিকাল স্কুল হইতে উত্তীর্ণা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীবৃত্তি—স্নেহলতা মজুমদার ১ম শ্রেণীর এবং ইসাবেলা জি সামুয়েল্‌স ও জেসী রসেল ২য় শ্রেণীর সিনিয়ার; অমিয়া রায় প্রতিযোগিতায় ১ম শ্রেণীর ২য় জুনিয়ার ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন।

দান—(১) মটলী বাই নাম্নী পারসী মহিলা মৃত পুত্রের স্মরণার্থ ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। (২) লণ্ডন বোর্ড স্কুলের ছাত্রেরা ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৫০০ পাউণ্ডের অধিক চাঁদা দিয়াছে।

নব্যা গান্ধারী—বিয়েনার একটী তাঁতিনীর বয়স ৪০ বৎসর, ইতিমধ্যে তিনি ৩২টী সন্তানের জননী, তন্মধ্যে বালক ২৬ ও বালিকা ৬টী; ১১টী বারে এতগুলি সন্তান হয়, কোনও বারে ৩।৪টী করিয়াও হইয়াছে। তাঁহার মাতার ৪টী যমজ কন্যার তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা। মাতা সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮টী সন্তানের মুখ দর্শন করেন।

বিধবা বিবাহ—জব্বলপুরে কেশব রায় গড়গিলের সহিত শ্রীমতী বেণী বাইয়ের এবং ভাস্কর রাও ঠাটের সহিত শ্রীমতী গঙ্গা বাইয়ের বিবাহ হইয়াছে। পাত্র পাত্রীগণ সকলেই মহারাষ্ট্রজাতীয়।

হীরক জুবিলী।

গত ২০এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পূর্ণ ৬০ বৎসর হইয়াছে, এজন্য তাঁহার সসাগরা সদ্বীপা সাম্রাজ্যরাজীর সর্ব্বত্র আনন্দ মহোৎসব হইয়াছে। ইংলণ্ডের আর কোনও রাজা কি রাজ্ঞী কস্মিন্ কালে এত বড় সুবিশাল রাজ্যের উপর

আধিপত্য করিতে সমর্থ হন নাই এবং একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল মহৈশ্বর্য্য-সহ রাজমর্য্যাদা ভোগ করাও তাঁহাদের কাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কেবল ইংলণ্ডের কেন, পৃথিবীর আর কোনও রাজমুকুটধারীর সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে কি না সন্দেহস্থল। মহারাণীর রাজশ্রী যেমন অত্যুজ্জ্বল, তাঁহার চরিত্রগৌরবে তিনি সেইরূপ আবার সকল ভূপতির যশঃকীর্ত্তি ম্লান করিয়াছেন। এরূপ রাজ্ঞীর ষষ্টিতম রাজত্বোৎসবে যে সাম্রাজ্যের আপামর সাধারণ সকল প্রজা সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বামাকুলের এবং বামাবোধিনীর আনন্দ অবর্ণনীয়। আমরা দিব্যচক্ষুতে দেখিতেছি, এই ঘটনার মধ্যে বিশ্বপতির মঙ্গল হস্ত দেদীপ্যমান। বিক্টোরিয়া একে স্ত্রীলোক, তাহাতে স্বয়ং রাজকন্যা ছিলেন না। তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কাহারও পুত্র কি কন্যা কোনও সন্তান থাকিলে তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির মূলে যেমন ভগবানের সাক্ষাৎ হস্ত, তাঁহার এই মহোচ্চপদে এতকাল স্থিতিও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত আর কি সম্ভবে? দ্বিতীয়তঃ মহারাণীর চরিত্রবল তাঁহার এই স্থায়ী রাজত্বের কারণ। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও বিবেকানুবর্ত্তিতার কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জুন ১৮ বৎসর বয়সে বিক্টোরিয়া ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। ঐ দিন রাত্রি প্রভাত হইবার বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার কেন্‌সিংটন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া এই শুভ সংবাদ দেন। রাজ্ঞী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধর্ম্মযাজককে সর্ব্বপ্রথম এই কথা বলিলেন "আপনি কৃপা করিয়া আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।"

প্রিবি কাউন্সিলের প্রথম সভায় তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় বলেন—"আমার যেরূপ অল্প বয়স এবং সামান্য অভিজ্ঞতা তাহাতে এরূপ গুরুতর ভার বহনে সাহসী হইতাম না। তবে আমার সাহসের দুইটী কারণ আছে:—(১) যে বিধাতা আমাকে এই পদে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আমার উপযুক্ত শক্তি বিধান করিবেন। (২) প্রজাদিগের হিতসাধনেচ্ছা আমার অন্তরে, ইহাতে আর সকল অভাব পূর্ণ করিবে।"

তাঁহার প্রথম প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ কন্যার ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসিতেন এবং তিনিই তাঁহার রাজনীতির আদি শিক্ষাগুরু। তিনি রাজ্ঞীর হৃদয়ের কোমলতার সহিত নৈতিক দৃঢ়তার সাক্ষাদান করিয়াছেন। তিনি একদিন কোনও আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন ইহা শীঘ্র স্বাক্ষরিত হইয়া বিধিবদ্ধ না হইলে বড় অসুবিধা হইবে। তাহাতে রাজ্ঞী উত্তর দেন:—

"মহাশয়! ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ আমি শিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সুবিধা কথাটী আমি শুনিতে চাই না এবং বুঝিতেও চাহি না।"

মন্ত্রী আক্ষেপ করিয়া বলেন "এরূপ একজন রাজ্ঞীকে চালান অপেক্ষা দশজন রাজাকে চালান সহজ।"

১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের জন্য যে রাজঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তাহা রাজ্ঞীর রাজ-ধর্ম্ম-নীতির জাজ্বল্য প্রমাণ। ইহা ভারতের প্রত্যেক গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

"We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects and those obligations by the blessings of Almighty God, We shall faithfully and conscientiously fulfil.

Firmly rejoicing ourselves in the truth of Christianity and acknowledging with gratitude the solace of religion, We disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our Royal will and pleasure that none be any wise favored, none molested or disqualified by reason of their religious faith or observances, but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the Law. And We do strictly charge and enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects on pain of our highest displeasure.

And it is our further will that so far as may be our subjects of whatever race or creed be freely and impartially admitted to office in our service, the duties of which they may be qualified by their education, ability, and integrity duly to discharge.

When by the blessings of Provldence internal tranquillity shall be restored, it is our earnest desire to stimulate the peaceful industry of India, to promote works of public utility and improvement, and to administer its government for the benefit of all our subjects resident therein.

In their prosperity will be our strength, in their contentment will be our secutity, and in their gratitude, our best reward and may the God of all power grant to us and to those in authority under us strength to carry out these our wishes for the good of our people."

"আমাদের অন্যান্য সমুদায় প্রজাবর্গের সহিত আমাদের যে কর্ত্তব্যের দায়িত্ব-বন্ধন আছে, ভারতবাসী প্রজাদিগের সহিতও সেই বন্ধনে আমরা বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করি। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমরা আমাদের বিবেক অনুসারে বিশ্বস্তরূপে এই কর্ত্তব্য পালন করিব।

যদিও খৃষ্টধর্ম্মের সত্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আমরা আনন্দিত এবং সেই ধর্ম্ম-জনিত সান্ত্বনা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, তথাপি আমাদের প্রজাদিগের কাহারও উপর আমাদের বিশ্বাস চাপাইবার অধিকারও আমাদের নাই, সে ইচ্ছাও আমাদের নাই। আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে,

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা অনুষ্ঠানের জন্য কেহ কোনও প্রকারে আমাদের বিশেষ অনুগ্রহ বা নিগ্রহের পাত্র হইবে না, কেহ তাহার ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু সকলেই আইনের তুল্য ও অপক্ষপাত আশ্রয় লাভ করিবে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে আজ্ঞা ও আদেশ করিতেছি যে, আমাদের অধীনে যাহারা রাজপদে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা প্রজাদিগের কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস বা উপাসনায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিলে আমাদিগের যার পর নাই অসন্তোষভাজন হইবেন।

আমাদের আরও ইচ্ছা এই যে, আমাদের প্রজারা যে জাতি ও যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত হউক, তাহাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা তাহারা উপযুক্ত হইলে যতদূর সম্ভব আমাদের অধীনস্থ সকল পদে অবাধে ও অপক্ষপাতে নিযুক্ত হইবে।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যখন আভ্যন্তরিক শান্তি স্থাপিত হইবে, তখন ভারতের শান্তিময় শিল্পবাণিজ্য, সাধারণ উন্নতি ও হিতকর কার্য্য যাহাতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয় এবং আমাদের শাসন যাহাতে দেশবাসীদিগেরই উপকারার্থ ব্যবস্থিত হয়, তজ্জন্য আমাদের একান্ত চেষ্টা থাকিবে। তাহাদিগের সৌভাগ্যে আমাদের বল, তাহাদের সন্তোষে আমাদের নিরাতঙ্ক এবং তাহাদিগের কৃতজ্ঞতাতেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার লাভ। সকল শক্তির আধার পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আমাদিগের প্রজাদের কল্যাণার্থ আমাদের এই যে সকল ইচ্ছা, তৎসম্পাদনে তিনি আমাদিগকে এবং আমাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে বলপ্রদান করুন।"

যে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমাদের সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার রাজধর্ম্ম ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডপতির চরণে শরণাগত হইয়া আপনার বিবেক বুদ্ধি অনুসারে প্রজাদিগের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত। তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হউক এবং ইংলণ্ডীয় রাজনীতি সংসারকে উদার, পবিত্র ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করুক।

বিক্টোরিয়া যে আদর্শ রাজ্ঞী হইতে পারিয়াছেন, ইহার কারণ—তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। এক মহাত্মা বলিয়াছেন, জীবনকে পূর্ণরূপে গঠনের পক্ষে ৫টী উপাদানের প্রয়োজন :—(১) সুজন্ম, (২) সুশিক্ষা, (৩) সুসঙ্গ, (৪) সুসাধন, (৫) ব্রহ্মকৃপা। তাঁহার ভাগ্যে এ সকলই ঘটিয়াছে।

(১) তাঁহার পিতা কেণ্টের ডিউক এডওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠ, পরহিতৈষী, সংযতচিত্ত, উদার ও প্রজাপক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার জননী মেরী লুইসা, ধর্ম্মপ্রাণা, মিতাচারিণী, শ্রমশীলা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাঁহাদের কন্যা পিতা মাতার সকল সদ্‌গুণের অধিকারিণী হইয়াছেন।

(২) যে শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্মে আস্থা,

চরিত্র গঠন ও বুদ্ধির বিকাশের সহিত হৃদয়ের বিকাশ হয়, তিনি মাতার সুব্যবস্থায় প্রথম হইতে সেই প্রকার শিক্ষা লাভ করেন।

(৩) শৈশবাবধি কুসঙ্গ হইতে যত্নের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছিল। তৎকালীন রাজদরবার নরককুণ্ডবিশেষ ছিল। কন্যাকে ভাবী রাজেশ্বরী বলিয়া জানিলেও মাতা অনেক দিন তাহা তাঁহাকে জানান নাই এবং তাঁহাকে কখনও রাজসভার ত্রিসীমায় যাইতে দেন নাই, প্রত্যুতঃ সাধু সাধ্বী নরনারীর সংসর্গে সর্ব্বতোভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহারাণী বয়স্কা হইয়া সাধু নরনারী দ্বারাই পরিবেষ্টিত থাকেন, অত্যন্ত ধনাঢ্য আত্মীয় ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে তাহার মুখ দর্শন করেন না।

(৪) বাল্যকাল হইতে বিক্টোরিয়া ঈশ্বরভক্তি, পরসেবা, দীনদরিদ্রদিগের তত্ত্বাবধান, আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ প্রভৃতির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। এ সাধনার সুফল তাঁহার জীবনে ফলিয়াছে।

(৫) তিনি প্রার্থনাপরায়ণা ও ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীলা, ইহাতে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা [illegible] যে অধিকারিণী তাহার সন্দেহ কি?

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার জীবনচরিত যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন সকল সদ্‌গুণ তাঁহার জীবনে কেমন সম্মিলিত ও বিকসিত!

পিতৃভক্তি—যখন তাঁহার বয়স ৭ মাস মাত্র, তখন তিনি পিতাকে হারান। তাঁহার পিতা রাজমন্ত্রীদিগের চক্রান্তে উপযুক্ত বৃত্তি না পাওয়াতে এবং সৎকার্য্যে তাঁহার অনেক ব্যয় ব্যসন থাকাতে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যান! রাজ্ঞীর হৃদয়ে এজন্য দারুণ দুঃখ ছিল, এবং তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াই নিজ বৃত্তি হইতে প্রথমে পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।

মাতৃভক্তি—তাঁহার অসাধারণ ছিল। তিনি রাজ্যেশ্বরী হইয়াও সর্ব্বদা মাতার আদেশ ও পরামর্শের অনুবর্ত্তিনী ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সন্তোষসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোনও বিষয়ে পাছে মাতার প্রাণে ক্লেশ হয়, এ ভাবনায় অস্থির হইতেন।

পতিভক্তি—ইংরাজ রমণী হইলেও হিন্দু নারীর পতিভক্তি আপনার জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞার মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইয়া চলিবার কঠিন নিয়ম আছে, তাঁহার পক্ষে ইহা শিথিল করিবার জন্য যাজকেরা ও রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন "না, অন্য স্ত্রীরা যেমন স্বামীর অধীনে থাকিবার প্রতিজ্ঞা করে, আমার পক্ষেও তাহাই পালনীয়। যিনি আমার স্বামী হইবেন, তিনি আমার প্রভু।" ইহাঁদের দাম্পত্য সুখ আদর্শস্থানীয় ছিল। আজি ৩৭ বৎসর পতিহীনা হইয়া তিনি বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন।

সন্তানবাৎসল্য—রাজ্ঞী সন্তানদিগের প্রতি যেমন স্নেহবতী, তাহাদের শিক্ষা ও

চরিত্রগঠনের জন্যও তেমনি যত্নশীলা। কন্যাগণকে তিনি বিলাসিনী ও পুত্রগণকে রাজপুত্রের ন্যায় অলস দেখিতে চান না। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ নানা বিদ্যা ও ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত, চাষ বাসের কার্য্য পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন।

সৌজন্য ও দয়াদাক্ষিণ্য—দাস দাসীর প্রতি মহারাণীর বড় স্নেহ মমতা। তাহাদিগকে আপনার পরিজন বলিয়া গণনা করিয়া তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। দয়া তাঁহার নিত্যব্রত—গোপনে তিনি যে কত দীন দরিদ্র পরিবার পরিদর্শন করিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার এক একটী উপাখ্যান অদ্ভুত উপন্যাসবৎ।

সামাজিক পবিত্রতা সাধন—রাজ্ঞী তাঁহার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে এবং পাপের প্রতি বিরাগ ও সচ্চরিত্রতার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন দ্বারা ইংরাজ সমাজকে উন্নত করিয়াছেন, এবং জগতের সম্মুখে পবিত্রতার আদর্শ অতি উজ্জ্বল করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

এরূপ রাজ্ঞীর প্রজা বলিয়া আমরা কি আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারি না? রাজ্যের রক্ষণ ও পালন করেন বলিয়া রাজা পূজনীয়, আবার তাঁর চরিত্র নির্ম্মল হইলে তিনি কত না ভক্তির পাত্র? এই জন্য মহারাণী বিক্টোরিয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমগ্র প্রজার ভক্তি যেরূপ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, অল্প রাজা ও রাজ্ঞীর ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। রাজ্ঞীর রাজত্বকালে ইংলণ্ড যেমন ধনধান্য সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে, সেইরূপ শিল্প সাহিত্যে ও জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়াছে, বিশ্বসেবা ব্রতে বিশেষরূপে দীক্ষিত হইয়াছে, ধর্ম্মের উদারতা শিক্ষা করিয়াছে, জাতি সকলের মধ্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে ভারত অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

(১) বাহ্য উন্নতি—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, গ্যাসলাইট, সুলভ ডাকের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট ইত্যাদি বিষয় সকল স্মরণ করিলে আমরা ইংরাজ রাজত্বকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

(২) শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইয়া সাধারণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার কত বিস্তার হইয়াছে। আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ দেশীয় লোক ইউরোপে গিয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(৩) ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়া ইহার সাহিত্য ভাণ্ডার কত পুষ্টি লাভ করিয়াছে এবং তাহা ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর।

(৪) রাজনীতি—ভারতবাসীরা রাজনীতির চর্চ্চা করিতে শিখিতেছেন। মান্দ্রাজী, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাবী, আসামী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলে এক আশ্চর্য্য

একতা-সূত্রে বদ্ধ হইতেছেন। ব্যবস্থাপক সভা এবং পার্লামেণ্ট মহাসভাতেও দেশীয়ের স্থান হইয়াছে।

(৫) নৈতিক উন্নতি—বিচারাদি বিভাগ শিক্ষিত উন্নত-চরিত্র লোকদিগের প্রবেশে কত সংস্কৃত হইয়াছে! অনেক দুর্নীতি নিবারিত হইয়া সুনীতির প্রতি লোকের সমাদর ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

(৬) স্ত্রীলোকদিগের অবস্থোন্নতি—স্ত্রীলোকদিগের নিকট উচ্চতম শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা বিদ্যা-বিষয়ে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতেছেন। চিকিৎসক, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকেরা সমাজে পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। স্ত্রীজাতির সুচিকিৎসার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা সকল হইয়াছে। ভারতনারীদিগের অবস্থার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আর কোন্ বিদেশীয় রাজার অধিকার কালে নারীদিগের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও উন্নতির পথ এত প্রসারিত হইয়াছিল?

(৭) সমাজ সংস্কার—বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পুনঃ প্রচলন, নিম্নশ্রেণীর লোকের উচ্চ অধিকার লাভ ইত্যাদি নানা উপায়ে সামাজিক সংস্কার সাধন ও কুসংস্কার সকলের নিরসন হইতেছে।

(৮) ধর্ম্ম—রাজশাসনে এক ধর্ম্মের প্রতি অন্য ধর্ম্মের অত্যাচার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে আপনার আপনার ধর্ম্মসাধন করিতেছেন এবং পরস্পরের প্রতি উদার ভাব ধারণ করিতেছেন: হিন্দুধর্ম্ম বিশোধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বা তদনুরূপ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সহিত প্রায় সম-সাময়িক। এই সমাজের অভ্যুদয়ে প্রাচীন ঋষিধর্ম্ম যে অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা তাহা দেশমধ্যে প্রচারিত হইতেছে। নূতন ধর্ম্মভাবে পরিবার ও সমাজের সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। ধর্ম্মান্দোলনে সমস্ত ভারতবাসীর মনে এক নূতন ধর্ম্মতৃষ্ণা ও নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিবেন, তাহার আশা হইতেছে।

ভারতে ইংরাজ শাসন আকস্মিক ঘটনা নয়, মহারাণীর এ সুদীর্ঘকাল রাজত্বও আকস্মিক ঘটনা নয়। পতিত ভারতের উদ্ধারের জন্য ইহা ঐশ্বরিক বিধান। মহারাণী ভারতকে যে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন, আমরা তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি ও পাইতেছি। সিপাহী-বিদ্রোকালে উদাসীন মন্ত্রিসভা ও পার্লা-মেণ্টকে তিনিই কর্ত্তব্য সাধনে উত্তেজিত করেন, ইংরাজের দুর্দ্দম বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা খর্ব্ব করিয়া দয়া ও ক্ষমা দ্বারা বিদ্রোহী-দিগকেও বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতের রাজকোষ হইতে তিনি এক পয়সাও পান না, তথাপি ভারতের

দুঃখবিপৎকালে তিনি আপনার ভাণ্ডার হইতে অকাতরে অর্থদান করেন। তিনি যে ভারতের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, অনেক সময় তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। একটী ভারতবাসীকে তিনি আপনার শিক্ষকরূপে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচারকদলের মধ্যে ভারতবাসী কয়েক জনকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং শুনা যায় তাঁহাদিগের সেবায় তিনি যেরূপ সন্তুষ্ট, অন্য কাহারও সেবায় সেরূপ নহেন। ভারতবাসিনী রমণীগণ বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, এই কথা শুনিয়া তিনি অশ্রুপাত করেন, এবং লেডী ডফারিণকে এই অভাব মোচনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ভারতব্যাপী লেডী ডফরিণ হাঁসপাতাল সকল ইহারই শুভ ফল। রাজ্ঞী সুযোগ পাইলেই ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহমমতা ও ভালবাসার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না।

জুবিলী মহোৎসবের দিন সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থান হইতে মহারাণীর জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনাধ্বনি উঠিতেছে। আমরাও প্রার্থনা করি, তিনি সাম্রাজ্ঞীকে দীর্ঘজীবিনী করুন, এবং তাঁহার শাসনকে জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কারণ করুন। আজি তিনি রাজপরিবারস্থ সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। উভয় পার্লেমেণ্ট মহা-সভাকে আশীর্ব্বাদ করুন। আর ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ও রাজপ্রতিনিধি হইতে ক্ষুদ্রতম রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত যাঁহাদের মধ্যে রাজশক্তি বিদ্যমান, তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন, সকলে ন্যায় ও সত্য অনুসারে শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীদিগের পরম কল্যাণ সাধন করুন, এবং মহারাণীর মহৎ যশোগৌরব আরও বর্দ্ধিত করিতে থাকুন। মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর রাজা ও প্রজা উভয়কে তাঁহার প্রেমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, এবং উভয়কে স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়ব্রত করিয়া এই হীরক জুবিলী ঘটনার মহোদ্দেশ্য পূর্ণ করুন।

প্রলয় *।

(১)

দেবতা গো!
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া
সহসা অসহ্য তাপে
অবনীর হিয়া কাঁপে,
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিণ্ড উঠিছে জ্বলিয়া!—

তপ্ত জগতের ভার
বহিতে না পারি আর,
বাসুকি, সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িয়া—
লক্ষ মুখে রক্ত উঠে,
লক্ষ শ্বাসে বহ্নি ছোটে,
লক্ষ তালে কাল ঘাম উঠে উথলিয়া!—

* ১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৫টায় যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তদুপলক্ষে লিখিত।

বসুধার হাড়গুলি,
হ'ল বুঝি গুঁড়া, ধূলি,
হিমালয় কুমারিকা, যায় বা মিশিয়া !—
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া !

(২)

গেল যে গেল যে বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া—
গভীর গরজি সিন্ধু
পরশিছে রবি, ইন্দু,
উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে বা গ্রাসিয়া !
(পাইয়া বিষম ত্রাস,
টানিয়া জলদবাস,
তপন আপন মুখ ফেলিছে ঢাকিয়া !)
বুঝি বা পাতালবাসী
"ফেন" রূপে আসে ভাসি,
তাদের কলিজা, প্রাণ গিয়াছে পিষিয়া !
দেখ দেব ! গেল সব ভাঙিয়া চুরিয়া !

(৩)

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া—
সুবিশাল তরুকুলে
উপাড়িছে বুঝি মূলে,
লতা, গুল্ম, তৃণ, ভয়ে মরিছে কাঁপিয়া !
আকুল বিহগদল,
দাঁড়াইতে নাহি স্থল,
পরাণ বাঁচাতে চাহে আকাশে উঠিয়া !
মহাকায় মহীধর
জানিত না "ভয় ডর"
সে বুঝি আছাড় খায় ভূতলে পড়িয়া !—
ক্ষুদ্র কিবা মহত্তম,
এবে হায় ! সবি সম,
আসিছে কালান্ত কাল মুখ বিস্তারিয়া !—
দেবতা ! গেল যে সব দেখ গো আসিয়া !

(৪)

গেল যে গেল যে সব ভাঙিয়া চুরিয়া—
জলে স্থলে বাষ্পযান—
হ'ল বুঝি শত খান,
আরোহী বা জন্মশোধ পড়িল ঘুমিয়া !—
লোকালয়ে বাড়ী ঘর
কাঁপিতেছে থর থর,
পড়িছে প্রাসাদ-চূড়া ভূতলে লুটিয়া !
বিবশা মা, কাঁপি কাঁপি
শিশুরে হৃদয়ে চাপি,
পলাইতে চাহে আহা ! ধরণী ছাড়িয়া !
সন্তান আতঙ্ক-ভরে
মায়েরে জড়ায়ে ধরে,
বুড়া বুড়ী রাখে করে নেত্র আবরিয়া !
লভিবারে প্রাণারাম,
কেহ স্মরে ইষ্টনাম,
কেহ স্মরে প্রিয়-মুখ, "অন্তিম" জানিয়া !
মহা মরণের তূরে
সবাই প্রতীক্ষা করে,
আপনি আঁখির পাতা আসিছে মুদিয়া !—
কালান্তক মহাকাল,
পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল,
মরণে মরণে দিবে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া !
এখনি যে হবে ধরা,
অনন্ত মরণ-ভরা !—
রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া !
আর কেহ জাগিবে না,
আর কেহ কাঁদিবে না,
কেহ কারো আঁখি-জল দিবে না মুছিয়া।
চির-লব্ধ সরবস্ব
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম,

জগতের "ইতিহাস" যাইবে মুছিয়া !
অনন্ত প্রলয়ে বিশ্ব যাইবে ডুবিয়া !

(৫)

কেন মা ধরিত্রি ! হেন নিঠুর হইয়া,
আজি এ সায়াহ্ন-বেলা,
খেলিছ ভীষণ খেলা,
তুমি কি করিবে স্নান জীব-রক্ত দিয়া ?
তোমার স্নেহের বুকে,
আশ্বাসে, বিশ্বাসে, সুখে,
সকলে বসতি করে, গেলে কি ভুলিয়া ?
তুমি যে মা ! চিরদিন,
বিরক্তি-সন্তাপ-হীন,
"সর্ব্ব-সহা *" নাম তব নিখিল যুড়িয়া !—
শত তাপে হোক তাপী,
মহাপাপে হোক পাপী,
বান্ধবে করুক ঘৃণা চরণে দলিয়া ;
তবু সে কোলের ছেলে,
কবে মা' দিয়াছে ফেলে,
পারে কে তা তোর সম পাষাণী হইয়া ?
ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত,
অগণ্য বিপৎপাত,
সহে প্রাণী, তব কোলে মুখ লুকাইয়া !—
আজি যে দাঁড়াতে ঠাঁই,
জগতে কোথাও নাই,
তুমি যে কোলের ছেলে ফেলিছ ছুড়িয়া !—
আমরা দাঁড়া'ব কোথা, কেহ মা ! বলিয়া।

(৬)

একদিন—কতদিন গিয়াছে চলিয়া—
অসুরে নাশিয়া রণে,
বিজয়-উল্লাস মনে,
শ্যামা মা নাচিলা সেই, আনন্দে মাতিয়া !
সে দিনে এমনি হায়,
ধরা রসাতলে যায়,
তাই দিলা সদাশিব হৃদয় পাতিয়া !—
আজি কি তেমনি তবে,
(কারে সুধি, কেবা ক'বে ?)
মরিল অমর-রিপু সমরে পশিয়া ?
সে আনন্দে সে কৌতুকে,
অট্টহাসি, হাসি মুখে
নাচে মা প্রকৃতি, শত করতালি দিয়া ?—
রাখিতে "ব্রহ্মাণ্ডটুক"
দেবতা কি পাতি বুক,
নিবারিবে এ যুগান্ত আরাম ঢালিয়া ?
এই কি সে মহা "লাস্য" কে দিবে বলিয়া ?

(৭)

যে হোক সে হোক বিভো ! দেখ গো চাহিয়া—
মৃত্যু করে উপহাস,
অকথিত সর্ব্বনাশ,
সত্যই তোমার সৃষ্টি যায় যে মজিয়া !
আমাদের কিসে ক্ষতি,
তুমি অগতির গতি,
জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়া ;
কিন্তু দেব ! তব ধরা,
অতুল সৌন্দর্য্য-ভরা,
এত কাল এত করে রেখেছ পালিয়া,
আজি তা' হইবে দূর—
অনন্ত ধ্বংসের পুর !
তুমিই কাঁদিবে পিতঃ ! সে দৃশ্য দেখিয়া !
শবরাশি স্তূপে স্তূপে,
রহিবে পর্ব্বতরূপে,
অনন্ত মরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়া !—

* সর্ব্বংসহা—পৃথিবী।

এত শ্রম, স্নেহরাশি,
কি ফল এরূপে নাশি,
বিফলে ভাঙিবে কেন এতটা গড়িয়া ?
তাই দেব ! পায়ে পড়ি,
ভাঙিও না—লহ গড়ি,
উঠ হে করুণাসিন্ধো ! "মা ভৈঃ" ডাকিয়া,
মৃত্যুমুখে বিশ্ব তব, লহ বাঁচাইয়া।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রমণীশক্তি যে শুধু গৃহে পরিবারেই অপরাজেয়া তাহা নহে। আমেরিকার জনৈক ডাক্তার বলিয়াছেন, তাঁহাদের কলেজের ছাত্রগণ পূর্ব্বে বড়ই অশিষ্ট ও দুশ্চরিত্র ছিল ; কিন্তু যে সময় হইতে সেই কলেজে নারীজাতি প্রবেশ লাভ করিলেন, তদবধি ছাত্রগণ শিষ্ট ও সচ্চরিত্র হইল। বিবী বুথ, কুমারী ফ্রান্সিস উইলার্ড, বিবী জোসেফাইন বাট্‌লার, লেডি হেনরি সমারসেট্, কুমারী নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি যশস্বিনী ইউরোপীয় মহিলারা জীবনে দেখাইয়াছেন যে, রমণীশক্তি অন্যত্রও অপরাজেয়া।

কি সামাজিক জগৎ, কি রাজনৈতিক জগৎ, কি ধর্ম্মজগৎ, সর্ব্বত্র রমণীশক্তির অতুল প্রভাব। রমণীশক্তির অভাবে ইহার কোন জগৎই সুচারুরূপে চলিতে পারে না। উক্ত ত্রিবিধ ক্ষেত্রেই উক্ত যশস্বিনী মহিলাদের শক্তি প্রবেশ করিয়া মানব-জাতির অশেষ কল্যাণের সূত্রপাত করিয়াছে, এবং জগতের নিকট এই নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই রমণীশক্তির অভাবে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। জনৈক শ্রদ্ধেয় লেখক বলিয়াছেন :—"যখন অবলার আধখানা এখনও অনাবিষ্কৃত, তখন তোমরা যাহা কেন বল না, আজি হাজার হাজার বৎসরের উচ্চ দুন্দুভিনিনাদিত যে উন্নতি তাহা আধখানা বই ষোল আনা—একখানা নহে। কে জানে রমণী-শিক্ষিত, রমণী-গঠিত, নারী-সৃষ্ট ভাবী জগতের ভাবী উন্নতি কেমন ?"

বিবী বুথের প্রভাব যে মুক্তিফৌজ-সম্প্রদায়কে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে, এবং সেই প্রভাবে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। বিবী জোসেফাইন বাট্‌লার সমাজের দোষ-সংশোধনের জন্য, পতিতা রমণীদের উদ্ধারের জন্য, তাঁহার জীবন অতিবাহন করিতেছেন, এবং তাঁহার অতুল প্রভাবে পবিত্রতার রাজ্য কিরূপ স্থাপিত হইতেছে, কত অপবিত্র পাপাসক্ত জীবন পুণ্যশোভায় বিভূষিত হইতেছে, জনসমাজের কি প্রভূত কল্যাণ সাধিত

হইতেছে, সে বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

কুমারী ফ্রান্সিস উইলার্ড, লেডি হেন্‌রি সমারসেট্ প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাদিগের চেষ্টায় যে মাদক সেবন নিবারণার্থ পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় রমণীর স্বাক্ষরিত এক বৃহৎ আবেদনপত্র পৃথিবীর সকল রাজশক্তির নিকট উপস্থিত করা হইতেছে, তাহা "বামাবোধিনী পত্রিকা"তেই অনেকে পাঠ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে প্রেমের, পবিত্রতার ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের রাজ্য ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে কতদূর বিস্তৃত হইতেছে, সাময়িক পত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহাদের সকলেই সে বিষয় অবগত আছেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেল আহত-সৈনিক-সেবা-রূপ মহদনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত করিয়া লোকের হৃদয়ে পরহিতৈষণা বৃত্তি জাগ্রত করিয়া দিয়াছেন, আর এখন সহস্র সহস্র রমণী পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জগতের দুঃখভার লঘু করিতেছেন, সংসার মধুময় করিতেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার হিতৈষণা বৃত্তি কিছুমাত্র নিস্তেজ হয় নাই। ভারতের সুদূর পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যের বিষয় তিনি এ দুর্ব্বল শরীরেও চিন্তা করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্ট সমীপে পত্র লিখিয়া দরিদ্র ভারত-বাসীর দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেছেন। কুমারী কার্পেণ্টারের অনুরাগ ও চেষ্টায় ভারতে স্ত্রীশিক্ষার কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা সকলেরই জানা আছে। ভারতকে তিনি এত ভাল বাসিতেন যে, বন্ধু বান্ধব ও ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও বৃদ্ধাবস্থায় আবার এখানে আসিয়াছিলেন, কোন প্রতিবন্ধকই তাঁহার পথরোধ করিতে পারিল না।

ভগিনী ডোরার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও শক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। বিলাতের দীনশ্রেণীর লোক ভয়ানক দুর্বৃত্ত। তাহাদের স্থান নরকতুল্য। তাহারা রাক্ষস সদৃশ এবং তাহাদের কার্য্যও তদ্রূপ। নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ তাহাদের দ্বারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্থানে পুলিস প্রহরীও যাইতে সাহসী হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভগিনী ডোরা এই সকল দুর্দ্দান্ত দস্যুকে, এই সকল ভীষণ রাক্ষসকে তাঁহার ইঙ্গিতমত কার্য্য করিতে, ও উপদেশমত চলিতে বাধ্য করিতেন। শিশুর মত তাহাদিগকে শাসন করিতেন। এক দিবস গভীর নিশীথে যখন সেই নরকের একতম প্রকোষ্ঠে রাক্ষস-সদৃশ মানবগণ স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া নানা দুষ্ক্রিয়াতে মত্ত ছিল, তখন তিনি তাহাদের গৃহদ্বারে আঘাত করিলে প্রথমতঃ তাহারা আমোদের ব্যাঘাতের জন্য অনেক গালি প্রদান করিল। তৎপরে তিনি ডাকিবামাত্র তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল। জ্যাক্ নামক একজন দস্যু উপাসনার সময় গোল করিলে ভগিনী ডোরা যেই বলিলেন "জ্যাক ! সাবধান ! আমার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বস", অমনি জ্যাক্ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার

এক পার্শ্বে বসিল। ভগিনী ডোরা জ্যাক্ ও বিল নামক ভীষণকায় দুই দুর্দ্দান্ত পুরুষের মধ্যস্থলে বসিয়া ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তাহারাও প্রশান্তভাবে বসিয়া রহিল। সাধুতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি অপ[illegible]য়া শক্তি!

কুমারী [illegible] দুর্ব্ব[illegible]ঠোরপ্রকৃতি ইউরোপীয় সমাজ[illegible]তে ইতর জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যব[illegible]র অনেক পরিমাণে রহিত করিতে সক্ষ[illegible]ম হইয়াছেন। পশু প্রভৃতিও যে আমাদে[illegible]র প্রেম ও দয়া পাইবার অধিকারী, এই সত্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নেই ইউরোপীয় সমা[illegible]জে এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিবী[illegible]কারিয়েট বিচার ষ্টো "অঙ্কল টম্‌স ক্যাবিন" অ[illegible]বা "টম কাকার কুটীর" ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্বারা [illegible] দাসত্ব-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে কতদূর সক্ষম হইয়া[illegible]ছেন, তাহা আর বলিতে হইবে না। রমণীর শক্তি [illegible]সমাজের অস্থি মজ্জাতে প্রবিষ্ট, জঘন্য প্রথা সকল উন্মূলিত করিতে কতদূর সক্ষম, তাহা এই সকল জীবনে দেখিতে পাই। এই সকল মহিলাকে যে কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কোন বাধাই তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে নাই। তাঁহাদের অপরাজেয়া শক্তির সম্মুখে সমস্ত বাধাই অবনত হইয়াছে!

আমেরিকার কলরেডো নামক স্থানে স্ত্রীলোকেরা নির্ব্বাচন অধিকার পাইয়াছেন। একবার নির্ব্বাচনকালে তাঁহারা সকল দলকে সাবধান করিয়া দেন, কোন প্রকারের কলুষিত-চরিত্র কাহাকেও যেন পদপ্রার্থীরূপে খাড়া করা না হয়; কোনও ভদ্র মহিলা এরূপ লোককে ভোট দিবেন না। সকল স্থলেই এই কথামত কার্য্য হয়, কেবল এক স্থানে একটী মদ্য-বিক্রেতা ও অপবিত্রতার প্রশ্রয়দাতা বিদেশী লোককে পদপ্রার্থী করা হয়। মহিলারা এই কথা জানিবামাত্রই ইহার নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ইহার প্রতিযোগীর পক্ষে অনেক বেশী ভোট সংগ্রহ করিয়া তাহাকে নির্ব্বাচিত করিলেন; অথচ সেই প্রতিযোগীর বিশেষ কোন গুণ ছিল না, তিনি জনসাধারণের প্রিয়পাত্রও ছিলেন না—কেবল শুদ্ধচরিত্র ছিলেন। নব জিলণ্ডে এবং আমেরিকার যে সব প্রদেশে মহিলারা নির্ব্বাচন অধিকার পাইয়াছেন, সেই সকল স্থানে চরিত্রবান্ লোকেরাই সভ্য হইতেছেন, চরিত্রহীন লোক সকল তাড়িত হইতেছে,—[illegible] তথায় পবিত্রতা সংরক্ষিণী অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মহিলাদিগকে নির্ব্বাচন অধিকার দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু মদ্যবিক্রেতা ও পাপব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে যে, দশ জন মহিলার মধ্যে নয় জনই সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির প্রধান শত্রু। তাই নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষার জন্য তাহারা এই প্রস্তাবের ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, রমণীশক্তি কত প্রবল, এবং রমণীশক্তির

উপর জগতের কল্যাণ কতদূর নির্ভর করে। এই সকল দৃষ্টান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, জগতে প্রেমের, পবিত্রতার ও ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ভার লইয়া নারীজাতি সৃষ্ট হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সর্ব্বোপরি জয় লাভ করিবার শক্তিও দুর্ব্বলা রমণীকে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত নবেম্বর মাসে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে রমণীদিগের যে মহাসভা হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, ইউরোপখণ্ডে রমণীমণ্ডলী কিরূপ কার্য্য করিতেছেন। যে সকল সভা উহাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে, কত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহারা শক্তি খাটাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদিগকে অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। কুমারী উইলার্ড প্রভৃতি যে মাদকনিবারিণী সভা স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু স্ত্রীলোককে একত্র করিয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছেন।

আমরা "অবলা" আখ্যা পাইয়া থাকিলেও সকল বিষয়েই যে অবলা, তাহা নহি। বিশ্ববিধাতা যে আমাদিগকে শক্তিহীনা করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বরং মহাশক্তিশালিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আর অস্বীকার করিতে পারি না। নারীজগতের প্রভাব সমস্ত জগতে, প্রত্যেক মানবের জীবনে কিরূপ অতুলশক্তিশালিনী—কেমন অপরাজেয়া, তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দেখিয়া আর কিরূপে অস্বীকার করিব? এমন মহিমাময়ী অতুলশক্তি পাইয়া কেন আর দীনা হীনার ন্যায় ধূলিতে পড়িয়া থাকিব? সংসারের স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া যাইব, পৃথিবীর অবস্থার বাত্যাতে শাখাভ্রষ্ট শুষ্ক পত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইব? আমরা দীনা হইলেও জীবন্ত দেবীমণ্ডলীর ভিতরে অপরাজেয়া শক্তি সন্দর্শন করিতেছি। পাশ্চাত্য মহিলাদিগের কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যক্ষেত্র আমাদের পক্ষে না খাটিতে পারে, কিন্তু আমরা আপনার কার্য্যক্ষেত্রে আপনার মত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই নারীজীবনের সেই সকল উচ্চ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। আমাদের জীবনের মূলেও গূঢ়রূপে এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমাদের শক্তিতে যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে জানিলাম রমণীজীবন দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, ততক্ষণ জীবন। আপনাতে অবিশ্বাস আর ঈশ্বরে অবিশ্বাস একই কথা। আমাদের জীবনের দুর্গতি অত্যন্ত গভীর হইলেও, শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও, স্বয়ং বিধাতা আমাদিগকে যে শক্তি, যে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহা উন্মূলিত করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যদি তাহা করিতে পারিতাম, তবে এত দিন পৃথিবী হইতে রমণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

আমরা এই শক্তির মূলে প্রবেশ করি। শক্তির উৎসসমীপে উপনীত হই।

প্রত্যেকে এই অতুল শক্তিতে শক্তিময়ী হই, এবং নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া স্ব স্ব জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দিয়া কৃতার্থ হই। বিশ্ববিধাতা দীনা অবলার জীবনে তাঁহার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন। রমণীজাতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দুর্ব্বলা বঙ্গবালা।

শৈশব-সঙ্গিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকে ছোটবেলায় সকলেই "ফুলি" বলিয়া ডাকিত। পাড়ার বালিকাদের মধ্যে সকলকার চেয়ে ফুলির বিলক্ষণ সুখ্যাতি ছিল; সে খুব ঠাণ্ডা, খুব সরল, আবার খুব সুবোধ। কখনও কাহারও উপরে রাগ করে না; কাহাকেও কটু কথা বলে না, সাথীদের সঙ্গেও আড়ি করে না। বাঙ্গালা দেশে "মেয়ে সন্তান" হওয়া আজি কালি বিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইলেও প্রফুল্লকুমারীর সরল, সুন্দর, নবস্ফুট কুসুমের মত মুখখানি দেখিয়া সকলেই তাহার মাতাপিতার "পুণ্যবল" মনে করিত। সাথীরাও ফুলির সহিত খেলা করিতে বড়ই ভালবাসিত।

ফুলি তাহার সকল বন্ধু বান্ধব অপেক্ষা তাহার "যোগেন দাদার"ই বেশী অনুরক্ত। যখন ফুলি আরও ছোট ছিল, তখন তাহার যোগেন দাদা তাহাকে কোলে করিয়া বেড়াইত; কাঁচা নারিকেল পাতায় বাঁশী করিয়া দিত; কদম ফুলের গাড়ী করিয়া দিত; তাহাকে ফুলের গহনায় সাজাইয়া "ফুলরাণী" করিত। এখন ফুলি একটু বড় হইয়াছে, এখন মাষ্টার মহাশয়ের কাছে লেখা পড়া শিখিতেছে, এখন তাহার যোগেন দাদা তাহাকে পড়া বলিয়া দেন; ম্যাপ দেখাইয়া দেন; গল্পের বই কিনিয়া দেন; খেলা করিতেও কত খেলানা আনিয়া দেন! সেই জন্য রাত্রিতে মা'র কোলে শুইয়াও "যোগেন দাদা"কে একটু না দেখিলেই তাহার মনে অসহ্য কষ্ট হইতে থাকে।

বয়স নয় পরে দশ, তার পরে এগার বছর শেষ হইল; প্রফুল্লের বয়স বার বছর হইলে তাহার বিবাহের জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রফুল্লের পিতা ধনী, প্রফুল্ল তাঁহার একমাত্র কন্যা; এখনকার দিনে টাকা হইলেই মেয়ের বিবাহে সুপাত্র মিলে; সুতরাং প্রফুল্লের অদৃষ্টে সুপাত্র মিলিল। প্রফুল্লের পিতা একজন কৃতবিদ্য, বি, এল, উপাধিধারী সুসভ্য ব্যক্তির হস্তে হীরক, মুক্তা ও স্বর্ণাভরণে বিভূষিতা প্রাণাধিকা কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইল; প্রফুল্লের মাতা রূপগুণান্বিত জামাতা

পাইয়া মনে করিলেন, তাঁহার কন্যার মা হওয়া সার্থক হইল; আর স্নেহ-প্রতিমা প্রফুল্ল উপযুক্ত বরে অর্পিত হইল দেখিয়া প্রফুল্লের "যোগেন দাদা" ভাবিলেন "আমার জীবন সার্থক হইল!" কিন্তু যিনি যাহাই মনে করুন, যে দেবতা সকল নর-নারীর অদৃষ্টলিপি পাঠ করিতে পারেন, তিনিই অবশ্য স্বতন্ত্র কথা বুঝিয়াছিলেন! ক্ষুদ্র মানবের সে শক্তি কোথায়?

এইখানে বলা আবশ্যক, প্রফুল্লের বর সুরেশচন্দ্রের অন্য অভিভাবক কেহ না থাকায় প্রফুল্ল আপাততঃ পিতৃগৃহেই রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের পরে আর দুই বৎসর কাটিল। সুরেশচন্দ্র, বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবকের মত, ওকালতি করিতে গিয়া পয়সা অভাবে "স্বাধীন ব্যবসায়ের" আশয়ে জলাঞ্জলি দিলেন; শেষে যথারীতি "মুন্সেফ" হইয়া বিচারাসনে বসিলেন। তখন প্রফুল্লকে তাঁহার কাছে আনা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল।

এদেশে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে কত বালিকা খোকা খুকির মা হইয়া সংসার করে, কিন্তু প্রফুল্লের আজিও বাল্যভাব দূর হইল না! আজিও কাজ কর্ম্ম সারিয়া সে সখীদের সহিত খেলা করে; যোগেনের সহিত গল্প করে; স্বামীর কাছে যাইতে হইবে—মা' বাপকে ছাড়িয়া, যোগেন দাদাকে ছাড়িয়া, কমলা পুঁটি, সুকুমারীকে ছাড়িয়া, পিত্রালয় বিল্বগ্রাম ছাড়িয়া স্বামীর কাছে যাইতে হইবে, এ কথা মনে করিলেই তাহার বুকের ভিতর কেমন আতঙ্ক হয়! তাহার চক্ষুর পাতা আপনা আপনি ভিজিয়ে আসে! মা' প্রফুল্লের এমনতর বালিকা-স্বভাব দেখিয়া মনে কতই ভয় করেন, এক এক দিন তাঁহার ননন্দাকে বলেন "ঠাকুর ঝি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, ফুলি এখন ডাগর মেয়ে হ'তে গেল, তবু ওর ছেলেমি গেল না, জামাই, এ রকম দেখে রাগ করেন, কি কি করেন, আমার তো বড়ই ভাবনা হয়!"

সন্ধ্যা হইয়াছে; শুক্ল সপ্তমীর চন্দ্রমার সোণার মুখে হাসি উথলিয়া পড়িতেছে; প্রফুল্ল তাহাদের বারাণ্ডায় বসিয়া যোগেন্দ্রের কাছে গল্প শুনিতেছিল। গল্প পদ্মিনীর উপাখ্যান; রাজপুতললনা-রত্ন কি করিয়া পাপী যবনকে প্রতারিত করিয়াছিলেন, রমণীর সর্ব্বস্ব ধন সতীত্ব রত্ন রক্ষার্থে কি করিয়া জ্বলন্তানলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যোগেন্দ্র সেই পবিত্র কাহিনী শুনাইতেছিলেন, প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল, তাহার বুকের ভিতর যুগান্তর চলিতেছিল, এমন সময়ে বালিকা পুঁটুরাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া "শান্তিভঙ্গের অপরাধ" করিল।

পুঁটু প্রফুল্লের পিসীমা'র কন্যা। প্রফুল্ল পুঁটুকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে পুঁটু?" পুঁটুর গোলা'ল মুখখানি রাঙা হইল, চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া গেল, সে

বড়ই কাতরকণ্ঠে কহিল "জামাই বাবু এসেছে দিদিমণি; তোকে কা'ল বনগাঁয়ে নিয়ে যাবে"। পুঁটুর চক্ষের জল দুই গালে গড়াইয়া পড়িল।

তখন অচিরশ্রুত পদ্মিনী উপাখ্যান ভুলিয়া প্রফুল্ল আঁচলের কোণ লইয়া পাকাইতে লাগিল; যোগেন্দ্র চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন, অশ্রুজলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে। একটু খানি পরে যোগেন্দ্র বলিলেন "কাঁদ্‌চিস্ কেন ফুলি?"

ফুলি কথা কহিল না, দুই হাতে চোখ মুছিতে লাগিল। যোগেন্দ্র সকরুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "কেঁদ না লক্ষ্মী দিদিমণি, তুমি কত পতিব্রতাদের কথা শুনেছ, দেখ দেখি সীতা সাবিত্রী কত কষ্ট—স্বামি-সঙ্গ লাভের লোভে কত কষ্ট সহিয়াছেন! মেয়ে কি চিরদিন মা' বাপের কাছে থাকে? তা' থাকা কি ভাল?"

প্রফুল্ল আবার চোখ মুছিয়া কহিল "যোগেন দাদা, আমার বড়ই প্রাণ কেমন কোচ্চে; মা'কে বাবাকে আর তোমাকে দেখতে পাব না, তাই আমার বুক যেন ফেটে যাচ্চে"। আবার সেই অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল! যোগেন্দ্র আপনাকে সামলাইয়া বলিলেন "ফুলি, এই যে তোমাকে কত দিন বলেছি, ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত; আমাদের পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়া বড় কষ্টের হলেও, আমরা কর্ত্তব্যের ত্রুটি কেন করিব? আমরা ভগবানের ইচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হোচ্চি, আবার ভগবানের ইচ্ছায় একত্রিত হব।"

প্রফুল্ল ভ্রাতার উপদেশের অপেক্ষা তাঁহার শেষ কথাটীতে একটু বেশ আরাম পাইল। তাহার বয়সে, তাহার হৃদয়ে, কর্ত্তব্যজ্ঞান অপেক্ষা আশা অধিক আদরের জিনিস।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত সংযতচিত্তে প্রফুল্ল বলিল "আমি এখান থেকে গেলে, তোমার যদি অসুখ হয়, কাকীমা যদি তোমাকে যত্ন না করেন, তা'হলে কি হবে যোগেন দাদা?" এইবার যোগেন্দ্রের চোখের জল চাপিয়া রাখা গেল না বুঝি! কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র সে বেগ সম্বরণ করিলেন; বলিলেন "তার জন্যে ভাবিস্ কেন ফুলি, ভগবানই তো মানুষকে রক্ষা করেন; তাঁর ইচ্ছা হ'লে কি লোকে কষ্ট পায়? এই যে অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা, এ সকল সাধু কাজের প্রবর্ত্তক কি মানুষ? না, মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র? যাঁহার দয়ায় ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা হোচ্ছে, তিনিই সকলের মূল। তবে তোমার ভাবনা কিসের?"

প্রফুল্লের মুখ প্রফুল্ল হইল; সে যুক্তকরে ভগবানের চরণে প্রণাম করিল। এইখানে আমরা যোগেন্দ্রের একটু পরিচয় দিতেছি।

যোগেন্দ্র প্রফুল্লের সহোদর নহে; প্রফুল্লের পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবে মাতৃহীন বলিয়া প্রফুল্লের মাতা যোগেন্দ্রকে নিজের সন্তানের মত স্নেহ ও যত্ন করেন। যোগেন্দ্র তাঁহাকে মাতৃবৎ, এবং প্রফুল্লকে সহোদরাবৎ মনে করেন।

যোগেন্দ্র প্রফুল্ল হইতে পাঁচ বৎসরের বড়। লেখা পড়ায় ও ধর্ম্মানুরাগে, শিক্ষিত সমাজে যোগেন্দ্র বড়ই প্রশংসিত। শুনিয়াছি কলিকাতার কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়াছেন "বয়সে বালক হইলেও যোগেন্দ্রের প্রকৃত চরিত্রবল, ও মহৎ-হৃদয় আছে।" আর গ্রামের লোকেরাও অনেকে বিবেচনা করেন "যোগেনের কার্ত্তিকের মত রূপ, লক্ষ্মণের মত স্বভাব; অমন ছেলে যাঁ'কে মা' বলে, তাঁহারই জীবন ধন্য!"

অনেকের বিবেচনা এইরূপ হইলেও সকলের বিবেচনা অবশ্য অন্যরূপ। আমরা এ কথার উল্লেখ করিতেছি, কেননা সত্য সত্যই মাতৃহীন যোগেন্দ্র যাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকেন, যোগেন্দ্রের সেই বিমাতা ঠাকুরাণী কিন্তু সে জন্য নিজের জীবন "ধন্য" মনে করেন না; "জীবন ধন্য" মনে করা দূরে থাকুক, যোগেন্দ্রের উপরে তিনি যে রকম ব্যবহার করেন, তাহাতে কৈকেয়ী-চরিত্র স্মরণ না হইয়া যায় না। সেই জন্যই স্নেহশীলা প্রফুল্ল তাহার প্রিয় ভ্রাতার জন্য এ রকম ব্যথিতা।

যাহা হউক আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, যোগেন্দ্রের একমাত্র অপরাধ, তিনি তাঁহার বিমাতার মৃত-সপত্নী-পুত্র। সেই অপরাধেই বিমাতা যোগেন্দ্রের প্রতি স্নেহ-শূন্যা।

এ সংসারে যাহাকে তুমি ভালবাসিয়া থাক, তাহার স্নেহভাজনের উপরেও তোমার ভালবাসা জন্মিবে; ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্গগৃহে অনেক রমণী—সকলকার কথা আমরা কখনই বলিতেছি না—অনেক দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষের রমণী, প্রিয়তম স্বামীর প্রিয় সন্তানকে "সপত্নী-সন্তান" ভাবিয়াই দারুণ ঈর্ষ্যার চক্ষুতে দেখেন! যে দেশে রমণী-হৃদয়ে এত সঙ্কীর্ণতা, সে দেশের প্রকৃত উন্নতি কতদূরে, কে ও বলিবে?

(ক্রমশঃ)

সন ১২৯৩ সাল
তারিখ
কলিকাতা

মহরম।

মহরম অতীত কালের শোকস্মৃতি। এসলাম্-ধর্ম্ম-স্থাপনকর্ত্তা মহাত্মা মহম্মদের দুইটী প্রিয় দৌহিত্র হাসেন ও হোসেন। এই দুইটী দুহিতৃ-পুত্র ভিন্ন মহম্মদের নিজের পুত্র সন্তান ছিল না। হাসেন ও হোসেনের পিতার নাম মহাবীর হজরত আলি। হজরত আলি, হজরত মাবিয়া এবং অন্যান্য কয়েক জন মহম্মদের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। মাবিয়া অক্কতদার [illegible] মহম্মদ ইসলাম ধর্ম্মানুসারে ত্রিকালজ্ঞ, বিশেষতঃ ঈশ্বরের দোস্ত বা বন্ধু। এক দিন মহম্মদ কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বিচিত্র, মাবিয়া আমার প্রিয় বন্ধু, তথাপি ইহাঁর পুত্র আমার দৌহিত্র দুটীকে বধ করিবে। মাবিয়া ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরূপ যাহাতে না ঘটে আপনি

তাহার ব্যবস্থা করুন। পরম ভক্ত মহম্মদ বলিলেন, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ প্রার্থনা করিব না। মাবিয়া অন্য ধাতুর মানব। তিনি বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব না, দেখিব কিরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছা সফল হয়।" কিন্তু কিছুদিন পরে মাবিয়া এরূপ বিপদে পড়িলেন যে, বিবাহ ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় রহিল না। দৈববাণী হইল, দারপরিগ্রহ কর। মাবিয়া ঈশ্বরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বাজার হইতে একটী বৃদ্ধা এবং কুৎসিতা নারীকে কিনিয়া আনিলেন। তাহার পুত্র সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া নিকা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা বিবি রাজভোগে সুন্দরী যুবতী হইয়া দাঁড়াইলেন। মাবিয়ার দর্প চূর্ণ হইল, বিবির গর্ভে এজিদ নামে এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। অপত্যস্নেহে মাবিয়ার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল। মহম্মদের স্বর্গারোহণের পরেও মাবিয়া দিন কতক জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্র এজিদকে অনেক সদুপদেশ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহম্মদের পারিষদেরাও প্রত্যেকে এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর ছিলেন। এজিদ পিতৃত্যক্ত সিংহাসনে বসিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। এজিদ শব্দের অর্থই পাপ-পুরুষ। তিনি সম্রাট মহম্মদের দৌহিত্র-গণের সহিত সদ্ভাব রাখিলেন না, কর দিতেন না, মনে মনে মহাদ্বেষ করিতেন। ধর্ম্মাত্মা হাসেন হোসেন ইহা সহ্য করেন; সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্য রক্তপাত ভাল বাসিতেন না। এদিকে ক্রমেই এজিদের বুক বাড়িতে লাগিল। দুরাত্মা এক দিন সংবাদ পাইল, নগরবাসী কোন ধার্ম্মিক পুরুষের পরম সুন্দরী স্ত্রী আছে। তাহার প্রতি লোভ পড়িল। কিন্তু সে সাধ্বী সতী কিছুতেই টলিল না। ইহাতে পাপিষ্ঠ অন্য উপায় করিল। সুন্দরীর স্বামীকে রাজ-সভায় আনিয়া বলিল, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, তুমি ভিন্ন আর কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী পরম সুন্দরী, বড়ই ধার্ম্মিকা। সে ধার্ম্মিক ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, রূপ বা রাজ্য ধন চাহে না। তুমি বিখ্যাত ধার্ম্মিক, তোমার রোজা নমাজ বাদ যায় না। এই কথা শুনিয়া সে তোমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে। তবে সে এই চাহে যে, তুমি তাহাকে আন্তরিক স্নেহ ও যত্ন করিবে। সরল ধার্ম্মিক ইহাতে সম্মত হইলেন। এজিদ একজনকে মধ্যবর্ত্তী দূত করিয়া অন্দরে পাঠাইলেন। মুসলমানগণ এই মধ্যবর্ত্তী দূতকে উকীল কহে। বর-কন্যার দেখা সাক্ষাৎ হয় না, উকীল কন্যার সম্মতি আনিয়া দিলেই মন্ত্রপাঠ হয়। এই সম্মতিকে "এজেন" বলে।

এজিদের এই কার্য্য প্রতারণাপূর্ণ, কেননা তাহার ভগ্নীই ছিল না। উকীল সাহেব অন্দর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বিবি প্রণয়ের জামিন চাহেন। তিনি বলেন, ধার্ম্মিকের যখন বিবাহিতা স্ত্রী বর্ত্তমান, তখন তিনি আমাকে ষোল আনা ভাল বাসিবেন কিরূপে? কিন্তু এই ধার্ম্মিককে পতিরূপে না পাইলে, আমি এ পাপ জীবন

রাখিব না। ধার্ম্মিক মহা বিব্রত হইলেন। এজিদের পাপ সহচরগণ উহাকে বন্ধুভাবে বুঝাইয়া ঠিক্ করিলেন। সরল মুসলমান, ইহাদের কুহকে পড়িয়া রাজকন্যার লোভে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে তাল্লাক দিলেন, অর্থাৎ ত্যাগ করিলেন।

এদিকে দ্বিতীয়বার উকীল সাহেব সংবাদ আনিলেন, বিবির মত ফিরিয়া গিয়াছে। বিবি বলেন, যে ব্যক্তি রাজ-কন্যার লোভে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি আবার মহারাজকুমারীকে পাইলেই আমাকে তাল্লাক দিবে। এরূপ পাপিষ্ঠকে আমি পতিত্বে বরণ করিতে পারি না।

ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী হইলেন। এজিদ উহার স্ত্রীর নিকট ঘটক পাঠাইলেন। ঘটক যাইতেছেন, পথে হাসেনের সঙ্গে দেখা হইল। হাসেন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, আমিও নিকার উমেদার আছি, বিবির দরবারে আমার আরজিও আপনি পেশ করিবেন। বিবি যাহার প্রতি রাজি হইবেন, সেই তাহার পতি হইবে।

ঘটক বিবির নিকটে প্রথমতঃ এজিদের, পরে হাসেনের এবং অবশেষে নিজের ইচ্ছা জানাইলেন, এবং তাঁর মতা-মত জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিবি ঘটককে পিতৃসম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসেন ও এজিদের মধ্যে কে যোগ্যতর ব্যক্তি? ঘটক ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া হাসেনের পক্ষে রায় দিলেন। বিবিও ঐ হাসেনকে পতি স্বীকার করিলেন। এজিদের ক্রোধানলে ঘৃত পড়িল। এজিদ গুপ্ত দূতীর দ্বারা ঐ স্ত্রী-লোককে দিয়া হাসেনকে বিষপান করাইল। হাসেন বিষের জ্বালায় মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া হোসেনকে বলিয়া গেলেন, ভাই, এই হতভাগিনী স্ত্রীর কোন দোষ নাই। এজিদের লোক উহাকে প্রতারণায় ভুলাই-য়াছে। স্বামি-বশ করিবার ঔষধ বোধে আমাকে কালকূট দিয়াছে। উহাকে কিছু বলিও না, বরং প্রতিপালন করিও। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর নিজেই সুবিচার করিবেন।

কিন্তু এজিদ সে ধাতুর লোক নহে। সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া নানা ছলে হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইল। হোসেনের বাহুবল, কি লোক-বল কম ছিল না। কিন্তু এজিদ ছল কৌশল ক্রমে হোসেনের পক্ষবর্ত্তী লোকের জলপান বন্ধ করিল। আরবদেশে জল বড় দুষ্প্রাপ্য। পিপাসায় হোসেনের লোক লস্কর হস্তী ঘোড়া মরিতে লাগিল। এজিদ সর্ব্ব সৈন্য একত্র করিয়া জলপথ আটক রাখিয়াছে। হোসেনের পিপাসাতুর সৈন্যদল উহাদিগকে আঁটিতে পারে না। যে ছলে যুদ্ধ ঘটাইয়াছিল, তাহাও অতি ঘৃণিত। কারবেলা নামক স্থানে হোসেনের একজন বিশ্বাসী বন্ধু বাস করিত। এজিদ এই বন্ধুকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করে। বিশ্বাসঘাতক একদিন হোসেনকে গোষ্ঠী-বর্গ সহিত ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল।

হোসেন মনে দ্বিধা না করিয়া নিমন্ত্রণে গেলেন। সঙ্গে হাসেনের পুত্রগণ প্রায় সকলেই ছিলেন। কেবল একমাত্র জয়নাবকে বাড়ীতে রাখিয়া যান।

কথিত আছে, ধর্ম্মাত্মা হোসেন কতকগুলি কুলক্ষণ দেখিয়া আতঙ্কিত হন, এবং সেই কপট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ স্থানের নাম কারবেলা। মাতামহের মুখে শুনিয়াছিলেন, কারবেলায় তাঁহার মৃত্যু হইবে। ইহাতেই আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া তলোয়ার হস্তে প্রস্তুত রহিলেন। যুদ্ধ হইবে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে বহু সেনা আনিতে পারিতেন। শরীর রক্ষার্থে জন কয়েক লোক মাত্র সঙ্গে আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এজিদের লোক সকল স্থলে জল আটক করিয়াছে। ইহারা বহুসংখ্যক, ইহাদিগকে কেহ সরাইতে পারিল না। হাসেনের পুত্র প্রভৃতি সকলেই একে একে প্রাণ দিল। ইহাদের একজন সেই দিনেই বিবাহ করেন, এবং বিবাহ বস্ত্র লইয়াই রণস্থলে শয়ন করিলেন। হোসেন এই সমস্ত দেখিয়া একাকী অশ্বারোহণে তলোয়ারের আঘাতে শত মুণ্ডচ্ছেদন করিতে করিতে নদীর পথ পরিষ্কার করিলেন। দারুণ পিপাসায় অঞ্জলিপূর্ণ জল মুখের নিকটে তুলিয়া ভাবিলেন, এই জলের জন্য আমার অনুগত অনুচরেরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহই আসিতে পারে নাই। আমি কোন্ প্রাণে একা জল পান করিব? স্বজনবৎসল মহাবীর অঞ্জলির জল নদীতে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শত্রু মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাপিষ্ঠগণ অন্যায় সমরে হোসেনকে বধ করিয়া অবশেষে শিশু বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকেই নষ্ট করিল। অনেকের বংশ লোপ পাইল। কিন্তু ইহাতেও এজিদের আশা পুরিল না। তিনি হাসেনপত্নী বা এমামদের রাজসিংহাসন হস্তগত করিতে পারেন নাই। হাসেন হোসেনের বৈমাত্র ভাই মহাবীর হানিফ আসিয়া এজিদের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন, জয়নাবকে এমামদের সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনিলে নিষ্ঠুরের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। এই মহরমে গোমরা মাটির দিন মুসলমানকন্যারা "হায় হোসেন ইয়া বলি কাসেম" রবে মাথায় এবং বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পথে পথে ফিরিয়া থাকে। মুসলমান নারীদের ক্রন্দনে হিন্দুস্থানী কুলনারীরাও উন্মত্তার মত উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া থাকে। পশ্চিমে বহু হিন্দু মহরম পর্ব্ব পালন করিয়া থাকে। হিন্দুরা তাজিয়া বা গোমরা নির্ম্মাণ করিতেও ছাড়ে না। আজ কাল মুসলমানের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোক মহরম পর্ব্ব ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল হিন্দুরা এখনও ছাড়ে নাই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

জ্বরের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ।

গুলঞ্চ, কালমেঘ, বিল্বপত্র, সিউলি ফুলের পাতা, তুলসীপত্র প্রভৃতি দ্রব্যের রস। চিরতা, নালতে, নিমছাল, আতইচ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্বাথ।

অতিসারঘ্ন দ্রব্য।

বেলশুঁঠা, মুতা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, আমের কোশী, মাজুফল, কুরচি, ধাঁইফুল প্রভৃতি দ্রব্যের ক্বাথ।

কাশনিবারক দ্রব্য।

বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টিমধু, কণ্টিকারী, বচ, কুড়, তালিশপত্র, পিপুল, কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রভৃতির ক্বাথ। বংশলোচন, তুলসীপত্র, পান ও আদার রস ইত্যাদি।

কোষ্ঠপরিষ্কারক দ্রব্য।

তেউড়িমূল চূর্ণ, দন্তীমূল চূর্ণ, হরিতকী ভিজার জল, এবং সোনামুখী, কটকী, গোলাপফুল, এরণ্ডমূল প্রভৃতির ক্বাথ।

রক্ত উঠা ও রক্তভেদ নিবারক দ্রব্য।

আয়াপানের রস, লাক্ষা ভিজার জল বা ক্বাথ, যজ্ঞডুমুরের রস ও চিনি। কুকশিমের মূলের রস ও চিনি, ছাঁচি কুমড়ার জল, দূর্ব্বাঘাসের রস, ছাগীদুগ্ধ, কুরচির ছালের ক্বাথ, কুঙ্কুম, মোচরস ইত্যাদি।

ক্বাথ।

ক্বাথ্য দ্রব্যের পরিমাণ মোট দু তোলা, একটী দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলে সেই দ্রব্যটী ২ তোলা লইতে হইবে। ক্বাথ্য দ্রব্য অধিক হইলে প্রত্যেকের সমপরিমাণে লইয়া মোট পরিমাণ ২ তোলা করিবে। প্রথমে ক্বাথ্য দ্রব্য বীজ ডাঁটা ও মূলের কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া লইবে। পরে পরিমাণ ঠিক্ করিয়া অল্প থেঁতো করিবে। অনন্তর দেড় পোয়া জলে এক ঘণ্টা আন্দাজ একটী মৃৎপাত্রে একখানি সরা চাপা দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ক্বাথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্বাথ প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে হইবে।

ছয় প্রকার রসের গুণ।

ছয় রসের মধ্যে মধুর রস অম্ল অপেক্ষা, অম্লরস লবণ অপেক্ষা, লবণ রস তিক্ত অপেক্ষা, তিক্তরস কটু অপেক্ষা এবং কটু রস, কষায় অপেক্ষা বলোৎপাদক। মধুর রস বলোৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই ছয় রসের মধ্যে মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ুনাশক, কিন্তু কফকর। কটু, তিক্ত ও কষায় ইহারা কফনাশক কিন্তু বায়ুকর। কষায়, তিক্ত ও মধুর ইহারা পিত্তনাশক। লবণ, অম্ল ও কটু ইহা পিত্তজনক।

অনুপান গ্রহণ বিধি।

যে দ্রব্যের রস লইতে হইবে, সেই দ্রব্যটী যদি কোন এক প্রকার ফল হয়, এবং সেই ফলের যদি শক্ত বীজ থাকে, তাহা হইলে বিচি পরিত্যাগ করতঃ ফল

থেঁতো করিয়া রস লইতে হইবে। কঠিন বীজ না থাকিলে সবীজ সমস্ত ফল থেঁতো করিয়া রস লইতে হইবে।

মূলে যদি শক্ত কাষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে কাঠ পরিত্যাগ করিয়া মূলের ছালের রস লইতে হইবে। কচি মূল হইলে এবং তাহাতে কোন কাঠ না থাকিলে সমস্ত অংশ থেঁতো করিয়া লইতে হইবে।

ছালের রস লইতে হইলে যেন ছালের সহিত বৃক্ষের কাঠ না থাকে।

বোঁটা ফেলিয়া পত্র থেঁতো করিয়া রস বাহির করিতে হইবে।

থেঁতো করিয়া নিঙড়াইলে যদি সহজে রস বাহির না হয়, তাহা হইলে অল্প জলের ছিটা দিয়া থেঁতো করিয়া রস বাহির করিয়া লইবে। যে দ্রব্যের রস বাহির করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে। রসের পরিমাণ ১ তোলা। রস প্রত্যহ টাট্‌কা লইতে হইবে।

অল্কেকজাণ্ডার পোপকৃত ইলিয়াডের বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রথম ভাগ।

প্রস্তাবনা।

পুরাকালে গ্রীকদেশে হোমার নামক এক মহাকবি জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার অবস্থা এত হীন ছিল যে, তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে স্ব-রচিত গাথা গান করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার সেই সকল "গাথাই" ইলিয়াড নামে পরিচিত। ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস, স্পার্টার পরমা সুন্দরী রাজ্ঞী হেলেনাকে হরণ করিলে, হেলেনার উদ্ধারার্থ তাঁহার স্বামী স্পার্টার রাজা ম্যানিলিয়স বহুসংখ্যক গ্রীক মিত্র রাজগণের সহিত, ট্রয় নগরী আক্রমণ ও পরে তাহা ধ্বংস করিয়া হেলেনার উদ্ধার সাধন করেন। মূলতঃ এই বিষয় অবলম্বনে হোমারের ইলিয়াড্ রচিত হইয়াছে, ইংরাজি ভাষায় ইহার অনেক প্রকার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে আলেকজাণ্ডার পোপ পদ্যে ইলিয়াড অনুবাদ করেন। বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের নিকট হোমারকে পরিচিত করিবার জন্য আমরা আজ পোপের ইলিয়াড বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, ভগিনীগণ ইহা পাঠ করিয়া আমোদিত হইবেন। পোপের ইলিয়াড মিত্রাক্ষরে রচিত, কিন্তু আমরা ইহা অমিত্রাক্ষরে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কেননা বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ অধিক ওজস্বী ও শ্রুতিমধুর।

উর দেবি বীণাপাণি! গ্রীসের শোকের
উৎস ভয়ঙ্কর—সেই আকিলিস*-ক্রোধ-
গীতি গাও তুমি আজি, যে ক্রোধ জ্বলন্ত
অকালে নিহত যত বীর শ্রেষ্ঠগণে
করিলা প্রেরণ চিরান্ধতমসাবৃত
যমরাজপুরে; অনাবৃত সিন্ধুকূলে,
অন্ত্যেষ্টিবিহীন হায়, যাহাদের দেবি!
শবদেহ যত, শকুনি কুক্কুরগণ
করিলা ভক্ষণ। আকিলিস-আট্রিডিস †,
বিবাদের কালে, এ মহাদুর্দ্দৈব ঘোর
হয়ে সঙ্ঘটন, করিলা সফল তবে,
(নৃপতির ভাগ্যদোষে), যোভের‡ বাসনা।
ব্যক্ত করে বল তুমি, কি কুক্ষণে হায়!
বিষম বিবাদ এই লভিলা জনম,
কি ক্রোধ কারণ দেবি! লেটোনা§ নন্দন,
মৃত্যুর করালমূর্ত্তি, ভীষণ মড়ক,
বিস্তারি সক্রোধে, পুঞ্জীকৃত শবদেহে
ছাইলা শিবির? করিলা নৃপতি দর্পী
অবজ্ঞা তাহার পূজ্য দেব পুরোহিতে,
এই হেতু ঘটিল সমূহ মহামারী
প্রজার নিধন। অমূল্য রতন দানে,
বন্দিনী কন্যার, চাহিলা কৃসিস § এবে,
দাসত্ব মোচন; হইয়া যাচক যবে
দাঁড়ালেন আসি, সমবেত গ্রীকমাঝে,
করদেশ তাঁর শোভিত হইতেছিল
আপলোর সুভীষণ পতাকা সকলে।
প্রসারিয়া স্বর্ণদণ্ড, লরেল মুকুট,
সমবেত গ্রীক কাছে, জানুপাতি হায়!
আপলোর* নামে, চাহিলা কন্যার তার
দাসত্ব মোচন। করপুটে ম্যানিলিসা†,
আট্রিডিস কাঁছে, যাচিলা কেবল মাত্র
করুণা তাঁদের। এইরূপে সম্বোধিয়া,
বলিলা সকলে, "হে বীর হে রাজগণ,
আশীষি সবায়, করুক সুসিদ্ধি লাভ
প্রতিজ্ঞা সবার, ভূমিতে লুণ্ঠিত হোক
গর্ব্বিত প্রাচীর ওই ট্রয় নগরীর,
এই যুদ্ধ শেষে সবে, যোভের কৃপায়
স্বদেশের সুখ পুনঃ কর উপভোগ;
কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যা কৃসিসাকে ‡ পুনঃ,
অর্পি মম করে, অভাগ্য পিতার তার
দুঃসহ যাতনাভার কর বিদূরিত।
যদিগো করুণা নাহি হয় মোর প্রতি,
তবে এ আমার সব উপহার দান,
আর সেই আপেলোর প্রতিশোধ ভীতি,
হৃদয় সবার তবে করুক দ্রাবিত।"
শুনি এ প্রার্থনাবাণী, গ্রীক বীরগণ,
করিলা সু-উচ্চৈঃস্বরে সম্মতি প্রকাশ,
তুষিতে যাজকে আর করিতে মোচন
বন্দিনী কন্যার তার দাসত্ব শৃঙ্খল।
কিন্তু হায়! আট্রিডিস, রাজগর্ব্বভরে,
পবিত্র যাচক বৃদ্ধে করি উপেক্ষিত,

---

* অ্যাকিলিস—থিওটিসের রাজকুমার এবং এক প্রসিদ্ধ গ্রীক বীর।

† আট্রিডিস—গ্রীক অধিরাজ আগামেম্‌নন্।

‡ যোভ—দেবরাজ ইন্দ্র।

§ লেটোনা—আপলো বা সূর্য্যদেবের মাতা।

§ ক্রাইসিস সূর্য্যদেবের পুরোহিত। প্রকৃত নাম ক্রাইসিস, কিন্তু এই পদের অক্ষর ঠিক রাখিবার জন্য কৃসিস করা গেল।

* আপলো—সূর্য্যদেব।

† মানিলিস—স্পার্টার রাজা।

‡ কৃসিসা—এখানে সূর্য্যদেবের পুরোহিতের কন্যা।

এইরূপে সম্বোধিয়া করিলা উত্তর ;—
"রণক্ষেত্র হতে প্রাণ লয়ে অবিলম্বে
কর পলায়ন, হে মূঢ় হে দুঃসাহসি !
নৃপতির ধন—হইয়া সাহসী কভু
যাচিও না আর ; লয়ে তব স্বর্ণদণ্ড,
লয়েল মুকুট, সত্বর এ স্থান হতে
কর প্রস্থান। ওই তব দেবাঙ্কিত
পতাকার পরে অধিক বিশ্বাস নাহি
করিও স্থাপন। হে যাজক ! শুন এবে
দুহিতা তোমার হয়েছে সম্পত্তি মম,
বৃথা তুমি তব ও প্রার্থনা-অশ্রু আর
উপহার দানে, যাচিছ তাহায় তুমি।
যদবধি নাহি হায়, কালের প্রভাবে,
যৌবন সৌন্দর্য্য তার হয় অপগত,
কিম্বা মোর এই আলিঙ্গন-পাশ হতে
যৌবনের অবসানে, না হয় দূরিত,
তদবধি কন্যা তব থাকিবে আমার।
বিগত-যৌবনে বস্ত্র করিবে বয়ন,
কিম্বা নিত্য শয্যা মম করিবে রচিত,
তার পর হে যাজক, দুহিতা তোমার,
হেথা হতে যথা ইচ্ছা করিবে গমন।"
শুনি এ উত্তর-বাণী, পুরোহিত এবে,
ফিরিলা সাগরতীরে, কম্পিতশরীরে,
কন্যার বিরহশোকে, তীব্র যাতনায়,
করিতে লাগিলা বহু রোদন বিলাপ,
কিন্তু গ্রীসিয়ান-ভয়ে, দেবতা-সমীপে,
করিবারে অভিযোগ, না করি সাহস,
গভীর কল্লোলময় সাগরের তীরে,
নীরবে শোকার্ত্তচিতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হইলেন উপনীত, বহুদূরে যবে,
এইরূপে প্রার্থিলেন দেবতাসমীপে ঃ—

"হে স্মিনথিয়াস !* সুন্দরী লেটোনাগর্ভে
জনম তোমার, সিলার † রক্ষক তুমি,
আলোক-আধার, তব আগমনে দেব,
কৃসিস সমুদ্রকূল, উজলিত সদা,
টিনিস ‡ দ্বীপের তুমি পূজিত দেবতা,
পবিত্র মন্দিরে তব, যদি কভু আমি
কুসুম-গ্রথিত হার দোলাইয়া থাকি,
অগ্নিরে করিতে তৃপ্ত যদি গো কখন
হত বৃষমেদে আমি করে থাকি কভু,
হোমযজ্ঞ যাগ, তবে হে রজতময়,
শরাসনধারী, দাসের এ অপমান
প্রতিবিধানিতে, সমূলে ও গ্রীকদলে
করিতে নিধন, করহ বর্ষণ তব
রৌপ্য শরজাল, কৃসিসের ভিক্ষা এই।"
শুনিয়া আপলোদেব, সুপ্রসন্ন-মনে,
নামিলেন ওলিম্পির $ উচ্চ চূড় হতে,
করিতে আহত তবে গ্রীকের হৃদয়,
করিলা আনত তার দীপ্ত শরাসন,
প্রচণ্ড গমনে দ্রুত, রৌপ্য শরজালে,
হইতে লাগিল মহাশব্দ সমুত্থিত।
গ্রীসিয়ান পরে, ঘোরতর প্রতিহিংসা
করিতে সাধন, সহসা নিশীথছায়ে
ঢাকিলা মেদিনী, নিবিড়তমিস্রাপূর্ণ,
অন্ধকাররাশি, ঘুরিতে লাগিলা তার
মস্তক উপরে, তরণী সম্মুখে হায়,

* স্মিনথিয়াস—সূর্য্যদেবের অপর নাম।

† সিলা—একটি নগরের নাম।

‡ টিনিডাস—একটা দ্বীপের নাম। প্রকৃত নাম টিনিডাস, এখানেও পদের অক্ষর ঠিক রাখিবার জন্য টিনিস করা গেল।

$ ওলিম্পিয়—একটি পর্ব্বতের নাম।

সাক্ষাৎ শমন সম শরাসন যবে,
টঙ্কারিলা, সন্‌সনে, হলো উড্ডীয়ান,
পক্ষযুক্ত মৃত্যু যেন শরজালরূপে।
প্রথমে মড়ক আরম্ভিল অশ্বতরী
কুকুরের মাঝে, অবশেষে প্রতিহিংসা-
পূর্ণ শরজাল নিক্ষেপ করিলা হায় !
মানবের পরে। এবে নব রাত্রি ধরি,
ঘন প্রজ্বলিত দীপ্ত চিতার অনল,
তমোময় নভোদেশ উজলিত করি,
সুবিকট তীব্রালোক করে উদ্গিরণ।
দশম দিবসে, জুনো দেবী * অভিজ্ঞান
পাইয়া অন্তরে, থেটিসের † সুরসম
পুত্র মহাবীর, করিলেন সমবেত,
গ্রীকগণ সবে। হেরিয়ে এতেক হায়,
বীরের নিধন, হয়েছিল সন্তাপিত,
জুনোর হৃদয়। উঠিল সভার মাঝে,
বীর অ্যাকিলিস, এইরূপে নৃপতিরে
বলিলা সম্বোধি ঃ—"ত্যজি এ শমনরূপী
ট্রয় উপকূল, দূর জলধির সীমা,
উজানিয়া পুনঃ, স্বদেশে মোদের সবে
চল যাই ফিরি, রক্ষিতে এ অবশিষ্ট
গ্রীসিয়ান্‌গণে হয়েছে সময় এবে।
ভীষণ মড়ক করিছে সংহার সবে,
সমরে যাহারা পাইলেক অব্যাহতি।
কিম্বা সুধাও সত্বর কোন দৈবজ্ঞ কি
শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী বৃদ্ধজনে, আপলোর
ভীষণ এ ক্রোধের কারণ। হায় এবে
যদ্যপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে এই অভিশাপ
হয়ে থাকে নিপতিত মস্তকে মোদের,
তবে ও মন্দিরে ধূপ করি প্রজ্বলিত,
শত ধেনুমেধ যজ্ঞ করি সম্পাদন,
প্রসন্ন দেবতাগণে করি এস সবে।
মোদের এ প্রায়শ্চিত্তে, দেবগণ সবে
অর্পিবেন পুনঃ তবে, সুপ্রসন্নমনে,
মুমূর্ষু গ্রীসীয়গণে নূতন জীবন।
প্রসন্ন আপলো দেব, আর নাহি তাঁর
বর্ষিবেন ক্রোধভরে মোদের উপরে,
জ্বলন্ত বহ্নির তুল্য দীপ্ত শরজাল।
বলিয়া এতেক যবে, বীর আকিলিস
বসিলা সভার মাঝে, বালকান * তবে,
উঠিলেন এইরূপে উত্তরিতে তারে।
সেই ত্রিকালজ্ঞ, বৃদ্ধ জ্ঞানী বালকান্,
যাঁর জ্ঞানচক্ষু পারেগো ভেদিতে, দূর
অতীত, ভবিষ্য আর বর্ত্তমান কাল,
যিনি অধিষ্ঠিত, গ্রীক পুরোহিত আর
ধর্ম্মনেতৃপদে, বহু বিজ্ঞ বর্ষীয়ান্,
সকলের পূজ্য যিনি, জ্ঞানীর প্রধান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

* জুনোদেবী—যোভ-পত্নী শচিদেবী।

† থেটিস—অ্যাকিলিসের মাতা। তিনিও এক জন দেবী।

* বালকান্—গ্রীসের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ও গ্রীকগণের পুরোহিত।

বাছুর ধরান।

বাছুর ধরান কথাটা, বোধ হয়, সকল দেশেই প্রচলিত আছে। তবে উহার অর্থ হয়ত, কেহ জানেন, কেহবা জানেন না। এ জন্য অগ্রেই উহার অর্থটী

প্রকাশ করিব। এই শব্দের অর্থ প্রকাশ বা তদন্তর্গত ব্যাপারটী মাত্র বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐ ব্যাপারটীর সহিত সাধারণ মানবজীবনের একটী অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যটী আমাদের মনকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছে। যে দ্রব্যটী আমাদের মিষ্ট লাগে, দেখিতে পাই, তাহা অন্যেরও মিষ্ট লাগে। যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা, বোম্বাই, নেঙ্গড়া প্রভৃতি। যে সাদৃশ্যটী আমাদের মন হরণ করিয়াছে, তাহা অন্যের মনও আকর্ষণ করিতে পারে, এই বিশ্বাসেই "বাছুর ধরান" প্রবন্ধের অবতারণা।

যে সকল দুগ্ধবতী গাভী মৃতবৎসা, তাহাদিগের বৎসগুলি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বা ১০।১৫ দিবস পরেই মরিয়া যায়। কোন কোন গাভী অনেকী প্রসব করিতে পারে না,—বিশেষ যত্নে তাহাদিগকে মৃত বৎস প্রসব করাইতে হয়। এতাদৃশ গাভী সকল প্রায় বর্ষান্তে গর্ভ ধারণ করে। এই রোগাক্রান্তা নারীরাও প্রায় প্রতি বৎসর গর্ভ ধারণ করেন। নারীগণের প্রতি বৎসর গর্ভ ধারণ এবং প্রসূত সন্তানগুলিকে সূতিকাগারেই যমের মুখে অর্পণজনিত অসীম বিড়ম্বনা ভোগ ভিন্ন আর কোনই ফল হয় না। কিন্তু মনুষ্যের বুদ্ধিচাতুর্য্যে গাভীগণের গর্ভধারণ ও বৎসবিনাশ নিতান্ত বিফলে যায় না। দুগ্ধবতী গাভীর বৎস মরিয়া যাইবামাত্র গোপগণ অন্য গাভীর সদ্যঃ-প্রসূত বৎস আনিয়া উহার সম্মুখে স্থাপন করে। সন্ততি স্নেহ-বিহ্বলা নবপ্রসূতি গাভী সেই বৎসকে আপনার গর্ভজাত মনে করিয়া লেহন করিতে আরম্ভ করে। সে একবারও মনে করে না যে, এ বাছুরটা তাহার নহে। এই বাছুর দেখিয়া বাৎসল্যরসে তাহার হৃদয় বিগলিত হয়, স্তনচতুষ্টয় দুগ্ধভারে পুলকিত হয়, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়। এই বাছুরকে পরমানন্দে স্তন্যপান করায়। গোপগণ এই বাছুর দ্বারা ঐ গাভীকে পানাইয়া লয় এবং অজস্র দুগ্ধ দোহন করে। ইহাকেই "বাছুর ধরান" কহে।

জীবগণেরও ঠিক্ এই অবস্থা। বিষ্ণু-মায়া তাহাদিগকেও বাছুর ধরাইয়াছেন। তাহাদিগের আপনকে পর, ও পরকে আপন করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগের আপন হইতে আপন,—জীবনের জীবন কোন বস্তু থাকিতেও তাহারা সে বস্তু ভুলিয়া পরকে আপন আপন করিতেছে। এই পরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনি আপনার স্বরূপ—আপনার নাম ধাম সকলি ভুলিয়া গিয়াছে। যে সকল অনিত্য বস্তু নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিয়া দেয় মাত্র, আমরা সেই সকল অনিত্য বস্তু লইয়া এতই বিহ্বল যে, সেই নিত্য সত্য সনাতন বস্তু ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা পরম পিতা ছাড়িয়া পার্থিব পিতাতে, পরম মাতা ছাড়িয়া পার্থিব মাতাতে, প্রাণের সখাকে ত্যাগ করিয়া লৌকিক বন্ধুতে, অজ অব্যয় প্রাণের প্রাণ চিন্তা-মণি পুত্রকে ছাড়িয়া জন্মমরণশীল জড়ীয়

পুত্রে, এবং প্রেমের সার ভাব—ভাবের সার মহাভাবস্বরূপিণী মনোমোহিনী ভুবনমোহিনীকে ছাড়িয়া প্রাকৃত পত্নীতে আসক্ত হইয়া বিহ্বল হইয়াছি। এই অসত্য অনিত্য বস্তুর সংযোগে সুখী ও বিয়োগে দুঃখী হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়া প্রতিক্ষণ জন্মমরণযাতনা ভোগ করিতেছি। অতএব আমরা, আর গাভী অভিন্ন। কেননা আমরাও গাভীর ন্যায় আপন বাছুর ছাড়িয়া পরের বাছুর ধরিয়াছি। পরের বাছুরের গা চাটিয়া, পরের বাছুরের মলমূত্র খাইয়া, পরের বাছুরকে স্তন্যপান করাইয়া পরম সুখ অনুভব করিতেছি।

আমরা যদি পিতা মাতার সেবা হইতে পরম পিতা মাতার সেবা শিক্ষা পাই, আমরা যদি বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া পরম সখার সন্ধান পাই, আমরা যদি পুত্রের লালন পালন হইতে বাৎসল্য ভক্তির উদ্দেশ পাই, আমরা যদি পতি পত্নীর প্রেমযোগ দ্বারা আত্মা পরমাত্মার যুগল-মিলন রসের ও যুগলতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারি, তবেই আমাদের মঙ্গল, নচেৎ মনুষ্যদেহে গাভী বা শূকরের জন্ম ভোগ করা মাত্র।

সন ১২৯৩ সালে
তারিখে
কলিকাতা

জন্তুদিগের বিশেষ লক্ষণ।

১। পক্ষীদের ও কচ্ছপদিগের দাঁত নাই।

২। যে সকল পশু জাবর কাটে, তাহাদের পায়ের ক্ষুর কাটা।

৩। অধিকাংশ পক্ষী এক চোয়াল নাড়ে, তোতাজাতীয় পক্ষী দুই চোয়াল নাড়িতে পারে।

৪। ঘোড়াদের চক্ষুতে ভ্রূ নাই। যে ঘোড়ার চক্ষু যত বেশী সাদা, তাহার স্বভাব তত দুষ্ট।

৫। বিড়ালছানা সারস পক্ষীর অতি প্রিয় ভক্ষ্য এবং সারস তাহা সহজে শিকার করিয়া থাকে। বিড়ালেরাও সারস পক্ষীর শাবক খাইতে বড় ভালবাসে, এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিকার করে।

৬। ভেকের শরীরের [illegible] কঠিন, তাহাতে সে হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস টানিতে ও ফেলিতে পারে না। বেঙকে অধিকক্ষণ হাঁ করাইয়া রাখিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া সে মরিয়া যায়।

৭। শূকরদিগের সম্মুখের পদদ্বয় ঘেঁসাঘেঁসি থাকাতে তাহারা ভাল সাঁতরাইতে পারে না। জলে পড়িলে সাঁতরাইতে গিয়া আপনাদের গলা ছিঁড়িয়া ফেলে।

৮। শশকদিগের চক্ষুর পাতা না থাকাতে তাহারা ঘুমাইবার সময় চক্ষু মুদিতে পারে না। তাহাদের চক্ষুর রক্ষার জন্য ঘুমের সময়ে—কখনও জাগ্রত সময়েও—একটী পাতলা চর্ম্মে চক্ষু ঢাকিয়া যায়।

৯। হরিণদের নাসিকাদ্বার ছাড়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অন্য উপায়ও আছে, এজন্য শিকারী জন্তু দ্বারা তাড়িত হইলে তাহারা বহুক্ষণ দৌড়িয়াও রুদ্ধশ্বাস হয় না।

১০। মৎস্যদিগকে দুই চোয়াল নাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয়, এজন্য ইহারা খাদ্য মুখের ভিতর অধিকক্ষণ রাখিয়া চিবাইতে পারে না, এককালে গিলিয়া খায়।

১১। বহুরূপীর প্রতিক্ষণ রঙ পরিবর্ত্তন তাহার আত্মরক্ষার একটী প্রধান উপায়। সে যেরূপ বস্তুর উপর থাকে, ঠিক্ তাহার রঙ ধারণ করে, ইহাতে শত্রুরা তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারে না।

১২। উটের পিঠে যে মাংসের ঢিবি কুঁজের আকারে আছে, তাহা তাহার পোষণের উপায়। ইহারা অনেক দিন আহার না পাইলেও এই মাংসপিণ্ড দ্বারা শরীর পোষণ করে।

১৩। পেচকের চক্ষু চক্ষুকোটরে এরূপ মাংসপেশীর দ্বারা বদ্ধ যে, ইহা কোনও দিকে নাড়িতে চাড়িতে পারে না। এই অভাব পূরণার্থ ইহার গ্রীবা এরূপ নমনীয় যে, সে তাহা ইচ্ছাক্রমে সকল দিকে সহজে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে।

১৪। ভেড়ার উপরের পাটিতে দন্ত নাই। কোনও কোনও দেশে ভেড়ার লাঙ্গুলে এত অধিক পরিমাণে চর্ব্বি হয় এবং তাহা এত ভারী হয় যে, তাহার পশ্চাতে দুচাকা গাড়ী বাঁধিয়া তাহাকে বহিয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই লাঙ্গুলের চর্ব্বি অতি নরম এবং তাহা দ্বারা নবনীত প্রস্তুত হয়।

১৫। কুমীরেরা ঝিকঝাক নামক একজাতীয় পক্ষী ব্যতীত আর সকল পক্ষী খায়। কুমীর নদীতীরে আসিয়া হাঁ করিয়া থাকে, তখন এই পক্ষী মুখের ভিতর গিয়া কুমীরের চোয়ালে ও দাঁতে যে সকল জোঁক ধরিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া কুমীরকে সুস্থ করে। জলে বাস প্রযুক্ত কুমীরের দাঁতে জোঁক ধরে।

রাজভক্তি ও রাজধর্ম্ম।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ৩॥

লোক অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইবে, এই জন্যই পরমেশ্বর সমুদায় চরাচরের রক্ষার জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥ ৮॥

রাজা বালক হইলেই তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবে না, যেহেতু তিনি মহতী দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।

যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥১৪॥

যিনি প্রসন্ন হইলে মহতী সম্পত্তি লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রমে শত্রু জয় ও বিজয় লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধে পড়িলে মৃত্যু হয়, সেই রাজা সর্ব্বতেজোময়।

তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ॥ ১৪॥

রাজদণ্ডভয়ে চরাচর সমস্ত জগৎ নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, রাজদণ্ড-ভয় না থাকিলে বলবান্ দুর্ব্বলকে স্ত্রী, ধন, গৃহাদি ভোগ করিতে দিত না। রাজদণ্ডভয়েই লোকে স্বকর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হয় না।

তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু॥

রাজা দেশ কাল ও অপরাধীর শক্তি বিদ্যাদি বিবেচনা করিয়া যাদৃশ অপরাধে যেমন দণ্ড হওয়া উচিত, ন্যায়ানুসারে সে সকল নিরূপণ করিয়া অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড করিবেন।

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥ ১৯॥

সম্যক্ বিচার করিয়া প্রজাদিগের দেহ-ধনাদি রক্ষার্থ সেই রাজদণ্ড পতিত হইলে সমুদায় প্রজা রাজাতে অনুরক্ত হয়, আর বিচার না করিয়া (লোভাদিবশতঃ) নিরপরাধ প্রজার দণ্ড করিলে রাজা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হন।

কামন্দক বলিয়াছেন ;—

লোকাধারাঃ শ্রিয়ো রাজ্ঞাং দুরাপা দুষ্পরিগ্রহাঃ।
তিষ্ঠন্ত্যাপ ইবাধারে বিশদাত্মনি সংস্কৃতে॥

প্রজাই রাজলক্ষ্মীর একমাত্র আধার ; এই রাজলক্ষ্মী অতীব দুর্লভ এবং লব্ধ হইলেও সহজে রক্ষণীয় নহে। যেমন সুদৃঢ়, ছিদ্রাদিহীন ঘটাদিতে জল ঠিক্ থাকে, তেমনি নির্ম্মল ও সুশিক্ষিত রাজাতেই রাজলক্ষ্মী স্থায়ী হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্ দিবানিশং।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥৪৪॥

ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বিষয়াসক্ত না হয়, অহোরাত্র তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে, যেহেতু জিতেন্দ্রিয় রাজাই প্রজাগণকে বশে রাখিতে পারেন।

রঘুবংশে কালিদাস বলিয়াছেন ;—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎসৃষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ ১৯॥

তিনি (দিলীপ রাজা) প্রজাগণের মঙ্গলের জন্যই প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিতেন, সূর্য্যদেব সহস্রগুণ রস (বৃষ্টিরূপে) প্রতিদান করিবার জন্যই পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥ ২৪॥

প্রজাগণকে সুশিক্ষা দান, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, ভরণ পোষণ দ্বারা তিনি তাহাদিগের পিতা ছিলেন। তাহাদের পিতারা কেবল জন্মদাতা ছিল।

তং বৈধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ॥ ২৯॥

বিধাতা যে উপাদানে পঞ্চ মহাভূত

(ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বুঝি সেই উপাদানেই তিনি সেই দিলীপকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেননা, সেই দিলীপের সমস্ত গুণই (পঞ্চ মহাভূতের গুণের ন্যায়) একমাত্র বিশ্ব-হিতার্থেই নিযুক্ত ছিল।

তেনার্থবান্ লোভপরাঙ্মুখেন
তেন ঘ্নতা বিঘ্নভয়ং ক্রিয়াবান্।
তেনাস লোকঃ পিতৃমান্ বিনেত্রা
তেনৈব শোকাপনুদেন পুত্রী॥

রাম লোভপরাঙ্মুখ হওয়াতে লোক সকল সমৃদ্ধিশালী হইল। তিনি বিঘ্নভয় হরণ করাতে সকলে ক্রিয়াবান্ (পুণ্যশীল) হইল, তিনি পালনগুণে সকলের পিতা হইলেন, এবং শোক দূর করিয়া সকলের পুত্রী হইলেন।

রামের উক্তি ;—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

প্রজাগণের অনুরঞ্জনের জন্য যদি আমাকে স্নেহ মমতা, এবং নিজের সমস্ত ভোগসুখ অথবা জানকীকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতে আমার ক্ষোভ নাই।

দুষ্মন্তের উক্তি—

যেন যেন বিস্থজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তেষাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

আমার রাজ্যে ঘোষণা কর—আমার প্রজাদিগের মধ্যে যার যার যে যে স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অভাব হইবে, 'দুষ্মন্ত,' কেবল পাপসম্পর্ক ভিন্ন আর সকল স্থলেই সেই সেই প্রজার সেই সেই স্নেহাস্পদ আত্মীয়ের অভাব পূরণ করিবে।

হেঁয়ালী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের "বামাবোধিনী"তে প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর।

১। প্রথম উত্তর তবে শুন দিদিমণি।
"নৃপতি" সবার পূজ্য, ধনী, মানী, জ্ঞানী॥
২। সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী কে এমন আর।
"মাতা" বিনা মরুময় জগৎ সংসার॥
মাতাই উত্তর দিদি তব হেঁয়ালীর।
করি পেশ তোমা কাছে করে মনঃ স্থির॥

৩। বেঙাচি তাহার নাম লয় এই মনে।
লেজ খসে ব্যাঙ হয় জানে সর্ব্বজনে।
৪। "হাজার" হাজার বলি সম্ভাষি তাহার।
মধ্য বর্ণ ছাড়ি দিলে দিব্য অলঙ্কার॥

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দাসী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালী।

১। অর্দ্ধগ্রামে অর্দ্ধগাছে বসতি আমার।
হিন্দুর দেবতা সাকারেতে নিরাকার॥
২। সিঁড়ি বেয়ে নাকে উঠি দেখি চমৎকার।
রাজার কুমার এক পর্ব্বত-আকার॥

৩। সুরাধার আছে ভাই মাঝেতে আমার,
তথাপি পানীয় তরে করি হাহাকার,
পিতৃস্বস্পতি-সনে সতত বসতি,
দেহের মাঝেতে পদ অদৃশ্য মূরতি।

৪। ছায়াহীন কায়া মম উজল বরণ,
আহারে বিচার নাই পতিতপাবন।
আদি বর্ণ গতিশীল—ছাড়িলে বিহঙ্গ,
শেষ বর্ণ বিনা প্রাপ্তি-আশার তরঙ্গ।
মধ্য বর্ণ বিনা বুঝ সুখাদ্য রন্ধন,
তিন বর্ণে নাম মম করহ পূরণ।

নূতন সংবাদ।

১। ১লা জুলাই ও তাহার পূর্ব্ব দিন এক মসজিদ ভাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া কলিকাতার নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা ক্ষিপ্ত হইয়া সহর অরাজক করিয়াছিল, কেল্লা হইতে সৈন্য আনিয়া ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগে অনেক দোষী নির্দ্দোষীকে বধ করিয়া শান্তি স্থাপিত করিতে হইয়াছে। সহরে এরূপ কাণ্ড মধ্যে মধ্যে ঘটিতেছে।

২। গত ২১এ জুন মড়ক কমিসনার র‍্যাণ্ড সাহেব এবং লেপ্টনেণ্ট আয়ার গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে পুনার রাজপথ দিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কোন দস্যু তাঁহাদিগকে গুলি করে। লেপ্টনেণ্ট তখনি হত হন, র‍্যাণ্ড কয়েক দিন পরে গতাসু হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এ জন্য পুলিস দ্বারা পুনাবাসীদিগের উপর কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

৪। সার্ আলেকজাণ্ডার মাকেঞ্জী জুনের শেষে সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মাননীয় সি সি ষ্টিভেন্স তাঁহার স্থানে ছোট লাট হইয়া সর্ব্বপ্রথম ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন করেন। কলিকাতায় গোলযোগ শুনিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছেন।

৫। ভূমিকম্প ৩০শে জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়া আসাম, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে এক মাস কাল চলিয়াছে, আজিও শান্তি নাই। ইহার সবিশেষ বিবরণে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র সকল পূর্ণ। আমরা তাহার স্থানসমাবেশ করিতে পারিলাম না।

৬। কুমারী অমিয়া রায়—যিনি এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২য় হইয়াছেন—তিনি এবং কুমারী মিনি রায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন।

৭। ২৮এ জুন মেদিনীপুরে কর্দ্দম বৃষ্টি ও ৩০এ জুন ময়মনসিংহের নেত্র-কোণায় চন্দন বৃষ্টি হইয়াছে।

৮। মূকবধির বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট ১২৫৲ স্থানে ১৫০৲ টাকা মাসিক সাহায্য দিয়াছেন।

৯। কলিকাতা মেডিকাল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির সহায়তার জন্য হীরক জুবিলী উপলক্ষে রাজ-প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম।

বামারচনা।

জয় বিক্টোরিয়া।

ঘন আঁধারের ঘন মাঝে
কিসের এ পূর্ণ জ্যোতি ?
নিবিড় জলদতলে
ঝলকে বিজলী-ভাতি ?
দরিদ্র ভারতভূমি
হরষে উঠিল মাতি,
জয় বিক্টোরিয়া মাতা
বলিয়া গাহিল গীতি।
মঙ্গল আনন্দ ধারা
সুখময় শান্তি প্রীতি
বিভুর করুণা দান
লভ মাতঃ নিতি নিতি।
ষষ্টিতম বর্ষব্যাপী
রাজত্ব গৌরবে সাজি
প্রচারিছ যাঁর দয়া
হেন শুভ দিনে আজি,
তাঁহার চরণপ্রান্তে
যোড় করে ভিক্ষা চাই
রাজ্ঞী মার পুণ্যবলে
(ভারতের) ঘুচুক সব বালাই।
নিস্তারিণী দেবী,
সাহরাণপুর।

বিধবা কবি। *

বিধবার উদাসীন প্রাণে
কে দিল এ অমৃত ছানিয়া ?
বিধবার মরুময় বুকে
কে দিল এ নিঝর আনিয়া ?
কবিতার পূত মন্দাকিনী
বহিতেছে শত স্রোত ধারে,
শীতলিয়া তাপিত অন্তর
মিশিতে অমৃত পারাবারে !
এ'ত নহে নগ্ন প্রেমগীতি
এ'ত নহে বীণার ঝঙ্কার,
হিমগিরি (পাষাণ) ভেদিয়া
এ যে গো ! ছুটেছে হাহাকার !
নাহি তা'তে কামনার লেশ,
নাহি তাতে নিরাশার কণা,
প্রতি ছত্রে উঠিছে ফুটিয়া
সুপবিত্র নিষ্কাম সাধনা।
ধরণীর মঙ্গলের তরে
সঁপিয়া দিয়াছে প্রাণ মন ;
বিধবার কেহ নহে পর
বিধবার সবাই আপন !
বিধবার করুণ নয়নে
বরিষে অনন্ত শান্তিজল ;
কোটি প্রাণে প্রদানে সান্ত্বনা
বিধবার কর সুকোমল !
দূরে—দূরে অমর নগরে—
স্বামী তার নন্দন বাগানে ;

* কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কনকাঞ্জলির কবি।

মরতের ক্ষীণ হাহাকার
পশে কিনা পশে তার কাণে।
বালিকা তনয়া "প্রিয়বালা"
দেবতার স্নেহ নিদর্শন ;
চাহিয়া তাহারি মুখপানে
রাখিয়াছে যেন গো ! জীবন।
সবি গেছে চিরবিসর্জ্জনে
আছে শুধু স্মৃতি আর জ্বালা ;
বিধবার বিরামের স্থান
কেবল বালিকা প্রিয়বালা !

একাদশী।

বঙ্গের ভীষণ ব্রত
আহত পরাণে হত
বিষম কঠিনা ওগো একাদশী তিথি !
তোমার নৃশংস নামে প্রাণে লাগে ভীতি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল
ঘোষে তব অমঙ্গল,
গালি মনে লয় গণি সধবা রমণী,
স্মরে না তোমার ছায়া অলক্ষণ জানি।
গঠিত তোমার হিয়া
কি জানি কি বিষ দিয়া
নাহিক হৃদয়ে তব মমতার লেশ,
দলিতে কোমল প্রাণ নাহি ভাব ক্লেশ !
ভাঙ্গে যবে হৃদি প্রাণ
বিশ্ব হয় খান্ খান্
সদত ব্যাকুল মন করে হাহাকার,
আচ্ছন্ন নয়নতল ঘোর অন্ধকার,
তীব্র শিখা শত শত
বক্ষমাঝে ছুটে কত
নৈরাশ্য ঝটিকা যবে বহে ঘোরতর,
বহে কপোতাক্ষি ধীরে ধীরে
গাহিয়া করুণ খেদগান ;
জাগাইয়া আকুল অন্তরে—
কত স্মৃতি অনল সমান।
হে বিধবে, দেবতার কাছে
এই ভিক্ষা যাচি কায়মনে ;
অন্তিমে সে মিলনের দেশে
চিরতরে মিলিও দুজনে।
শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

তরিখানি ডোবো ডোবো নাহি পারাপার।
সেইরে ভীষণকালে
করালের কাল কোলে
জীবনের চিরসঙ্গী অঘোরে ঘুমায়,
সহস্র করুণ ভাষে ফিরে নাহি চায়।
তুমি সেই দিন হতে
অভাগীর শিয়রেতে
সদত নিবাস কর হইয়া প্রহরী,
শোণিত শুষিয়া পান কর ধীরি ধীরি।
কৃষ্ণ শুক্ল দুই পক্ষে
অনল জ্বালাও বক্ষে
কণামাত্র বারিদানে হইয়া কাতর—
রাখহ আপন ধর্ম্ম বঙ্গের ভিতর।
ফুটন্ত কলিকাগুলি
রুদ্রতেজে পড়ে ঢলি
মুদিত কোরক আর ফুটিতে না পায়,
হসিত কুসুমদল মুসড়িয়া যায়।
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা

একই শৃঙ্খলে বদ্ধা
লঘু গুরু নাহি জান সকলি সমান,
বড়ই উদার প্রাণ নাহি ভেদ জ্ঞান!
এই তব ধর্ম্মরক্ষা
বিধবারে দিতে শিক্ষা
করিয়াছ মহাঘোর ক্রূর অনুষ্ঠান,
ছিল না বিধিতে বুঝি কোন তপ দান?
পিপাসায় দাহ করে
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধরে
পালিতে বৈধব্য ব্রত করেছ নিয়ম,
ভয়ানক রীতি নীতি কঠোর সংযম।
এ ধরায় মূর্ত্তিমতী
আছে পবিত্রতা সতী
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া নারী রজঃপূতবালা
সমাহিতে সহে তারা বৈধব্যের জ্বালা।
সারাটি জীবন ধরি
পতিপদ হৃদে স্মরি
বিশ্বহিতে প্রাণ মন করে সমর্পণ,
জীবনের সুখ সাধ করিয়ে বর্জ্জন।
ধ্যেয়ায় পরমানন্দে
সদা সেই চিদানন্দে
যাঁহার সৃজিত এই বিশ্ব ভূমণ্ডল
যাঁর কৃপাবলে হর্ষ প্রেম অশ্রুজল।
সহিতে পারে না তারা
তোমার নৃশংস ধারা—
জীবন্ত শরীরখানি করিয়া দাহন
এমন কঠোর নীতি করে না পালন।
নিদাঘের খর তাপে
শুষ্ক কণ্ঠনালি কাঁপে,
নিদারুণ পিপাসায় প্রাণ আন্‌ চান্‌,
ভাবিলে গো সে যাতনা শিহরে পরাণ।
আত্মত্যাগে অভিলাষ
করে ব্রত উপবাস
স্বামীর গৌরব বাড়াইতে চিরদিন,
পালিয়া তোমার আজ্ঞা অতীব কঠিন।
মাসে দুইবার করি
অন্ন পান পরিহরি
মৃত পতি তরে শুধু আত্মবলিদান,
যোগিনী কে আছে বঙ্গ বিধবা সমান?
বঙ্গবালা তুমি ধন্য
একাদশী করে মান্য
বাড়ালে পতির প্রেম জগতভিতর,
তোমার সতীত্ব ধর্ম্ম খ্যাত চরাচর।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

"শৈলবালা।" *

মরি কি বালিকা ছবি সরলতাময়ী,
সৌন্দর্য্যের ভরে আছ আপনি মগন;
"দিলীপ দিলীপ" তরে চঞ্চল উন্মুখ,
ভাঙ্গিল অচিরে সেই সুখের স্বপন।
হারায়ে পিতায় পেলে স্নেহময়ী সখী,
বাসন্তী-প্রসূন ধীরে উঠিল ফুটিয়ে,
বীরবালা বীরবেশ ধরিয়া আমরি
বাঁধিলে হৃদয়-রাজে হৃদয়ে হৃদয়ে!

* মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী-প্রণীত গ্রন্থের নায়িকা দৃষ্টে লিখিত।

"কনক।"

বালিকা তবুও নহে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিষাদের গুরু ভারে রয়েছ মগন,
কি অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ মধুরতাময়!
অদৃষ্ট তবুও তব নহেত তেমন।
ভ্রাতার সুখের তরে আপনার সুখ—
বিসর্জ্জিলে আজন্মের প্রাণের কামনা,
তবুও হইল সে ত তোমারে বিমুখ,
"হিরণের" কোলে আহা বিগতজীবনা!
কনককুসুম কলি না ফুটিতে হায়
নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতে ওই ঝরে যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

বাসি ফুল।

১

বাসি ফুল বলে এরে দলিবে কি পায়?
অধরের চারু হাসি
সরল লাবণ্যরাশি
গিয়াছে তপনতাপে শুকাইয়া হায়;
প্রাণের সুরভি বাস
হায়রে হয়েছে নাশ,
রক্তিম কপোল এবে ঢাকা কালিমায়!
তা'বলে এখন কিরে
দলিবে চরণে তারে
মাটিতে রাখিবে ফেলে ঘৃণা অবজ্ঞায়?
তা'হলে নিষ্ঠুর! কেন
কোমল কুসুম হেন
তুলেছিলে বোঁটা ছিঁড়ে যৌবন উষায়?
থাকিত সে নিজ মনে
ফুটিয়া বিজন বনে,
হাসিত পাতার তলে বন-লতিকায়।
একাকী প্রফুল্লমুখে
প্রীতমনে নিজ সুখে
করিত জীবন ভোর নিজ তপস্যায়।
কেনরে নিষ্ঠুর! তুলে আনিলে তাহায়?

২

বাসি ফুল বলে তারে দলিবে কি পায়?
এমনি কি স্বার্থপর
ঘোর অকৃতজ্ঞ নর
হইয়াছ ভুলে এবে মায়া মমতায়?
যৌবন সুষমা দিয়া
যে তোষিল তব হিয়া,
হৃদি-পরিমল ঢেলে' যে দিল তোমায়;
প্রতিদান বুঝি হায়!
আজিকে দিতেছ তায়
অবহেলে' ভূমিতলে দলি' অবজ্ঞায়!
যখন আছিল তার
পরাণে সুরভিভার,
ঢল ঢল ছিল তনু লাবণ্য জ্যোৎস্নায়;
তখন সোহাগভরে
হৃদয়ে লইয়া তারে
চুম্বিয়াছ কত বার মনে নাহি হায়!
বাসি ফুল বলে আজ দলিছ দু পায়!!

শ্রী বিদ্যুল্লতা রায়।

বাতায়নে।

শুক্লা দশমীর চাঁদ গগনে উদয়,
হেরিয়া জোছনা আলো জগত মাতয়।
ফুটিয়াছে বেলি যূঁই ফুটিয়াছে সুধাময়ী
গোলাপ কামিনী ফুল সেফালি টগর,
চাহি চন্দ্র মুখপানে আনন্দে বিভোর।
বসি আমি বাতায়নে চাহিয়া চন্দ্রমাপানে
ভাবিতেছি জীবনের গত অভিনয়।
ভাবিলাম মনে মনে শৈশবেতে এইখানে
হেরিয়া চাঁদেরে ছিনু উন্মত্ত-হৃদয়।
ভীষণ নিরাশামাতে, ছিন্ন করি আশালতা
ফেলিয়া দিয়াছে তারে মূলসহ উপাড়িয়া।
এবে আমি আশাহীন, সকলি হয়েছে লীন,
যাইব নিরাশাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া।
দেখি ওই চন্দ্রমুখ, কি জানি কি হয় সুখ!
কেন যে দেখিলে হই এমন পাগলপারা?
হৃদয় স্বপনভরা স্বপনে আবৃত ধরা
সে স্মৃতি স্বপন মাঝে পরাণ আপন হারা।
অজানা কিসের তরে পরাণ কেমন করে
আকুল হৃদয় মোর অতীতে পাইতে চায়।
চাহিয়া আকাশ পানে, সদাই আকাঙ্ক্ষাপ্রাণে
কবে যে মিশিব গিয়ে অনন্ত ও নীলিমায়।

শ্রীমতী আমোদিনী সেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সাবেক।

ত্রিগুণাপ্রসন্ন বসু	রঘুনাথপুর	৫৲
শ্রীমতী মগ্নময়ী গুপ্ত	ভবানীপুর	১৲
অন্নদা প্রসাদ বসু	„	২৲
রাণী ভবানী	গৌরীপুর	২৷৷৵০
গোপালচন্দ্র সেন	হাজারিবাগ	৭৲
কুমুদিনী কুমার বন্দ্যো	রাজসাহী	৪৲
ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৷৷৵০
বিপিনবিহারী গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
দয়াল চন্দ্র বসু	„	১৷৵০
কৈলাস চন্দ্র সেন	„	৷৷৵০
শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	২৲
যোগীন্দ্র নাথ ঘোষ	বাঁকিপুর	৭৷৶০
চতুর্ভুজ পট্টনায়ক	কটক	২৷৷৵০
বেণীমাধব বরাট	গোপালগঞ্জ	১৲
মন্মথ নাথ ঘোষ	মৌলবী বাজার	১৷৵০
প্রিয়নাথ দত্ত	কলিকাতা	১৲
আশুতোষ ঘোষ	ভবানীপুর	১৲
শ্রীমতী বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরাণী	মুক্তাগাছা	২৷৷৵০
অক্ষয়কুমার দাস	কলিকাতা	১৷৷১০
ননীগোপাল পাল	হাওড়া	১৲
প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	আজমির	৷৷৶১০
মিসেস আর শীল	কলিকাতা	৷৷০
শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দাসী	মজিলপুর	২৲
দামোদর দাস বর্ম্মণ	কলিকাতা	৸৵০
হরনাথ ভট্টাচার্য্য	„	১৷১০
বিপিনবিহারী সেন	„	১৷৷১০
শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী দেবী	যাদবপুর	৷৷০
„ প্রভাবতী চক্রবর্ত্তী	নারায়ণ গাঁ, পুনা	২৷৷৶১০
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
তারিণীচরণ দত্ত	„	১৲
সতীশচন্দ্র বন্দ্যো	এলাহাবাদ	২৷৷৵০

ডাঃ হরিমোহন সেন	ভবানীপুর	২৲
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	সাঁতরাগাছি	২৲
রামলাল সেট	কলিকাতা	১৷৷১০
কুমার পি, সি, বড়ুয়া	গৌরীপুর	১৷৷৵০
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী	ভবানীপুর	১৲
অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার	গিরিডি	৫৷৷৵০
শ্রীমতী শতদলবাসিনী বসু	সরিষা	২৸০
রাধানাথ দেব	কলিকাতা	১৲
বিজয় চন্দ্র মজুমদার	জুড়াপাড়া, ঢাকা	৩৵০
শ্রীশচন্দ্র নাগ	যশোহর	১৷৵০
মহেন্দ্র নাথ বসু	দুমকা	২৲
কালীপ্রসন্ন মজুমদার	শিবপুর	১৷৵০
ডাঃ হরনাথ বসু	কলিকাতা	১৲
		৷৷১০

মহারাণীর সগোষ্ঠী ছা

		২৷৷৵০
নৃত্যকৃষ্ণ বসু	„	১৷৵০
অম্বিকা চরণ বসু	„	১৷৵০
শ্রীমতী বিধুমুখী রায়	ভবানীপুর	২৷৷৵০
সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	বালিগঞ্জ	২৷৷৵০
লালা বিধুভূষণ	সুলতান গঞ্জ	১৷৵০
শশিভূষণ বসু	ভবানীপুর	১৲
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	„	১৷০
শ্যামাচরণ ঘোষ	কলিকাতা	১৲
সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	„	৷৷৵০
কেদার নাথ রায়	„	৵০
শ্যামাচরণ মিত্র	„	১৲
শ্রীমতী নিধুরাণী দেবী	বেনারস	২৷৵০
ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	৫৵০
অবিনাশচন্দ্র মুখো	বাগেরহাট	৫৷০
যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ	বরিশাল	২৷৷৵০
চন্দ্রকুমার দত্ত	দক্ষিণ সাজাদপুর	৬৲
অন্নদা প্রসাদ বসু	ভবানীপুর	১৸০
দ্বারিকানাথ মিত্র	ফরিদপুর	২৲
প্রকাশ চন্দ্র রায়	বর্দ্ধমান	৫৲
সেক্রেটারি, ভ্রাতৃ সমিতি	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	১৲
ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার	কলিকাতা	১৷৷১০
দেবেন্দ্র নাথ বসু	„	৷৷০
শ্রীমতী হেমলতা সরকার	ভবানীপুর	১৷৷৵০
মহেন্দ্রনাথ বসু	„	৪৷৵০
শ্রীমতী মগ্নময়ী সেন গুপ্ত	„	১৲
কৈলাস চন্দ্র সেন	কলিকাতা	১৲
দীননাথ বসু	„	৸৵০
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী	গোরখপুর	৭৸৵০
প্রসন্নকুমার গুপ্ত	পটুয়াখালি	৫৲
		(ক্রমশঃ)

অগ্রিম।

শিবনাথ দত্ত	শিলং	২৷৷৵০
ডাঃ কেদার নাথ বন্দ্যো	আলিগড়	১৲
মহেন্দ্র নাথ মিত্র	ভবানীপুর	২৷৷৵০
রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর	কলিকাতা	২৷৷৵০
বারাশত বালিকা বিদ্যালয়	বারাশত	৷৵০
হরিদাস মল্লিক	জামালপুর	১৷৵০
মিসেস ডি এফ, স্মিথ	বালেশ্বর	২৷৷০
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ভাগলপুর	২৷৷৵০
হরকুমার সরকার	রাজসাহি	২৷৷৵০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	খিদিরপুর	২৷৷৵০
মুকুন্দ নাথ রায়	কলিকাতা	২৷৷৵০
নকুলাল সরকার	হাওড়া	১৷৷৵০
কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বাঁকুড়া	২৷৷৶০
ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী	গৌরিপুর	২৷৷৵০
মন্মথ নাথ ঘোষ	মৌলবী বাজার	২৷৷৵০
শ্রীমতী বর্ণবন্দিনী দেবী	কালীঘাট	২৷৷৵০
চারুচন্দ্র বসু, খাবুটক্যান,	বর্ম্মা	২৷৷৵০
কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২৷৷৵০
সেক্রেটারী ডায়মণ্ড জুবিলী রিডিং রুম এবং রাজার বাগান লাইব্রেরী		১৷৵০
শ্রীমতী কুমুদবাসিনী দেবী,	গোলাঘাট	২৷৷৵০
সেক্রেটারি উত্তরপাড়া পবলিক লাইব্রেরী		২৷৷৵০
প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	আজমির	২৷৷৶১০

শ্রীনাথ বন্দ্যো	মঙ্গলদহ আসাম	২৷৷৵০
ব্রজগোপাল মতিলাল	কলিকাতা	২৷৷৵০
হরিজাহ্নবী হালদার	শিবপুর	১৷/০
বঙ্কুবিহারী দে	কলিকাতা	১৲
শীতলচন্দ্র মুখো	মথুরা	২৷৷৵০
শ্রীমতী প্রভাবতী চক্রবর্ত্তী	নারায়ণ গাঁ পুনা	৫৷১০
ডাঃ লালবিহারী মিত্র	কলিকাতা	১৲
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	২৷৷৵০
কুঞ্জবিহারী চৌধুরী	ভবানীপুর	২৷৷৵০
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ	শালিখা	২৷৷৵০
প্রিয়নাথ গুপ্ত	যোধপুর	২৷৷৵০
গণেশচন্দ্র ঘোষ	হাওড়া	২৷৷৵০
নরেন্দ্র নাথ সেন	কলিকাতা	৷৵০
দাশরথি সান্যাল	ভবানীপুর	২৷৷৵০
হেমমোহন রায়	”	১৲
ডাঃ অন্নদা প্রসাদ মজুমদার	গিরিডি	২৷৵০
অক্ষয়কুমার বর্ম্মণ রায়	বিদ্যাকুট	১৷/০
মহেন্দ্র নাথ মল্লিক	খিদিরপুর	২৷৷৵০
ডাঃ বিহারিলাল বসু	ভবানীপুর	২৷৷৵০
কেশব চন্দ্র দাস	”	১৷/০
সেক্রেটারি কটেজ লাইব্রেরী	ভবানীপুর	২৷৷৵০
রহিম বক্স	জলপাইগুড়ি	২৷৷৵০
গিরীন্দ্র নাথ সরকার	রেঙ্গুণ	২৷৷৵০
ডাঃ জগবন্ধু দত্ত	কলিকাতা	২৷৷/১০
শ্রীমতী নিস্তারিণী দাস	বসন্তিয়া	২৷৷৵০
শ্রীশচন্দ্র নাগ	যশোহর	২৷৷৵০
বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	৷৷৵০
ক্ষেত্রমোহন দে	কলিকাতা	২৷৷৵০
গৌরদাস বসাক	”	১৲
নলিনবিহারী সরকার	”	২৷৷৵০
গোপাল চন্দ্র দত্ত	শিবপুর	২৷৷৵০
বিজয় লাল দত্ত	ভবানীপুর	২৷৷৵০
শ্রীমতী ইন্দুবালা গুপ্ত	বরিশাল	২৷৷৵০
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	ভবানীপুর	৷৷৵১০
কুমারী সরলতা বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৷৷৵০
শ্রীমতী সুশীলা বসু	সরিশা	১৷/০
দেবেন্দ্রকুমার মিত্র	মুঙ্গের	২৷৷৵০
দ্বারিকানাথ ভট্টাচার্য্য	ময়মনসিং	২৷৷৵০
প্রমদানাথ মুখো	খুলনা	২৷৷৵০
ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী	কিশোরগঞ্জ	২৷৷৵০
শ্রীমতী সত্যবতী দেবী	রাঁচি	২৷৷৵০
শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	কলিকাতা	১৷৷৵০
গোষ্ঠবিহারী দত্ত	”	২৷৷৵০
অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস	ছাপ্রা	২৷৷৵০
রাধিকানাথ মুখো	বেনারস	২৷৷৵০
রায় বেণীমাধব বন্দ্যো বাহাদুর	কলিকাতা	২৲
আদ্যনাথ বসু	ভবানীপুর	২৷৷৵০
মনোহর মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া	২৷৷৵০
যোগেন্দ্র বৈকুণ্ঠ	শ্রীমতী আমোদিনী সেন।	
বামাচরণ ঘোষ	কলিকাতা	১৲
রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বারাশত	২৲
প্রসন্নকুমার সেন	কিশোরগঞ্জ	২৷৷৵০
প্রিয়নাথ মল্লিক	ভবানীপুর	২৷৷৵০
মহেন্দ্র নাথ রায়	হাওড়া	২৷৷৵০
মতিলাল চট্টো	”	২৷৷৵০
শ্রীমতী কিরণশশী দেবী	কলিকাতা	২৷৷৵০
শিবপ্রসন্ন সেন	হুগলি	২৷৷৵০
রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	কলিকাতা	২৷৷৵০
উমাকালী মুখো	খিদিরপুর	২৷৷৵০
গিরীন্দ্র চন্দ্র মুখো	ভবানীপুর	২৷৷৵০
যোগেন্দ্র নাথ সেন	কলিকাতা	১৲
আশুতোষ বিশ্বাস	ভবানীপুর	২৷৷৵০
উপেন্দ্র নাথ ঘোষ	”	২৷৷৵০
সুরেন্দ্রনাথ সরকার	কলিকাতা	২৷৷৵০
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী	গোরখপুর	২৷৵০
ক্ষুদীরাম বসু	কলিকাতা	১৲
প্রকাশচন্দ্র রায়	বর্দ্ধমান	৷৵০
শশিভূষণ সুর	কলিকাতা	২৷৷৵০

No. 391. August, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৯১ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩০৪—আগষ্ট, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর সগোষ্ঠী ছবি — মহারাণী অনুমতি করিয়াছেন, তাঁহার, [illegible] রাজের, তৎপুত্র ও পৌত্রের, এই চারি পুরুষের ছবি হীরক জুবিলীর চিহ্নস্বরূপ একত্র অঙ্কিত হয়। অনেক ব্যয়ে ইহা চিত্রিত হইতেছে।

যোগ্যা রাজবধূ—হীরক জুবিলী উপলক্ষে যুবরাজ-পত্নী লণ্ডনের দরিদ্রদিগের ভোজের যে আয়োজন করেন, তাহাতে ৫৬টী ভিন্ন ভিন্ন ছত্রে ৩ লক্ষ ১০ হাজার লোক তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছে।

মহারাণীর প্রিয় গ্রন্থকার—কবিদিগের মধ্যে সেক্ষপীর, স্কট ও টেনিসন; নবন্যাসকারদিগের মধ্যে অষ্টেন, সার্লট ব্রণ্টি, জর্জ ইলিয়ট, বিবী ক্রেক, বিবী আলিফাণ্ট, এডনা লায়াল; জর্ম্মণ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে গোয়েথ, হীন ও সিলার এবং ফরাসী গ্রন্থকারদিগের মধ্যে লামার্টিন ও মেসিন।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশু — দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মধ্য ভারতবর্ষে অন্যূন ৫০০০ হিন্দু বালক বালিকা নিরাশ্রয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পঞ্জাবের হিন্দুগণ ১০০ শিশুর ভার লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দিল্লীর এক ধনী বণিক্ ৫০টী, এবং বাবা নানকের বংশধর বাবা ক্ষেমসিং ৫০টী চাহিয়াছেন। ইতিমধ্যে অনেক বালক বালিকা দয়াশীল খৃষ্টীয়দিগের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা অনাথাশ্রমের তত্ত্বাবধানে ৫৩টী অনাথ আছে, আশ্রমের অধ্যক্ষ আরও লইতে প্রস্তুত; তবে ফণ্ড বৃদ্ধি আবশ্যক। নিঃসন্তান বা সসন্তান ধনবান্ ও ধনবতীদিগের সদ্ব্যয়ের এই এক উৎকৃষ্ট অবসর।

ইহুদী ধর্ম্ম-যাজিকা—বিবী হানা [illegible] সলোমন সর্ব্ব প্রথম ইহুদী ধর্ম্ম-যাজিকা। ইনি সিকাগোর এক ধর্ম্মমন্দিরে যাজকতা করিতেছেন।

কলেজ আসোসিয়েসন গৃহ—লেডি ডফরিণের কলিকাতার নূতন হাঁসপাতাল-বাটী খৃষ্টানগণ ক্রয় করিয়া ছাত্রদিগের জন্য পাঠালয় ও বক্তৃতাগৃহ করিয়াছেন। ইহার এক বৃহৎ হলে সহস্র দর্শকের আসন সুসজ্জিত রহিয়াছে। গত ১৬ই জুলাই সমারোহে ইহা খোলা হইয়াছে।

কয়েদী খালাস—হীরক জুবিলী উপলক্ষে ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ২০,০৭৪ জন কয়েদী মুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোক ১৮,২৬২ জন।

ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—এ পর্য্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। ভারত দুর্ভিক্ষে মরিসস্-বাসিগণ ১৩০০০ টাকা দান করিয়াছে।

রচনা-পারিতোষিক—আর্য্য হিন্দু-জাতির সমাজবন্ধন বিষয়ে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিবেন, সাহিত্য-পরিষদ তাঁহাকে ৫০০ টাকা পারিতোষিক দিবেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অন্যূন ২০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। রচনা ১৩০৪ সালের মাঘের মধ্যে সম্পাদক বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

ভিক্টোরিয়ার সম সাময়িক রাজা—অষ্ট্রিয়ার ২টী সম্রাট্, বেল্‌জিয়মের ২টী রাজা, হণ্ডুরাসের ২ রাজা ও ১ রাজ্ঞী, সুইডেন নরওয়ের ৩টী রাজা, রোমের ৩ জন পোপ, ডেনমার্কের ৪টী ভূপতি, পোর্টুগালের ৩টী রাজা ও ১টী রাজ্ঞী, রুসিয়ার ৪ জন সম্রাট, প্রুসিয়ার ৫টী নৃপতি, স্পেনের ৩টী রাজা, ১টী রাজ্ঞী ও ২ জন প্রেসিডেণ্ট, ফ্রান্সের ১ রাজা, ১ সম্রাট, ২ কমিটি এবং ৭ জন প্রেসিডেণ্ট, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের ১৭ জন প্রেসিডেণ্ট।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ২১শে জানুয়ারী যে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, তাহা বোম্বাই ও ত্রিহুত হইতে সুন্দররূপে দেখা যাইবে।

কুৎসিত চিত্র দমন—ফরাসী সেনেট কুৎসিত চিত্র বিক্রয়ের প্রতিবিধানার্থ এক কঠিন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্মৃতিচিহ্ন—গত জুবিলী দিবসে [illegible] রোজপুর আর্য্য-সমাজ [illegible] পণ্ডিত লেখরামের নামে একটী উচ্চ [illegible] শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

সহমরণ—দিল্লীর এক ব্রাহ্মণ চাপরাসী বিষপানে প্রাণত্যাগ করে। তাহার সৎকারের সময় তাহার যুবতী স্ত্রী প্রজ্বলিত চিতায় ঝম্প প্রদান করে। কিন্তু বলপূর্ব্বক নিবারিত হওয়াতে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া একটী কূপে ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছে।

নব অনাথাশ্রম—গত ১৪ই জুলাই পঞ্জাবে একটী হিন্দু অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে আর্য্য, ব্রাহ্ম, জৈন, শিখ, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দু-সন্তান গৃহীত হইয়া শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে।

যুক্ত রাজ্যের বলবৃদ্ধি—সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের হাউই দ্বীপ এই রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

বিজয়নগরের ব্যবস্থা—পরলোকগত মহারাজার জননী ৩৬ লক্ষ টাকার

দাবী পরিত্যাগ করাতে রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভূমিকম্পে বড়লোকের মৃত্যু—রঙ্গপুরের মহারাজা গোবিন্দলাল ও সুসঙ্গের রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ ভূমিকম্পে প্রাণ হারাইয়াছেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের আরও অনেক ধনেশ্বর মারা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

লালাবাবুর দীক্ষা।

ধর্ম্মজীবনে শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা এই দুইটী বড়ই উপাদেয় সামগ্রী। যাহা অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, তাহার নাম শাস্ত্র। এই শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা থাকিলে চিন্তাশীল মনুষ্য-জীবন বহুতর দুঃখ ও দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পায়; সুতরাং সহজেই সুখ ও সন্তোষের উদয় হইয়া জীবনকে সরস করে। শ্রদ্ধার ন্যায় জীবনকে সরস করিবার আরও একটী হেতু আছে। তাহার নাম দৈন্য, বা নীচতা। এ নীচতা ভক্তি-ভূমি, জীবনের নীচত্ব বা অধমত্ব সূচক নহে। এই দৈন্যের সহিত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের সম্বন্ধ আছে; এই জন্যই এ স্থলে উহার উল্লেখ করিতেছি। মৃন্ময় ভূমির সহিত চিন্ময় জীবনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমির উপর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি-বারি উচ্চ স্থান ত্যাগ করিয়া নিম্ন স্থানে সঞ্চিত হয়। সেইরূপ যিনি অহঙ্কারের উচ্চ ভাব ত্যাগ করিয়া নীচ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যে কোন অপ্রাকৃত রস সেই জীবনেই সঞ্চিত হয়। অহঙ্কারীর জীবন শুষ্ক। দীক্ষা বা গুরুকরণ হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্গত একটী গুরুতর প্রকরণ হইলেও যতদিন জীবনে দৈন্যভাব না আইসে, ততদিন তাহাতে আন্তরিক রুচি হয় না। অধুনাতন শিক্ষিতবর্গ এই প্রথার বিপক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন করুন, প্রকৃত দৈন্যের অভাবই সে ভাবের উত্তেজক।

অধুনাতন শিক্ষিতগণের অনেকেই গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে আপনার উপযুক্ত গুরু খুঁজিয়া পান না। আপনি শিষ্যের উপযুক্ত ব্যক্তি কিনা, এ চিন্তা একবারও মনে উদিত হয় না। আমাদের বিশ্বাস, যাঁহার যেরূপ অধিকার, তাঁহার উপযুক্ত গুরু এ পৃথিবীতে আছেন। উৎকৃষ্ট গুরুলাভের জন্য যদি কাহারও ঐকান্তিক বাসনা হয়, তিনি অবশ্যই উৎকৃষ্ট গুরু লাভ করিবেন, এবং সেই ঐকান্তিক বাসনাবশে আপনিও উৎকৃষ্ট গুরুর শিষ্যযোগ্য হইবেন! একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা আমরা ঐ কথার সমর্থন করিব।

পাইকপাড়া রাজবংশের অন্যতম আদি পুরুষ সুবিখ্যাত বৈরাগী শ্রীল লালাবাবুর নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। বৃন্দাবন-যাত্রিগণ, পুলিন বা রাসস্থলী নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে যে অপূর্ব্ব দেবালয় ও কৃষ্ণরায়-জীর সেবা দেখিতে পান, তাহা ঐ লালা-বাবুর কীর্ত্তি। তিনি কোন রজকের সন্ধ্যা-কালীন একটীমাত্র বাক্য শ্রবণে যেরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যময় সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, সে ঘটনাও সর্ব্বজনবিদিত। আমরা শুনিতে পাই, লালাবাবুর এই উৎকট বৈরাগ্যের বীজ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। আমাদের ঠিক্ স্মরণ হইতেছে না, বোধ হয়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ লালাবাবুর পিতা। এই প্রাণকৃষ্ণ অতি শিশুকালে একটী পড়া শুক পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে কহেন,—"ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় ঐ পাখীটীও তাহা শুনিত। ভাগবত শুনিলে, যখন মানুষের সংসারবন্ধন মোচন হয়, তখন ঐ পাখীটীই বা পিঞ্জরাবদ্ধ রহিবে কেন? এই জন্য উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" এই মহাপুরুষই লালাবাবুর পিতা। যাহা হউক, লালাবাবু যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনে বাস করেন, তখনও তাঁহার দীক্ষা হয় নাই।

যখন লালাবাবু শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীহরিনাম সাধনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থ হিন্দী "ভক্তমালের" বঙ্গানুবাদক শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীও বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি কিরূপ সাধু ও ভক্তিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, ঐ বাঙ্গলা ভক্তমাল গ্রন্থ পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিতান্ত নিঃস্পৃহতা, ঐকান্তিক শরণাপত্তি, অপরিসীম দয়া, উৎকট বৈরাগ্য, অসামান্য দীনতা প্রভৃতি বৈষ্ণব গুণগ্রাম ক্রমশঃ লালাবাবুর শ্রুতিগোচর হইল। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একদা বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস বাবাজী ইতিপূর্ব্বেই লালাবাবুর পূর্ব্বাবস্থা, উৎকট বৈরাগ্য, শ্রীবৃন্দাবনের কীর্ত্তিকলাপাদি সকলই অবগত হইয়াছিলেন। লালাবাবুর সদৃশ একটী শিষ্য লাভ করিবার জন্য অধুনাতন অনেক আচার্য্যেরই কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজি লালাবাবুর যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসাবাদ করিয়া সাতিশয় দীন ও করুণবচনে কহিলেন,—"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর।"

লালাবাবু, বাবাজীর এই উক্তি শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছি, এবং নিজের ঠাকুরবাড়ীতে এক মুষ্টি প্রসাদ

ভোজন করিয়া অষ্ট প্রহর হরিনাম করি। বাবাজী কহিলেন, আমার এখনও দীক্ষার বিলম্ব আছে। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণভাবে গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনার অপরাধ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুই চারি দিবস নিরন্তর স্বীয় চরিত্রানুশীলন করিয়া স্থির করিলেন,—

"আমার এখনও হৃদয়ের প্রধান মালিন্য ও কৃষ্ণভক্তির সবিশেষ প্রতিবন্ধক যে অহঙ্কার তাহা যায় নাই। তাহা আমার হৃদয় যুড়িয়া এখনও বসিয়া আছে। 'আমার' ঠাকুরবাড়ীতে 'আমার' ব্যয়-সম্পন্ন প্রসাদ ভোজন করি, এখনও আমার এই জ্ঞান রহিয়াছে। এই গুণে আমি কিনা কৃষ্ণদাস বাবাজীর কৃপা লাভ করিব? আমাকে ধিক্!"

লালাবাবুর মনে যে দিন এই ভাবের উদয় হয়, সেই দিন হইতেই তিনি মাধুকরী বৃত্তি আশ্রয় করেন। নিজের ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদভোজন এককালে ত্যাগ করেন। পাঁচ শত কুঞ্জ বা ঠাকুরবাড়ী হইতে এক এক টুক্‌রা রুটি ও কিঞ্চিৎ উপকরণ ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ী ও সেবায় যে মমতা সম্বন্ধ ছিল, তাহা এক-কালে বিনষ্ট করিলেন। কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে অন্যান্য উদাসীন সাধু বৈষ্ণবের মাধুকরী ভিক্ষা করিবার যে সম্বন্ধ ছিল, লালাবাবুও কৃষ্ণরায়জীর বাড়ীতে তদতি-রিক্ত আর কোন সম্বন্ধই রাখিলেন না। 'ঐ ঠাকুরবাড়ী আমার নহে,' এ জ্ঞান পরিপক্ক হইতে অবশ্য লালাবাবুরও কিছু সময় লাগিয়াছিল। যখন বুঝিলেন, দুশ্ছেদ্য মমতারজ্জু উত্তমরূপে ছিন্ন হইয়াছে, অমরা অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে, তখন আবার আর এক দিন কৃষ্ণদাস বাবাজীর আশ্রমে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। এবার বাবাজী আমাকে কৃপা করিবেন, এ আশায় আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না। লালাবাবু বাবাজীর চরণযুগলে দীন নয়ন অর্পণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। লালাবাবু স্বীয় প্রার্থনা জানাইবামাত্র বাবাজী পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষাগ্রহণের এখনও একটু বিলম্ব আছে!!" লালাবাবু বজ্রা-হতের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া অকূল পাথার ভাবিতে লাগিলেন। নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ এবং অপরাধীর ন্যায় বাবাজীর কুটীরপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান রহিলেন।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

লোকোত্তরপ্রভাবশালী মহাপুরুষগণের চিত্ত কুলিশ হইতেও কঠোর এবং কুসুম হইতেও কোমল। তাহার যথার্থ স্বরূপ পরিজ্ঞানে কেহই সমর্থ নহেন। বঙ্গের একজন প্রধান সামন্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়া পথের ফকির হইয়াছেন,—মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করিতেছেন, দীক্ষা-মাত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া দীননয়নে অশ্রু

বিসর্জ্জন করিতেছেন, কৃষ্ণদাসবাবাজীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই!! লালাবাবু অনেকক্ষণ এইরূপে রোদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কি দোষে এখনও দীক্ষা পাইতেছেন না, অনেক দিন ভাবিয়াও স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া কৃষ্ণরায়জীর নিকট মনের দুঃখ জানাইলেন। এই ঘটনার দুই এক দিন পরেই তাঁহার মনে হইল,—

"আমি স্ত্রী পুত্র বিষয় ঐশ্বর্য্য সকলই ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের তরুতল আশ্রয় করিয়াছি,—মাধুকরী ব্রতে জীবনধারণ করিয়া অষ্টপ্রহর হরিনাম করিতেছি, সত্য; কিন্তু এখনও ত শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে পারি নাই। তবে আমার মন শুদ্ধ হইয়াছে কই? এখনও শত্রুকে ঘৃণা করিতেছি! শত্রু-বিদ্বেষ এখনও মনকে ছাড়ে নাই! ধন্য বাবা কৃষ্ণদাস! তোমার কৃপার বলিহারি যাই! তোমার মহিমারও অন্ত নাই। তুমিই আমাকে তোমার দাসের যোগ্য করিতেছ।"

এই স্থলে আর একটু ইতিহাস আছে। সে টুকু না জানিলে লালাবাবুর উক্ত ভাব বুঝা যাইবে না। মথুরা জেলার মধ্যেও লালাবাবুর কতক ভূসম্পত্তি আছে। লক্ষাধিক মুদ্রা তাহার বার্ষিক আয় হইয়া থাকে। ঐ আয়ের দ্বারাই কৃষ্ণরায়জীর সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং উহার আদায় উসুলের সদর কাছারি ঐ ঠাকুরবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত। জয়পুরের শেঠ বাবুরাও মহাভক্ত ও মহাধনী। বৃন্দাবনে তাঁহাদিগেরও ঠাকুরবাড়ী ও ঠাকুরসেবা আছে। ঐ সেবার সমৃদ্ধির পরিসীমা নাই, অনেকেই তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও মথুরা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জমীদারী আছে। বোধ হয়, ঐ সকল সূত্রেই বহুপূর্ব্ব হইতে লালাবাবুর সহিত শেঠ বাবুদিগের ভয়ানক শত্রুতা জন্মিয়াছিল। এমন কি, পরস্পরে পরস্পরকে হত্যা করিবারও সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। লালাবাবুর পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থাকালেও দুই এষ্টেটের মধ্যে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল। তজ্জন্যই লালাবাবু বৃন্দাবনে সকল কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন, কেবল শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জে যাইতে পা উঠিত না—শেঠ বাবুদিগের বাড়ী যাইবেন,—এ কথা মনে হইলেও মাথা কাটা যাইত। এখন তাঁহাদিগের বাড়ী ভিক্ষা করিতে হইবে,—কি ভয়ানক কথা!

যে ভক্তকে শ্রীভগবানের কৃপা করিবার ইচ্ছা হয়, গুরুরূপে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে এমনি করিয়া স্বচরণ দানের যোগ্য করিয়া লন। লালাবাবুর মনে যে দিন যে ক্ষণে শেঠ বাবুদিগের কুঞ্জের কথা মনে পড়িল, তাহার পরবর্ত্তী মধ্যাহ্নকালেই শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া অতি দীনবেশে ভিক্ষার্থী হইয়া ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন! ঠাকুরবাড়ীর কর্ম্মচারিগণ কলিকাতার বাঙ্গালী রাজাকে ভিখারী দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু আপন

প্রভুদিগের ভয়ে ফুকারিতে পারে না। চক্ষের জল মুছিয়া অন্তরে গুমরিতে লাগিল। অথচ মাধুকরীও দিতে পারে না,—পাছে লালাবাবুর পরম শত্রু শেঠ বাবুরা রাগ করেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে শেঠ বাবুদিগের কর্ত্তাও ঠাকুরবাটীর গৃহান্তরে উপস্থিত ছিলেন। জনৈক ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে এই অসম্ভব সংবাদ দিল। তিনি ত্বরিতপদে আসিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই লালাবাবু! লালাবাবুর প্রতি যে শত্রুভাব ছিল, লালাবাবুর দীনভাব দর্শনেই তাহা দূরে গেল। লালাবাবুর মুখে মাধুকরী ভিক্ষার কথা শুনিয়াই তাঁহার প্রাণ গলিয়া গেল। সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। লালাবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন, এবং উভয়ে প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। শেঠ বাবু লালাবাবুকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লালাবাবু তাঁহার মাধুকরী ব্রত পণ্ড হইবে বলিয়া স্থূল ভিক্ষা গ্রহণে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেঠ বাবু অগত্যা তাঁহাকে মাধুকরী দিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রস্থান করিলেন। লালাবাবু মাধুকরী গ্রহণ করিয়া যেমন ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে আসিলেন, অমনি দেখিলেন, সম্মুখে কৃষ্ণদাস বাবাজী দণ্ডায়মান। লালাবাবু মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাকে পরম যত্নে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন,—

"বাবা, তোমার দীক্ষার সময় উপস্থিত।"

আমরা এই গুরু শিষ্যের নাম লইবারও যোগ্য নহি। কা, ম, ঘ।

শৈশব-সঙ্গিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস। সকালে বিকালে পৃথিবী হিমে আচ্ছন্ন। ঘাসের উপরে শিশির আবার মুক্তার মত শোভা পাইল; সরোবরে পদ্মিনী আবার শুকাইয়া গেল; চাঁদের আলো আবার অস্পষ্ট হইল। যুবার সর্দ্দি হইল, বুড়ার কাশী বাড়িল, শিশু জ্বরে পড়িল। রাজকর্ম্মচারীদিগের ছুটি ফুরাইল; জমিদারের রাজস্ব আদায়ের চিন্তা বাড়িল; নিত্য নূতন রোগী সমাগমে চিকিৎসকের অবকাশ কমিল। এই রকম আহ্লাদ অনাহ্লাদে হেমন্ত ঋতু বঙ্গদেশে নিজ প্রভাব বিজ্ঞাপিত করিল।

এমনি হেমন্তকালে বঙ্গগৃহে এক দম্পতীর মধ্যে যে কথা চলিতেছিল, তাহা আমরা পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিতেছি। স্ত্রী বলিতেছিলেন "তোমার কাছারি খুলিবে কবে?"

স্বামী। আর এক সপ্তাহ পরে।

স্ত্রী। তবে চল না কেন, এই কয় দিন।

স্বামী। কোথায় যাব ?

স্ত্রী। আমাদের সেখানে ?

স্বামী। তোমাদের কোন্ খানে ?

স্ত্রী। (হাসিয়া) তোমার যত ন্যাকামি ! চল না কেন, মোটে পাঁচ ছয় দিনের জন্য বেড়িয়ে আসি।

স্বামী। যে আজ্ঞে ; তা কোন্ চুলায় যাব তা তো কিছুই বুঝা যাচ্চে না।

স্ত্রী। বালাই, চুলায় যেতে বোল্‌বো কেন, চল না এই ক'দিন বেল গাঁ' থেকে বেড়িয়ে আসি।

প্রফুল্লের কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র হাসিলেন ; বলিলেন "এই তো ক'মাস এসেছ, এরই মধ্যে কেন আবার বেল গাঁয়ে যেতে চাচ্চ ?"

প্রফুল্ল অপ্রতিভ্ হইল। কেন যাইতে চাহিয়াছিল, সে কথার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। স্বামীকে সে এত ভালবাসে, স্বামীর নিকট হইতে সে এত ভালবাসা পায়, তথাপি প্রফুল্লের বালিকা-হৃদয় তাহার মাতা পিতা প্রভৃতি দেখিবার জন্য কেন ব্যস্ত হয়, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না। প্রফুল্ল নীরবে রহিল। সুরেশচন্দ্র বলিলেন "তুমি যদি সেখানে যেতে চাও, তবে না হয় তোমাকে পাঠিয়ে দিই।"

প্রফুল্ল লজ্জিতা হইল। কাতর স্বরে বলিল "না, না, তুমি যদি না যাও, তবে আমি এখন যাব না।" সুরেশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন।

খানিকক্ষণ একথা ওকথার পরে প্রফুল্ল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই ফোঁটা কবে হবে ?"

সু। আর পাঁচ দিন পরে।

"ভাই ফোঁটা" প্রফুল্লের বড়ই আদরের জিনিস। প্রফুল্লের নিজের সহোদর নাই—কিন্তু পবিত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিনে প্রফুল্ল যোগেন্দ্রকে "ভাই ফোঁটা" দিয়া থাকে ; সে দিন দুই ভাই বোনের ভিতরে বড়ই আনন্দোৎসব হইয়া থাকে ; প্রফুল্ল স্বহস্তে কত খাবার প্রস্তুত করিয়া "যোগেন দাদা"কে দিয়া থাকে ; যোগেন্দ্রও ফুলের তোড়া বাঁধিয়া, সুন্দর ছবি আনিয়া প্রফুল্লকে "উপহার" দিয়া থাকেন, সে কথা প্রফুল্লের মনে পড়িল। প্রফুল্ল স্বামীকে বলিল "দেখ, একটা কথা বলিব ?"

সু। বল না কেন ?

প্র। আমি যোগেন দাদাকে ভাই-ফোঁটা দিব, দেখ, তুমি তাঁকে শীঘ্র এখানে আস্‌তে একখানা চিটি লেখ।

পত্নীর অনুনয় শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল ; বলিলেন, "যোগেন্দ্রকে ভাইফোঁটা দিতে এত কি আবশ্যক প্রফুল্ল ?"

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া প্রফুল্লের বুক কাঁপিল, তথাপি সে বলিল "যোগেন্দ্র দাদা আমাকে সহোদরের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, আমি তাঁকে চিরদিনই ভাইফোঁটা দিয়ে থাকি।"

সুরেশ পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন

সন ১২৯৩ সাল

"যোগেন্দ্র তোমার সহোদরও নয়, বিশেষ আত্মীয়ও নয়, তার বিষয়ে যে তুমি বাড়াবাড়ি কর, ও সব আমি ভালবাসি না।"

আকাশে সহসা বজ্রধ্বনি শুনিয়া পথিক যেরূপ চমকিত হয়, সুরেশের কথায় প্রফুল্ল সেইরূপ চমকিত হইল। একটু পরে কতকদূর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল "তুমি তো জান, যোগেন দাদাকে আমি সহোদরের মত মনে করি——"

প্রফুল্লের মুখের কথা মুখে রহিল, সুরেশচন্দ্র আরক্তনয়নে বলিয়া উঠিলেন, "শোন প্রফুল্ল ! ফের্ তুমি যোগেন্দ্রের কথা বলো না। সে যদি তোমার সহোদর হ'ত, তাহ'লে আমি অবশ্য তোমাকে এ কথা বল্‌তেম না। সে হোচ্চে কোথাকার কে, একজন পর, আমি যে তা'কে আমার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর সহিত মিশামিশি কোত্তে দিই—ওসব বিলিতি ধরণ আমি আদৌ ভালবাসি না। যোগেন্দ্রকে তুমি কতখানি ভালবাস, আর যোগেন্দ্র তোমাকে কতখানি ভালবাসে, আমি সে সব হিসাব চাচ্চি না। তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী, আমি যা' বল্‌বো, তুমি তাই কর্‌বে ; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য।"

স্ত্রীকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রদান করিয়া সুরেশচন্দ্র বাহিরে গেলেন। প্রফুল্ল দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রফুল্লের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে "উনি যোগেন দাদাকে মোটেই ভালবাসেন না!" প্রফুল্লের প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে "যোগেন দাদা আসা করিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে ভাইফোঁটা দিব, তিনি হয়তো ভাবিবেন আমি এখন বড়মানুষ হ'য়ে তাঁর স্নেহ ভুলে গিইচি!" প্রফুল্ল যত ভাবে, ততই তার কান্না পায় ! বালিকাকালের কত কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, তাহার যোগেন দাদার কত স্নেহই তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল ; তাহার অশ্রুও কেহ দেখিল না, তাহার হৃদয়ও কেহ বুঝিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ফুলি !"

"মা !"

"তুই শীঘ্র আয় ! শীঘ্র আয় !"

"কেন মা, কি হয়েছে ?" বলিতে বলিতে প্রফুল্লকুমারী মাতার সম্মুখীনা হইল। মাতা বলিলেন "যোগেনের অসুখ নাকি বড় বেড়েছে ; চল তুই, আমরা তা'কে দেখে আসি"।

প্রফুল্ল, বজ্রাহত তরুর মত নিশ্চল হইয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল ; তাহার শরীর যেন নিস্পন্দ, অসাড় !

কেন এমন হইল, তাহা বলিতেছি। প্রফুল্লকে নিজের কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়া সুরেশচন্দ্র তিন বৎসরের মধ্যে আর পিত্রালয়ে পাঠান নাই। প্রফুল্লের মা'র কাঁদা কাটাতে প্রফুল্লের পিতা অনেক বার লোক পাঠাইয়া নিরাশ হইয়াছেন।

যোগেন্দ্র কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছিলেন, প্রফুল্লের মা' তাঁহাকে একবার জামাতা সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অনুরোধ করিতে বলেন। যোগেন্দ্র অনেক দিন প্রফুল্লকে দেখেন নাই, সেই জন্য সুরেশের বাসায় যাইতে একান্ত ব্যগ্র হইলেন। তিনি শীঘ্র প্রফুল্লকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া প্রফুল্লের কাছে এক পত্র লিখিলেন।

প্রফুল্ল পত্রের উত্তর দিল না; সুরেশচন্দ্র ইংরাজীতে এক পোষ্ট কার্ড লিখিলেন; সে পত্র এইরূপ—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমার স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। তিনি ভাল আছেন; আপনি এখন কষ্ট পাইয়া আমাদের এখানে আসিবেন না; যখন আপনার আসা আবশ্যক হয়; তখন আমি আপনাকে সংবাদ দিব। আর আপনি আমার স্ত্রীর নামে পত্র না লিখিয়া আমার নামে লিখিলে অনুগৃহীত হইব।"

পত্র পড়িয়া যোগেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, কিছু রুষ্টও হইলেন। সুরেশকে কিছুই লিখিলেন না; প্রফুল্লের মা'কে লিখিলেন, বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি সুরেশ বাবুর নিকটে যাইতে পারিলেন না। প্রফুল্ল ভাল আছে ইত্যাদি।

যোগেন্দ্রের পত্র পাইয়া প্রফুল্লের মা, কন্যার জন্য আরও অধীরা হইলেন। তাঁহার অধীরতায় উত্তেজিত হইয়া প্রফুল্লের পিতা দীননাথ বাবু স্বয়ং প্রফুল্লকে আনিতে গেলেন। শ্বশুরের "ভক্তিভরে" জামাতার হৃদয় "দ্রব" হইল। তখন "অভয়" পাইয়া "অনুরক্ত শ্বশুর" জামাতাদেবের কাছে "বর" যাচ্ঞা করিলেন—প্রসন্ন হইয়া সুরেশচন্দ্র "তথাস্তু" বলিলেন। প্রফুল্লের পিত্রালয় যাওয়া ঘটিল।

পিত্রালয়ে পাঠাইবার পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে কয়টী শপথ করাইলেন; প্রথম প্রত্যহ একখানি করিয়া পত্র লিখিতে হইবে; দ্বিতীয়, যে দিন সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে আনিতে পাঠাইবেন, সেই দিনই—পিতা মাতা অসম্মত হইলেও, সেই দিনই প্রফুল্লকে চলিয়া আসিতে হইবে; তৃতীয়, যোগেন্দ্রনাথের সহিত প্রফুল্ল বাক্যালাপ করিতে পারিবেন না। প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ, প্রফুল্ল অনায়াসেই করিয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় শপথের কথা শুনিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। স্বামীকে বলিল, "দেখ, তুমি যদি অসুখী হও, তবে আমি যোগেন দাদার সহিত কথা কহিতে চাহি না, কিন্তু লোকে আমাকে কি মনে করিবে? আমার মা, বাপ জিজ্ঞাসা করিলেই বা আমি কি বলিব? তোমার নামে যাহাতে নিন্দা হয়, সে রকম কথা আমি কখনই বলিতে পারিব না।"

তার পর অনেক তর্ক বিতর্কের পরে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লকে শপথ করাইলেন, বিশেষ আবশ্যক না হইলে সে যোগেন্দ্রের সহিত কথা কহিতে পারিবে না; বিশেষ

আবশ্যক হইলেও দুই একটীর অধিক কথা কহিবে না; কোনও মতে তাহার সহিত মিশামিশি করিবে না, ইত্যাদি। অগত্যা প্রফুল্ল সেই শপথ করিল।

প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে আনিয়া মাতার প্রাণ জুড়াইল বটে, কিন্তু তিনি বেশ বুঝিলেন তাঁহার সেই আনন্দময়ী সুখের প্রতিমা ফুলি আর নাই!—এখন সেই হাসিমাখা গোলাপ ফুলটীর পরিবর্ত্তে, বিষাদময়ী, সঙ্কুচিতা, লজ্জাবতী লতাটীকে তিনি কোলে পাইয়াছেন। এ পরিবর্ত্তন মা'র ভাল লাগিল না; কিন্তু তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার প্রফুল্লকে আর ফুলি করিতে পারিলেন না! অতীত আনন্দ আর ফিরিল না!

সুরেশের সেই পোষ্ট কার্ড মনে করিয়া অথচ প্রফুল্লের প্রতি বুক-ভরা স্নেহ মমতা লইয়া, যোগেন্দ্র প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দুজনেই সঙ্কুচিত, বড় বেশী কথা হইল না। তার পর দিন প্রফুল্ল শুনিল যোগেন্দ্রের জ্বর হইয়াছে। প্রফুল্ল যোগেন্দ্রের জন্য—যোগেন্দ্রের আরোগ্যের জন্য, ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু সে যোগেন্দ্রকে দেখিতে গেল না।

এখন মা'র কাছে যোগেন্দ্রের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া স্বামীর সেই রুক্ষভাব—সেই শপথ প্রফুল্লের মনে পড়িল। সেই, সঙ্গে যোগেন্দ্রের আশৈশব হৃদয়পূর্ণ স্নেহ মমতা, তাঁহার উপরে সুরেশের অকারণ অত্যাচার, সে সবও মনে পড়িল। সেই যোগেন্দ্র—সেই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক স্বভাব, সেই স্নেহময় করুণ হৃদয়, সেই প্রফুল্লের সহোদরাধিক বন্ধু, আজি দারুণ পীড়ায় শয্যাগত, প্রফুল্ল ভাবিতেছিল "আমি এখন করি কি? এমন সঙ্কটের অবস্থায় ভগবান্ আমাকে কেন ফেলিলেন?"

কন্যাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মা' আবার বলিলেন "চল্! আমরা যোগেনকে দেখিয়া আসি।"

মা'র ডাক শুনিতে শুনিতে প্রফুল্ল—সেই অকূল সাগরে ভাসমানা প্রফুল্ল যেন কিনারা প্রাপ্ত হইল। সে ভাবিল "আমি যোগেন দাদাকে দেখিতে যাইব, উনি ভুল বুঝিয়াছেন, যদি আমার উপরে রাগ করেন, আমি পায়ে ধরিয়া তাঁহার ভুল ভাঙিব। 'স্বর্গও যদি চ্যুত হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দাও' ইহাই মানুষের প্রতি জগদীশ্বরের আদেশ। আর আমি যদি ভগবানের চক্ষে নিরপরাধা হই, তবে ভগবানই আমাকে রক্ষা করিবেন।" ভগবানের উপরে নির্ভর করিয়া প্রফুল্লের প্রাণে নবীন শক্তি, নবীন সাহস আসিল! বিপদে তাঁহার উপরে নির্ভরের মত আরামজনক আর কি আছে?

প্রফুল্ল যোগেন্দ্রকে দেখিতে গিয়া, অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। যোগেন্দ্রের প্রবল, জ্বর, তাঁহার নিকটে বসিবার, ঔষধ খাওয়াইবার অথবা অন্যরূপ শুশ্রূষা করিবার নিরূপিত লোক কেহই নাই; তবে এক একবার ঝি, চাকর, কেহ

আসিয়া একটী কাজ করিয়া যায়। যোগেন্দ্রের প্রতিবাসী কেহ আসিয়া এক একটু বাচনিক যত্ন করিয়া যায়। আর সমবয়স্ক বন্ধু কেহ আসিয়া একবার ঔষধ পথ্য দিয়া যায়। প্রফুল্ল বড়ই অনুতপ্তা হইল; অনেক দিন আগে এই দিনের কল্পনায় তাহার বুকে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছিল; আর আজি সেই দিন উপস্থিত; সেই যোগেন্দ্র, সেই প্রফুল্ল! প্রফুল্ল মরমে মরিয়া গেল; সূর্য্যের প্রখর কিরণে নবস্ফুট ফুল যেমন শুকাইয়া পড়ে, তাহার সুন্দর মুখখানি তেমনই বিশুষ্ক হইল।

যোগেন্দ্রের বিমাতা স্বতন্ত্র ঘরে সমবয়স্কাদিগের সহিত তাস খেলিতেছিলেন, তিনি প্রফুল্লকুমারীর প্রতি একবার ঈর্ষ্যা-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিতে গেলেন; শেষে প্রফুল্লের মাতার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃষ্টিতে অপ্রতিভ হইয়া চপলার মত গৃহকোণে লুক্কায়িতা হইয়া পড়িলেন।

মায়ের সঙ্গে প্রফুল্ল তাহার যোগেন দাদার বিছানার খুব কাছে বসিল। যোগেন্দ্রের উত্তপ্ত হাতখানি আপন হাতে লইয়া ডাকিল "যোগেন দাদা!"

যোগেন্দ্রের তন্দ্রা দূর হইল। চক্ষু খুলিয়া উত্তর করিলেন, "ফুলি!"

দুই জনের চক্ষু দিয়াই জল পড়িল। সুরেশচন্দ্র তুমি এখানে থাকিলে তোমার চক্ষে কি জল আসিত না? কে বলিবে?

ভূমিকম্প।

(১৩০৪ সালের ৩০এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত)

(১)

একমনে লোক আছে নিজ কাজে—
ঘাটে মাঠে পথে কিংবা গৃহমাঝে,—
কেহ নিদ্রাগত, কেহ বা জাগ্রত,
সমাসীন কেহ, কেহ সচল;
রহস্য কৌতুকে রত কোন জন,
কেহ কার সনে কলহে মগন,
কেহ মহাসুখে কেহ ভাসে দুখে,—
নানাভাবে সবে আছে বিহ্বল;
হেনকালে, একি?— আচম্বিতে দেহ
কাঁপিয়া উঠিল!— স্থির নহে কেহ!
কেন বাড়ী ঘর কাঁপে থর থর?—
খরবেগে বায়ু নাদিত হয়।
ওকি! কেন শুনি ঘন ঘণ্টা রোল,
বহু শঙ্খরব, উচ্চ হরিবোল!
"বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন"—
কেন ডাকে লোক—কিসের ভয়?
"ভূমিকম্প" বলি চৌদিকে চীৎকার
উঠিল অমনি বুঝিনু ব্যাপার!
নিমেষে তখন— সহ পরিজন
নিকটের মাঠে ছুটিয়া যাই!
চারি দিকে দেখি মহা হুলস্থূল,

প্রাণভয়ে লোক সবে সমাকুল,
দিশাহারা প্রায় ইতি উতি ধায়—
পরস্পর করে চাওয়া চাই!
গৃহমাঝে এবে নাহি কোনজন,
রাজপথে মাঠে ল'য়েছে শরণ,
বৃদ্ধ, রোগীজনে আনিছে স্বজনে
ধরাধরি করি প্রাণের দায়!
চির-অন্তঃপুর- বাসিনীনিচয়
পরিহরি লাজ, গুরুজনভয়,
অনাবৃত অক্ষে পুরুষ সমক্ষে
ছুটাছুটি করি বাহিরে ধায়!
বাহিরে আসিয়া স্থির নহে কেহ,
ঘন ভূকম্পনে ঘন কাঁপে দেহ,
ধরণীর পৃষ্ঠে তিলমাত্র তিষ্ঠে—
হেন সাধ্য আর কাহার নাই।
বলিষ্ঠ, দুর্ব্বল, প্রাচীন, নবীন
সমভাবে সবে সামর্থ্য-বিহীন,
হেলিছে, দুলিছে, চলিছে, টলিছে,
বলিছে হুতাশে—"কোথায় যাই!"
"দুর্গতিনাশিনি ওগো জগদম্বে,
"রসাতলে যাই উর অবিলম্বে,
"অকালে প্রলয় এ যে দেখি হয়—
তুমি না রাখিলে কে রাখে আর?
"কুপুত্র হ'য়েছি করমের ফলে,
"কুমাতা তুমি ত নহ, লোকে বলে!
"পরিহরি রোষ, আত্মজের দোষ
ক্ষম ক্ষেমঙ্করী তার এবার"!
তরঙ্গতাড়িত তরণী যেমন—
দুলিতে লাগিল ধরণী তেমন,
উথলি উঠিল সরসী-সলিল—
দেখিতে দেখিতে ভাসিল তীর!

ইষ্টকরচিত অট্টালিকারাজি
দ্বিতল, ত্রিতল— টলমল আজি,
সকলের কায় ফুটি-ফাটা প্রায়,
ভাঙ্গিয়া পড়িছে কাহার শির!
কোন কোন উচ্চ গৃহ সুবিশাল—
আঁধারিয়া দিক্ তুলি ধূলিজাল,
পড়িছে ভূতলে, পড়ি তার তলে
কত নরনারী মরিল, হায়!
চৌদিকে উঠিল হাহাকার রব,
আসিয়া যুটিল প্রতিবেশী সব,
ভাবিয়া অস্থির কেমনে বাহির
করে সে মৃত বা সজীব কায়!

(২)

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা যখন
পেয়েছিনু টের প্রথম কম্পন,
ঘটিকা নির্দ্দেশে বুঝিলাম শেষে
কম্প-স্থিতিকাল বিংশতি পল*।
"কম্প" অবসান হইল এখন,
তথাপি না যায় দেহের দোলন!
ঘন ঘোরে শির, চরণ অস্থির,
নাহি যেন আর শরীরে বল!
মন প্রাণ এবে হ'য়েছে উদাস,
হৃদয়ের মাঝে স্থায়ী ভাব ত্রাস!
ধন পরিজন যা ভাবি আপন
নিশার স্বপন হইল জ্ঞান!!
মুহূর্ত্তে ধরিয়া মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
সংহার-আকারে বিশ্বের ঈশ্বর
দিয়া দরশন করিলা ছেদন
ক্ষণকাল তরে—মায়ার টান।
জননীর কোলে শিশুরা যেমন

* বিংশতি পল—৮ মিনিট।

পূর্ণ পরাধীন, জীবন মরণ
সকলি তাদের র'য়েছে মায়ের
ইচ্ছার উপর করিয়া ভর ;
মানবের দশা এ ভব মাঝার,
ভাবি দেখ, ভাই, কিরূপ প্রকার ?
সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু সন্নিধান
শিশু হ'তে সবে আতুরতর !!
এই ত এখনি তাঁর "ইচ্ছা"বলে
যেতেছিনু যম- সদনে সকলে !
অপর "ইচ্ছায়" তোমায় আমায়
রাখিলেন প্রাণে সে "ইচ্ছাময়" !!
মূর্ত্তিমান্ এই অলোক ব্যাপার
করিয়া স্মরণ ত্যজ অহঙ্কার,
পুত্তলিকাপ্রায় কুহকে নাচায়
আমাদের, "আমি" কেহই নয় !!
হেন মত কত ভাবিতে ভাবিতে
বাসগৃহ মনে পড়ে আচম্বিতে !
উঠিয়া তখন সহিত স্বজন
ধীরে ধীরে ফিরে আইনু ঘরে ;
ক্ষণ পূর্ব্বে গৃহ সুসজ্জিত ছিল,
এবে তার দশা কে হেন করিল ?
কে যেন আসিয়া ভাঙ্গিয়া চূরিয়া
ওলট্ পালট্ গিয়াছে ক'রে।
রাশীকৃত ইট বালির জমাট,
ঠেলিলে না নড়ে দ্বারের কবাট !
দ্রব্য সমুদায় গড়াগড়ি যায়
ভঙ্গুর যে সব—ভাঙ্গিয়া চুর !
ফাটিয়াছে ছাদ প্রাচীর খিলান,
এখনি পড়িবে— হেন হয় জ্ঞান !
কাণ্ড বিলোকিয়া ভয়ে কাঁপে হিয়া,
ভাবিনু পলাই ত্যজিয়া পুর !
ভাবিয়া আকুল— ল'য়ে পরিজন
কোথায় করিব রজনী যাপন,
আছে অগণন কাছে নিকেতন !!
দশা ত সবার সমান, হায় !
আমাদের মত প্রতিবেশিচয়
সমভাবনায় ব্যাকুলহৃদয়,
আরো মনে ভয় পুন যদি হয়
নিশিতে ভূকম্প—ঘটিবে দায় !!
অনাবৃত স্থানে ভয়ে জাগরণে
যাপিলাম নিশি নিজ জন সনে,
প্রভাত হইল ভানু প্রকাশিল
ক্রমশঃ কাহিনী শুনিনু কত ;
আসিতে লাগিল যত দিন যায়
লোকমুখে ডাকে, তারের দ্বারায়
লোমহর্ষ অতি ভূকম্প-ভারতী
ভারতের নানা স্থানের যত।

(৩)

প্রলয় সদৃশ ঈদৃশ ব্যাপার
এ দেশে কখন ঘটে নাহি আর !
হেন অসম্ভব দৈব উপদ্রব
প্রাচীনের কাছে না শুনা যায় !
পূর্ব্বে কত বার কাঁপিয়াছে ধরা,
মৃদু সে কম্পন থামিয়াছে ত্বরা,
খণ্ড এক মাত্রে ধরণীর গাত্রে
কম্প অনুভব হইত তায় ;
এই বারে—একি কাণ্ড বিভীষণ ?
সর্ব্বদেশব্যাপী এ মহাকম্পন,
পৌরাণিক কথা "দক্ষযজ্ঞ" যথা
"চূরমার" তথা হ'য়েছে দেশ !
পদ্মাবতী পার যত ভূমিখণ্ড
পূরবে আসাম সব লণ্ডভণ্ড !

প্রাসাদ অতুল, দেবের দেউল
ধরাশায়ী, চিহ্ন না দেখি আর !
রাজা মহারাজ, অন্য জনগণ—
কত যে করিলা লীলা সম্বরণ,
দিতে পরিচয় বিদরে হৃদয়,
লেখনী না চায় লিখিতে, হায় !
বার্ত্তাবহ তার ছিঁড়িল আপনি,
এমনি প্রচণ্ড ধরার কাঁপনি !
রেলপথ কত উন্নতাবনত
হইল—না চলে শকট তায় !
ছিল কোনখানে রাজকার্য্যালয়,
কর্ম্ম করে তায় কর্ম্মচারিচয়,—
দেখিতে দেখিতে এ কি ! আচম্বিতে
পশিল ভূগর্ভে সে সমুদায় !!
কোথা কার্য্যালয় কর্ম্মচারিগণ ?
দেখিতে না পাই কোন নিদর্শন !
এ হেন ব্যাপার কত স্থানে আর
কত যে ঘ'টেছে কে জানে, হায় !
কত সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড ফাটি
সবেগে উঠিছে কাদা জল মাটি !
গন্ধকের বাস- পূরিত বাতাস
ব্যাপিয়া আকাশ চৌদিকে বয়।
কোনখানে ধরা তরু লতা সহ
নিমেষে মজিল উপজিল "দহ" !
এই ছিল স্থল এবে তথা জল
পবন-হিল্লোলে তরঙ্গময় !
কোন গিরি-শির পড়িল খসিয়া,
কার পার্শ্বদেশ গিয়াছে ধ্বসিয়া,
লোক, লোকালয়, অট্টালিকাচয়
গেল রসাতল চাপনে তার।
কত নদ নদী সরসী তড়াগ
জলপূর্ণ ছিল, এবে তলভাগ
হ'য়েছে উন্নীত বালুকা-পূরিত
বিন্দুমাত্র জল দেখি না আর !
ফিরিয়াছে স্রোত কত তটিনীর,
কত উচ্চ ভূমি হ'য়েছে গভীর !
শুনেছি ভারতী ভেদি স্রোতস্বতী
জলস্তম্ভ কোথা উঠেছে নাকি !!
বিপন্ন এবার ধনশালী জন,
টলে নাই প্রায় দরিদ্র-ভবন,
অবাধে নীরবে অনশন সবে
সহিছে আপন কুটীরে থাকি !
পুরাতন কথা পুনরায় কহি
এবারে যে ভাবে কাঁপিলেন মহী,
সে ঘোর কম্পন করিয়া স্মরণ
মানিবে আপনা আতুরতম ;
মায়াবশে ভুলি মায়াতীত নাথে
"আমি সর্ব্বেশ্বর" ভাবি অধঃপাতে
যেতেছি দেখিয়া ধরা কাঁপাইয়া
কৃপা করি প্রভু নাশিলা ভ্রম !! শ্রীকঃ।

আশা।

নিরন্নতোয়ে তুমুলার্ত্তনাদে
গ্রস্তে মহামারিভয়েন দেশে
পতন্তি বারীণি নবাম্বুবাহাৎ
কৃপামৃতানিব জগজ্জনন্যাঃ।

অন্ন নাই, জল নাই, ঘোর হাহাকার,
মহামারিভয়ে দেশ হৈল ছারখার !
নবীন নীরদ হ'তে ঝরিতেছে নীর,
যেন কৃপামৃতধারা বিশ্বজননীর !

পরার্থের সূত্রপাত—বিবাহ।

যেমন মানুষ যত শিশু, ততই স্বার্থপর, তেমনি যে জাতির যত বাল্যভাব, সে জাতিও ততই স্বার্থপর। বাল্যভাব অতিক্রান্ত হইবার দুইটী কারণ,—বয়স ও শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা শিশুও বৃদ্ধ হয়,—শিক্ষার অভাবে বৃদ্ধও শিশু থাকে। কেবল মাত্র বয়সে একটী শিশুর, বা একটী জাতির বাল্যভাব দূর হয় না। এই জন্য কত মানুষ বৃদ্ধ হইয়াও শিশুসম স্বার্থপর,—কত জাতি শত সহস্র বর্ষেও পরার্থ বুঝে না।

নিতান্ত শিশুর হাতে একটী সন্দেশ দাও, সে তাহা টপ করিয়া গালে পূরিবে, তাহার একটী গুঁড়াও অন্যকে দিবে না। তদপেক্ষা বড় ছেলে আপনার ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে একটু একটু দেয়। যে বালকটী তদপেক্ষাও বড় এবং পাঠশালায় শিশুবোধ, বোধোদয় প্রভৃতি পড়িয়াছে, সে প্রতিবেশবাসী খেলুড়ীদিগকেও একটু একটু না দিয়া খাইতে পারে না। এইরূপে বয়স ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিশুর স্বার্থ,—প্রথমে বাড়ী,—পরে পাড়া,—পরে গ্রাম,—পরে প্রদেশ,—পরে দেশ,—পরে মহাদেশ,—অবশেষে মহাদ্বীপেও বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারে, এবং পড়িয়াও থাকে। আবার যখন দেখে, মানুষ পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, পরও তাহার প্রতি সেইরূপ করিতে বাধ্য হয়, তখন স্বার্থবিস্তৃতির স্রোতঃ অধিকতর বাড়িয়া যায়। কিন্তু মনুষ্যের এরূপ পরার্থপরতা শুষ্ক ও ভাসা ভাসা। ইহাতে মনে কখন সুখ থাকে,—কখন থাকে না। যে কার্য্যে মনে সুখ থাকে না,—সেরূপ লোক-দেখান সকের কার্য্যে বড় আটা হয় না। সকের কাজ,—ফলফুলের কলমের গাছের ন্যায় দেখিতে ভাল,—ফল বেশি ধরে না। "পেসাদারী" কথাটা শুনিতে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু পেসাদারী কাজ ভিন্ন সমাজ চলে না। অর্থাৎ যে পরার্থের মূলে স্বার্থ নাই,—সে পরার্থ শূন্যগর্ভ। স্বার্থ পরার্থ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কৃষক, বণিক, শিল্পী, ইহাদিগের কার্য্যও স্বার্থ-পরার্থ-বিমিশ্রিত।

স্বার্থসাধনে সৃষ্টি,—স্বার্থনাশে মহাপ্রলয়। স্বার্থই অনন্ত সৃষ্টির কেন্দ্র। স্বার্থ মানবজীবনের সহ এরূপ দুশ্ছেদ্যরূপে জড়িত হইলেও উহার সাধন বড়ই লজ্জাজনক ও অপ্রশংসাসূচক। যিনি নিজ সুখে সুখী, নিজের সুখের জন্য পরকে দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হন না, স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহার অযশের সীমা নাই। যিনি মুখের অন্ন পরকে দেন, পরের জন্য নিজের কার্য্য নষ্ট করেন, আপনি শত দুঃখ ভোগ করিয়াও পরকে সুখী করেন, এ জগতে তিনি দেবতা। মনুষ্যের হৃদয়ে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুইটী ভাব বিদ্যমান। এই বিরুদ্ধধর্ম্মী

স্বার্থপরার্থের সংঘর্ষে পতিত হইয়া মানুষ মারা যায়। যদি এমন উপায় হইতে পারে, স্বার্থসাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরার্থ সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর কোন সঙ্কটই থাকে না। বিবাহ মানুষকে ঐ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমি উত্তমরূপে ভোজন করিলে,—উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিলে,—উত্তম শয্যায় শয়ন করিলে, সুখ হইবে আর এক জনের;—আমি উৎকৃষ্ট বসনাভরণে সজ্জিতা হইলে,—অঙ্গে সুগন্ধ লেপন করিলে,—কবরীকণ্ঠে কুসুমদাম ধারণ করিলে, প্রাণ জুড়াইবে আর একজনের; এরূপ ভাব মনে থাকিলে আর স্বার্থসাধনে সঙ্কোচ ও লজ্জা হয় না। তখন স্বার্থপরার্থ এক হইয়া যায়। ব্যয় করাই অর্থের প্রয়োজন,—কেননা অর্থ ব্যয় করিলে তদ্দ্বারা উপকার হয়। ব্যয় না করিয়া অকারণ অর্থ সঞ্চয় করিলে, লোকে কৃপণ,—যক্ষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া কত নিন্দা ও গ্লানি করে। কিন্তু আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদি অর্থাভাবে কষ্ট না পায়, ইহা ভাবিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে আপনার মনে সঙ্কোচ ও গ্লানি হয় না, এবং লোকেও নিন্দা করিতে পারে না। ধনসঞ্চয়রূপ স্বার্থসাধনে পুত্রপৌত্রাদির কষ্টনিবারণরূপ পরার্থ সিদ্ধ হয়।

তত্ত্বপথে বিচার করিলে স্ত্রীপুত্রাদি কেহই কাহার নহে,—সকলেই পর। মনুষ্যের যত বয়স হয়, যত শিক্ষা হয়,—মায়ার বন্ধন যতই শিথিল হয়, ততই সে বুঝিতে পারে, কেহ কাহারও নহে,—সকলেই পর। সুতরাং তাহাদের সুখের জন্য যে যে কার্য্য করা যায়, সকলই পরার্থ। স্ত্রীপুত্রদিগকে যে পরিমাণে পর মনে হইতে থাকে,—দেশ বিদেশের নিঃসম্পর্ক নিষ্পরাদিগের জন্য ততই প্রাণ কাঁদিতে আরম্ভ হয়। তখন তাহাদিগেরও সুখের জন্য কার্য্য করিতে আর কোনও আপত্তি থাকে না। মানুষ এইরূপেই পরার্থপরায়ণ বিশ্বপ্রেমিক হইয়া পড়েন। বিবাহই আমাদিগকে এই মহাশিক্ষা প্রদান করে। অতএব বিবাহ হইতেই প্রকৃত পরার্থপরতার সূত্রপাত হয়। এই জন্যই হিন্দুজীবনে বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার,—শরীর ও মন পবিত্রকারী মহাধর্ম্ম;—ইতর জাতির ন্যায় পাশবী ক্রিয়া সম্পাদনের সদুপায়মাত্র নহে।

আশ্চর্য্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতি।

১। তিব্বতবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক মৎস্যদের আহারের জন্য হ্রদের জলে নিক্ষেপ করে।

২। বাক্‌ট্রিয়ার প্রাচীন অধিবাসিগণ তাহাদের আত্মীয় বন্ধুগণের মৃতদেহ কুক্কুরের ভক্ষ্য করিয়া দিত এবং এই জন্যই কতকগুলি কুক্কুর পুষিত।

৩। নরওয়ের লোকেরা পূর্ব্বকালে মৃত জলদস্যুদিগকে তাহাদের জাহাজে

পূরিয়া আগুন জ্বালিয়া গভীর সমুদ্রে ভাসাইয়া দিত।

৪। ইথিওপীয় দেশবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত, অথবা সুবর্ণে মণ্ডিত কিম্বা দগ্ধ মৃত্তিকায় আবৃত মূর্ত্তি করিয়া আবাসবাটীতে যত্নে সংরক্ষণ করিত।

৫। বাবিলনবাসীরা দাহক্রিয়ার বিরোধী ছিল, তাহারা মৃতদেহ মধুর মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিত। তাহাদের বিশ্বাস শব দাহ করিলে সূর্য্যকে অবমাননা করা হয়।

৬। কানারি দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা তাহাদের মৃতদেহ শুষ্ক করিয়া ও তাহাতে বার্ণিস মাখাইয়া সংরক্ষিত করিত।

৭। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের পূর্ব্বনিবাসী পাহাড়িয়ারা পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিত এবং তাহাদের মৃতদেহ পর্ব্বতকন্দরে কবর দিত।

৮। প্রাচীন গ্রীকেরা আইনমতে মৃতদেহ পোড়াইতে বাধ্য ছিল। কবর দেওয়া রোমকদিগের প্রথা ছিল, শেষে গ্রীকদের হইতে দাহ-প্রথা গৃহীত হয়। পেরুবাসীরা মিসরবাসীদিগের ন্যায় প্রধান লোকদিগের শব সংরক্ষিত করিয়া রাখিত। মেক্সিকোতে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল।

৯। পারসীদের মৃতদেহ প্রথমে ডাখামা বা শুদ্ধাগার নামক স্থানে স্থাপন করে, পরে মাংসাশী পক্ষিগণ তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া অস্থিসার করিলে মাসান্তে উক্ত দেহ এক গভীর কূপের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে অনেক বংশ-পরম্পরার দেহাবশেষ সঞ্চিত।

১০। হিমালয় পর্ব্বতের ঢালু প্রদেশে সিকিমের অধিবাসিগণ মৃতদেহ দাহ করিয়া তাহার ছাই আকাশে উড়াইয়া দেয়। উনালাস্কা ও লুটকাবাসীরা এইরূপ ছাই কবরে সমাহিত করে এবং প্রত্যেক পথিক তদুপরি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে মৃতের সদ্গতি হইবে আশা করে।

১১। হিরোডোটস বলেন, কোন কোন স্থানের প্রধান লোক মরিলে পালিত প্রিয় অশ্ব ও ক্রীতদাস সকলকে তাহার সহমৃত করা হইত, পরলোকে ইহারা তাহার প্রয়োজনে লাগিবে এই বিশ্বাস। ভারতবর্ষের ন্যায় অনেক দেশে সতীদাহ-প্রথা প্রচলিত আছে।

১২। ব্রহ্মদেশে ভদ্রলোকদিগের মৃতদেহ সুসংস্কৃত শবাধারে আবদ্ধ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণ নৃত্য গীতাদি করে, পরে মূল্যবান্ কাষ্ঠস্তূপের মধ্যে রাখিয়া দাহ করে; যখন দেহটী প্রায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তখন তাহা অগ্নির ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়।

১৩। আমেরিকার আদিমবাসীদের অনেকে মৃতদেহ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখে এবং তাহা শকুনিদিগের খাদ্য ও ঝঞ্ঝাবাতের ক্রীড়নক হয়। কোন কোন স্থলে উইলো-শাখায় জড়াইয়া শবের পদ দক্ষিণদিক্স্থ করিয়া কার্পাস

বৃক্ষে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গে প্রচুর খাদ্য, অস্ত্র, তামাক দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস পরলোকযাত্রার সময় এই সকল দ্রব্য কাজে লাগিবে।

১৪। চীনদেশের লোকেরা তাহাদের মৃতদেহ সুপরিষ্কৃত ভূমিতে সমাহিত করে এবং তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করে। স্বদেশ হইতে যাহারা কুলির কার্য্য করিতে বিদেশে যায়, তাহারা তথায় মৃত হইলে তাহাদের শবদেহ যাহাতে স্বদেশে আনীত হইয়া পিতৃপুরুষদিগের কবরে সমাহিত হয় এরূপ বন্দোবস্ত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, শবদেহ পিতৃপুরুষদিগের কবরস্থ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইলে স্বর্গীয় কুসুমকাননে চিরবিরাম লাভ করিবে, অন্যথা প্রেতাত্মা যথাতথা উচ্ছৃঙ্খলাবস্থায় কালাতিপাত করিবে।

শুক্রবার মন্দ দিন নয়।

১। জর্জ ওয়াসিংটন ১৭৩২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

২। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণির প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলি ও গ্লাড্ষ্টোন এবং বিসমার্ক শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন।

৩। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ শুক্রবার হড্সন নদ আবিষ্কৃত হয়।

৪। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জুন শুক্রবার একাদশ লুই ফ্রান্সের সর্দ্দারগণকে বশীভূত করেন।

৫। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন শুক্রবার কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৬। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন শুক্রবার বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক স্পারজন জন্মগ্রহণ করেন।

৭। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ২০শে নবেম্বর শুক্রবার উত্তর আমেরিকায় প্রথম কোটাঘর নির্ম্মিত হয়।

৮। টমাস্ সট্টন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি স্পেনিয়ার্ডদিগের হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৯। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান ধনী সম্রাট্ চার্লস্ দি বোলড্ ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন।

১০। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে নবেম্বর শুক্রবার লণ্ডন নগরে টাইমস্ নামক পত্রিকা প্রথম বাষ্পযন্ত্রে মুদ্রিত হয়।

১১। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মে শুক্রবার তাপমান যন্ত্র আবিষ্কারক গেব্রিয়েল ফারেনহিট্ জন্ম গ্রহণ করেন।

১২। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই শুক্রবার জন এডামের প্রস্তাবে এবং রিচার্ড হেন্রির অনুমোদনে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের উপনিবেশিগণকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

রমণীর অপরাজেয়া শক্তির উৎস কোথায় ?

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের আকরভূমি, মহিমা ও গৌরবে পৃথিবী হইতে সমুন্নত, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎসারিত হইয়া ক্ষীণ প্রবাহে চলিয়াছে। কে ভাবিতে পারে ইহা একদিন উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকীর্ণ বেগবতী স্রোতস্বতী-রূপে পরিণত হইবে? ক্ষীণ প্রবাহিণী ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রস্তর প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, নাচিতে নাচিতে সে সমস্তই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে—গভীর, অতলস্পর্শ, বিশাল সমুদ্রবক্ষে মিশিতে ছুটিয়াছে, অবিরাম ছুটিয়াছে! সাগরপথ কত দীর্ঘ। তবু শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দিকে দৃক্‌পাত নাই, ছুটিয়াছে। সম্মুখে কত বাধাই না পড়িতেছে! কিন্তু সে বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য, স্রোত ততই প্রবল হইতেছে। স্রোতোমুখে যখন উচ্চ পর্ব্বত দণ্ডায়মান হয়, তখন এই প্রবাহই সেই পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে জলপ্রপাতরূপে পরিণত হইয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা ও বিস্ময়কর শক্তি প্রকাশ করিতেছে। মানব স্তম্ভিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিয়া থাকে।

স্রোতস্বতীর উৎপত্তি, গতি ও পরি-সমাপ্তি কতই না সুন্দর! উৎপত্তি—গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য, উচ্চতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ। গতি—প্রবলা, নিজ উদ্দেশ্যসাধনে অবিরাম প্রবহমানা—সে প্রবাহে পৃথিবীর সুখ ও কল্যাণ পরিবর্দ্ধিত, পৃথিবী ধনধান্যে সুশোভিতা, "সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা।" আবার পরিসমাপ্তি—গভীর, অতলস্পর্শ, সৌন্দর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়। নদীর জন্ম, উদ্দেশ্য সকলই সার্থক। আর যে জন্য এই জীবন, যে জন্য এই শক্তি, যাঁহার জীবনে তাহা পূর্ণ হয়, তাঁহার জীবনই সফল, তিনিই ধন্য। সেই জীবনের সুখ সমুদ্রের মত অসীম, অতলস্পর্শ, অফুরন্ত। আমরাও ত ঈশ্বর হইতে নদীর মত অপরাজেয়া শক্তি পাইয়াছি, কিন্তু নদীর মত গতি কোথায়? সে অপরাজেয়া শক্তি, অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব, আনুগত্যজনিত অবিরাম উন্নতির চেষ্টা কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য সাধন, পৃথিবীর সুখ ও কল্যাণবর্দ্ধন কোথায়? পৃথিবীর কার্য্যের পরিসমাপ্তিতে—মৃত্যুতে নদীর মত সফল-জীবন হইবার আশাই বা কোথায়? নদীর এই অপরাজেয়া শক্তির মূল, সিন্ধু পানে ধাবিত হওয়ার—মহাসিন্ধুতে আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়ার স্বাভাবিক টান। জড়বিজ্ঞানের ভাষায় ইহার অর্থ মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষণ, আর হৃদয়ের ভাষাতে এই টানের গূঢ় অর্থ প্রেম বা আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশ্ববিধাতৃপ্রদত্ত আমাদের সেই অপরাজেয়া শক্তির মূলও প্রেম এবং আত্মবিসর্জ্জন।

আমাদের বর্ত্তমান জীবনপ্রবাহের মূলেও প্রেম আছে, আত্মসমর্পণ আছে। ঘরে ঘরে দেখিতে পাই মাতা, পত্নী, ভগিনী নিজ নিজ সন্তান, স্বামী ও ভ্রাতার জন্য অহর্নিশ খাটিতেছেন, নিজের শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, নিজ সুখ ভুলিয়া কেবল তাঁহাদের জন্যই ব্যস্ত আছেন। তাঁহাদের সেই সহিষ্ণুতা, সেই প্রেম, সেই আত্মসমর্পণ—তবে এমন হীনপ্রভ কেন? জীবনের জীবন্ত প্রভাব নাই কেন? এই প্রেম, সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণের মূলে কি আছে, তাহা দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে; ভ্রাতা ও স্বামীর জন্য সহিষ্ণুতা অনেক সময় নাচার হইয়া, উপায় নাই বলিয়া। পুত্রের জন্য সহিষ্ণুতা মমতার দুর্ব্বলতার অধীন হইয়া। আত্ম-শক্তি, আত্ম-জ্ঞান ও আত্মচিন্তা একেবারে ক্ষীণ—ঘটনাস্রোত যে দিকে চালায়, সেই দিকেই চলি। কখনও বিকৃত সন্তান-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের অন্যায় পথে যাইবার প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া সকল আবদার পালন করি, কখনও আবার সামান্য ত্রুটিতে রাগে অন্ধ হইয়া প্রহার করি। পূর্ব্বোক্ত স্নেহের ফলে সন্তান উগ্র, অসংযমী এবং চঞ্চল ও লঘুস্বভাব, দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের ফলে প্রেম ও ভক্তিশূন্য, হৃদয়হীন ও অবাধ্য। এই কি সন্তানস্নেহ—এই প্রেমই কি অপরাজেয়?

মাতৃস্নেহ সন্তানের জীবনকে সুগঠিত করিয়া পৃথিবীর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিবে। কিন্তু এই বঙ্গদেশে কয়জন মাতা শিশুসন্তানের প্রকৃতি বুঝিয়া আপনার হৃদয়নিঃসৃত স্নেহ সুধা ঢালিয়া সন্তানকে ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিতে পারেন, উপ-যুক্তরূপ পরিপুষ্ট করিতে পারেন, তাহার উন্নতির সাহায্য করিতে পারেন? উন্নতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বিবেচনার অভাব বশতঃ, সূক্ষ্মদর্শন না থাকাতে সন্তানের বিকৃত স্বভাবের কারণ হইয়া পড়েন। যে মাতার মুখ সর্ব্বদাই স্নেহ, প্রেম, আনন্দ ও হাস্যে প্রসন্ন, আত্ম-সংযম, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাতে যাঁহার ললাট উন্নত, যাঁহার বাক্য কার্য্য ব্যবহার সুস্নিগ্ধ, সন্তান সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া কি ইহার বিপরীতভাবাপন্ন হইতে পারে? যে গৃহে সজনে, নির্জ্জনে, ব্যস্ততায়, বিপদ কোলাহলে কি সন্তানের দুর্ব্যবহারে ও নানা বিশৃঙ্খলাতে মাতার স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বাক্য কার্য্য কখনও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সীমা উল্লঙ্ঘন করে না, সে গৃহের শিশু উচ্ছৃঙ্খ-লতা, রাগ, বিরক্তি, কর্ত্তব্য অবহেলা, অপ্রেম কোথা হইতে শিখিবে? কিন্তু যদি মাতাতে ঠিক্ ইহার বিপরীত ভাব দেখে, যদি মাতাকে সর্ব্বদা রাগের সহিত শাস্তি দিতে, বিরক্ত হইতে ও কর্কশভাবে তিরস্কার করিতে দেখে, তবে সন্তান কেনইবা রাগ করিতে না শিখিবে—মাতাকে অশ্রদ্ধা না করিবে? এ অবস্থায় সন্তানের উপর মাতার শক্তিই বা কি প্রকারে থাকিবে? আবশ্যক হইলে অবশ্য

শাস্তি প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত করিতে হইবে। ক্রোধান্ধ হইয়া শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহাতে অপকার বই উপকার নাই। তাহাতে মাতার প্রতি ভক্তির হ্রাস হয়। সন্তানের উপর এরূপ মাতার প্রভাব অতি অল্পই থাকে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শুধু প্রেম ও আত্মসমর্পণ থাকিলেই অপরাজেয়া শক্তি হয় না। আমাদের প্রেম ও আত্মসমর্পণ এমন বিকৃত ভাবাপন্ন যে, তাহা দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না, এবং বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি ভিন্ন তাহা চিনিতেও পারা যায় না। অজ্ঞানীর নিকট অমৃতও বিষ হয়, প্রাণনাশক হয়, আর জ্ঞানীর নিকট বিষও কাজে লাগে, অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়—ইহাত সকলেই জানি। আমরা অজ্ঞান অবোধের মত এমন প্রেম ও আত্মসমর্পণরূপ অমূল্য ধনকে—এমন সঞ্জীবনী সুধাকে বিকৃত করিয়াছি, গরলে পরিণত করিয়াছি!

বিকৃত প্রেম ও বুদ্ধিহীনতা বশতঃ আমাদের শক্তির অপব্যবহার করি বলিয়া সন্তানের জীবন, মানবসমাজ অধঃপতিত এবং আপনারাও অধঃপতিত। যে শক্তি সন্তানের ভিতরে কার্য্য করিলে সন্তান ও মানবসমাজ সুন্দর ও সমুজ্জ্বল উন্নতিশিখরে আরোহণ করিত, সেই শক্তি প্রভাবেই আবার আজ সকলে অন্ধতম গুহায় নিপতিত। ইহা কি শক্তির বিকৃতি নহে? স্নেহের বিকৃতি নহে? যদি এখনও বিন্দু পরিমাণ স্নেহ থাকে, তবে কি প্রাণাধিক সন্তানের জন্য, সমাজের জন্য, নিজের জন্য, ইহার বিকৃতি ঘুচাইতে যত্ন করিব না? শুধু প্রেম থাকিলে চলিবে না। চিন্তা, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চাই। চিন্তা দ্বারাই সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করা যায়। স্থূল দর্শনে আমরা যাহা ক্ষুদ্র বালুকণা, জলকণা কিম্বা সামান্য তৃণ বলিয়া তুচ্ছ করি, সূক্ষ্ম দর্শনে তাহার ভিতর কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া, অপূর্ব্ব কৌশল, অচিন্তনীয় জ্ঞান ও মহিমা দেখিয়া জ্ঞানিগণ মোহিত ও স্তম্ভিত হন। তাই স্থূল দর্শনে সন্তানের প্রকৃতি ও আমাদের ব্যবহারের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা সকল বুঝিয়া থাকেন। তাই মানসিক শক্তিকে চিন্তাবিহীনতা দ্বারা জড় করিলে চলিবে না, সব জীবন্ত করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে মাতৃস্নেহের যেরূপ বিকৃতি দর্শন করিলাম, স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির সেইরূপ অপব্যবহার ঘটিতেছে। যে রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী—সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সাহায্যকারিণী, তিনি হয়ত খাওয়া পরা প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্য ভিন্ন অন্য সাহায্য করিতেই সক্ষম নহেন। কিন্তু ইহাতে কি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষা হয়? এই কি পত্নীর প্রেম যাহা কেবল স্বামীর শরীর-রক্ষার্থ আহার প্রস্তুত করে ও নানা সাংসারিক কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়? এই প্রেমই কি অপরাজেয়? পত্নী স্বামীর জন্য অসীম কষ্ট সহ্য করেন, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দেন সত্য, কিন্তু সামান্য একটী

দাসীও কি ইহা করে না? তবে বিশেষত্ব রহিল কোথায়? স্বামীর সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য ব্যস্ত হইলেও তাঁহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির বিষয় পত্নী বড় ভাবেন না। হয় ত স্বামীকে মৃত্যুর দিকে যাইতে দেখিয়াও তন্নিবারণের কোনও চেষ্টা করেন না। আবার স্বামী যে সংসারের নীচ বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসেন না, তাহা দেখিয়াও স্বয়ং সেই ক্ষুদ্রতা ও নীচতা লইয়াই ব্যস্ত হন। হয় ত স্বামীর ক্রীড়ার পুতুল, না হয় ত তাঁহার কৃপার পাত্রী। এই কি পতিপ্রেম? না এই প্রেমে স্বামীর হৃদয়ের উপর জয়লাভ করা যায়, ইহা কি প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে? যে প্রেম স্বামীর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধনের জন্য—প্রকৃতভাবে স্বামিসেবা করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যগ্র না করে, সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর উপযুক্ত সাহায্যকারিণী হইবার জন্য, প্রকৃত জীবন লাভের জন্য ব্যস্ত না করে, তাহা পতি-প্রেমই নহে। সাধারণ দাম্পত্য প্রেমে সহিষ্ণুতা আত্মত্যাগ আছে সত্য, কিন্তু এই সহিষ্ণুতা ও এই আত্মত্যাগে শক্তি নাই, কেননা তাহাতে মহত্ত্বের নিতান্তই অভাব। আত্মসমর্পণ অর্থ আত্মবিনাশ নহে। আত্মসমর্পণ পরাধীনতা ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতাতে লইয়া যায় না। কর্ত্তব্যজ্ঞান ভিন্ন মহত্ত্ব—প্রকৃত আত্মত্যাগ জন্মে না। সহ্য করাই একটা গুণ নয়। উহা অনেক সময় একটা দোষ ও দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যত্বের জন্য, স্বামী ও শিশু সন্তানের কল্যাণের জন্য যাহা প্রয়োজন, চিরকাল যদি তাহাতে অবিচলিত সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সে সহিষ্ণুতায় জগতের কি আসে যায়? সহিষ্ণুতার মূলে আত্মত্যাগ ও দৃঢ় সঙ্কল্পের গভীর প্রবাহ থাকিলেই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হয়—উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। নতুবা "কেবল সহ্য না করিয়া আর কি করিব, আর উপায় কি?" এই মৃতভাবে সহিষ্ণু হইয়া যদি সমস্ত জীবন যাপন করি, তথাপি কিছু হইবে না। সে সহিষ্ণুতার কোনও শক্তি হইবে না।

স্বামী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী, পিতা মাতার আত্মার এবং শরীরের কল্যাণের জন্য এমন কোন কষ্টকর দুঃসাধ্য ব্রত কি আছে যাহা পালন করিতে আমরা অক্ষম হইব? পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে যে সহিষ্ণুতা সর্ব্বসহনীয়তারূপ অজেয় শক্তি দিয়াছেন, ইহা দ্বারা অসাধ্যও সাধন করিতে পারিব। যাহা নিজের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে উচিত বুঝিব, তাহা যদি ভয়, নিন্দা কিম্বা আর কোনও কারণে পালন করিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে ইহা সহিষ্ণুতা নহে—ভীরুতা। সে ভীরুতা আমাদের অবলম্বনীয় নহে। ভীরুতা বিনাশের পথে লইয়া যায়, সৎসাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় লইয়া যায়।

আমাদের প্রেম ও আত্মত্যাগ আছে, কিন্তু তাহা বিকৃত বলিয়া এক প্রকার মৃত। মৃত প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না, অপরাজেয়া শক্তির মূল হইতে পারে না।

কাজেই আমাদের চিরপ্রবহমান, অবিকৃত জীবন্ত প্রেম ও আত্মসমর্পণ চাই। কিন্তু তাহার উপায় কি? পার্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীর দিকে চাহিলেই আবার সে উপায় দেখিতে পাইব।

সাগরপথে কত বাধা, ক্ষুদ্র স্রোতটীকে বিনাশ করিবার কত আয়োজন, তবু স্রোত মরে না কেন? শুষ্ক হয় না কেন? তাহার গতি রুদ্ধ হয় না কেন? তাহার মূলে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে চিরস্থায়ী অফুরন্ত উৎস রহিয়াছে বলিয়াই। নদী জীবন্ত, ক্ষুদ্র নদীর এই শক্তি। নদী যদি পার্ব্বতীয় উৎস হইতে জল না পাইত, তবে তাহার এ শক্তি থাকিত না, এ গতি থাকিত না। আবার নদী প্রকৃতি হইতে—তাহার স্রষ্টা মহান্ ঈশ্বর হইতে এক অপরিবর্ত্তনীয় প্রভাব লইয়া জন্মিয়াছে, তাই ক্ষুদ্র হইলেও তাহার শক্তি অপরাজেয়। সে নিম্নে ছুটিবেই, বিশাল সমুদ্রবক্ষে মিশিবেই। স্রোতের গতি নিম্নদিকে, তাই ইহার গতির বিরাম নাই। স্রোতস্বতীর স্বাধীনতা নাই, তাই সে এই স্বাভাবিক নিয়মের, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে পারে না। আনুগত্যের জন্য তাহার বিপরীতাভিমুখী হওয়া অসম্ভব, তাই ইহার গতির বিরাম নাই। স্রোতস্বতীর সম্মুখে ছোট বাধা, বড় বাধা কিছুই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না।

আমাদের সম্বন্ধেও স্বাভাবিক নিয়ম আছে, মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অভিপ্রায় আছে। আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি; অনন্ত উন্নতির দিকে ছুটি; জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে বিভূষিত হইয়া অবিশ্রান্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের অনন্ত জলধি বিশ্বস্রষ্টার সহিত মিশি ইহাই আমাদের স্বভাব, ইহাই আমাদের জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া যদি আমরা স্বভাবের বিরুদ্ধে চলি, বিশ্ববিধাতার আনুগত্য স্বীকার না করি, তবে আমাদের শক্তি কোথা হইতে আসিবে? আর যদি তাঁহার অনুগত হইয়া চলি, তবে আমাদের জীবনের সকল প্রকারের বিকৃতিই দূর হইবে, আমরা প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সেই অপরাজেয়া শক্তি লাভ করিব। তখন কোন বাধাই আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না। সমস্ত বাধা দূর করিয়া আমরা তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে সক্ষম হইব।

আমাদের প্রেম অচল, অটল, জীবন্ত হইবে। আমরা এই প্রেমে আপনাকে হারাইব সত্য, কিন্তু সে আত্ম-বিস্মৃতিতে মনুষ্যত্ব হারাইব না। আমাদের প্রেম, আমাদের আত্ম-সমর্পণ মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইবে। তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকিবে; কেননা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার উৎস ভগবান্ এই প্রেমের মূল হইবেন। তিনি আমাদের প্রেমের পশ্চাতে থাকিলে আমরা প্রকৃতজীবন লাভ না করিয়া—জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতায় বিভূষিত না হইয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং এই প্রেমে আত্ম-ত্যাগে কোন সময়েও কুফল

উৎপাদন করিবে না। এই প্রেম সন্তানের পশ্চাতে থাকিলে সাধ্য নাই সন্তান পাপ পথে—অমঙ্গল পথে বিচরণ করে। এই প্রেম স্বামীর পশ্চাতে থাকিলে সাধ্য নাই স্বামী নীতি এবং ধর্ম্মপথ অতিক্রম করেন। এই প্রেম থাকিলে স্বামী পুত্র কন্যা কাহারও সাধ্য নাই আমাদিগকে পাপের নিকট অবনত হইতে বাধ্য করেন। স্বামী যদি অন্যায় অপবিত্র কিছু বলেন বা করেন, তাহা হইলে কর্কশভাবে তিরস্কার করিব না সত্য, কিন্তু এমন ভাবে চুপ করিয়া থাকিব না যে, তাহা আমার অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। মুখে হয় ত কিছুই বলিতে হইবে না, কিন্তু আমার সমস্ত জীবনে ও কার্য্যে পবিত্রতা, ধর্ম্ম ও প্রেম এমনই দীপ্তি পাইবে যাহাতে পাপ অপবিত্রতা আপনা আপনি পরাস্ত হইয়া যাইবে—স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, সকলেই অভিভূত হইয়া পড়িবে। কেহই সেই তেজের, সেই শক্তির নিকট অবনত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে অমূল্য রত্ন প্রেম ও আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহাই আমাদের অপরাজেয়া শক্তির মূল। এই প্রেমই আমাদের জীবন। প্রেমশূন্য রমণীজীবন অতি অসার। "যেমন সূর্য্যের মুল্য তেজ, চন্দ্রের মূল্য জ্যোৎস্না, স্বর্ণের মূল্য দীপ্তি, তেমনি রমণীর মূল্য প্রেম।" এই প্রেমেই আমাদের সুখ, শান্তি ও আনন্দ। এই প্রেম ও আত্ম-বিসর্জ্জনে যে বিমলানন্দ উপভোগ করা যায়, তাহার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন আনন্দের তুলনা হয় না।

আমরা কি এমন অমূল্য ধন ও অতুল শক্তি থাকিতে জড়ের মত পড়িয়া থাকিব? আমাদের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, জীবন সব জগতের জন্য বিকসিত করিব না? অন্যের জন্য প্রাণদানের উদ্দেশ্যেই ত আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাইত প্রভু আমাদিগকে এই প্রেম ও আত্ম-ত্যাগ শক্তিতে অপরাজেয়া করিয়া পাঠাইয়াছেন।

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

যথার্থই আমরা নিজের জন্য নহি, অপরের জন্য। যে রমণী নিজের জ্ঞান, প্রেম, বুদ্ধি, শক্তি ও দেহ অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার জীবনই সফল। তাঁহার সে মহিমান্বিত প্রেম ও আত্ম-ত্যাগের নিকট পৃথিবীর রাজা এবং বড় বড় বীর সকলেই নতশির। জগতের ইতিহাস এবং সাধু-জীবন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রেম সাধনের জন্য বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র—বিশাল প্রাণিজগৎ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অপরাজেয়া শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই, যুদ্ধ করিবারও প্রয়োজন নাই, প্রতিদিন গৃহে অন্তঃপুরাবদ্ধা বঙ্গললনার দৈনিক জীবনে ইহা ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ

রহিয়াছে। গৃহ পরিবারই প্রেম ও আত্ম-সমর্পণের উপযুক্ত স্থল।

আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। এ জীবনকে যত উন্নত ও পবিত্র করিতে পারিব, ততই তাহা জগতে বিতরণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। পৃথিবীর কোন বাধাই আমাদের জীবনের এই উদ্দেশ্য পালনে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আমরা যে জন্য আসিয়াছি, যে জন্য শক্তি সামর্থ্য সকলই পাইয়াছি, পৃথিবীর বাধায় যেন তাহা পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন না করি। আলস্য, ভয়, লজ্জা, আত্ম-সুখাভিলাষ প্রভৃতি আমাদের এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় যা কিছু আছে, সব ছাড়িয়া আমরা কায়মনঃপ্রাণে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপনে নিযুক্ত হই। মহান্ পরমেশ্বর এ দুর্ব্বলা রমণীমণ্ডলীর সহায় হউন, তাঁহার ইচ্ছা পুর্ণ হউক।

প্রত্যাখ্যান।

শ্রীমতী—

১

রাণি! আসিবে কোথায়?—
"ইচ্ছা ক'রে ঘর ছাড়ি
থাকিগে' তোমারি বাড়ী"
কি লিখেছ প্রিয়সখি! দুঃখে হাসি পায়!
বিশাল বিশ্বের পর,
আছে কি আমার ঘর?—
আমার "ত্রিপাদভূমি" আছে কি ধরায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

২

রাণি! আসিবে কোথায়?
তুমি কি ভেবেছ মনে,
আমার ফুলের বনে,
যূথী জাতি বেলী ফোটে বাসন্তী উষায়?
ভেবেছ কি চন্দ্রাননে!
মোর মুক্ত বাতায়নে
হাসে চাঁদ উঁকি দিয়া, শারদী নিশায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

৩

রাণি! আসিবে কোথায়?—
ভেবেছ কি হরি! হরি!
যথা আমি বাস করি,
"ইজারা মহল" মোর তথা সমুদায়?—
হা পোড়া কপাল মম,
কাঙালে সম্রাট্ সম
গড়িতেছ, কবি যথা গড়ে কল্পনায়!
রাণি! আসিবে কোথায়?

৪

রাণি! আসিবে কোথায়?
মিছা দুষি' শত দোষে,
ভাই বন্ধু যারে রোষে,
নীরব অশ্রুতে যার বুক ভিজি যায়,
ভুলিছে যে নীতিতত্ত্ব—
"আত্মাদর, মনুষ্যত্ব"
অবস্থা, ব্যবস্থা তার ফোটে কি ভাষায়?
রাণি! আসিবে কোথায়?

৫

রাণি! আসিবে কোথায়?—
কহিতে তোমার কাছে
কি বাধা আমার আছে,
তুমি মম সুখস্মৃতি, জীবনে সহায়!—
মনে জে'ন বিধুমুখি,
আমি, চির দীন দুখী,
ভাসিতেছি ভবার্ণবে শেহালার প্রায়!—
শুনিতে হয়োনা ক্ষুণ্ণ—
আমিই আশ্রয়শূন্য,
নাহি মোর "ভদ্রাসন" বিশ্ব বসুধায়—
সে আমার কাছে রাণি, আসিবে কোথায়?

* * *

রাণি! আসিবে কোথায়?—
একদিন হবে বটে,
স্বর্গে—মন্দাকিনী-তটে,
শ্যামল সরল নব দেবদারু-ছায়;
নন্দন কানন থেকে,
আতর চন্দন মেখে,
বহে যথা ধীরে ধীরে সুমধুর বায়!
কাঞ্চন-কুরঙ্গগণ
সুখে করে বিচরণ,
ময়ূর আনন্দে নাচি মেঘ পানে চায়!
যেথানে ফণীর সনে,
ভেক সদানন্দ মনে
করে খেলা, হিংসা দ্বেষ জানে না যথায়,
যথা সবে চিরদিন,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্যহীন,
ঝড় ভূমিকম্পে দেশ বহিয়া না যায়!
যেথানে অসীম স্ফূর্ত্তি,
পবিত্রতা-প্রতিমূর্ত্তি
অমর অমরীগণ পুলকে বেড়ায়;
একদিন, সেই খানে—
সেই সুধামাখা স্থানে,
আমিও বাঁধিব ঘর, বিভুর কৃপায়;
তুমি যদি মনে রাখ,
দেখিতে ইচ্ছুক থা'ক,
আমার সে ঘর বাড়ী—যাইয়া তথায়
লয়ে যাব, নিমন্ত্রণ করিয়া তোমায়।
তোমার সেই "দিদি।"

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

দিনচর্য্যা অর্থাৎ দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রতিদিন কিরূপ আচরণ করিলে সুস্থ শরীরে কালযাপন করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভাব-প্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ বিধি লিখিত হইয়াছে।

যে প্রকার আহার ও আচরণাদি দ্বারা মানবগণের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, বৈদ্য তদনুরূপ আদেশ করিবেন। স্বাস্থ্য সকলেরই অভীপ্সিত, স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে জীবনধারণই বিষবৎ হইয়া উঠে। এই স্বাস্থ্যলাভের উপায় স্বরূপ যে দিন, রাত্রি ও ঋতুচর্য্যা লিখিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিলে নিশ্চয়ই সুস্থ থাকিতে পারা যায়।

যদি বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি, ধাতু ও মলের শমতা থাকে, শরীরানুরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায়। মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়কালের প্রথম দুই দণ্ডের মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখশান্তির জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে দধি, ঘৃত, দর্পণ, শ্বেতসর্ষপ, বিল্ব, গোরোচনা ও মালা দর্শন ও স্পর্শ করিবে। প্রত্যহ ঘৃতের ছায়ায় স্বকীয় বদন দর্শন করিতে পারিলে আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে। এই ঊষাকালেই মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে পেট ঢোকা, আধ্মান (ফোলা) ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মল মূত্রাদির বেগ কখনই ধারণ করিবে না, ধারণ করিলে উদরে গুড় গুড় শব্দ এবং নানা প্রকার বেদনা ও গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া প্রভৃতি জন্মে। বায়ুবেগ ধারণ করিলে মলমূত্র নীরোধ, উদরাধ্মান ও শরীরের ক্লান্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মূত্রবেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয় প্রভৃতিতে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরঃশূল, শরীরের নম্রতা এবং বঙ্ক্ষণদেশে আকর্ষণবৎ পীড়া হয়। এই জন্য মল মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে বিশেষ কার্য্যানুরোধেও ঐ বেগ ধারণ করিবে না, এবং বেগ উপস্থিত না হইলেও বলপূর্ব্বক অকালকুহুনাদি দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিতে চেষ্টা করিবে না। কিন্তু শোক, ভয়, ও ক্রোধ প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য। মলমূত্রাদি বিসর্জনান্তে গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে; ইহা দ্বারা শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং দেহ ও মন পবিত্র হয়। পরে হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিবে; ইহাতে শারীরিক পুষ্টিসাধন ও চক্ষুর হিত হইয়া থাকে। পরে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালন করিবে।

দন্তধাবন ও জিহ্বা বিলেখনের (জিব ছোলার) পর পুনঃ পুনঃ শীতল জল গণ্ডুষ করিবে। ইহাতে কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত ও মুখের অভ্যন্তর বিশোধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহই কটু তৈলাদির নস্য গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিবে। কিন্তু কফশান্তির নিমিত্ত প্রাতঃকালে, পিত্তশান্তির নিমিত্ত মধ্যাহ্নকালে, বায়ু নিবারণ জন্য সায়ংকালে নস্য গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ নস্য গ্রহণ করিলে মুখ সুগন্ধ, স্বর স্নিগ্ধ ও ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয়, এবং বলি পলিত ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইহার পর সৌবীরাঞ্জন (কাজল) নয়নে প্রয়োগ করিবে, ইহা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা এবং পরিশ্রান্ত, বমিরোগাক্রান্ত, ভুক্ত ও শিরঃস্নাত, এই সকল ব্যক্তি নেত্রাঞ্জন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

পাঁচ দিন অন্তর নখ, শ্মশ্রু, কেশ ও রোম কর্ত্তন করিবে, কারণ কেশাদির কর্ত্তন শোভাজনক, পুষ্টিকারক, পরমায়ুবর্দ্ধক, শুচিকারক, শরীরের কান্তিপোষক। নাসিকার লোম উৎপাটন করিবে না, এই লোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হয়। প্রত্যহ চিরুণি দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, যেহেতু কেশ প্রসাধন দ্বারা কেশের হিতসাধন হয় এবং তন্মধ্যস্থ ধূলি, ক্রিমি ও মল দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রত্যহ দর্পণে বদন দর্শন করিবে, এইরূপ দর্শন মঙ্গলকর, কান্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলবিধায়ক ও পরমায়ুবর্দ্ধক।

প্রতিদিন ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, কর্ম্মসামর্থ্য, বিভক্ত ঘন-গাত্রতা (অর্থাৎ শরীরের যে যে স্থানে সরু মোটা হওয়া উচিত, পুষ্টির সহিত তাহা সম্পন্ন হওয়া), দোষের নাশ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। বসন্ত ও শীত ঋতুতে ব্যায়াম করা বিশেষ উপকারী, এতদ্ভিন্ন অর্থাৎ গ্রীষ্মাদিতে যাঁহার যেরূপ বল, তিনি তাহার অর্দ্ধাংশ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবেন। যৎকালে হৃদয়স্থিত বায়ু মুখরন্ধ্র দ্বারা মুহুর্মুহু বহির্গত হইবে এবং মুখশোথ উৎপন্ন হইবে, কপাল, নাসিকা, গাত্রসন্ধি ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে, তখন অর্দ্ধশক্তি পর্য্যন্ত ব্যায়াম হইল বলিয়া জানিতে হইবে। ভোজনান্তে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে এবং কাশ, শ্বাস, ক্ষয়, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোথ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিশয় ব্যায়াম করিবে না। অত্যন্ত ব্যায়াম দ্বারা কাশ জ্বর, বমি, শ্রম, ক্লান্তি, তৃষ্ণা ও রক্তপিত্ত উৎপাদিত হয়।

শরীরপুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে হইবে, কিন্তু মস্তকে, কর্ণদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে বিশেষ করিয়া তৈল মর্দ্দন হিতকর। অভ্যঙ্গ বিষয়ে সর্ষপ তৈল, গন্ধতৈল ও পুষ্পবাসিত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ, ও শ্রান্তি দূর হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি বৃদ্ধি ও শরীরপুষ্টি হয় এবং শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। কেশবাহুল্য, কেশের দৃঢ়মূলতা, কোমলতা, দীর্ঘতা, কৃষ্ণবর্ণতা, এবং মস্তিষ্ক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রত্যহ কর্ণে তৈলপূরণ করিলে কর্ণরোগ, কর্ণে মল, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃশ্রুতি এবং বধিরতা উৎপন্ন হয় না। কর্ণে কোন রসাদি পূরণ করিতে হইলে ভোজনের পূর্ব্বে এবং তৈলাদি পূরণ করিতে হইলে সূর্য্যাস্তের পর হিতজনক হয়। পদাভ্যঙ্গদ্বারা পদদ্বয়ের স্থিরতা, নিদ্রা ও চক্ষুর প্রসন্নতা হয়। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ও পদাভ্যঙ্গ করিলে সহজে কোন পীড়া উপস্থিত হয় না। গাত্রে তৈল মর্দ্দন করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ইহাতে লোমকূপ শিরাজাল ও ধমনী দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে তৈলজলাদি প্রবিষ্ট হইয়া দেহের তৃপ্তি সম্পাদন এবং বল

বৃদ্ধি করে। যেরূপ মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে নূতন পল্লবাদি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ স্নেহসংসিক্ত গাত্রে অবগাহন স্নান করিলে মনুষ্যের রস রক্তাদি ধাতুসমূহ পুষ্ট হইয়া থাকে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী এবং যাহাকে বিরেচন বমন ও নিরূহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অভ্যঙ্গ ক্রিয়া অকর্ত্তব্য। উদ্বর্ত্তন কফঘ্ন, মেদনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং চর্ম্মের প্রসন্নতা ও কোমলতা-উৎপাদক।

কেদার ও অমলা।

(৩৮৯ সংখ্যা—৫৯ পৃষ্ঠার পর)

কেদার অমলার বিষয় আর না ভাবিয়া আমরুর পরামর্শে চলিতে লাগিল, এবং দুষ্কার্য্যের পর আরও দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইল। নিকটবর্ত্তী এক রাজা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, কেদার আমরুর এক বন্ধুকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল। এই বন্ধু পরাস্ত হইলে কেদার তাহার রাজ্যের অধিকাংশ হারাইল, সে তাহার সৈন্যগণকে অসন্তুষ্ট করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিল এবং গুরু করভারে প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিল, তাহা অপব্যয়ে উড়াইয়া দিতে লাগিল। অবশেষে আমরুর উত্তেজনায় প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কেদার তাহার রাজপ্রাসাদে অবরুদ্ধ হইল। আমরু কেদারের পক্ষ-সমর্থন করিবার ভাণ করিয়া তাহার রক্ষিগণকে আপনার হস্তগত করিয়া লইল, এবং আপনাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। কেদার এখন বুঝিতে পারিল তাহার হৃদয়ের বন্ধু আমরু কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক!

আমরু কেদারের প্রাণসংহারের উদ্যোগ করিল, কেদার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য একটু সময় লইল। তাহার পিতা এই রাজপ্রাসাদে একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারের চাবি কেদারের হস্তে ছিল। কেদার এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া প্রস্থান করিল। পথে চলিতে চলিতে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং হাজার হাজার দুশ্চিন্তায় তাহার প্রাণ আকুল হইতে লাগিল।

যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, তখন অমলা সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহাকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাহার পিতা মাতা মরিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া সে বিস্তর কাঁদিল, এবং পিতৃসম সাধু

মালিকে পরিত্যাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু মালি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া তিনি অমলাকে বলিলেন, আমার মৃত্যু হইলে সে কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। আমার পোষাক ও লম্বা দাড়ি তুমি পরিধান করিবে, এবং এই আশ্রমেই বাস করিবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন "অমলা তোমার জীবনে মহৎ ঘটনা সকল ঘটিবে।" তিনি অমলার নিকট গুপ্ত ধনের কথা বলিলেন, এবং কেদার তাহার পিতৃবন্ধুর অনুসন্ধান করিতে আসিলে কিরূপ আচরণ করিবেন তাহারও উপদেশ দিলেন। এইরূপে আপনার কর্ত্তব্য সকল শেষ করিয়া সাধু মালি প্রাণত্যাগ করিলেন। অমলা তাঁহার জন্য কাঁদিলেন, এবং তাঁহাকে সমাধিস্থ করিলেন। পরে তিনি তাহার পোষাক ও লম্বা দাড়ি পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি এমন ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন যে, তাঁহাকে বালিকা বলিয়া কাহারও কণা-মাত্র সন্দেহ হইল না।

কেদারের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার শিরশ্ছেদাজ্ঞা হইয়াছে, বন্ধু বান্ধব নাই, অনুচর নাই, সঙ্গে এক কপর্দ্দক সম্বল নাই। তখন তাহার পিতৃবন্ধু সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল, আর তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, গুরুতর বিপদ পড়িলে সাধু মালির আশ্রয় গ্রহণ করিও, এই কথা স্মরণ হইল। এখন তাহার সেই ঘোর বিপদের সময়, সে গোপনে আশ্রম পর্ব্বতের উদ্দেশে চলিল। সৈন্য সকল তাহার পশ্চাতে ধাবমান, সে এক ফকিরের ছিন্ন কন্থা লইয়া আপনার মূল্যবান্ পরিচ্ছদ তাহাকে দিল। পথে এক কৃষকের কুটীরে রাত্রি যাপন করিল। কেদারের রাজ্য সম্পদ্ গিয়াছে, ইহাতে সেই কৃষক পরিবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে, যাত্রাকালে সে শ্রবণ করিল। তাহার গর্ব্ব এককালে চূর্ণ হইয়াছে, সে এখন অতি দীনবেশে শৈল-শিখরে আসিয়া উপনীত হইল।

বুদ্ধিমতী অমলা সদয়ভাবে কেদারকে অভ্যর্থনা করিল। সে কেদারকে চিনিয়াছে, কিন্তু কেদার তাহাকে চিনিতে পারে নাই। যুবক আপনার দুরবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক তাহার নিকট বর্ণন করিল, এবং প্রিয় মেষপালিকার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে, ইহারও উল্লেখ করিল। অমলার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত। সে মনে মনে কেদারের চরিত্রশোধনের জন্য উপায় স্থির করিল। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। ছদ্মবেশী বালিকা তাহাকে অনেক জ্ঞানোপদেশ দিল, এবং প্রতিবেশী হাতেম নামক যে রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অধীনে সৈনিক হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিল। বালিকা বলিল, "বীরত্বের কার্য্য করিয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা কর; যখন বাহুবলে প্রভুর অনুরাগভাজন হইবে, তখন আপনার পূর্ব্ব পরিচয় দিবে।

তাঁহার সাহায্যে হৃত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পার। এই বলিয়া বালিকা তাহার হস্তে কিছু অর্থ দিল, কেদার সেই অর্থ সম্বল করিয়া সৈনিকবৃত্তি গ্রহণার্থ যাত্রা করিল।

কেদার সৈনিকদলে প্রবেশ করিল। তাহার অসীম সাহস ছিল, মহাবীরত্বের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিল। উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করিতে লাগিল এবং আপনার ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রদর্শনে সমর্থ হইল। কিন্তু তাহার অভ্যুদয়ে রাজমন্ত্রীরা ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং রাজদৃষ্টি হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহার প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার হইতে লাগিল। প্রাপ্য পুরস্কার সকল হইতে সে বঞ্চিত হইল—এক কথায় ক্ষুদ্রাশয় লোকদিগের চক্রান্তে গুণবান্ লোকে যে উৎপীড়ন সহ্য করেন, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। অবশেষে কেদার মহা বিরক্ত হইয়া সৈনিককার্য্য পরিত্যাগ করিল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত সন্ন্যাসীকে বলিতে গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি যখন রাজা ছিলে, তখন গুণবানের প্রতি ঠিক্ এইরূপ ব্যবহার করিয়াছ।" কেদার আত্মদোষ স্বীকার করিল এবং এখন স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া অত্যাচারীর দোষ কত গুরুতর তাহা বুঝিতে পারিল। সন্ন্যাসী তাহাকে বাণিজ্য করিতে উপদেশ দিলেন এবং ব্যবসায় আরম্ভের জন্য যে মূলধন আবশ্যক, তাহা তাহার হস্তে প্রদান করিলেন।

কেদার বাণিজ্য উদ্দেশে বোগদাদ নগরে গমন করিলেন। তাহার প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন হইল, সে অল্প দিনে মহা ধনশালী হইয়া উঠিল। এক ধনাঢ্যা বিধবা তাহার সহিত বিবাহিত হইতে চাহিল। কিন্তু কেদারের হৃদয়ে মেষপালিকার কথা জাগিতেছে,তাহার সহিত পুনর্ম্মিলনের আশায় সে নিরাশ হয় নাই, সুতরাং বিধবার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। কালিফের অর্থের প্রয়োজন, কেদার তাহাকে অনেক টাকা ধার দিল, টাকা ফিরিয়া না পাওয়াতে দেউলিয়া হইল। বাণিজ্যের প্রতিকূল আইন সকল বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহার সর্ব্বনাশ হইল। সে আবার সন্ন্যাসীর নিকট আসিল। সন্ন্যাসী তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন "তুমিও ত যখন রাজা ছিলে, তখন বাণিজ্যের সপক্ষ ছিলে না।" কেদার পূর্ব্ব প্রণয়ের অনুরোধে ধনাঢ্যা রমণীর পাণিগ্রহণ করিল না, তাহার এই মহত্ত্ব ভাবিয়া বালিকার প্রাণ মুগ্ধ হইল এবং তাহাকে আর দূরদেশে যাইবার পরামর্শ দিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। সন্ন্যাসী তাহাকে কৃষিকার্য্য করিতে বলিলেন। নিকটে কৃষিকার্য্যের উপযোগী উত্তম ভূমি, কৃষি যন্ত্র ও গোমেষাদি পশুদল কিনিয়া দিলেন। তাহার কার্য্যের সকল সুব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "একদিন অন্তর ক্ষেত্রে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

কেদার কৃষিকার্য্যে এক প্রকার সুখী হইল। সে দেখিল যেমন পরিশ্রম করে, সেই পরিমাণে ফসল পায় ও তাহার লাভের

অঙ্ক ক্রমে বেশী হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? শ্রমজীবীদিগের মজুরী ও রাজকর দিতে এবং রাজকর্ম্মচারী ও ক্ষমতাশালী প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট করিতে তাহার প্রায় সমুদায় আয় নিঃশেষিত হইয়া যায়। কেদার সন্ন্যাসীর নিকট এই সকল দুঃখ জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিলেন "দেশের এরূপ আইনের কর্ত্তা ত তুমি।" যাহা হউক, কেদার অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা কৃষিকার্য্য পছন্দ করিল। এই অবস্থায় তাহার মেষপালিকাকে পাইলে আর তাহার কোন অভাব থাকে না। সন্ন্যাসীর নিকট সে সেই বালিকার কথা সর্ব্বদাই বলে। এক দিন সন্ন্যাসী বলিলেন "সেই বালিকার সহিত তোমার পুনর্ম্মিলন করিয়া দিব।"

বালিকার সহিত কেদারের সাক্ষাতের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন "যে বনপ্রদেশে বালিকার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় যাইলে তাহার সহিত আবার সাক্ষাৎ হইবে।" অমলা সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্ববেশে বনপ্রদেশে গিয়া প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয়ে প্রগাঢ় স্নেহে পরস্পরের সহিত পূর্ব্বের মত মিষ্টালাপ করিল। কেদার অমলাকে তাহার সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিল। অমলা বলিল "উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই;" কিন্তু তাহাকে পাণিপ্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। পরে তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইল এবং পুনরায় একদিন সেই স্থানে আসিয়া মিলিত হইবে স্থির করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

ঋতু হরীতকী।

বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরিতকী সেবন করিতে হয়। ইহাকে হরীতকী রসায়ন বা ঋতু হরীতকী বলে।

পঞ্চতৃণ মূল।

কুশমূল, কেশমূল, শরমূল, বেণামূল ও কৃষ্ণ ইক্ষু মূল এই পাঁচটীর মিলিত নাম পঞ্চতৃণ মূল। প্রত্যেকটী সম পরিমাণে লইতে হইবে।

ত্রিকটু।

শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের মিলিত নাম ত্রিকটু।

ত্রিফলা।

হরীতকী, বহেড়া ও আমলা ইহাদের মিলিত নাম ত্রিফলা। একটী হরীতকী, দুইটী বহেড়া ও চারিটী আমলা বীজ-

রহিত করিয়া ঔষধ সেবনের বার ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী মৃৎ, পাথর বা কাচ পাত্রে এক ছটাক আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাই ত্রিফলা ভিজান জল।

প্রস্রাব সরল করিবার দ্রব্য।

স্থলপদ্মের পাতার রস, কুশমূল, কেশে-মূল, শরমূল, বেণামূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল, পাথরকুচি, সোরা ভিজার জল, কাবাব চিনি, গোক্ষুরবীজের বা পরগাছার অথবা আঁকড়মূলের ক্বাথ ইত্যাদি।

প্রস্রাব কমাইবার দ্রব্য।

যজ্ঞডুমুরের বীচির গুঁড়া, মোচার রস, ঝিঞা পোড়ার রস, তেলাকুচার মূলের রস, জামের বীচির গুঁড়া, অশ্বত্থ ছাল ইত্যাদি।

প্রমেহ ও প্রদরনাশক দ্রব্য।

গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কচি শিমূল-মূলের রস, শ্বেত চন্দন ঘসা, অশ্বগন্ধা চূর্ণ, গঁদ ভিজার জল, কদমছালের রস, কেশুরের রস, গাব ভিজার জল; যজ্ঞ-ডুমুরের রস প্রভৃতি।

রজঃ প্রবর্ত্তক দ্রব্য।

মুশব্বর, বাঁশের নীল, ঈশলাঙ্গলা, উলট্ কম্বল, জবাপুষ্প, লতা ফটকীর পাতা, প্রভৃতি।

রজোরোধক দ্রব্য।

অশোকছাল, কুরচি ছাল, রক্ত চন্দন, গাবছাল, লাক্ষা প্রভৃতির ক্বাথ। কাঁটা-নটের মূলের বা রক্তোৎপলের মূলের রস, আয়াপানা কেশুরিয়া প্রভৃতি দ্রব্যের রস।

অগ্নিমান্দ্য-নিবারক দ্রব্য।

মৌরি, যবানী, বনযবানী প্রভৃতি দ্রব্যের ভিজান জল ও পিপুল, পিপুল মূল, মরিচ, চই, শুঁঠ, হিং প্রভৃতি।

ক্রিমিনাশক দ্রব্য।

বিড়ঙ্গ অথবা ডালিমের মূল সিদ্ধ জল ও মধু এবং আনারসের কচি পাতা, বা ঘেঁটু পাতার রস ও মধু, শজিনা, নিসিন্দা পত্রের রস।

বায়ুরোগনাশক দ্রব্য।

ত্রিফলা ভিজার জল, শতমূলীর রস, ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস, আমলা ভিজার জল প্রভৃতি।

বল ও শুক্রবৃদ্ধিকারক দ্রব্য।

মাখন, দুগ্ধের সর, দুগ্ধ, বেড়েলা; আল-কুশী, ভূই কুমড়া, অশ্বগন্ধা, শিমুলমূল, অনন্তমূল।

শোথ নাশক।

বিল্বপত্রের রস, শুষ্ক মূলার ক্বাথ, পুন-র্নবার ক্বাথ, গোলমরিচ চূর্ণ প্রভৃতি।

পিত্তনাশক ও দাহনিবারক।

পলতা, নালিতা, ধন্যা, অনন্তমূল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল প্রভৃতির কাথ, হেলেঞ্চা, গুলঞ্চ, বেঁতের ডগা প্রভৃতির রস।

খৈচুর বা চাঁপা প্রস্তুত করিবার প্রকরণ।

টাট্‌কা খৈ	১২ রেক
দোবারা চিনি	৵১৷৷ দেড় সের
ছোট এলাচ গুঁড়া	১ এক তোলা
মরিচের গুঁড়া	১ এক তোলা
কর্পূর	সম্ভব মত অল্প

প্রথমে টাট্‌কা খৈগুলিকে ধান হইতে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে।

চিনির একবন্দ তার রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ খৈ ঢালিয়া অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ঐ রস সকল খৈগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তাহা চটকাইয়া চূর্ণ করিয়া পাত্রে রাখিবে। অবশিষ্ট চিনি লইয়া তিন তার বন্দ রস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এই চূর্ণ খৈ নিক্ষেপ করিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে হইবে, এবং ক্রমে ঘি, এলাচগুঁড়া, মরিচগুঁড়া তাহাতে মিশাইতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে তাহা শক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কর্পূর দিয়া নামাইয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে তাহা যেরূপ ইচ্ছা সেই রূপ গড়িয়া লইবে। ইহাতে চাঁপা ও খৈচুর দুই প্রকার করা যায়। খৈচুরে মোটা চিনির দানা উপরে দিলে আরও মিষ্ট বেশি হয়

দেখবালা সেন।

হেঁয়ালী।

আষাঢ়ের হেঁয়ালীর উত্তর।

দিদিমণি, শুন শুন শুন একবার।
একে একে করি সব উত্তর ধাঁধাঁর॥

১। অর্দ্ধভাগ শালবৃক্ষে অর্দ্ধভাগ গ্রামে;
তুমিহে হিন্দুর দেব, "শালগ্রাম"নামে।

২। "মৈ" অর্থে সিঁড়ি, নাক যোগ দিলে তায়,
"মৈনাক" এ পদ হয় নাহিক সংশয়।
গিরিরাজপুত্র বটে আকারে পর্ব্বত,
হলো কি উত্তর মম, তব মনোমত?

৩। "পিপা" হয় সুরাধার "পিপাসা" মাঝার,
"পিপাসার" অর্থ—পান তরে হাহাকার
প্রথম তৃতীয় বর্ণে করিলে মিলন,
পিপাসনে বাস তার হয় সম্পাদন।
মধ্য বর্ণ "পা" তার অর্থ "পদ" হয়,
সমস্যা পূরণ ইথে নাহিক সংশয়॥

৪। "পাবক" নামটী তব,
'পা' ছাড়িলে হও "বক"
পক্ষী এক ধবলবরণ।
খেতে পার সর্ব্ব বিশ্ব,
পরিপাকে সর্ব্ব ভস্ম,
আরো ভয় থাকিলে পবন।
"পা" দিয়ে সর্ব্বত্র যাই,
"পাক" করে সব খাই,
রসনায় লাগে সুমধুর,
"পাব" এই আশা পেলে
আহ্লাদেতে যাই গলে,
কিন্তু প্রাপ্তি বড়ই সুদূর।

শ্রীমতী সুবর্ণবালা দেবী।

শ্রাবণের হেঁয়ালী।

আদি অন্ত্যবর্ণযোগে নরম পশম,
মধ্য শেষে প্রহারয় যেন বজ্রসম,
আদি মধ্য যোগে বমনের অনুভব,
কে আমি ত্রিগুণধারী ত্রিবর্ণ-সম্ভব ? ১
অস্ত্র লয়ে ফিরে প্রভু ক্ষীণ-কলেবর,
নারী নরে তার ডরে কাঁপে থর থর।
ধড় ফেলে প্রভু যবে দেন দরশন,
চিহ্নিত ডাকাত চোর আপনি তখন। ২
আমার সঙ্গেতে রণ আদর-কারণ।
সাথে মোর রাতে যাহা অদৃষ্ট লিখন,
গলদেশ ধরি আমি অধোদেশে যাই,
মনের সহিত আমি উগারি যা খাই। ৩
আদি বর্ণ ছাড়িলে বিশাল তরুবর,
অন্ত্যবর্ণ ত্যজিলে পতঙ্গ-কলেবর,
মধ্যবর্ণ ত্যজিলে না ছোঁবে তুমি ভাই,
"মুস্কিলে আসান" আমি নামটী সুধাই।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল-মধ্যে ব্রিটিষ রাজ্যে মুক্তিফৌজের ন্যায় ২৯০টী ধর্ম্মসম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে।

২। ১২ই জুন হইতে অদ্যাপি আসাম, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমি-কম্প হইতেছে। মধ্যে গত ২রা আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৯টার সময় কলিকাতাতেও কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

৩। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাবড়া আমতা রেলওয়ে লাইন সম্পূর্ণ হইবে।

৪। আয়র্লণ্ডবাসীরা হীরক জুবিলী উৎসবে ভাল করিয়া যোগদান করে নাই। তাহাদের উপর বহুকালব্যাপী ইংরাজ অত্যাচার তাহাদের হৃদয়কে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

৫। রাজদ্রোহী বলিয়া পুনা নগরের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন:—মাননীয় বাল গঙ্গাধর তিলক, সর্দ্দার বলবন্ত রাও নাটু ও হরিপন্থ নাটু ভ্রাতৃদ্বয়, কেশব মহাদেব বল এবং শঙ্কর বিশ্বনাথ কেলকার। ইহাঁদের প্রতি কিরূপ বিচার হয় বলা যায় না। এই ঘটনায় দেশব্যাপী এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

৬। গত ১২ই আগষ্ট বেথুন সাহেবের ৪৬ সাংবৎসরিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ও ছাত্রীগণ এবং আরও কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি সমবেত হইয়া সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বেথুনের গুণ-কীর্ত্তনপূর্ব্বক উৎসব করেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

প্রথমশিক্ষা শরীর বিজ্ঞান—শ্রীযদু নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এম বি প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। শরীরের তত্ত্ব জানা শরীর-ধারী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে সহজ পুস্তক না থাকায় এ দেশের অধিকাংশ লোকে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। যদু বাবু এই অভাব পূর্ণ করিয়া এ দেশের একটী মহোপকার করিয়াছেন। পাঠিকা-গণের ইহা অবশ্য পাঠ্য।

শুশ্রূষা, প্রথম ভাগ—শ্যামাচরণ দে প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। এ পর্য্যন্ত রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে যত পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইল। ইহাতে জানিবার বিষয় অনেক আছে। গর্ভিণীর শুশ্রূষা ও শিশুপালনসম্বন্ধে দুই এক অধ্যায় থাকিলে ইহা পূর্ণাঙ্গ হইত। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ হইয়াছে। দুর্ঘটনা ও মুষ্টিযোগ প্রকরণ বিশেষ উপকারী। প্রত্যেক গৃহে এরূপ পুস্তক থাকা আবশ্যক।

*** অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা আগামী বারে প্রকাশ্য।

বামারচনা।

খোকা আমার।

কোথা হতে এ'লে তুমি, কোথা তব জন্মভূমি,
কি বারতা শুনাতে আসিলে ?
নিরমল মুখজ্যোতি, মনোহর প্রতিকৃতি,
হেনরূপ কোথায় পাইলে ?
তুমি কি আসিলে মর্ত্ত্যে, সুখের স্বরূপ হ'তে,
দূত হয়ে স্বর্গীয় পিতার ?
সেথা সুখ, সেথা শান্তি, নাহিক ভবের ক্লান্তি
দিতেএই সুখ সমাচার।
আহা কি মধুর হাসি, নাশে ঘন মেঘ-রাশি
আশা-স্রোতে ভাসে হৃদি-তরী,
হয়েছিল মগ্ন জলে, পুনঃ কি মোহন বলে,
কূল দিলে অকূল-কাণ্ডারী।
তোমার করুণা-স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
নিজ দোষে আমি দুঃখ পাই ;
পাপী আমি দীন হীন, তোমার প্রেমের ঋণ
শুধিব কেমনে ? ভাবি তাই।
শোকেতে হৃদয় ভগ্ন, মায়া মোহে অবসন্ন,
নাহি শক্তি নাহিক সহায় ;
(শিশু) করিবে কি এই শূন্য হৃদয় আমার পূর্ণ
কুলাবে কি ক্ষুদ্র ক্ষমতায় ?
কালের প্রবল বায়, নিবাল প্রদীপ হায়,
ঘেরিল চৌদিকে তম ঘন ;
জুড়াতে এ দগ্ধ হিয়া, আশার সলিতা দিয়া,
আলোকিলে সেই দীপে পুনঃ।
ধার না কাহার ধার, ভবের দুঃখের ভার,
বিচলিতে নারে তব চিত ;
নির্ভয়ে মনের সুখে, থাক তুমি মার বুকে,
মা মা বলে ডাক অবিরত।
এমন দুর্লভ ধন, দীননাথ দয়াঘন,
তোমা হতে লভিনু যখন,
সমুচিত সমাদরে, যেন এই অতিথিরে
সাধ্যমত সেবি অনুক্ষণ।
মাকে সব ভার দিয়ে, মাতৃগতপ্রাণ হ'য়ে
তাঁর কোলে থাকিব নির্ভয়ে।
সরল বিশ্বাস ভরে, ভবনদী যাব ত'রে
সম্বল অভয় নাম লয়ে।

মধুর প্রকৃতি ছায়া, ছিন্ন করে মোহমায়া,
পড়ে যবে এ পাপ জীবনে,
সহজেই মন টানে, জগত-জননী পানে,
নাহি ভুলে মায়ার ছলনে।

এমন সুন্দর ছেলে, তুমিই আমারে দিলে,
সঁপি তারে আজি তব পায়;
সুমতি সুবুদ্ধি পেয়ে, পিতার সুপুত্র হয়ে,
যেন সদা তব গুণ গায়॥—মে।

কে তুমি ?

দয়াময় বলিব তোমায়
হৃদয়ের নিগূঢ় সন্ধান;
শোকে তাপে তাপিত হৃদয়—
নাহি মম বলিবার স্থান। ১
দুঃখে দুঃখী হয়ে এ সংসার
শুনে নাকো বিলাপ রোদন,
হয় হোক্ ভাই ছারখার
ভাই চেয়ে দেখে না কখন। ২
আছে এক বিবশ হৃদয়—
নিবেদিবে অন্তর-যাতনা,
তুমি না শুনিলে দয়াময়
কে শুনিবে প্রাণের প্রার্থনা? ৩
সুগভীর বিচিত্র রচনা
জলে স্থলে অসীম গগনে,
বিচারিয়া না পাই তুলনা
ভেসে যাই অনন্তের সনে। ৪
কে তুমি কি তুমি? চিতে ভাবি,
কোথা থেকে রচ এ সকল
মম বর্ত্তমান ভূত ভাবী
গড়িয়াছ করি কি কৌশল! ৫
শরীরে অন্তরে সর্ব্বব্যাপী
গতি তব অদ্ভুত ব্যাপার;
বিজনে গড়েছ বিশ্বছবি
সুদর্শন অচিন্ত্য অপার। ৬
আত্মতত্ত্ব বুঝি না কেমন
তুমি দেব, সদা আত্মগত;
আত্মামাঝে দেও দরশন
মিলে যদি আত্ম-মনোনীত। ৭
তুমি আমি—মধ্যে যবনিকা
এ সংসার; কোন অভিজ্ঞতা
নাহি—মোহ-সংহারিকা,
হতে প্রভু সংসার-অতীতা। ৯
সংসার এ কিবা অপরূপ
গূঢ় মর্ম্ম ভিতরে নিহিত,
উথলে ভাবুক-ভাব-কূপ,
দেখে শুনে হই চমকিত। ৯
পিতা, তব তত্ত্ব তত্ত্বাতীত,
ভাবচয় নিগূঢ় গভীর,
নির্গুণে সগুণে—পরাজিত
বুদ্ধি মন করিবারে স্থির। ১১
সুধাতে এসেছি আজ তাই
অচ্যুত অনন্ত লীলাময়!
কেবা তুমি কোথা তব ঠাঁই,
বলে তৃপ্ত কর এ হৃদয়।

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।

কি চাহিব ?

না চাহিতে সবি পাই
বল কি চাহিব আর ?
বুকভরা আশা আছে
নয়নেতে অশ্রুধার।
হৃদে আছে ভক্তি-নদী,
প্রাণে আছে হাহাকার।
পূরাতে গভীর তৃষা
দেছ প্রেম পারাবার।
পূর্ণিমার স্নিগ্ধ রেতে
দিয়েছ অমৃতরাশি,
অন্ধকার অমানিশা
বসন্তে ফুলের হাসি।
প্রকৃতির মধুরিমা
নির্ঝরের বারিধার

কি চাহিব এর চেয়ে
তোমার নিকটে আর ?
বিরহ বিচ্ছেদে যবে,
ভেঙ্গে চুরে যায় প্রাণ,
সঙ্গীতের সুধা দেছ
গাইতে পবিত্র নাম।
পিতা, মাতা, ভাই বোন
সবিত পেয়েছি নাথ!
ভালবাসা, স্নেহ প্রেম,
তাওত তোমারি হাত।
চারি দিকে চাই, হেরি
অভাব কিছুই নাই,
অন্তিমে এ ভিক্ষা মাগি
যেন ও চরণ পাই।

হ'ল কিবা ভুল ?

এ জনমে ঘটেছিল সেই এক ভুল।
স্মরণে পরাণ সদা করয় আকুল।
মোহের সুষুপ্তিভরে ছিনু অচেতন,
সেই ঘুম ঘোরে এক দেখিনু স্বপন।।
স্বরগের আভা যেন তথা পরকাশে,
দেবের তনয় এক মর্ত্ত্যে নেমে আসে,
মরি! কি সৌন্দর্য্য তার কনকবরণ,
অমিয়-মাধুরী-ভরা তরুণ তপন।
নিরখি সুন্দর শিশু মন লয় হরি,
রোমাঞ্চিত-কায় আমি তাহারে নেহারি।
কি ভাব হইল তার আমার উপর,
মায়ারূপে উপনীত নিকটে সত্বর।
সাধের বাসনা পূর্ণ হলো অকস্মাৎ,
পরাণে বহিল কত ঘাত প্রতিঘাত!
সহসা ভাঙ্গিয়া গেল স্বপনের ভুল।
অকালে তপনতাপে ঝরিল মুকুল।
কোন্ দোষে ত্যজে শিশু করিয়ে আকুল,
এখনো বুঝিতে নারি হ'ল কিবা ভুল॥

শ্রীস—দেবী,
বেনারস।

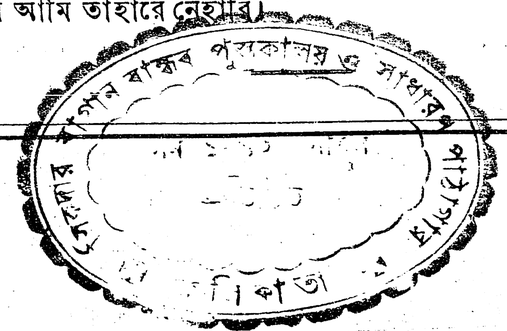

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিক নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন? এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্‌বুক্‌ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল্‌ টেক্‌ষ্ট্‌-বুক্‌ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা পর পর বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা,
১লা জুলাই ১৭৯৭

সি. এ, মার্টিন,
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

No. 392. September, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯২ সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩০৪—সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭। ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

বামাবোধিনীর পঞ্চত্রিংশ জন্মোৎসব।

যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় আয়ুষ্মতী বামাবোধিনী ৩৪ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩৫ বর্ষে পদার্পণ করিল, আজি সেই পরম দেবতার চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে ও ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বামাবোধিনী ইহার গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকা ও হিতৈষী বন্ধুগণকে সাদরে অভিবাদন করিতেছে, ইহার এই শুভ জন্মদিনে তাঁহারা সকলে আনন্দ করুন্‌ এবং ইহার সহিত একহৃদয় হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যেন এই পত্রিকা নূতন বৎসরে নূতন উদ্যমের সহিত দেশীয় ভগিনীগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনার জীবনকে ধন্য করিতে পারে।

আমরা বর্ষে বর্ষে নারীজাতির উন্নতির আলোচনা করিয়া বামাবোধিনীর জন্মোৎসব করিয়া থাকি, এ বৎসরও সে বিষয়ে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। দেশে বিদেশে নারীজাতির জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা, গুণগৌরব ও কার্য্যশক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহাদের অধিকারও সমাজের উপর অধিকতর বিস্তৃত হইতেছে। গৃহে রমণীর সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আবার ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, সমাজনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা দিন দিন পুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়া সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে গঠন করিতে তাঁহাদিগের প্রধান সহায় হইতেছেন। এ বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা—একটী রমণী পৃথিবীর এক সভ্যতম জাতির সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধির সহায় হইয়া পূর্ণ ৬০ বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে তাঁহাদিগের উপর রাজত্ব করিলেন। ইতিহাসে এ ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

গৌরবে কোন্ রমণী না গৌরবান্বিতা হইয়াছেন ?

ঈশ্বরপ্রসাদে বামাবোধিনী এ বৎসর বর্দ্ধিতকলেবরে প্রকাশিত হইয়া আপনার উন্নতির পরিচয়দানে সমর্থ হইয়াছে। গ্রাহকগ্রাহিকাদিগের অনুগ্রহই এ উন্নতির এক প্রধান কারণ। বামাবোধিনীর উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি সাধনের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব, আশা করি তাঁহারাও আমাদিগকে অধিকতর সহায়তা ও উৎসাহ দান করিতে বিমুখ হইবেন না।

পরিশেষে বামাবোধিনীর অবলম্বিত ব্রতসাধনে যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী বিশেষ সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। আমরা দেখিতেছি ক্রমে অধিকসংখ্যক ভগিনী বামাবোধিনীর সহিত সমহৃদয় হইয়া ইহার কার্য্যক্ষেত্রে খাটিতে এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ঈশ্বর করুন, বিদেশীয় সুশিক্ষিতা মহাপ্রাণা রমণীদিগের ন্যায় এ দেশের মহিলাগণও আপনাদিগের কর্ত্তব্যভার আপনাদিগের মস্তকে লইয়া যেমন গৃহ পরিবার ও স্বজাতির উন্নতি সাধন করিবেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে তাঁহাদের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের সহায় হইতে পারেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জীবসৃষ্টি—লর্ড কেলবিন লণ্ডনের কোন স্থানে বক্তৃতা করিতে করিতে বলেন, প্রায় ৩ কোটী বৎসর হইল পৃথিবী জীবের আবাসভূমি হইয়াছে। ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, এই মত ক্রমে অগ্রাহ্য হইতেছে।

আগ্নেয় গিরি—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মেয়ন নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত গত জুন মাসে আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে ১২০ ব্যক্তির সহিত একটী গ্রাম ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয়—জাপানের ওমস্কো নামক নগরে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকায় শিক্ষিত কয়েকটী জাপানী ইহার উদ্যোগকর্ত্তা। এক্ষণে জাপানে ২টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাতে রমণীর প্রবেশাধিকার নাই।

শিক্ষার ব্যয়—প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট কলেজে এক একটী ছাত্রকে শিক্ষা দিতে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ বার্ষিক ব্যয় হয়ঃ—

কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ২২৩, মান্দ্রাজে ২৭৬, বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজে ২৪৩, উত্তর পশ্চিম মুইর সেণ্ট্রাল কলেজে ৯৯, লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজে ২৯৫, মধ্যভারত জব্বলপুর কলেজে ১৬৫ এবং ব্রহ্ম রেঙ্গুণ কলেজে ৮৯৫ টাকা।

ইহার তুলনায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যয় এখনও সামান্য।

স্ত্রী উকীল—কুমারী মেটিল্ডা কোহেন এম, এ, কলিকাতা হাইকোর্টের আটর্ণি হইবার প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, জজেরা একমত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সময় আসিবে যখন অবলাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ বৃথা আপত্তির স্থল থাকিবে না।

সীমান্তে যুদ্ধ—আফ্রিডিস নামক অসভ্য জাতির প্রায় দশ সহস্র লোক ইংরাজের বিরুদ্ধে অসমসাহসে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে। সিংহের নিকট পতঙ্গ কতক্ষণ যুঝিবে? কুচবিহারের মহারাজা ইংরাজপক্ষের একজন সেনাধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন।

ছোট লাটের অসুস্থতা—ছোট-লাট-প্রতিনিধি সি সি ষ্টিভেন্স শাসনকার্য্যভার গ্রহণাবধি দেশবাসীদিগের কল্যাণার্থ যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। হাঁটুতে আঘাত লাগিয়া তিনি বাহির হইতে পারিতেছেন না, শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

কাবুলের আমীর—তুরস্ক কর্ত্তৃক গ্রীসের পরাজয়বার্ত্তা শুনিয়া আমীর তুরস্কের সুলতানের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ সংবাদপত্রের বিশ্বাস, তিনি সুলতানের অধীন হইয়া ইংরাজ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

দুর্ভিক্ষ-সাহায্য—সিটি অব এবারেট নামক তিমিঙ্গিসাকৃতি মার্কিণ জাহাজ গম লইয়া খিদিরপুরে পৌঁছিয়াছে। ডাক্তার থোবরণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যার্থ এই খাদ্য আনিয়াছেন। বিলাত হইতে ১ কোটীর অধিক টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রিন্স রণজিৎ সিং—যে রণজিৎ ক্রিকেট খেলায় বিলাতের ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া মহাখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার ভূসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বঙ্কিম-স্মৃতিচিহ্ন—স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একখানি অয়েল পেইণ্টিং ছবি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে ও আর একখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে স্থাপিত হইয়াছে।

নরনারীর সাম্য।

সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়ী। কোন দুইটী সৃষ্ট পদার্থ এক প্রকার নহে। সমান আকার ও সমান প্রকৃতির দুইটী মনুষ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এক এক শ্রেণীর মধ্যে আবার কত বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। কতকগুলি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া তাহাদিগকে একটী শ্রেণীর

অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, এক শ্রেণীর অন্তর্গত কোন বস্তুরই সহিত কোন বস্তুর সম্পূর্ণ মিলন নাই। প্রত্যেকেরই কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা আছে। বৈচিত্র্যই সৃষ্টির এক অদ্ভুত রহস্য!

আমাদের এই মানবজাতির কথাই ধরা যাউক। মানবজাতি বলিলে মানব-দেহধারী পৃথিবীর সুসভ্য হইতে অসভ্য সকল ব্যক্তিকেই বুঝায়। এই মানব-জাতির মধ্যে সুসভ্য ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, হিন্দু, চীন ও তুর্কী আছে; আবার অসভ্য কোল, ভীল, হটেণ্টট্ ও বন্যজাতিও আছে। সকলেই মানবপদ-বাচ্য; সকলেরই আকারে ও প্রকৃতিতে এমন কতকগুলি সাদৃশ্য আছে, যদ্দ্বারা তাহারা মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কি অসভ্য হটেণ্টট্‌কে সুসভ্য ইংরেজের সমান বলিবেন?

মানবের মধ্যে আবার দুইটী বিভাগ আছে। কতকগুলি মানব পুরুষজাতীয়, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয়। নিকৃষ্ট জন্তুগণের মধ্যেও এইরূপ বিভাগ আছে। পুরুষ ও স্ত্রীর শারীরিক গঠন ও আকারে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। আকার ও গঠন দেখিয়াই পুরুষ হইতে স্ত্রীলোক বাছিয়া লওয়া যায়। উভয়েই মানব-পদ-বাচ্য হইলেও, উভয়ে একরূপ নহে; একজন পুরুষ, অপর জন স্ত্রী। এই পার্থক্য এরূপ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক যে, শিশুরাও তাহা বুঝিতে পারে।

এক অবস্থারূঢ় দুইটী পুরুষকে যদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্নরূপে বিকশিত হয়। দুইটী সহোদরের মধ্যে একটী যদি সমরবিদ্যায় পটু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সাহস, বীরত্ব ও কঠোরতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণের বিকাশ হইবে। অপরটী যদি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধর্ম্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে বিনয়, সদাচার, লোক-হিতৈষিতা, পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কতকগুলি মহদ্‌গুণের বিকাশ হইবে। এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন গুণের বিকাশ জন্য তাহাদের বাহ্য আকারেও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। একজনকে গর্ব্বিত, দাম্ভিক, বীর, ক্রোধী ও ভয়ঙ্কর মনে হইবে; অপরকে শান্ত, প্রসন্ন, গম্ভীর, স্থির ও প্রিয়দর্শন মনে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র মানুষের মধ্যে এমনই পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে!

যদি এক শ্রেণীর ও এক অবস্থার দুইটী মানুষের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্নতানুসারে এরূপ প্রকৃতি ও আকারগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের দুইটী মানবের মধ্যে যে বিস্তর বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আবার যেখানে এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক, সেখানে আমাদের আর কি বলিবার আছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরনারীর শারীরিক

আকার ও গঠন বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জন্ম হইতেই এই বিভিন্নতার উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এই বিভিন্নতা সৃজন দ্বারা তাঁহার এক মহদুদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছেন। কেহই এই বিভিন্নতাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যদি তাহাই হইল, তবে এখন বুঝিতে পারিবেন যে, এই শারীরিক আকার ও গঠনের বিভিন্নতা পুরুষ ও স্ত্রীর কর্ম্মক্ষেত্র বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে, এবং এই বিভিন্নতাই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এ অধীনতা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধীনতা নহে; ইহা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব! এ অধীনতায় স্ত্রীজাতি সামান্য ও নিকৃষ্ট অধিকার ত্যাগ করিয়া মহৎ ও উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন! নারী মনুষ্যের পদবী হইতে দেবতার পদবীতে উন্নীত হইয়াছেন; গৃহের ও সমাজের সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে পূজিত হইতেছেন, মানবকে আত্মত্যাগ ও উন্নত ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং সংসারকে অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতেছেন। এই সামান্য বিভিন্নতার জন্যই পুরুষ চিরকালের তরে নারীজাতির নিকট হীন ও পরাজিত হইয়া আছে।

কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অনেকেই বলেন যে, "নারীজাতি ভীরু, অবলা ও কোমলাঙ্গী। তাই স্বার্থপর বলবান্ পুরুষ তাহাদিগকে সভ্যতার আদিম কাল হইতে আপনাদের অধীন, বা পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। পরাধীন নারীজাতির তাই কোনও উন্নতি হয় নাই। পুরুষেরা তাহাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যে অধিকারটুকু দিয়াছে, তাহাই তাহারা পাইয়াছে; তদতিরিক্ত তাহাদের কিছুই পাইবার আশা নাই। কৃত্রিম সমাজের দোষে নারী পুরুষের অধীন হইয়াছে। নতুবা উভয়েই সমান এবং উভয়েই সমান অধিকার পাইবার উপ-যুক্ত। মানবসমাজ যত সভ্য হইবে, ততই নারীজাতি পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রাপ্ত হইবে।"

এই বাক্যটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রবল পুরুষ যে দুর্ব্বলা নারীকে পরাধীন করিয়া-ছেন, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। নারী ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, প্রকৃতি তাঁহাকে পুরুষজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। যদি উভয়কেই আমরা শারীরিক বল ও সাহসে সমানই ধরিয়া লই, তাহা হইলেও একটী স্থলে স্ত্রীলোকের পরাজয় হইয়াছে। তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত একটী মহান্ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া! নারীজাতিই প্রজা উৎপন্ন করিয়া ভগবানের এই সৃষ্টিলীলার সহায়তা করিতেছেন। নারী না থাকিলে এই সৃষ্টি বহুকাল লয় প্রাপ্ত হইত। ভগবান্ যে নারীজাতিকে তাঁহার সৃষ্টিলীলার সহায় করিয়া লইয়াছেন, ইহাতেই তো তাঁহারা চিরকালের জন্য মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন!

পুরুষ সন্তানের জনক, নারী সন্তানের জননী। শাস্ত্রকারেরা জনক অপেক্ষা জননীকেই উচ্চতর স্থান প্রদান করিয়াছেন। পিতা আকাশ হইতেও মহত্তর; কিন্তু জননী "স্বর্গাদপি গরীয়সী!" এই মহদ্বাক্যটি কেবল মাত্র উচ্চকল্পনাপ্রসূত নহে; ইহা একটী পবিত্র সত্য বাক্য। নারীকেই গর্ভধারণ করিতে হয় এবং নারীই গর্ভে সন্তানকে পোষণ করেন ও সন্তান প্রসূত হইলে স্তন্য দ্বারা তাহার লালন পালন করেন। নারী যদি ভগবানের সৃষ্টিলীলার এইরূপে প্রধান সহায় না হইতেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে সৃষ্টি কি থাকিত? সেই কারণে, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "নারী গর্ভ ধারণ ও সন্তান পালন করেন বলিয়া অতীব পূজার্হা।" অপর, এক স্থলে তাঁহাকে জগজ্জননী বলা হইয়াছে এবং গৃহস্থকে নারীপূজা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা:—

"নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্গৃহে গৃহস্থানাং নারীপূজা গরীয়সী।"

কি সুন্দর, পবিত্র ভাব! নারী পুরুষজাতির জননী; বুধেরা নারীকে শ্রী (লক্ষ্মী) বলিয়াছেন। অতএব, গৃহস্থের গৃহে নারীপূজা শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলজনক কর্ম্ম।

গর্ভধারণ করিতে হইয়াছে বলিয়া নারী পুরুষের অপেক্ষা পাশবিক বলে হীন হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই হীনতা হইতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদিত হইয়াছে। গর্ভধারণ করিতে না হইলে এবং পুরুষের ন্যায় কঠোর কার্য্যে ও যুদ্ধবিগ্রহে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে, নারীও যে পুরুষের ন্যায় বীর্য্যশালিনী হইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা আমেজন-নাম্নী এক নারীসম্প্রদায়ের বিবরণ পাঠ করিয়া থাকি। ইহাঁরা চিরকাল অনূঢ়া থাকিতেন এবং পুরুষের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইতেন। থিসিয়সের ন্যায় মহাবীরও যুদ্ধে এই নারীগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। কিন্তু এই নারীগণ প্রকৃতির বিরোধী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নারীত্ব হারাইয়াছিলেন এবং এক কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছিলেন। জগতের নারীমাত্রেই যদি অনূঢ়া থাকিতেন এবং কদাপি পুরুষের সম্পর্কে না আসিতেন, তাহা হইলে ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি কতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। স্থলবিশেষে বিবাহ বা গর্ভধারণ অপ্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা নারী সাধারণের পরিত্যাজ্য নহে। নারী ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে গর্ভধারণ করিয়া সন্তান পোষণ ও পালন করিতে হয়। ইহাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ও ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে গিয়া, আশ্রয় ও রক্ষার জন্য প্রবল পুরুষের নিকট তাঁহাকে অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই অধীনতা হইতেই এক মহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। গর্ভধারণ-

সময়ে নারীর দেহ ও মন কত দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। সেই সময়ে, তিনি স্বয়ং কঠিন বা শ্রমসাধ্য কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। গর্ভধারণকালে তাঁহাকে যেন মৃত্যুর দ্বারেই দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এই কঠিন সময়ে নারীর রক্ষা ও আশ্রয়ের সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়। সভ্যতার আদিমকালে, মনুষ্য যখন দুর্দ্দান্ত অসভ্য বা নরাকার পশুরূপে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিত, যখন সামাজিক নিয়ম, শৃঙ্খলা বা শাসন কিছুই বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, যখন বর্ব্বর মনুষ্যদলের পারস্পরিক বৈর বা জিঘাংসাই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল, তখন নারীগণ বলবান্ ও সমর্থ পুরুষ ভিন্ন কাহাকেও আশ্রয় করিত না। প্রকৃতি বা আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তিই তাহাদিগকে বীর্য্যশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। এ দেশের পৌরাণিক যুগেও নারীগণ বীর্য্যশুল্কা হইতেন। সীতাদেবী ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে শারীরিক বলবীর্য্যই পুরুষের বিবাহযোগ্য গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে পুরুষের মানসিক শক্তিই বিবাহযোগ্য গুণরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ পিতামাতারা বুদ্ধিমান্ ও অর্থার্জ্জনক্ষম যুবাপুরুষের হস্তেই কন্যাদান করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই সমস্ত প্রথারই মূলে গর্ভধারণসময়ে ও প্রসবান্তে নারীগণের আত্মরক্ষা ও সন্তানরক্ষার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাই বীজরূপে নিহিত আছে। অবলা নারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই প্রবল পুরুষের অধীন হইয়াছিলেন। প্রকৃতিই তাঁহাকে এই অধীনতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই অধীনতা স্বীকারের জন্যই দুর্দ্দান্ত প্রবল পুরুষ আপনার পশুত্ব ও বর্ব্বরত্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছি।

হিংস্র ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী অরণ্যমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করে এবং উদর পরিতৃপ্ত হইলে যথেচ্ছ স্থানে শয়ন ও উপবেশন করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঘ্রী যখন আসন্নপ্রসবা হয়, তখন উভয়ে পর্ব্বতগুহা বা কোনও নিরাপদ স্থানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ব্যাঘ্রী সন্তানকে সেই নিরাপদ স্থানে রক্ষা করে এবং উভয়ে নানা স্থানে পশু হনন ও পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া সেই গুহার মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে তাহারা যত্র তত্র বিচরণ ও শয়ন করিত, কিন্তু সন্তান হওয়ার পর হইতে, সেই গুহাই তাহাদের গৃহস্বরূপ হইল। ব্যাঘ্রশিশু মাংসাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইলে, ব্যাঘ্র-দম্পতী তাহাদের জন্য মুখে করিয়া মাংস লইয়া আইসে। অন্য কোনও সময়ে ব্যাঘ্রীর নিহত পশুটি হয়ত স্বয়ং ব্যাঘ্র মহাশয়ই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করিতেন। কিন্তু, এই সময়ের ভাব একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। হিংস্র জন্তুর মধ্যেও আত্মত্যাগ কেমন বীজরূপে নিহিত রহিয়াছে।

অতঃপর এক পক্ষি-দম্পতীর কথা মনে করুন। উভয়ে বনে উপবনে মনের সুখে বিচরণ করে, এবং উদরতৃপ্তি হইলে এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক নিশা যাপন করে। কিন্তু যাই পক্ষিণী আসন্ন-প্রসবা হইল, অমনি পক্ষিদম্পতী ভাবী শাবকের রক্ষার জন্য কুলায় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইল। যাহাতে ডিম্বগুলি ও শাবকেরা রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড় প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়, তাহারই উপায় করিয়া উভয়ে নীড় প্রস্তুত করিল। ডিম্ব প্রসব করিয়া পক্ষিণী আহার বিহার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদের উপর বসিয়া রহিল। পক্ষী মহাশয় ইচ্ছা করিলে পক্ষিণীকে এই সময়ে পরিত্যাগ করিয়া মনের সুখে গান গাহিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কিন্তু ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! তাহারও আর নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। এই ক্ষুদ্র পক্ষীর হৃদয়েও সেই সময়ে পবিত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগরিত হইয়া উঠিল। পক্ষী ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করিয়া পক্ষিণীর শ্রমের অংশ গ্রহণ করিল। সে পক্ষিণীকে উঠাইয়া দিয়া নিজে ডিম্বের উপর বসিল; সেই অবসরে পক্ষিণীও ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিয়া লইল। শাবক উৎপন্ন হইলে, উভয়ের আর বিরাম নাই। যেখানে তাহারা সুপক্ক ফল, কীট, পতঙ্গ পাইতেছে, সেইখান হইতেই তাহা চঞ্চু দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া শাবকদিগকে খাওয়াইতেছে। মুখের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য রহিয়াছে, অথচ তাহা উদরসাৎ করিবার প্রবৃত্তি নাই। ভিতর হইতে কি এক অপূর্ব্ব শক্তি প্রবল হইয়া সেই খাদ্য দ্রব্যকে গলাধঃকৃত হইতে দিতেছে না! দেখুন, সন্তানের রক্ষা ও পালনের আকাঙ্ক্ষা নিকৃষ্ট পশু পক্ষীকেও কিয়দ্দিনের জন্য কিরূপ মহৎ করিয়া ফেলিতেছে!

নারী যদি না থাকিতেন এবং তাঁহাকে যদি গর্ভধারণ ও সন্তানপালন না করিতে হইত, তাহা হইলে সংসার কখনই বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না। মনুষ্যেরা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইত, পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিত, গৃহাদির সৃষ্টি হইত না, স্বাভাবিক পর্ব্বতগুহা-দিতেই পশুর ন্যায় সকলে কাল যাপন করিত এবং সকলেই কেবলমাত্র আপনার জন্যই ভাবিত। কিন্তু মঙ্গল-ময় ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্ত্রীজাতিকেই মনোনীত করিলেন এবং দুর্দ্দান্ত মানবকে এই স্ত্রীজাতি দ্বারাই মার্জ্জিত ও সংযত করিয়া লইয়া সংসার-ক্ষেত্রকে স্বর্গের শোভায় পরিণত করিলেন। নারী আপনার সুবিধার জন্যই পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিল; পুরুষ তাহার ও তদ্গর্ভজাত সন্তানের রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল, ভবিষ্যতের জন্য আহারসামগ্রী সঞ্চয় করিতে শিখিল, নিজে না খাইয়া স্ত্রীকে ও সন্তানকে খাওয়াইবার জন্য ব্যগ্র হইল, সামাজিক নিয়মের সৃষ্টি করিল,

প্রয়োজনানুসারে সেই নিয়মকে পরি-বর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে লাগিল, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শস্যাদি উৎ-পন্ন করিতে শিখিল, যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি কার্য্য সকলকে দূরতঃ পরিহার করিতে লাগিল এবং কালক্রমে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে স্বার্থপর মনুষ্য পরার্থপর হইল, আত্মপর মনুষ্য আত্মত্যাগ শিখিল, পশু মানব হইল, মানব দেবত্ব লাভ করিল।

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, নারী পুরুষের অধীনতা গ্রহণ না করিলে, তিনি আজ তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন কি না, দুর্দ্দান্ত পুরুষকে আজ এরূপ আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হইতেন কি না, সংসারকে এরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর করাইতে পারিতেন কি না এবং সর্ব্বোপরি উভয়ে উভয়ের বলে বলীয়ান্ হইয়া পবিত্র সংসারধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ হইতেন কিনা?

ভগবান্ নারীকে সৃষ্টি রক্ষার সহায় করিয়া লইয়া পুরুষ অপেক্ষাও উচ্চতর পদবী প্রদান করিয়াছেন। তাই নারী দেবতা, তাই নারী লক্ষ্মী, শ্রী ও পূজার্হা, তাই গৃহস্থের গৃহে "নারীপূজা গরীয়সী।" আর্য্যেরা এই মহৎ সত্যটি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং নারীকে আদ্যা শক্তি, জগদ্ধাত্রী ও জগজ্জননী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মহাভাব আর কোনও জাতির মনে উদিত হয় নাই।

এ হেন নারীকে পুরুষের সমান বলিলে বা পুরুষের সমান করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার কেবল অবমাননা করা হয়। নারী পুরুষের অধীন হইয়াও তাঁহার প্রভু। নারীর জন্যই গৃহ এবং নারীই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। গৃহই নারীর কর্ম্ম-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। গৃহের বহির্ভাগে নারী প্রকৃতপক্ষে অবলা। গৃহের বহি-র্ভাগে নারীচরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ হওয়া অসম্ভব। জল যেরূপ মৎস্যের জীবন, গৃহও তদ্রূপ নারীর প্রকৃত আরামস্থল। এই গৃহে তিনি নানামূর্ত্তিতে বিচরণ করেন। জননী, ভগিনী, কন্যা ও সহ-ধর্ম্মিণীরূপে তিনি গৃহের চতুর্দ্দিকে করুণা, প্রেম, আনন্দ ও মঙ্গল ছড়াইতে থাকেন। এই গৃহক্ষেত্র হইতে নারীকে উৎপাটিত করিয়া অন্যত্র রোপণ করিলে, তিনি অচিরে বিশুষ্ক হইয়া যাইবেন। সে সমস্ত কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। এক্ষণে "নর নারীর সাম্য" এই বাক্যটি সকলে তলাইয়া বুঝিতে পারিলেই, আমরা সুখী হইব।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস, এম, এ।

বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার
সন ১২৯৩ সালে
কলিকাতা

শৈশব-সঙ্গিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকে সুরেশচন্দ্র ভালবাসেন না, এমন কথা আমরা কখনই বলিতে পারিব না। বরং বলিতে হয় যে, সুরেশ পত্নীকে খুব ভালবাসেন, অতিশয় ভালবাসেন, ভালবাসার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। বলিতে কি, প্রফুল্লকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া অবধি সুরেশচন্দ্রের খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সোয়াস্তি নাই, মুন্‌সেফীতে বিচার-শক্তি নাই। মেঘদূতের নায়ক যক্ষের মত সুরেশচন্দ্রের হাতে যদি দুই গাছি "কনক বল্লয়" থাকিত, আমাদের বিশ্বাস যে তাহাও খসিয়া কোথায় পড়িয়া যাইত!

সুতরাং প্রফুল্ল ষোল দিন পিত্রালয়ে গেলেই সুরেশচন্দ্রের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য হারাণ 'মা' ঠাকুরাণীকে' আনিতে গেল।

কথা ছিল হারাণ সোমবারে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সোমবারে সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লের যে পত্র পাইলেন, তাহাতে জানিলেন "বিশেষ কারণে সোমবারে আমার যাওয়া ঘটিবে না, শুক্রবারে তোমার শ্রীচরণে পৌঁছিব। আমার উপর রাগ করিও না।" ইত্যাদি। "রাগ করিও না" শুনিয়া রাগ যে আসিবে না, ইহা তো অসম্ভব। বরং সুরেশের বড়ই রাগ হইল—তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে এত বিলম্ব—প্রফুল্ল আবার "বিশেষ কারণ" বলিতেছে। পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা আছে যে, সুরেশের আজ্ঞা পালন করিতে প্রফুল্লের বিলম্ব হইতে পারে?

যাহা হউক এ দারুণ অবস্থাও সুরেশ সহ্য করিলেন—"বীর পুরুষের মত" ত্যাগ স্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রফুল্লের আসিবার দিন "শুক্রবার" আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল! মনুষ্য-হৃদয়ে আর কত সহ্য হয়? যাহা হউক, শেষে একদিন বিনা ওজরেই শুক্রবারকে হাজির হইতে হইল; সে যদি তোমার আমার মত শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে মুন্‌সেফ সুরেশচন্দ্র তাহার কপালে যে কি শাস্তি ব্যবস্থা করিতেন তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু সে অশরীরীকে শাসন করিবার কোনও উপায় মিলিল না!

শুক্রবারে সুরেশ কাছারিতে গেলেন সত্য, কিন্তু একটী মোকর্দ্দমাও নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, সবই মুলতুবি রহিল। তার পরে এজলাসী ঘড়ীতে চারিটা বাজিলে, হরিধন চাপরাসী নিতাই কোচ্‌ম্যানের গাড়ী সহ হুজুরের কাছে হাজির হইল। সুরেশচন্দ্র তদারোহণে বাসায় ফিরিলেন।

বাড়ীর দরজায় ঢুকিতেই সুরেশ দেখিলেন, বাহির বাড়ীর উঠানে বৃদ্ধ হারাণ চন্দ্র। তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—যদি প্রফুল্লকে না পাঠাইয়া

থাকে! হারাণ আপনা হইতেই কিছু বলিল না দেখিয়া, সাহসে ভর করিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি হারাণ?"

হা। আজ্ঞে খবর ভাল; আমার একটু সর্দ্দি হয়েছে; নমস্কার।

উত্তর শুনিয়া সুরেশের ইচ্ছা হইল এক মুষ্ট্যাঘাতে বৃদ্ধের জীবনের বাকি পথটা পরিষ্কার করিয়া দেন! কিন্তু সে বীরত্ব কার্য্যে দেখাইলেন না; বলিলেন "old fool! বলি বউকে নিয়ে এসেছ?"

হা। আজ্ঞে তাই? তা বৌমাকে নিয়ে এসেছি।

সুরেশচন্দ্রের বিধুমুখে হাসি ফুটিল; কাছারির কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত দিন বিলম্ব কোল্লে কেন হারাণ?"

হা। আজ্ঞে; তাঁদের—মা'ঠাক্‌রুণের বাপদের যেমন যত্ন, তেমনি খাওয়ানোর ঘটা। যে ক'দিন ছিলুম, ভাল সন্দেশ, ঘন দুদ, ঘি, দই, রুইমাছ—"

সুরেশচন্দ্র উচ্চহাসি হাসিয়া হারাণের কথা সম্পূর্ণ করিতে দিলেন না; তাহাকে বলিলেন "সেই সব খেয়ে ভুলে গিয়েছিলে নাকি?"

হারাণ যথাসাধ্য "আত্মসম্ভ্রম" রক্ষার্থে প্রস্তুত হইল; বলিল "না, না, খেয়ে ভুলি নাই, খেয়ে কি আমি কোন খানে ভুলে থাকি?—চির দিন তো আপনারই খেয়ে আস্‌চি! তা সেই বাবুটীর জন্যই তো দেরি হয়ে পোড়্‌লো, বাবুটী এখন আরাম হয়েছেন। আমাদের বৌ-মাই তো বাবুটীকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভাত না খেলে তো মা'ঠাক্‌রুণ আস্‌তে পারেন না; তাঁকে কা'ল্ ভাত দেওয়া হ'ল।

সু। সে বাবু কে?—কর্ত্তা বাবুর কি ব্যারাম?

হা। নাগো না, কর্ত্তা বাবুর নয়। ঐ যে পশ্চিমের পাশে বাড়ী; সোণার চাঁদ পানা ছেলেটী; নামটীও যে দিব্যি—কি নামটী মেনে?

কম্পিতকলেবরে সুরেশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি নাম? যোগেন্দ্র নাকি?"

হারাণ সোৎসুকচিত্তে উত্তর করিল "হাঁ, হাঁ, যোগীনই বটে! যোগীনই বটে!"

সুরেশ কাপড় ছাড়িয়া একটা ল্যাবেণ্ডারের শিশি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, হঠাৎ হাত কাঁপিয়া সে শিশি পড়িয়া গেল, সে দিকে আর চাহিলেন না, হারাণের সহিত আর কথা কহিলেন না, দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন।

প্রফুল্ল জিনিস পত্র গুছাইতেছিল, সে আজি কুড়ি একুশ দিন এখানে ছিল না, ঘরের সবই বেগোছ, অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাই সেই সব জিনিস পত্র গুছাইতেছিল। পথে আসিবার সময়ে সমস্ত ক্ষণ মনটা বড়ই খারাপ ছিল; মায়ের কান্না, বাপের সজল নেত্র, অন্যান্য সকলকার বিষণ্ণতা মনে পড়িয়া সমস্ত পথ প্রফুল্লের মনটা বড়ই খারাপ ছিল; আর মনে পড়িতেছিল যোগেন দাদাকে; তিনি যে অশ্রুপূর্ণ-

নয়নে কাতরস্বরে বলিয়াছেন "প্রফুল্ল! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ দিতে পারিব না। 'আমি রেমিটেণ্ট' জ্বরে পড়িয়াছিলাম, তুমিই আমাকে বাঁচাইয়াছ। আমার মা' নাই, সহোদরা নাই, বাবাও সেদিন আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তুমি আমার স্নেহময়ী ভগিনী, তুমিই এ হতভাগার সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছ। জগদীশ্বর তোমার দেব হৃদয়ের উপযুক্ত পুরস্কার দি'ন্, আমি কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করি।" প্রফুল্ল তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, "যোগেন দাদা যদি আমার সহোদর হইতেন, তবে এক দণ্ডও আমি যোগেন দাদাকে ছাড়িয়া থাকিতাম না। ভগবান্! তুমি আমার স্বামীর মন ভাল কর, উনি যেন আমার যোগেন দাদার মহত্ত্ব বুঝ্‌তে পারেন।" সমস্ত পথই, ঐ কথা ভাবিয়া প্রফুল্লের মন বড়ই খারাপ হইতেছিল, কিন্তু এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছে। এখন সুরেশের মুখখানি একটী বার দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির! ছি! রমণী-হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! বড়ই পরাধীন!

সুরেশচন্দ্র একেবারে তাঁহার শয়নঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্ল স্বামীকে দেখিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া একটুখানি ঘোমটা টানিল; তার পরে হাসিমাখা মুখে স্বামীর খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ এ সব কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, —বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন "তবে প্রফুল্ল! তোমার পতিপ্রাণতার পরিচয় এই!" স্বামীর মুখ দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া প্রফুল্লের হৃৎপিণ্ড চম্‌কিয়া উঠিল; শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল; কথা কহিতে পারিল না।

সেই স্বরে সুরেশ আবার বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমার এই হইতে সম্বন্ধ ফুরাইল! তুমি বাপের বাড়ী যাও, আর এখানে থাক, আমি চলিলাম!"

এবারে প্রফুল্ল কাঁদিয়া উঠিল। বলিল "আমার উপরে রাগ করিও না—তোমার পায়ে পড়ি! আগে আমার কথা শুন; ভগবান্ আমার মনের কথা জানেন।—"

প্রফুল্লের করুণস্বরে সুরেশের আরও রাগ বাড়িল, তিনি স্ফুরিতাধর হইয়া বলিতে লাগিলেন "আর এ জন্মে আমি তোমার কথা শুনিব? তোমার মুখ আর দেখিব? যে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী, স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের সহিত—" সুরেশের আর বলা হইল না, কেননা প্রফুল্ল আকুলভাবে তাহার পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া গেল।

তখন সুরেশচন্দ্র—আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি, যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন লজ্জা করিয়া আর নিস্তার পাইব কিরূপে? তখন সুরেশচন্দ্র "আমাকে স্পর্শ করিস্ না—স্পর্শ করিস্ না" বলিয়া প্রফুল্লকে—পদানতা সরল-হৃদয়া পত্নীকে এক পদাঘাত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন!!

(ক্রমশঃ)

সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

বিপদে শিক্ষা।

একে অমানিশা, তাহাতে আবার জলদজালে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে চপলা দিঙ্‌মণ্ডল বিভাসিত করিতেছে, শন শন রবে পবন বহিতেছে; এখনও বৃষ্টিপাত হয় নাই, কিন্তু পতনের আর অধিক বিলম্বও নাই—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। রামশরণ দুলে এই সময়ে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক ঢাল তলবারে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইতেছিল, কিন্তু সহসা একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিল,—"বাবা! তোমার পায়ে ধরি, তুমি আর বাহির হইও না।" ভীষণদর্শন যুবক তাহাকে দেখিয়া কর্কশস্বরে বলিল, মর! তোরে এখানে কে আস্‌তে বল্লে। তুই চলে যা।

সরো—না বাবা! তুমি ঘরে ফিরে না এলে আমি ফিরে যাব না; তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

রা। সে কি, তুই কোথায় যাবি?

সরো—তুমি কোথায় যাবে বাবা?

রা—আমি ডাকাতি কর্ত্তে যাব।

সরো—না বাবা! তা যেতে দোব না, আর তুমি ডাকাতি কর্ত্তে পার্‌বে না। ওঃ সচ্ছন্দে একটা লোক কেটে ফেল্‌বে। না বাবা! তোমার পায়ে ধরি তুমি যেও না, সে দিনের কথা মনে হলে আমার চোকদে কেবল জল আসে।

রা—তুই চলে যা।

এই বলিয়া রামশরণ যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি সরোজা তাহার পদতলে পতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল "বাবা! কালীমার দোহাই তুমি যেও না। আমায় মেরে না ফেল্‌লে তুমি যেতে পার্‌বে না।"

কঠিনহৃদয় রামশরণ তাহার কোমল হৃদয়ে দুই একবার পাদপ্রহার করিল, কিন্তু তবুও প্রতিবন্ধক হইতেছে দেখিয়া তাহাকে উন্মুক্ত তরবারির আঘাত করিল। বালিকা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রামশরণ প্রস্থান করিল। রামশরণের ন্যায় পাষণ্ড নিতান্ত দুর্লভ। তাহার বয়স পঞ্চত্রিংশ বৎসরের অধিক নহে বটে, কিন্তু এই বয়সে সে যে কত হত্যা করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জগতে স্নেহ মমতা বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা সে জানে কিনা, সন্দেহ। সর্ব্বাপহৃত পথিকের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন, আহতের আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর অশ্রুবারি কতবারই প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু কখনই তাহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। আজি তাহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার ক্রন্দনে সাহস কমিয়া গেল, হৃদয় কাতর হইল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রামশরণ কত বার মনকে প্রফুল্লিত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না, বিরস মনে ধীরে ধীরে যেখানে বালিকা

পড়িয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল বালিকা তখনও পাগলের ন্যায় বকিতেছে, "বাবা যেও না—আমার দিব্য, কালীমার দিব্য, তোমার পায়ে ধরি, যেও না।" রামশরণ নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, সরো—। বালিকা আনন্দে উত্তর করিল, বাবা, তুমিত যাও নাই, বেশ হয়েচে, চল বাড়ী যাই।

রাম। সরো! তোমায় কি বড় লেগেচে, এস আমার কোলে এস।

সরো। বাবা! আমার পিট দে কি রক্ত পড়্চে—বড় জ্বালা কর্চে।

রামশরণ নীরবে তাহাকে কক্ষে করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইল; দীপালোকে দেখিল বালিকার পৃষ্ঠদেশ ভয়ঙ্কররূপে কর্ত্তিত হইয়াছে, দর দর ধারে রক্ত বহির্গত হইতেছে। রামশরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল, অজ্ঞাতে তাহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বালিকা মৃদুস্বরে বলিল, বাবা তুমি আর ডাকাতি করো না।

রামশরণের পত্নী অনেক দিন গতাসু হইয়াছে। মাতৃহীনা কন্যাকে রামশরণ স্বয়ং মানুষ করিয়াছে। যে পাদপ স্বয়ং রোপণ করিয়া এত দিন সযত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, অদ্য তাহার মূলে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করিল! জগতের সমুদায় স্নেহ মমতা যে পাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিল, জগতের সমুদায় সুন্দর বস্তু হইতে যাহাকে অধিকতর সুন্দর বোধ করিত, আপন হৃদয় অপেক্ষা যে হৃদয় অধিকতর প্রিয় ছিল, যাহার দুঃখে তাহার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত, অদ্য তাহাকেই স্বহস্তে সংহার করিল, রামশরণের এ দুঃখ আর রাখিবার স্থান হইল না। তাহার হৃদয়ে যুগপৎ কত ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। যে রামশরণ অনুতাপ কাহাকে বলে জানিত না, অদ্য তাহার হৃদয়ে যাতনার পর যাতনা, অনুতাপের পর অনুতাপ আসিয়া তাহাকে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিল। পত্নীবিয়োগের কথা, মৃত পুত্রের কথা তাহার মানসে উদয় হইতে লাগিল। রামশরণ কি করিবে স্থির করিতে পারিল না, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

বালিকা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা! আর আমি কথা কহিতে পারিতেছি না, আমার শরীর যেন অবশ হইতেছে, তবু একটা কথা বলি, শোন, সে দিন যে লোকটীকে বাটীতে ডেকে এনে কত কষ্ট দিয়ে কেটে ফেলেচ, তার আপনার জনের মনে কত কষ্ট হয়েচে বল দেখি! হয়ত তার ছোট ছেলে মেয়ে খেতে পাচ্চে না, তার পরিবার কেঁদে কেঁদে হয় ত পাগল হয়েছে, একজনকে মেরে কত লোককে পথের কাঙ্গাল করেছ। তার কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিলে, তা সে দিনই সব খরচ হয়েছে। তার পর দিন আমরা অনাহারে ছিলাম, তুমি ডাকাতি করে অনেক টাকা আন বটে, কিন্তু তাতে আমাদের সুখ নাই। আমরা সব দিন খেতে পাই না। বাবা! তোমার পায় পড়ি, আর ডাকাতি করো না। সে দিন বামন ঠাকুর বল্লেন—যারা চোর নয়, ডাকাত নয়, তারাই সুখী; আমারও মনে ঐ কথা বড় ভাল লেগেচে। ও বাড়ীর দাদা মহাশয় কখনও চুরি ডাকাতি করেন না, তিনি কেমন সুখে আছেন। সকলে তাঁহাকে খাতির যত্ন করে। আমি পাড়ায় বেরুলে সকলে আমায় ঠাট্টা করে, টিপিটিপি চোরের মেয়ে বলে সরে যায়। কোন ছেলে আমার সঙ্গে খেলাতে আসে না। আমি সব বুঝতে পারি, ঘরে এসে দোর দে কত কাঁদি, তোমায় বল্লে তুমি আমার কথা শোন না।"

বালিকার স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। আর কথা বলিতে পারিল না—যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল। রামশরণ কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। দ্রুতপদে একখানি ছিন্ন বস্ত্র আনিয়া বালিকার কর্ত্তিত পৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বালিকা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "বাবা! জল।" রামশরণ সত্বর জল আনিল, কিন্তু বালিকা আর পান করিতে পারিল না—নীরবে একবার বা—বা—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। "ডাকাতের মেয়ে" এ কথা তাহাকে আর শুনিতে হইল না। স্বর্গের কুসুম স্বর্গে চলিয়া গেল।

রামশরণ নীরবে দেখিল তাহার হৃদয়ের হৃদয়, যতনের ধন, আনন্দের উৎস ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিল। তাহার হৃদয়ে অতীতের স্মৃতি উদয় হইয়া প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন্ দিন কোন্ পুত্রবতীর একমাত্র নন্দনকে উত্তপ্ত তৈল-কটাহে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ পথিকের কণ্ঠে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার প্রবাস-সঞ্চিত অর্থরাজি লুণ্ঠন করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ পতিব্রতার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ কোমলাঙ্গীর অঙ্গে ভীষণ আঘাত করিয়া সুবর্ণ বলয় কাড়িয়া লইয়াছে, একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। রামশরণ ভাবনার স্রোতে ডুবিয়া ভীষণ যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িল।

রামশরণের শেষ জীবনে কি হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ বিবরণ জানা যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, সে আর কখন লোকালয়ে আসে নাই। নির্জ্জনে হিমালয়ের কোন গুহ্য স্থানে বল্কলে শরীরাচ্ছাদন করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতি-বাহিত করিয়াছে। ম, না, সিংহ।

ভবের খেলা।

পাঠিকাগণ অনেকেই বোধ হয় গ্রাবু খেলিতে জানেন। এই গ্রাবু খেলার সহিত আমাদের 'ভবের খেলার' অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অনেক দিন হইল, বঙ্গদর্শন

পত্রিকায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর, সরস ও চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমার অদ্যকার এই প্রবন্ধে সেই সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধের দুই চারিটী কথার পুনরুল্লেখ হইবে। তবু এ প্রবন্ধ সেরূপ প্রবন্ধ হইতে বড়ই বিভিন্ন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ও আমার উদ্দেশ্য এক নহে।

ঐ দেখুন, চারি ব্যক্তি তাস খেলিতে বসিয়াছেন। এক জন তাস কাটিয়া দিলেন—অমনি খেলার রঙ বদ্‌রঙ স্থির হইয়া গেল। এক জন তাস বণ্টন করিয়া দিলেন। ৮ খানি করিয়া তাস সকলের হাতেই গেল। কিন্তু সমান ৮ খানি নহে। এক জনের হাতে রঙের গোলাম, নওলা (চৌদ্দ), টেক্কা গেল, বদ্‌রঙের টেক্কা-বড় একটা বিন্তি গেল, আর এক রঙের সাহেব বিবি গেল। তাঁহার পক্ষাশ্রিত অন্য এক ব্যক্তির হাতে তিন খানি রং গেল,আর তাঁহার হাতে যে রঙের সাহেব বিবি গেল, তাহারই টেক্কা গেল। প্রতিপক্ষের একজনের হাতে দু'খানি মাত্র রঙ গেল—অপরের হাতে আদৌ রঙ গেলই না। খেলার নিয়ম.—এরূপ অসমান বণ্টন হইলেও খেলা ত্যাগ করিবার যো নাই। খেলা চলিল। যাঁহারা বেশী পাইয়াছিলেন, তাঁহারা খেলিতে বেজায় ভুল করিতে লাগিলেন। কতক ভাল পাইয়াছেন বলিয়া আহ্লাদে মত্ত হইয়া, কতক হিসাবের ভুলে তাঁহাদিগের প্রতিবারেই প্রমাদ ঘটিতে লাগিল। যিনি গোলাম, চৌদ্দ, টেক্কা পাইলেন, তিনি রং খেলিলেন না—কিন্তু তাঁহার সাথী তুরুপ করিয়া খেলা হাতে নিলেন। নিয়া তিনি রঙ্ খেলিয়া দিলেন, একজন প্রতিপক্ষের হাত হইতে রঙ পড়িল না—তাঁহার সাথীর হাতে খেলা গেল। তিনি আবার রঙ খেলিলেন—তাঁহার সাথীর হাতের রঙখানি বাহির হইয়া গেল। তিনি তাঁহার পরে নিজের হাতের ফেরাই না খেলিয়া, হাতের পাঁচ রাখিতে তাহা রাখিয়া দিলেন। সাথীর হাতে টেক্কা না জানিয়াও, তিনি সাহেব খেলিলেন—তাহার সাথী টেক্কা মারিয়া হাতে খেলা লইলেন। তিনি আবার সেই রঙই খেলিলেন—কিন্তু হইলে কি হয়, তাহারও বিবি তাঁহার সাথীর হাতে, কাজেই ছক্কা হইল। পাঠিকাগণ ঐ দেখুন, দেখিতে দেখিতে আবার ৪ খানি কাগজ হইল; প্রতিপক্ষগণ খেলিতে একটীও ভুল করিতেছেন না, তবু একখানি একখানি করিয়া চারি খানি কাগজ হইল। শেষে বোম পাঞ্জাও হইল। যাহারা জয় লাভ করিলেন, তাঁহারা হৈ হৈ করিয়া শয্যাস্থিত ধূলি কাগজাদি প্রতিপক্ষের মাথায় দিলেন। দর্শকগণমধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহাদিগের খেলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন—বলিলেন উহারা খেলিলে কাহারও জিতিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি ভিন্নমতাবলম্বী হইলেন।

তিনি উঠিয়া পরাজিত পক্ষমধ্যে একজনকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "অনেকের খেলা দেখিয়াছি, কিন্তু ভাই, তোমার খেলার মত খেলা আমরা আর দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য! এত বিরুদ্ধ বল—এত পুনঃ পুনঃ ভাল তাস না পাইবার লাঞ্ছনা—তবু ভাই তোমার মুখখানি একটু বিরস দেখি নাই। খেলায় তোমার এক রত্তি তাচ্ছিল্য দেখি নাই। খেলিতে তোমার এক বিন্দু ভুল নাই। সাবাস তোমার এ খেলা!" তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া অন্যান্য দর্শকগণ তাঁহাদিগের সহিত ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিলেন!

এ দিকে দেখুন, সংসারে চারি ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিল। জন্ম হইবামাত্রই তাঁহাদিগের কতকটা অবস্থা স্থিরীকৃত হইয়া পড়িল। চারিজনেই মনুষ্যত্বের যাহা কিছু—হাত, পা, প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন বুদ্ধি প্রভৃতির অধিকারী হইল। কিন্তু একজন জন্মমাত্রই রাজার ন্যায় সম্মান, রাজার ন্যায় সম্পদের অধিকারী হইল। একজন জন্মমাত্রই চিরদারিদ্র্যের সহচর হইয়া বসিল। একজন জন্মমাত্রই সুন্দর স্বাস্থ্য ও বলশালী শরীর পাইল। অন্য একজন জন্মমাত্রই রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহ লইয়া পৃথিবীতে আসিল! কিন্তু হইলে কি হয়? চারি জনকেই মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারের লীলা খেলা করিতেই হইবে। চারিজনেই সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। একজন পরদ্রব্যলুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ করিয়া পৃথিবীতে দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ নরপতি হইয়া উঠিলেন—একজন সবল ও সুস্থদেহে পরিশ্রম করিয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের দিকে না চাহিয়া সংসারে অতুল যশ ও অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করিলেন। একজন ধর্ম্ম-পথ হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট না হইয়া গায়ের রক্ত জল করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী দুইটি অন্নও তাঁহার জুটিল না। বাল্যে তাঁহার মাতা পিতা মরিয়া গেলেন। আগুনে তাঁহার বাড়ী পুড়িয়া গেল। তিনি যে কার্য্যে হাত দিতে লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার লোকসান হইতে লাগিল। তিনি তবু অক্ষুব্ধচিত্তে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নপর রহিলেন। অন্য একজন আজীবন রোগযন্ত্রণাই ভুগিতে লাগিলেন। কিন্তু এই রোগের মধ্যেও একদিন তিনি কুপথ্যের প্রয়াসী হইলেন না, একদিন স্বীয় অসুখের জন্য জীবনকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন না, বা তাঁহার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য সম্পাদনে অবহেলা করিলেন না। যাঁহারা ইহাঁদিগের এই খেলা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই নরপতির এবং এই ধনবান্ ব্যক্তিরই পৌরুষের গুণগান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকেই সার্থকজন্মা বলিয়া জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। কেবল এক জন মাত্র—হাঁ এক জনই বটে—অত লোকের মধ্যে কেবল একজন মাত্র সেই দরিদ্রের ও রুগ্নের নিকট যাইয়া তাঁহা-

দিগের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"সংসারে আপনারাই ধন্য।"

তাই বলিতেছিলাম, এই ভবের খেলা অনেকটা সেই গ্রাবু খেলার অনুরূপ। প্রায় এইরূপই বণ্টন, এইরূপই জয় পরাজয়ের ব্যবস্থা—প্রায় বলিলাম এই জন্য যে গ্রাবুতে কেবল মাত্র দৈব বা accident ভিন্ন আর কিছুই অসম বণ্টনের কারণ স্বরূপে দেখিতে পাই না—ভবের বণ্টনে তাহার একটা কারণ আমরা শুনিয়া থাকি। সেটা জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট। গ্রাবুতেও তাহার সাদৃশ্য কতকটা দেখান যায়, কিন্তু অতটা গেলে, আমার এই প্রবন্ধ অপাঠ্য হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা—আমি অতদূর যাইব না।

খেলা প্রায়ই এক প্রকার—তবে গ্রাবু খেলাটার ভাল মন্দ বিচার যেমন সহজে হয়, ভবের খেলার বিচারটা তেমন সহজে হয় না। যাঁহারা খেলিতে জানেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিবেন—গ্রাবুতে ছক্কা পঞ্জা দ্বারা, জয় পরাজয় দ্বারা খেলোয়াড়ের বিচার চলে না, সেরূপ বিচারে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, ভ্রান্তি জন্মিয়াও থাকে। কিন্তু ভবের খেলাতে সেই কথাটা সকলে বুঝেন না, সকলে সেইরূপ বিচারই করিয়া থাকেন। সেই কথাটিই আমার অদ্যকার একমাত্র বক্তব্য।

এ সংসারে ছক্কা পঞ্জা দিয়াই প্রায় বিচার হইয়া থাকে। যিনি ধনী, যিনি কবি, যিনি পণ্ডিত, যিনি যোদ্ধা, এ সংসারে তাঁহারই জয় জয়কার। সেই ধন, কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও যুদ্ধনিপুণতা রূপ ছক্কা পঞ্জা দেখিয়া এই ভবের খেলোয়াড়দিগের বিচার হইয়া থাকে। এ বিচারে যদি কেবল মাত্র সেই খেলোয়াড়গণের প্রতিই অবিচার ঘটিত, আমরা আজ একটি কথাও বলিতে অগ্রসর হইতাম না। আমরা আজ এত কথা বলিতেছি এই জন্য যে, দেখিতে দেখিতে খেলার এই ছক্কা পঞ্জার দিকেই লোকের বেশী দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে চলিল—দেখিতে দেখিতে সংসারে এই বিকৃত আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কেহ ভাবিতেছেন, সংসারে ধনলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। সুখ ইহার উপরেই নির্ভর করে—সুখের সকল উপকরণ ইহা দ্বারাই ক্রীত হয়। ইহা দ্বারা যেমন বিলাসের উপকরণ, তেমনই যশ ও সম্মানও পাইতে পারা যায়। সংসারে ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর কেহ ভাবিতেছেন, সংসারে বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করাই শ্রেয়স্কর। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" কেহ ভাবিতেছেন, কবি হওয়াই জগতের শ্রেষ্ঠ সুখ। সেকস্‌পীয়র হইতেই জগৎ বাঁচিয়া আছে। ইংলণ্ডের গৌরব এই সেকস্‌পিয়র হইতে। এইরূপ কত আর দেখাইব? কিন্তু এ কথাটা অতি অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন যে, গ্রাবু খেলার ন্যায় এই ভবের খেলাতেও প্রকৃত প্রশংসার ভুল না করা হয়। প্রতিপক্ষ সহস্র ব্যোম পঞ্জা করুক, যদি খেলার ভুল না করিলাম, তবে আমিই প্রকৃত খেলোয়াড়। সংসারে যাহাই ঘটুক, আমি পণ্ডিতই হই, কি মূর্খই হই, কবিই হই, কি অরসিক হই, যদি আমার যথাকর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলাম—যদি আমার কর্ত্তব্যসাধনে কোন ত্রুটি না হইল, তবে আমিই খেলায় প্রকৃত জেতা। এ সংসারে তিনিই ধন্য, যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ। এ সংসারে তিনিই জ্ঞানী, যাঁহার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রস্ফুটিত। এ সংসারে তিনিই কর্ম্মী, যিনি এই কর্ত্তব্য, সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সংসারে তিনিই ভক্ত, যিনি এই কর্ত্তব্য পালনই ভগবানের প্রকৃত সেবা মনে করেন। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই নিষ্কাম সাধনা—এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই মোক্ষলাভের উপায়। যিনি ইহা করিতে পারেন, তিনিই সুখ দুঃখে সমান জ্ঞানী; যিনি ইহা করিতে পারেন, তিনিই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে শিখিয়াছেন।

বারান্তরে কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইব। (ক্রমশঃ)

শোকগাথা।

(মহারাণী স্বর্ণময়ীর পরলোক-গমনে)

১

আজ
আঁধারিয়া বঙ্গভূমি, দীনদয়াময়ি!
স্বরগে চলিলে—
বঙ্গের অমূল্য মণি,
(চির-গরবের খনি)
অতল সাগর-তলে সহসা ডুবিলে!

২

"মহারাণী স্বর্ণময়ী" স্বদেশ-ভূষণ—
নারী-কুলেশ্বরী,
তপস্বিনী, তপোরতা,
সদাচারা পুণ্যব্রতা,
কীর্ত্তিমতী, মূর্ত্তিমতী করুণা আ মরি!

৩

বিশাল গগন-বক্ষে হয় প্রতিধ্বনি
তব খ্যাতি-গান,
তাই মনে "ধন্য" মানি,
উপাধি সে "মহারাণী"
তোমারে বৃটিশসিংহ করিলা প্রদান।*

৪

দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজা রয়েছে চাহিয়া,
ওই মুখপানে,
তুমি যে মা! অবিরত,
স্নেহে জননীর মত,
সে সবারে পালিয়াছ হৃদি-রক্ত-দানে!

* রাণী স্বর্ণময়ীই এ দেশে, গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্বপ্রথমে "মহারাণী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

৫

ব্যথিতে উপেক্ষা তব নাহি এক দিন,
তাই ব্যথিগণ,
যবে দরিদ্রতাভরে,
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে,
চাহে তব স্নেহ-কোলে লুকাতে আনন।

৬

কন্যাদায়, পুত্রদায়, মাতৃপিতৃদায়,
জঠরের দায়,
সহস্র, অযুত জন,
করে তোমা নিবেদন,
শিশু যথা নিজ দুখ কাঁদি কহে মা'য়!

৭

বরষার মেঘ যথা ঢালে জলধারা,
তুমিও তেমনি,
অশ্রান্ত অযুত করে,
দান করি সমাদরে,
তুষিয়াছ দীন জনে দীনের জননি!

৮

তবে এবে ধরা ত্যজি যেতেছ কেমনে
নীরবে নীরবে,
তোমার অভাগা দেশ,
শত তাপে একশেষ,
তুমি গেলে তার হায় কিবা দশা হবে!

৯

নাহি সে বিদ্যাসাগর অনাথশরণ,
বঙ্গভূমি-কোলে—
তুমিও মা! যাবে চলি,
কাহারে "আমার" বলি,
দরিদ্র মুছিবে অশ্রু কাহার আঁচলে?

১০

বুঝি
বাঙ্গালার অন্নপূর্ণা অন্নহীন দেশে
থাকিতে নারিয়া,
চলি যাও বহু দূরে,
অনন্ত অমরপুরে,
বঙ্গভূমি শেষ-আশা গেল ফুরাইয়া!

১১

আঁধারি অবনী আজি রমণীর মণি
তুমি মা! চলিলে,
কত মেয়ে বঙ্গ মা'র,
আসে যায় কতবার,
তোমা হেন রত্ন হায় ক'টী কোথা মিলে?

১২

তুমি যে রমণীজন্ম লভিলে ভূতলে
ভাগ্য রমণীর,
পতি-পুত্র-হীনা হয়ে,
অগণ্য সন্তান লয়ে
খেলিলে আদর্শ খেলা মর পৃথিবীর!

১৩

তাই সাধি, যেও না মা! ছাড়ি ধরাতল,
থা'ক থা'ক থা'ক,
রহে যদি প্রাণ তব,
বাঁচিবে মা! কত শব,
বসি রাণি! রাজাসনে দীন দেশে রাখ!

১৪

কিম্বা যদি শ্রান্তা তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে খাটি,
মাগিছ বিরাম,
যাও মাতঃ স্বর্ণময়ি!
যথা মা আনন্দময়ী,
যাও সে অমিয় কোলে লভিতে আরাম!

১৫

যাও সুখে যশস্বিনি! দেব-পুষ্পরথে
অমর-আলয়,
তপস্বিনী, পুণ্যব্রতা,
নিয়ত পরার্থ-রতা,
হতাশের আশাদীপ, অনাথ-আশ্রয়!
যাও মা! নন্দনবনে,
পতি দেবতার সনে,
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অসফল নয়!
জনগণ-পূজনীয়া!
থাক মা! বৈকুণ্ঠে গিয়া,
কোটি মুখে বঙ্গবাসী "হরি হরি" কয়,
যাও অন্নপূর্ণে! থাক্ শূন্য দেবালয়।

শ্রীমা—

বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাব।

বৌদ্ধ পুরোহিতকে 'ভিক্ষু' বলে। ভিক্ষু সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, অষ্ট-বস্ত্র-খণ্ড-বিনির্ম্মিত পীতবর্ণ চীবর পরিধান করিবেন ও মস্তক মুণ্ডন করিবেন। নিয়মিত সময়ান্তর কেশাদি ছেদন করিতেই হইবে। ইনি একাহারী, শুধু তাহা নহে, ১০।১১টার মধ্যে এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া, যদি কোন ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলেন, অথবা এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যদি কোনও গৃহস্থ তাঁহার আশ্রমে কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য পাঠাইয়া দেন, তাহাহইলেই সাধুর আহার হইবে, নচেৎ নহে। নিয়ম আছে যে, তাঁহার আশ্রমে আদৌ ধূম দৃষ্ট হইবে না। ইহার পর, দিনমানের অবশিষ্টাংশে তিনি চা বা শরবৎ প্রভৃতি পানীয় গ্রহণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু দুগ্ধ পান,—এমন কি চা'র সহিতও দুগ্ধ পান করিতে পারেন না। এবম্বিধ উপায়ে সংগৃহীত ভিক্ষুর আহারীয় দ্রব্যের নাম "পিণ্ড দান"। হিন্দু সাধারণ মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুর প্রাত্যাহিক আহারের নাম পিণ্ড। ইহাঁরা মৃতকে পিণ্ড না দিয়া নিজে ভক্ষণ করেন। ভিক্ষু জীবন্মৃত এবং ভিক্ষুর জীবন সম্পূর্ণ সংযম ও আত্মবিসর্জ্জনের জীবন। ভিক্ষু খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি উচ্চ শয্যায় শয়ন করিবেন না। কোনও রূপ গন্ধদ্রব্য সেবন করিবেন না, এমন কি পুষ্পও ইহাঁর অস্পৃশ্য। ভিক্ষু পূজা-কালে উপস্থিত উপাসিকামণ্ডলীর মুখাব-লোকন করিবেন না, এই নিমিত্ত সম্মুখে তাল-বৃন্তাবলম্বনপূর্ব্বক পূজা করিবার বিধি আছে। ছত্র ইহাঁর প্রধান অব-লম্বন এবং দেহরক্ষার অন্যতম উপায়। ইহাঁর পক্ষে সময়বিশেষে পাদুকা ব্যব-হারের আদেশ আছে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এইটি আর্য্য-ঋষিদিগের বেদানুমোদিত মূলমন্ত্র। বুদ্ধদেব ইহার স্ফুরণ করেন। জৈনেরা ইহাকে চরম

সীমায় আনয়ন করিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দয়া-প্রধান ধর্ম্ম। দয়া ও ধর্ম্ম দুই পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মে অভিহিত, কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, দয়া যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বা প্রতি-শব্দ মাত্র, বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিবেচিত হয়। রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি পরোপকার কার্য্যে ইহারা স্বার্থপরতাকে পরার্থপরতায় একবারে বিলীন করিতে আদিষ্ট। ভিক্ষুর যে যে লক্ষণ, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। বুদ্ধদেবের আদেশ আছে যে, এমন যে ভিক্ষু, তাঁহাকে তাঁহার জনক জননীও প্রণাম করিতে পারেন; কারণ চীবরধারী ভিক্ষু-সন্তানকে জনক জননী প্রণাম করাতে এই বুঝিতে হইবে যে, ঐ প্রণাম তাঁহারা পুত্রকে করিলেন না, ধর্ম্মকে করিলেন; যেহেতু ধর্ম্ম সকলের পূজ্য। স্বয়ং বুদ্ধদেব পিতা শুদ্ধোধনের নিকট হইতে প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকার আদেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। আমরা যতদূর জানি ইহা আর কোনও ধর্ম্মে নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন যে, পিতা মাতা সাক্ষাৎ দেবতা, ইহা-দিগের অপেক্ষা গুরু আর কেহই নাই; পুত্র বিদ্যা, ধর্ম্ম কিম্বা যে কোনও ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করুন না কেন, পিতা মাতার সন্নিধানে তাঁহার অপকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। বৌদ্ধধর্ম্মে সর্ব্বোপরি ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা।

শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাস

সংসারপ্রান্তরে বটচ্ছায়া।

কোনও এক মহাত্মা বলিয়াছেন—"রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার-প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপত্র।" এই দুর্গম সংসারপথে মানুষকে কত না সংগ্রামই করিতে হইতেছে। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাসমূহ অতিক্রম করিতে যাইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ক্ষতবিক্ষত এবং শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হইতেছে। এই দুস্তর সংসারপ্রান্তরে তাহাদিগকে নানা তাপে ও দুঃখ যন্ত্রণায় কত না উত্তপ্ত ও ক্লিষ্টই হইতে হইতেছে! দুর্গম জীবনপথে বিশ্রামের স্থান না থাকিলে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। দুর্গম পর্ব্বতপথে চলিতে চলিতে পিপাসার্ত্ত পথিক কত ব্যাকুল-ভাবে নির্ঝরিণীর পানে ধাবিত হয়—দুস্তর প্রান্তরমাঝে কত আকুলনয়নে পথিক সামান্য একটী বটচ্ছায়ার অন্বেষণ করে, আর তাহা লাভ করিতে পারিলে পিপাসা ও শ্রান্তি দূর করিয়া কত আরাম ও শান্তি, নবোৎসাহ ও নব-বলই না লাভ করে! এইরূপ সময়ের ও সর্ব্ব সময়ের সঙ্গী আতপত্রের অভাবে

পথিকের পথ চলা কি আর সম্ভবপর হইত?

পরিশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিকের ন্যায় সংসারে নানা তাপে তাপিত হইয়া শান্তি, আরাম ও বিশ্রাম লাভের জন্য সকল লোক গৃহ পানে ছুটিয়া আইসে। মানব প্রবাসে থাকিলেও গৃহের মধুময় স্মৃতি ও মধুময় কল্পনা দ্বারা কত আরাম ও তৃপ্তি লাভ করে! গৃহই এই সংসার-মরুভূমিতে একমাত্র শান্তিনিকেতন—একমাত্র বিশ্রামের স্থল। বিখ্যাত বক্তা বার্ক বলিয়াছেন "যে মুহূর্ত্তে আমি গৃহে প্রবেশ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অন্তরের সমস্ত ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়।" রমণী গৃহে শান্তিরূপিণী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন--"রমণী পুরুষের রবিবার অর্থাৎ তাহার বিশ্রাম, আরাম ও পবিত্র আনন্দ-দায়িনী।" শান্তিদায়িনী জননী ও সহ-ধর্ম্মিণীর নিকটেই সকলে আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে, শান্তিজল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রেম-চ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ ও তাঁহাদের প্রদত্ত শান্তিজল পান করিয়া নূতন বল, আশা, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আবার জীবন-পথে চলিতে থাকে। এইজন্যই মার্কিন সাধু এমার্সন বলিয়াছেন "পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু স্ত্রীলোক কার্য্যকরী কবি; স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্ এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকেন।" সত্যই গৃহ না থাকিলে—স্ত্রীজাতি না থাকিলে এই দুর্গম সংসারপথে চলা নিতান্তই কষ্টকর হইত। রমণীর নিকট আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিতে না পারিলে তাপিত, ক্লান্ত পথিকের পক্ষে এই মরুময় সংসারপথে অগ্রসর হওয়া অতীব দুঃসাধ্য হইত। প্রথম বয়সে মাতা ও তৎপরে সহধর্ম্মিণী আতপত্রের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সংসারের নানা প্রকার প্রখর উত্তাপ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা না করিলে জীবনপথে অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই হইত। এইজন্য বলা হইয়াছে "রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া, জীবনপথের আতপত্র।"

সৌভাগ্যসোপানপ্রণেতা বলিয়াছেন, "রমণী মানবজাতির সর্ব্বাবস্থায় ধাত্রী-স্বরূপ। তিনি আপন প্রকৃতির কোমলতা দ্বারা শান্তি ও সন্তোষ বিস্তারপূর্ব্বক পুরুষদিগের চরিত্র গঠন করেন। তাঁহার অন্তরের গঠনই এইরূপ যে, তাহা দয়া, কোমলতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, আশা ও বিশ্বাস দ্বারা অলঙ্কৃত। যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাই উজ্জ্বলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বিষণ্ণ-ভাবকে প্রসন্নতায় পরিণত করে, দুঃখার দুঃখ দূর করে, এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করে।" কিন্তু আমাদের চারি দিকে কি দেখিতেছি? বাস্তবিকই কি আমাদের গৃহ পরিবারে জননী ও সহধর্ম্মিণী বিশ্ববিধাতার শান্তি-নির্ঝর হইয়া

সংসারকে শান্তিসুধাতে পূর্ণ করিতেছেন, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে শান্তি ও সন্তোষ, বিষণ্ণতায় প্রসন্নতা প্রদান করিয়া সমস্ত গৃহ উজ্জলতা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিতেছেন? স্বামী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ও প্রতিবেশী সকলকে শান্তিসুধার আস্বাদ প্রদান করিতে পারিতেছেন? বাস্তবিকই কি তাঁহারা "সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপাত্র" হইয়া রহিয়াছেন? অনেক স্থলেই ত শান্তির সুস্নিগ্ধ ছায়া দৃষ্ট হয় না, শান্তির সুমধুর আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনেক গৃহেই অশান্তির হাহাকার! গৃহে শান্তি, আরাম ও তৃপ্তি না পাইয়া কত লোক শান্তির আশায় বাহিরে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া সুখের পরিবর্ত্তে দারুণ দুঃখে পতিত হইতেছে, সুধার পরিবর্ত্তে গরল পান করিতেছে—জঘন্য আমোদে রত হইয়া গভীর নরকে ডুবিতেছে। হায়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই এই দৃশ্য দেখিতেছি! সত্যই "গৃহিণীর পাপে গৃহ নষ্ট।" এইরূপে কত পবিত্র স্বর্গের নন্দনকাননই না ভীষণ নরকে পরিণত হইয়াছে! নারীর দোষে কত গৃহ সুখ শান্তি ও আরামের আবাসভূমি না হইয়া ভীষণ অশান্তি ও দুঃখ কষ্টের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। এই দৃশ্যসত্ত্বেও জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, "বাইবেলে উক্ত আছে, নারীর জন্য আমরা স্বর্গ হারাইয়াছি; কিন্তু যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব।"

সাধু মহাত্মাগণের অন্তর্দৃষ্টি অতি প্রখর। তাঁহারা নারীপ্রকৃতির উপাদান এবং মহিমাময় আদর্শ রমণী-জীবন দেখিয়া এই সকল মহদ্বাক্য দ্বারা নারীজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। যাঁহারা সংসারে শান্তির উৎস হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে তাঁহারা 'রমণী' নামের অযোগ্যাই মনে করিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। প্রকৃত নারীজীবনের অভাবেই সংসার মরুময় হইয়াছে। রমণীর স্বাভাবিক প্রেম, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, আশা, সন্তোষ ও আত্মত্যাগ গৃহকে সত্য সত্যই শান্তিনিকেতনে পরিণত করে। কিন্তু নিজে শান্তি না পাইলে অপরকে শান্তি দেওয়া যায় না। অনেক নারীজীবনে সেই স্বাভাবিক শান্তি ও আনন্দ নাই, তাই গৃহেও শান্তি নাই। অনেক রমণী প্রকৃত সুখ ও শান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া নারীজীবনের অযোগ্য বিষয়ের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং তৃপ্তি, স্ফূর্ত্তি ও আরাম হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অপ্রেমে, স্বার্থপরতাতে, হিংসা দ্বেষে ও আত্মসুখ-পরতাতে শান্তি নাই। অভিমান, অসরলতা ও ক্রোধ-পরায়ণতা নারীজীবনের সুখ শান্তির পরম শত্রু। এরূপ অবস্থায় কোনও রমণী শান্তিসুখ প্রদান করিতে পারেন না, বরং তাঁহারা সমস্ত পরিবারকে অশান্তির আগুনে আরও দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া

থাকেন। ধন মান ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই—শান্তি নাই। যদি থাকিত, তবে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালীর গৃহে অশান্তির হাহাকার উঠিত না। প্রকৃত পক্ষে কোনও অবস্থার উপরেই সুখ নির্ভর করে না। নীচ হীন অসম্পূর্ণ জীবন লইয়া পৃথিবীর কোন অবস্থাতেই সুখলাভের আশা করা যায় না। বাহিরের সহস্র সুখ কাহাকেও অবিচ্ছেদে সুখী করিতে পারে না। সুখ মনের অবস্থায়, হৃদয়ের পবিত্রতায় ও প্রশান্ততায়। জীবনের উন্নতি ও বিকাশেই প্রকৃত সুখ। বিকাশজনিত সুখ ও আনন্দই অবিচ্ছেদে সুখ, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও প্রফুল্লতা প্রদান করিতে পারে। সুখ কোন অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে উৎপন্ন হয় না। যখন শরীর প্রকৃত অবস্থায় থাকে, যখন শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া সকল সুন্দররূপে চলে এবং উপযুক্তরূপে দৈহিক বিকাশক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখনই শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ বোধ করি। সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকল বৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশই সুখের মূল। শারীরিক সুস্থতাই যেমন শারীরিক সুখের মূল, আত্মার বিকাশজনিত যে স্বাস্থ্য, তাহা তেমনি আন্তরিক প্রকৃত সুখের মূল। অসম্পূর্ণ বিকল জীবনে সুখের আশা করা—জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা। আমাদের বর্ত্তমান পতিত অবস্থার জন্যই আমরা এত দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমাদের দুঃখের ছায়া গৃহ পরিবারে এবং পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে ছাইয়া পড়িতেছে এবং গৃহ অশান্তিময় করিতেছে। এই জন্যই আমরা "সংসার-প্রান্তরে বটচ্ছায়া এবং জীবনপথের আতপত্র" হইতে পারিতেছি না।

দীনা বঙ্গবালা।

কেদার ও অমলা।

(সমাপ্ত)

অমলা সন্ন্যাসিবেশ পরিধানার্থ আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে দেশাধিপতি আমরুর প্রধান ভৃত্যের চক্ষে পড়িলেন। সে প্রভুর জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সুন্দরী রমণীর অন্বেষণ করিতেছিল। অমলা তাহার দৃষ্টিতে পরমা সুন্দরী বলিয়া বোধ হইল এবং সে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরবর্গকে আজ্ঞা প্রদান করিল। নিরুপায়া অমলা রাজভবনের অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধা হইল। আমরু তাহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইল এবং স্বেচ্ছাক্রমে পাণিগ্রহণে সম্মত হইবার জন্য অমলাকে আট দিবস সময় দিল।

ইতিমধ্যে কেদার আশ্রমে আসিয়া সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত অস্থির হইল। অমলার সহিত সাক্ষাতের জন্য পুনরায় যে দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত হইল। কেদার সোৎসুকচিত্তে বনপ্রদেশে আসিলেন। কিন্তু কোথায় অমলা? তাহার দর্শনলাভ হইল না।

দুর্ভাগ্য কেদার ঘোর নিরাশায় নিমগ্ন হইয়া কি করিবে—কি ভাবিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এ দিকে অমলা অকৃষ্টবন্ধ, কিরূপে তাহার অবস্থার বিষয় কেদারকে জ্ঞাপন করিবে, তাহার জন্য অশেষ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরের সহিত যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ, সে তাহার প্রিয়পাত্রকে কিছুই জানাইবার উপায় পাইল না। অবশেষে তাহার মনে হইল যে, কেদারের কৃষিক্ষেত্রের দ্বারে দুইটী হরিৎকণ্ঠ ঘুঘু বাসা বাঁধিয়াছে, তাহারা তাঁহার উদ্ধারের সহায় হইতে পারে। অমলার প্রতি আমরুর বড়ই অনুরাগ এবং তাহার সন্তোষসাধনের জন্য সে সকলই করিতে প্রস্তুত। রমণী আমরুকে বলিল যে, জেমজেম পর্ব্বতের উপরে যে হরিৎকণ্ঠ ঘুঘু সকল আছে, তাহাদিগকে পাইলে তাহার যেমন সন্তোষ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। আমরু তৎক্ষণাৎ এক শত দাসকে ডাকিল এবং হরিৎকণ্ঠ কপোত যেখানে পাওয়া যায়, ধরিয়া আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিল। এই জেমজেম পর্ব্বতেই কেদারের বাস; দাসগণ তথায় আসিয়া কপোত সকল ধরিতে লাগিল। এই সকল ঘুঘু সন্ন্যাসীর প্রিয় বলিয়া কেদার প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। কপোতদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া অমলার হস্তে সমর্পণ করা হইল। রমণী পত্র লিখিয়া দুইটী ঘুঘুর পায়ে বন্ধনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিল। ঘুঘুরা কেদারের নিকট ফিরিয়া আসিল। কেদার তাহাদিগের পদলগ্ন পত্র খুলিয়া অমলার স্বাক্ষর দেখিয়া চমৎকৃত হইল। পত্রে অমলা কেদারকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছে—"অমুক দিনে অমুক বণিকের নিকট আমি প্রচুর পরিমাণে রেশম চাহিয়া পাঠাইব, তুমি এই রেশমের মধ্যে একখানি তরবারি লুক্কায়িত করিয়া পাঠাইবে, আমার ধর্ম্ম রক্ষার এই শেষ উপায়।" কেদার নিরাশার মধ্যে আশার আলোক দেখিল। তাহার যে কিছু অর্থ ছিল, সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে বণিকের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া বশীভূত করিল। পরে সে যাহাতে রেশমের বাক্সের মধ্যে স্বয়ং বদ্ধ হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রেরিত হইতে পারে, এজন্য একান্ত অনুরোধ করিল। তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। রেশমের বাক্সের মধ্যে বসিয়া কেদার নিরাপদে অমলার নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এই অসম্ভাবিত সম্মিলনে প্রণয়িদ্বয়ের হৃদয়ে যে কি আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু "যদি তাহারা

ধরা পড়ে, বিষম বিভ্রাট ঘটিবে" এই চিন্তায় বুক কাঁপিতে লাগিল। কেদার প্রস্তাব করিল যে, সে অমলার পরিবর্ত্তে স্বয়ং অবরুদ্ধ থাকিবে এবং অমলা সেই রেশমের বাক্সে লুকাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবে। এ প্রস্তাবে অমলার মন উঠে না। প্রাসাদস্থ সুড়ঙ্গপথের কথা কেদার ভুলিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার দ্বারের চাবি সর্ব্বদা আমরুর সঙ্গে থাকে। তাহারা কথোপকথন করিতেছে, ইতিমধ্যে এক ভৃত্য আসিয়া রুদ্ধ দ্বার খুলিল, কেদার সরিয়া গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিল। ভৃত্য অমলাকে বলিল যে, রাজা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছেন এবং সেই রজনীতে তাঁহার নিকট আসিবেন—অমলা যদি সহজে সম্মত না হন, নিশ্চয়ই তাঁহার উপরে বলপ্রকাশ করিবেন। এই কথা বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। অমলা বিষম বিপদ আসন্ন দেখিয়া কেদারের প্রস্তাবমতে রেশমের বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং যথাসময়ে বণিকের বাটীতে নীত হইল। কেদার অমলার পরিচ্ছদ পরিয়া এবং তাহার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া তরবারি হস্তে আমরুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমরু স্বীয় দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য সূর্য্যাস্ত হইতে না হইতেই বন্দিগৃহে উপস্থিত হইল। গৃহমধ্যে আর কেহ নাই, কেবল সে এবং অমলাবেশধারী কেদার। আমরু উল্লসিতমনে যেমন ঘোমটা টানিয়া খুলিতে যাইবে, কেদার এক অস্ত্রাঘাতে তাহাকে পদতলে নিপাতিত করিল, দ্বিতীয় আঘাতে তাহাকে বাক্‌শক্তিহীন করিল। পরে কেদার তাহার নিকট হইতে চাবি লইয়া সুড়ঙ্গের দ্বার খুলিল এবং সেই পথ দিয়া চলিয়া চলিয়া আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইল। অমলা ইতিপূর্ব্বে তথায় আসিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়া বসিয়া আছে। কেদার অমলার অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে পাইল না। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী প্রণয়িনীর সহিত কেদারকে আবার সম্মিলিত করিয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল এবং ইতিমধ্যে প্রণয়ি-হৃদয়ের বিচ্ছেদ-ব্যাকুলতা দর্শনে মনে মনে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

এ দিকে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রাজবাটীতে আমরুর মৃত্যুঘটনা প্রকাশিত হইল। রাজ্যের চারি দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দিন দিন শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। ঘোর অরাজকতা উপস্থিত! প্রজাগণ কেদারের পিতার সহিত কেদারকে স্মরণ করিতে লাগিল, অনেকে একজন নূতন রাজা মনোনীত করিবার জন্য কোলাহল করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী এই সুযোগে নগর পরিদর্শন করিতে আসিলেন এবং নগরবাসীদের নিকটে নূতন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাহারা সর্ব্বসম্মতিতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তিনি তাহাদের জন্য আইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়া রাজ্যের সকল

বিভাগের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই নূতন ব্যবস্থায় সুখী হইল। কেদারেরও অতৃপ্তির কোন কারণ রহিল না, কারণ তিনিই প্রজাতন্ত্রের অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আর যে প্রাণ-প্রিয়া অমলাকে হারাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী ও সহ-কর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া পরমসুখে গার্হস্থ্য ও রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম শূন্য হইল। রাজ্যে লোকদিগের বিশ্বাস—সাধু সন্ন্যাসী মালী দেশের পরমহিতসাধন করিয়া এত দিনের পর অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই।

গত ১০ই ভাদ্র ভারতের পক্ষে এক মহাদুর্দ্দিন! ঐ দিবস ভারতরমণীকুলের শিরোমণি দান-কল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! গত ১২ই জুনের ভূমিকম্পে ঘর চাপা পড়িয়া তাঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার পুণ্যবলে সে অবঘাত মৃত্যু হইতে তিনি অতিকষ্টে রক্ষা পান। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা শুনা যায়। ২১এ শ্রাবণ রাজবাটীতে যখন পুণ্যাহ হয়, সেই সময় হইতে তাঁহার শরীরের অবস্থা নাকি আরও খারাপ হয়। কিন্তু তিনি অন্তঃপুর-রুদ্ধা অবলা, তাঁহার ভাল মন্দ কে জানিবে? আজি কোটী কোটী প্রাণ তাঁহার বিয়োগে আকুল হইলেও কে তাঁহাকে পীড়াগৃহে দেখিতে যাইবে? ১০ই ভাদ্রের প্রাতে তাঁহার অন্তিম দশার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন ভাগীরথীতীরে তাঁহার সৈদাবাদের ভবনে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল। হঠাৎ এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভাগীরথীতীরে লোকে লোকারণ্য। বেলা দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল, ১টার কিছু পূর্ব্বে মহারাণী সজ্ঞানে ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ও ক্রন্দনের রোল উঠিল। কত দীন দুঃখী মাতৃহীন হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল — শোক-অশ্রু-প্রবাহ ভাগীরথীর সহিত বহিয়া দেশদেশান্তরে চলিল। শশ্মানভূমিতে—বহরমপুরের জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষ-গণ, স্থানীয় জমীদারগণ, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং আবালবৃদ্ধবনিতা অনেক লোক সমবেত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতিক্রমে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য ৪০০০ টাকা ব্যয় হইল। ১৫ মণ চন্দনকাষ্ঠ, ১ মণ ঘৃত ও ১ মণ ধুনাতে

চিতা সুসজ্জিত হয়। মহারাণীর নিকটস্থ জ্ঞাতি বাবু রাধিকাচরণ নন্দী অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করেন। স্বর্ণময়ীর সোণার দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মে পরিণত হইল!

মহারাণী স্বর্ণময়ীর শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতিকৃতি মূর্ত্তি বা ছবি নাই, তা থাকিলে তাহাদ্বারা আমরা বামাবোধিনীকে সুশোভিত করিতাম। তিনি জীবদ্দশায় যেমন সাধারণ চক্ষুর অগোচর ছিলেন, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ রহিলেন। তাঁহার গুণ ও কীর্ত্তিতেই তিনি জীবিতা, দেশবাসীদিগের হৃদয়ে দয়ার অতুলনমূর্ত্তি হইয়া তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। স্বর্ণময়ীর যশ জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। তাঁহার স্মরণার্থ কেবল স্থানীয় বিদ্যালয় সকল নয়, কলিকাতা ও মফস্বলের অনেক প্রধান বিদ্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে শোকপ্রকাশের সভা হইয়াছে। আমরা আশা করি, রাজধানীর রমণীগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য বিশেষ শোক প্রকাশ করিবেন এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া আপনাদিগের সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

স্বর্ণময়ীর জীবনচরিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তিনি কাসিমবাজারের যে রাজপরিবারের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, তাহার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। কাসিমবাজার একটী অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নগর। ইংরাজদিগের বঙ্গাধিকারের বহুপূর্ব্বে এই নগর একটী সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল এবং পোর্ত্তুগিজ, ফরাসী, দিনামার, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতির ন্যায় ইংরেজরাও এই নগরে কুঠী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতেন। বঙ্গেশ্বর সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের কুঠী লুণ্ঠন এবং কর্ম্মচারীদিগের প্রাণ সংহার করেন। যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ-গবর্ণর, তিনি প্রাণভয়ে এক মুদীর দোকানে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই দোকানের অধিকারী কৃষ্ণকান্ত নন্দী কাসিমবাজার, রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি আপনার প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় ইংরাজের প্রাণ বাঁচান। পলাসীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশ ইংরাজের হইল! কিছুকাল পরে হেষ্টিংস শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন। তখন তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ 'কান্তকে' আপনার দেওয়ান করিলেন। ইংরাজী ১৭৭৪ হইতে ১৭৮৮ সাল পর্য্যন্ত দেওয়ানী কার্য্য করিয়া কান্ত বাবু প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ উপার্জ্জন করেন এবং আজিমগঞ্জ ও গাজীপুরে জাইগীর পান। রঙ্গপুরে বাহিরবন্দ পরগণায় বার্ষিক ৮৩ হাজার টাকা রাজস্ব দিয়া ৪ লক্ষ টাকা আয়ের এক জমীদারী পান। তাঁহার জমীদারী ক্রমে মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদিয়া, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে

বালিয়া, আজিমগড় প্রভৃতি স্থানেও অধিকার স্থাপিত হয়। কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথ গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং জমীদারী অনেক বাড়াইয়া যান। রাজা লোকনাথের পুত্র হরিনাথ ১৮২০ সালে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট "রাজা" উপাধি পান। তিনি অতি দানশীল, বিদ্যোৎসাহী ও উদারচরিত ছিলেন। তিনি কাসিমবাজারে একটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন, বহু অর্থ ব্যয়ে নানা স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন এবং হিন্দু-কলেজ স্থাপনসময়ে ইহার ফণ্ডে ১০,০০০ টাকা দান করেন। রাজা হরিনাথের পুত্র কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথ পিতার ন্যায় অতি শৈশবে পিতৃহীন হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৪০ সালে লর্ড অকলণ্ড কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজা কৃষ্ণনাথ স্বর্ণময়ীর স্বামী। তিনি একজন তেজস্বী, মহদাশয়, উদারচরিত যুবক ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত হন। তিনি যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সেইরূপ দেশহিতকর অনেক কার্য্যেরও সহায় হন। ডেবিড হেয়ারের পাষাণময়ী মূর্ত্তির জন্য তিনি সর্ব্বোচ্চ দান করেন। কৃষ্ণনাথের জন্য একটী সুলক্ষণা কন্যার অন্বেষণ করা হয় এবং বর্দ্ধমান জেলার ভট্টকুল গ্রামের সামান্যাবস্থার লোকের ঘরের মেয়ে 'স্বর্ণময়ী' মনোনীতা হন। ১৮৩৮ সালে একাদশ বর্ষ বয়সের সময় কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। বালিকা স্বর্ণময়ী পতিগৃহে আসিয়া পতির উৎসাহে লেখা পড়া আরম্ভ করেন এবং অল্প দিনে বাঙ্গালা ভাষা ও হিসাব পত্র রাখা শিক্ষা করেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় লোকের সঙ্গে ফিরিতেন এবং শুনা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। কৃষ্ণনাথ তেজস্বি-স্বভাব প্রযুক্ত ইংরাজ হাকিম প্রভৃতিকেও গ্রাহ্য করিতেন না, এজন্য ইহাদের অনেকে তাঁহার শত্রু হন। ১৮৪৪ সালে তিনি একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া আদালতে হাজির হইবার জন্য আহূত হন। দৈববিড়ম্বনায় পাছে আদালতে অপমানিত হন, এই আশঙ্কায় গুলি খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, সে দিনকার শোকের ব্যাপার বর্ণনীয় নয়। দেশময় হাহাকার! বিবাহের ৬ বৎসর পরে ১৭ বৎসর বয়সে স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই। লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুইটী শিশু কন্যা ক্রোড়ে অনাথিনী হইলেন।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যু হইলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাসিমবাজারের রাজবাটী ও সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিলেন। এক 'উইল' বাহির হইল, তাহাতে কৃষ্ণনাথ তাঁহার ত্যাজ্য সমুদায় সম্পত্তি কোম্পানীকে দান করিয়া গিয়াছেন। স্বর্ণময়ী স্বামীর সমুদায় বিষয় বিভবে বঞ্চিতা হইয়া আপনার স্ত্রীধন যাহা ছিল,

তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় ঢাকার তিল্লীগ্রামনিবাসী বৈদ্যবংশীয় রাজীবলোচন স্বর্ণময়ীর সপক্ষ হইয়া বিষয় প্রাপ্তি জন্য সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলেন। ৩ বৎসর আদালতের সংগ্রামের পর "কৃষ্ণনাথের উইল বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য্য" বলিয়া অসিদ্ধ হইল এবং স্বর্ণময়ী জয় লাভ করিয়া সমগ্র বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। বিষয়াধিকার পাইলে কি হইবে? কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ৩ বৎসর কাল জমীদারীর ভার হাতে পাইয়া তাহার অবস্থা এরূপ করিয়াছিল যে, তাহার উপস্বত্বে সদর খাজনা দেওয়াও চলে না। ধন্য রাজীবলোচনের বুদ্ধিচাতুর্য্য ও কৃতিত্ব! তিনি দেওয়ান হইয়া সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিলেন এবং বার্ষিক ৩২ লক্ষ টাকা আয় দাঁড় করাইলেন।

রাজীবলোচন যেমন জমীদারীর সুব্যবস্থা করিয়া প্রভূত অর্থ সংস্থান করিয়া দিলেন, সেইরূপ নানাবিধ সৎকার্য্যে সেই অর্থ দান করিয়া তাহার সার্থকতা করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। প্রকৃত "দানসাগর" যদি কেহ করিয়া থাকেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী তাহা করিয়াছেন এবং মন্ত্রী রাজীবলোচনই এই দয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল! আমরা কোনও সময় কাসিমবাজারের রাজবাটী পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি, দানের একটী পৃথক্ বিভাগ এবং তাহাতে অনেকগুলি কর্ম্মচারী কেবল এই কার্য্যে সমস্ত দিন নিযুক্ত। রেজিষ্টারী করা চিটী স্তূপাকার, প্রতিদিন শত সহস্র পত্রযোগে দেশ বিদেশ নানা স্থানে দাতব্য বিতরিত হইতেছে। মাসে লক্ষাধিক টাকা এইরূপে বিতরিত হইত। দান কেবল ডাকযোগে ছিল না, কত অনাথ, বিধবা, পিতৃ-মাতৃ বা কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি রাজবাটীর দ্বারস্থ হইয়া যথাযোগ্য দান লইয়া বিদায় হইত। কাঙালদিগকে বিতরণ করিবার জন্য দিন ২৫ মণ চাউল বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের দৈনিক সেবায় কত ব্রাহ্মণ অতিথির সেবা হইত। পশুপক্ষীদিগকে পালন করিয়া ভূতযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত।

মহারাণীর নৈমিত্তিক দানও যথেষ্ট ছিল। তিনি উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন শাল, কম্বল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ব্রাহ্মণ ও গরিবদিগকে বিতরণ করিতেন। পূজা পার্ব্বণাদি উপলক্ষেও মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন।

তাঁহার দানের একটী প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, ইহা অনেক সময় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত হইত। যাহাতে বিদ্যার উন্নতি হয়, গুণী ব্যক্তিদিগের গুণের পুরস্কার হয়, সদনুষ্ঠানের সহায়তা হয়, সমাজসংস্কার ও দেশহিতকর কার্য্য সকলের পথ প্রসারিত হয়, তিনি তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। যদিও স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার দানের মুখ্য পাত্র ছিল, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেই তাঁহার দান বদ্ধ হয় নাই, ইহা বিদেশ ও বিজাতীয়দিগেরও অভাবমোচনে নিযুক্ত

হইয়াছে। তাঁহার কয়েকটী প্রধান প্রধান দানের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

বহরমপুর জলের কল	১৷৷০	লক্ষ টাকা।
উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষ	১।	,,
মেডিকাল কলেজ ছাত্রীনিবাস	১	,,
কলিকাতা পশুশালা	১৪	হাজার
কাম্বেল স্কুলের ছাত্রীনিবাস	১০	,,
কলিকাতা কুমারী মিলম্যান ফিমেল স্কুলে	১০	,,
রাজসাহী মাদ্রাসা	৫	,,
কলিকাতা দুর্ভিক্ষ সভা	৮	,,
চট্টগ্রাম ইংরাজ নাবিকনিবাস	৩	,,
বেথুন স্কুল	১৷৷০	,,
হিন্দু আনুয়িটি ফণ্ড	৪	,,
মেও হাঁসপাতাল	৮	,,
রঙ্গপুর হাই স্কুল	৪	হাজার
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী	৩	,,
সিটী কলেজ	১৷৷০	,,
কটক কলেজ	২	,,
প্রটেষ্টাণ্ট হোম	১	,,
আলিগড় কলেজ	১	,,
ভৈরবনদের উন্নতি জন্য	১	,,
গরিবদিগের শীতবস্ত্র জন্য এককালীন	১১	,,
বাকরগঞ্জ ঝড়পীড়িতদিগের জন্য	৩	,,
টেম্পল আশ্রম	১	,,
বহরমপুর কলেজ বার্ষিক	১৫	,,

স্বর্ণময়ীর দানের এই অসম্পূর্ণ তালিকা দ্বারা বুঝা যায়, কতপ্রকার হিতকর কার্য্যে তাঁহার হস্তাবলম্বন ছিল এবং তাঁহার দানের পরিমাণ কত! সাধু দৃষ্টান্ত সাধু-দৃষ্টান্তকে প্রসব করে। স্বর্ণময়ীর বদান্যতার দৃষ্টান্তে মহারাণী শরৎসুন্দরী, রাণী হরসুন্দরী, রাণী দাড়িম্ব দেবী প্রভৃতির অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। বিধিনির্দ্দেশে তাঁহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও স্বর্ণময়ীর দানস্রোত চিরপ্রবহমান ছিল। কালবশে সে স্রোত রুদ্ধ হইল, এখন তাঁহার স্থল কে অধিকার করিবে?

মহারাণী স্বর্ণময়ী বামাবোধিনীর এক-জন প্রাচীনতমা গ্রাহিকা ছিলেন এবং ইহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কখনও ত্রুটি দেখি নাই। এক সময় তিনি এককালীন ২০০৲ টাকা দান করিয়া বামাবোধিনীকে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব।

স্বর্ণময়ীর আশ্চর্য্য দানশীলতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাঁহাকে "রাণী" উপাধি দেন। পরে ১৮৭১ সালে "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৫ সালে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দেওয়ান রাজীবলোচনকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া মহারাণীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন। এই স্থলে মহারাণী স্বর্ণময়ীর একটী মহত্ত্বের কথার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বংশরক্ষার পরামর্শ দেন। কিন্তু মহারাণী তাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন এবং তাঁহার যে ভাগিনেয় ভাবী উত্তরাধিকারী আছেন, তিনিই 'মহারাজ' উপাধি পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে "C. I." ভারত মুকুট

এই সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা তিনি অলঙ্কৃতা হন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও নিজে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী ছিলেন এবং সামান্য আহার পরিধান ও শয্যাতে সন্তুষ্ট হইতেন। ঠাকুরসেবা, ব্রতনিষ্ঠা, তাঁহার জীবনের নিত্য নিয়ম ছিল। অতিথি-সেবায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল—অভ্যাগত ব্যক্তিগণ রাজভবনে বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইতেন এবং গুণী যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্র-দিগকে তিনি স্বচক্ষে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আমরা রাজীবলোচন ও তাঁহার এক ভ্রাতার মুখে শুনিয়াছি মহারাণী আপনার দৈনিক জীবন ধর্ম্মচর্চ্চা, পুস্তকাধ্যয়ন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সুন্দররূপে বিভক্ত করিয়া কাটাইতেন। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ও পত্রিকা নিজে পাঠ করিয়া তন্মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট অংশগুলি স্বহস্তে চিহ্নিত করিয়া কর্ম্মচারীদিগের পাঠার্থ প্রতিদিন প্রেরণ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি ও সদ্বিবে-চনা অসাধারণ ছিল।

স্বর্ণময়ীর লক্ষ্মী ও সরস্বতী নাম্নী যে দুইটী কন্যার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের একটী শৈশবে মৃত হয়। অপরটীকে তিনি এক সামান্যাবস্থার লোকের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে "ঘর জামাই" করিয়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটী অকালে কালকবলে পতিত হয়। রাজ-জামাতা আজিও জীবিত আছেন। তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই, মহারাণী তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে সম্মত হন নাই। মহারাণী তাঁহার অধিকার সংস্থান করিয়া গিয়াছেন। মহারাণীর ভগিনীপুত্র রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর রাজীবলোচনের পর ম্যানেজারের কার্য্য করিয়া মহারাণীর কীর্ত্তিকলাপ বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি সন্তানের ন্যায় মহারাণীর অতিশয় প্রিয়পুত্র ছিলেন, মহারাণী তাঁহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মহারাণীর ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধি-কারিণী এখন তাঁহার শাশুড়ী রাণী হরসুন্দরী। তাঁহার বয়স ৯০ অতিক্রম করিয়াছে। তিনি সংসার হইতে অবসৃত হইয়া কাশীধামে জীবন অবসান করিবার প্রতীক্ষায় আছেন। হরসুন্দরীর দৌহিত্র বাবু মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী তাঁহার কন্যা গোবিন্দ সুন্দরীর একমাত্র জীবিত পুত্র, ইনিই এখন সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আমরা আশা করি, তিনি কাশিমবাজারের রাজ-সম্পদের অধিকারী হইয়া "মহারাজ" উপাধি লাভপূর্ব্বক সুখে জীবন অতিবাহন করিবেন এবং মহারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহার গৌরব আরও উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিশেষে আমরা শান্তিদাতা মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি স্বর্গীয়া মহারাণীর সুকৃতির পুরস্কার

দান করিয়া তাঁহার আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন্ এবং তিনি যে রমণীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তে দীনদরিদ্রদিগের সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধন্য করুন্।

ভাদ্রের হেঁয়ালী।

পক্ষীর মধ্যেতে গাভী আছে লুকাইয়া
ধড় ফেলে কেল্লা হয়ে উঠে দাঁড়াইয়া।১
আদি বর্ণ ছাড়ি আমি বস্তু ঘৃণাকর,
মধ্য বর্ণ ছাড়ি হই আটা মনোহর,
শেষ বর্ণ ছাড়ি হই বোল বাজনার,
মানবের গৃহকর্ম্মে আমি সর্ব্বাধার। ২
ছাড়িলে প্রথম বর্ণ উঠি ছাদোপরি,
ছাড়িলে মধ্যম বর্ণ সূক্ষ্ম দেহ ধরি।
ছাড়িলে অন্তিম বর্ণ পাণাধার হই,
আমা লয়ে বিশ্বকর্ম্মা হন সর্ব্বজয়ী। ৩
মোর যোগে দুধ পয়সায় পরিণত,
আমার বিয়োগে দাদা রোগ-মধ্যগত,
দান স্থলে আমি যুটে দৈত্য অবতার,
চন্দ্র সঙ্গে 'ফন' করি অর্থ তুলিবার।৪
এক পিঠে ফোটে খই,
আর পিটে যত পার জল রাখ সই।৫

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজ পুত্র ডিউক অব ইয়র্ক সস্ত্রীক আয়র্লণ্ড দর্শনে গিয়াছেন।

২। সীমান্ত প্রদেশে আফ্রিদি জাতির সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মহাসমর চলিয়াছে। শত্রুরা থাইবার পাশের আলিমসজিদ ও মত নামক দুইটী ইংরাজ দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

৩। পুনার রাজবিদ্রোহাভিযুক্ত গঙ্গারাম তিলক জুরী বিচারে অপরাধী হইয়া ১৮ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আপীলের সম্ভাবনা।

৪। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভূমিকম্প হইয়াছে। ভাদ্র শেষ হইয়া আশ্বিন আসিল। তথাপি রঙ্গপুর, ময়নমসিংহ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে কম্পন চলিয়াছে।

৫। স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু উপলক্ষে ২৮এ আগষ্ট বরিশাল জেলা স্কুলগৃহে এক শোক-সভায় স্থির হইয়াছে যে স্বর্ণময়ীর জীবনী সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

৬। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থানে প্রবল বন্যা হইয়া গিয়াছে।

৭। অধ্যাপক ওসমান নামক

আমেরিকাবাসী আমেরিকায় "চৈতন্য সমাজ" নামে এক সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

৮। বোম্বাই ও পুনাতে মারীভয় পুনরায় প্রবল হইয়াছে।

৯। খানা জংসনে রেলওয়ের স্ত্রী-আরোহীদিগের রোগ পরীক্ষার্থ এক জন স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০। তিস্তা নদীর উপর এক সেতু নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১১। ফরিদ কোটের রাজা অমৃতসর গুরুদরবারের অন্নছত্রে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। বেতিয়ার মহারাণী জানকী কুয়ার চম্পারণ জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত-দিগের সাহায্যার্থ ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীপ্যারী মোহন দাস প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমান কালের হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস সংক্ষেপে সমালোচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত তুলনায় সমালোচনাও আছে। পুস্তকখানি যেমন গভীর গবেষণাপূর্ণ, সেইরূপ স্বাধীন চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। ইহা আরও বিস্তৃত আকারে রচিত হইলে বাঙ্গালায় ধর্ম্ম-সাহিত্যের একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ হইতে পারে।

২। আত্মতত্ত্ব প্রকাশ—শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি দর্শন বিষয়ক চূর্ণক। লেখক যেমন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেইরূপ যুক্তিমান্ বিচারক। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দর্শন সকলের মত সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়া কতকগুলি মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। এই মীমাংসাগুলি আস্তিক্য বুদ্ধির সমর্থক, মুক্তিপথ প্রদর্শক ও ধর্ম্মসাধনের সহায়। পুস্তকখানি সকলের পাঠ্য।

৩। যোগামৃত—শ্রীশশিভূষণ মজুমদার প্রণীত। যোগসাধনের নানাপ্রকার প্রকরণ পদ্যে বিরচিত হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রমাণস্বরূপ সংস্কৃত মূল শ্লোক সকল উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন যোগতত্ত্ব জানিতে চান, ইহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। পুস্তকখানি পদ্যে না হইয়া গদ্যে রচিত হইলেই ভাল হইত।

৪। হীরক যুবিলি—লেখায় কবিত্ব আছে। দেশের প্রকৃত অবস্থার ছবি কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। কবিতা প্রসঙ্গ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। ইহাতে ১৪টী কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, সকলগুলিই অতি হৃদ্য, ধর্ম্ম-

ভাবপূর্ণ এবং দেশহিতৈষিতা ও মহাপ্রাণতার উদ্দীপক। কোন কোন কবিতা পাঠে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়। মহাপ্রস্থান, মাতৃস্নেহ, কপিলাশ্রম, দধীচের তনুত্যাগ এবং চিত্র দর্শন অতি সুন্দর। চিত্রদর্শনের চিত্রটী অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কবিতা হৃদয়ের হৃদয়স্পর্শিনী ভাষা হয়, কবিতা প্রসঙ্গের তাহা বিশেষ লক্ষণ। এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৬। রাজা হরিশ্চন্দ্র—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। কম্বুলে টোনা লাইব্রেরীতে হরিশ্চন্দ্র বিষয়ক যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বক্তা বৈদিক ও পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রে নানা চিত্রের উল্লেখ করিয়া সমীচীন সমালোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

৭। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম—৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম এ সম্পাদিত, মূল্য ৸০ আনা। ইহাতে অতি সহজ ভাষায় প্রক্রিয়া সহিত ভার, তাপ, তাড়িত, চৌম্বক আণবিক ক্রিয়া, শব্দবিজ্ঞান ও আলোকতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং সৌরজগতের একটু সুন্দর খণ্ড আছে। এরূপ পুস্তক সর্ব্বথা সমাদরণীয়।

** অন্যান্য পুস্তক পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

দুঃখিনী বালিকা।

আকাশের নীল কক্ষ ঘিরিয়া,
পূর্ণিমার চাঁদ আছে চেয়ে ;
ধরণীর সুপ্ত বুকখানি
জোছনায় দিয়াছে ছেয়ে, ছেয়ে !১

নিরাশ হৃদয়খানি ল'য়ে
বাতায়নে আছে সে দাঁড়ায়ে,
বিষাদ আঁধার মেখে তার
আশা ছটা গিয়াছে মিশায়ে।২

সাধের আশার দীপ তার,
বহু দিন হ'ল নিভে গেছে ;
অতীতের সুখ-স্মৃতি মধু
হৃদি প্রান্তে আজো জাগি আছে।৩

শরতের অভ্রখণ্ড প্রায়,
বালিকার আশাহীন হিয়া
এলো মেলো নিরাশ বাতাসে
যেতেছিল কোথায় ভাসিয়া !৪

যে তরু আশ্রয় করি লতা,
এত দিন ছিল মনসুখে,
সে তরু পড়িয়া গেছে হায় !
শোক-শেল হানি তার বুকে।৫

ভবখেলা সাঙ্গ করি মাতা
স্বর্গধামে গিয়াছেন চলি,
জ্ঞানহীনা মেয়েটীকে শুধু
শরণ-বিহীন ভবে ফেলি' !৬

তাইত শোকের ঝঞ্ঝাবাত,
বহে তার হৃদয় আকাশে ;
দিশা-হারা তরণীর প্রায়
কূল-হীন সাগরে ভেসেছে !৭

অধরে ফোটে না হাসি তার,
বিষাদে হৃদয় ভেঙ্গে গেছে,
দলিতা সে লতাটীর মত
এক কোণে পড়িয়া রয়েছে !৮

চন্দ্রমা হাসিলে নীলাকাশে,
যোড় করি কচি দু'টী কর,
অশ্রু-নেত্রে, ঊর্দ্ধ-মুখে চেয়ে
দেবতাকে ডাকে নিরন্তর !৯

এ ভবেতে বুঝিল না কেহ,
বলি কার মরম বেদনা—
অনাথার অশ্রু কেহ
শান্তি নেতে মুছাতে এল না।১০

শ্রীশৈলজাসুন্দরী দেবী।

হিমাদ্রি-শেখর§।

ধর ধর ধর !
টলিতে টলিতে খুকু হয় অগ্রসর,—
তালে তালে ফেলে পা,
তালে তালে নাচে গা,
রাখিতে পারে না সে যে আপনার ভর !
হাতে নিয়া এক খণ্ড
অতি ক্ষুদ্র ইক্ষু দণ্ড
অই যে চলেছে খুকু প্রসন্ন অন্তর !১
লালেতে ভাসিছে বুক
কাদা-মাখা চাঁদ মুখ,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই,—বড়ই সুন্দর !
ধর্ ধর্ ধর্।
অই যে আসিছে খুকু স্নেহের সাগর,
তালি দেয় সোণা হাতে,
গান গায় সাথে সাথে,
চৌদিকে উছলি উঠে হাসির লহর !
ধরিতে ছুটিয়া যায়,
ধীরে ধীরে পায় পায়,
থাকিতে চাহে না আর কোলের ভিতর।
কেবল মাটীতে খেলা,
করে খুকু তিন বেলা,
নূতন হাঁটিতে শিখে মেজের উপর।
বড় দুষ্ট বড় বোকা,
এখন হয়েছে খোকা,
এখন রাখিতে হয় সাথে সাথে চর।
নতুবা সে দুষ্ট ছেলে,
পথে যায় ফাঁক পেলে,
ঘাটে যায় একা একা নাহি জানে ডর।
ভাবিয়া আকুল সবে,
কি জানি করিবে কবে ;
কোন্ সর্ব্বনাশ জানি করে এর পর।
ধর্ ধর্ ধর্।২

§ দেড় বৎসরের বালক।

ধর্ ধর্ ধর্ !
"ওদিকে যাস্‌নে খুকু ছাদের উপর,"—
সে কি শুনে সে বারণ,
সে কি ডরে সে কারণ ?
সে যেন সবার রাজা, সবার ঈশ্বর।
সে যেন সবার প্রভু,
কারে না ডরায় কভু,
তাইত রেখেছি নাম 'হিমাদ্রি-শেখর।'
আমরা ভাবিয়া মরি,
আমরা আশঙ্কা করি,
সে থাকে আপন মনে নির্ভয় অন্তর ;
সে আছে আপন রঙ্গে,
একাকী আপন সঙ্গে,
করিতে অমৃতপূর্ণ দিগ্ দিগন্তর !
ধর্ ধর্ ধর্।৩

ধর্ ধর্ ধর্।
ননীর পুতুল এযে ধরার উপর,—
এযেরে বিমল শশী,
ভূতলে পড়েছে খসি ;
এযে প্রভাতের নব অরুণ সুন্দর !
মুছিয়া ও কম কায়,
ধূলা মাটী সমুদায় ;
রাখিব যতনে পূরি প্রাণের ভিতর !
একাকী বিরলে বসি,
হেরি ও বদন শশী ;
জুড়াব জন্মের মত তাপিত অন্তর !
আয় খুকু আয় আয় !
নে'চে নে'চে পায় পায় ;
আয় কোলে প্রাণাধিক হিমাদ্রি-শেখর !
আয় খুকু, আয় বুকে,
চুমো খেয়ে চাঁদ মুখে,
জুড়াই জন্মের মত তাপিত অন্তর !
কত করুণায় বিধি,
দি'লা এ অমূল্য নিধি
দরিদ্র-কুটীরে স্পর্শমণি মনোহর,
তাঁতে যেন ভক্তি থাকে,
তাঁরে যেন মনে রাখে ;
ভবিষ্য জীবনে করি চরণে নির্ভর,
সুখে যেন থাকে মোর হিমাদ্রি-শেখর।৪

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
নময়মসিংহ।

"এই চাই।"

কতই দিয়েছে নাথ,
তবু কেন অশ্রুপাত ?
সংসার সংগ্রাম মাঝে
কেন প্রাণ কাঁপে ডরে ?
বহুক, তাপ, অশ্রু, হাসি,
ধরামাঝে মেশামিশি
হয়ে রয়, তাতে কেন
প্রাণ কাঁদে সকাতরে ?
চৌদিকে বাসনা শত,
ভ্রমিছে যে অবিরত,

দুর্ব্বল হৃদয় যেন
তারা না ছুঁইতে পারে ;
তুমি লও কোলে তুলে
দুঃখ-স্মৃতি যাই ভুলে,
জুড়াই তাপিত হৃদি
তব স্নিগ্ধ জ্যোতি হেরে।
হোক্ প্রাণ সুধাময়
গাই সদা তব জয়,
বিষাদ, চোখের জল
যাক্ চলে শত দূরে।
ভেঙ্গে যাক্ মোহ ঘোর,
সারাটী জীবন মোর
ঢেলে দেই তব পদে ;
গাই নাম প্রাণ পূরে।

কুমারী সুকুমারী দাস।

মমতার ফুল।

শিশুর জন্মোপলক্ষে।

(জন্ম-সময়—২রা শ্রাবণ, শনিবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা)

আজি এ বরষা দিনে নিশীথসময়ে,
ভিজে লতা ভিজে ফুল,
ভিজে বিহঙ্গমকুল,
সাগরে চলেছে নদী কুল কুল ব'য়ে। ১

মধুর বিধির লিপি—আজি এ নিশীথে,
আলোকি অন্তর-তম,
স্বরগের দূত সম,
ফুটিল ফুলের শিশু মলয় মারুতে। ২

কি শুভ বিধির ইচ্ছা কি করুণা তাঁর !
আজি তাঁর ইচ্ছা মত,
স্বর্গ পুষ্প সদ্যোজাত,
ফুটিল হৃদয়ে ঢালি সুরভি সম্ভার। ৩

সকলি তোমার ইচ্ছা বিভু সর্ব্বময়,
তোমারি চরণতলে,
এ ফুল দিলাম ফেলে,
চিরজীবী করে রাখ—দিয়া পদাশ্রয়। ৪

এ যে গো স্বর্গের দূত—অতুল অতুল,
স্বরগ মুরলীস্বরে,
ওঁয়া ওঁয়া—সুধাক্ষরে,
হার মানে এর কাছে শত বুল বুল। ৫

খেলিতে নন্দন বনে প্রভাত প্রদোষ,
বিধির অনুজ্ঞাক্রমে,
ধরায় আসিলে নেমে,
ঢালিয়া মায়ের প্রাণে অমিয় সন্তোষ। ৬

খেলিতে চাঁদের শিশু আনন্দ বাগানে,
ভরিয়া মন্দার সাজি,
তুলিয়া নক্ষত্ররাজি,
সায়াহ্নে বিথারি দিতে অনন্ত বিমানে। ৭

ধন্য তব দয়া স্নেহ ধন্য দয়াময়,
তোমারি করুণা হেরি,

আলোক আঁধারে ঘেরি,
আইলো তোমারি জ্যোতি দুঃখীর আলয়।
মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন,
সামান্য বনের ফুলে,
অযুত মাণিক জ্বলে,
বেলা-ভূমে ইন্দীবর শোভে অতুলন। ৮

মম—সকলি স্বরগ আজি সকলি নন্দন।
আঁধারে আলোক হাসে,
শিশিরে মুকুতা ভাসে,
জলদ কৌস্তুভ খণ্ড করে বরিষণ। ৯

জয় রবে পূর্ণ ধরা—আনন্দ-বাজার,
এখানে শান্তিতে গড়া,
পারিজাত গাছ ভরা,
প্রেমিকার প্রাণে বহে ত্রিবেণীর ধার। ১০

হেথা—সকলি করুণা-মাখা—সকলি সুন্দর,
কোমল শিশুর ঠোঁটে,
অমৃত নির্ঝর ছোটে,
আমার পৃথিবী আজি অতি মনোহর ১১

এ পাশে বিনয় মম ও পাশে মুকুল,
মাঝখানে অনুপম,
স্বরগের দূত সম,
ফুটিল নন্দন পুষ্প মমতার ফুল। ১২

তুমি কি করুণাসিন্ধু বিভু স্বপ্রকাশ,
আজি এ নিশীথ ঘোরে,
এ ধন সঁপিলে মোরে,
একি হেরি চারি দিকে তোমারি আভাস? ১৩

আজ—আনন্দে লইয়া কোলে শিশু সুকুমার,
ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে,
অতীব ভকতিভরে,
মঙ্গল আশিষ ভিক্ষা করি গো তোমার। ১৪

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস,
"প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

ছিন্ন মালা।

এ কা'র সাধের মালা ধূলায় লুটায়।
অযত্নে পথেতে পড়ি যাইতেছে গড়াগড়ি,
কাহার প্রণয়-চিহ্ন এ না জানি হায়!
আজিকা প্রভাত বেলা কে জানি ভরিয়া ডালা
তুলেছিল ফুলগুলি প্রফুল্ল হিয়ায়;
কত আশা ল'য়ে বুকে, না জানি সে কত সুখে,
গেঁথেছিল সযতনে চারু মালিকায়।
ভাল বাসে সে যাহারে সাদরে ডাকিয়া তারে
দি'ছিল পরায়ে বুঝি তাহার গলায়।
সে নিঠুর অবহেলে মালিকা চরণে দ'লে
গিয়াছে ফেলিয়া দূরে ঘৃণা অবজ্ঞায়!
তাই এ প্রণয়চিহ্ন হ'য়ে এবে ছিন্ন ভিন্ন,
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপে শুকাইয়া যায়।
এ কার সাধের মালা হায়! হায়! হায়!!

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতারায়।

No. 393. October, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৩ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩০৪—অক্টোবর, ১৮৯৭। ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় স্মরণার্থ সভা—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ৬৪ বার্ষিক উৎসব হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্য করেন। অনরেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রেঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন ও শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। কলেজের বৃহৎ হলে স্থানাভাব হইয়াছিল। উৎসব-কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

অনাথবন্ধু সমিতি—গত ২৫এ সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়। অনরেবল নরেন্দ্র নাথ সেন সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন। গত বর্ষে এই সমিতির আয় প্রায় ৮০০ টাকা হয়, এবং ইহা হইতে নিয়মিতরূপে ২৫ জন বিধবা ও অসমর্থ ব্যক্তিকে মাসিক সাহায্য দান করা হয়। তদ্ভিন্ন পূজার সময় গরিবদিগকে বস্ত্র বিতরণ ও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থানে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বল নির্ব্বিশেষে দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান করা হয়। এরূপ সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়।

রাজভক্তি—সীমান্ত যুদ্ধে দেশীয় রাজগণ বীরত্ব প্রদর্শনে যে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা আর আশ্চর্য্য নহে। ঢোলপুরের মহারাণী গবর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধাধিকার পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

সীমান্ত যুদ্ধ—শত্রুদিগের দলবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা অসম-সাহসে যুদ্ধ করিতেছে। বিলাত হইতে সেনাপতি সার উইলিয়ম লক্‌হার্ট ইহাদের দমনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি অনেক যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছেন। অসভ্য জাতি ইহাঁর সম্মুখে কতক্ষণ যুঝিবে? মহারাণী রাজপ্রতিনিধিকে তারে লিখিয়াছেন:—"আমার অনেকগুলি সাহসিক সেনাপতি ও সৈন্যের বিয়োগে আমি গভীর শোকার্ত্ত, আহতেরা কেমন আছে?"

বাঙ্গালী সিভিলিয়ান্—জজ বাবু কেদার নাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ২ জন মাত্র ভারতবাসী।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী—রাণী হরসুন্দরী দৌহিত্র বাবু মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীকে আপনার স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন। তিনিই কাশিমবাজারের বিষয়বিভব ভোগদখল করিবেন।

তিলকের মোকর্দ্দমা—বোম্বাইয়ের জজেরা পূর্ণ বেঞ্চে রায় দিয়াছেন, তিলকের মোকর্দ্দমার বিলাত আপীল হইবে না। অন্য উপায়ে বিলাত আপীলের চেষ্টা হইতেছে।

বীরাঙ্গনা—অষ্ট্রীয়ার আর্চ ডিউক-পত্নী মেরিয়া থেরিসা অদ্ভুত বলশালিনী। তিনি বাইসিকেল চালনে খুব পটু; আবার একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে এক হস্তে শূন্যে তুলিতে পারেন।

দান—(১) আমেরিকা হইতে কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে প্রায় ১২০০ টাকা দাতব্য আসিয়াছিল, আবার ৮০০ টাকা আসিয়াছে। একজন কালাবোবা স্ত্রীলোকের যত্নে এই দুই হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। (২) মাণিকদহের জমীদার বাবু বিপিন বিহারী রায় ফরিদপুরে জলের কল স্থাপনার্থ টাকা দিয়াছেন। তাঁহার জননী ধনমণির নামে ইহার নামকরণ হইবে।

বড় লাটের ভ্রমণ—লর্ড এল্‌গিন ৯ই নবেম্বর সিমলা ছাড়িয়া ১২ই তারিখে ডায়মণ্ডহারবরে ষ্টিমারে চড়িয়া ব্রহ্মদেশ পরিদর্শনে গমন করিবেন। ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবেন।

প্রধান সেনাপতির পরিবর্ত্তন—প্রধান সেনাপতি সার জর্জ হোয়াইট ছয় মাস পরে বিলাত গমন করিবেন। তখন সার উইলিয়ম লক্‌হার্ট তাঁহার পদ পাইবেন।

গ্রীস তুরস্ক সন্ধি—ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তুরস্কের ক্ষতিপূরণস্বরূপ গ্রীসকে প্রভূত অর্থ দিতে হইবে।

হীরক-জুবিলী—এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত মহিলারা "ভারত-মুকুট" (C. I.) উপাধি পাইয়াছেন:—রাজকুমারী আলেকজান্দ্রা, লেডি হাবেলক, উদয়পুরের মহারাণী এবং মুরসিদাবাদের বেগম সাহেব।

বিবিধ-তত্ত্ব-সংগ্রহ।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী। এই সাম্রাজ্য এক শত উপদ্বীপ, পাঁচ শত এক হাজার হ্রদ, দুই হাজার নদ নদী, এবং দশ হাজার দ্বীপের সমষ্টি। তাঁহার ইঙ্গিতে নয় লক্ষ সৈন্য রণক্ষেত্রে ধাবিত হইতে বাধ্য। তাঁহার আদেশে এক হাজার রণপোত এবং এক লক্ষ নাবিক সমুদ্র-যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে প্রস্তুত। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রাচীন কালের এসিরিয় সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপ পুরাকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতাপকেও অতিক্রম করিয়াছে। প্রাচীন কালের কার্থেজীয় সাম্রাজ্যের নামে পৃথিবীর সকল জাতিই মস্তক অবনত করিত; বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের প্রতি পৃথিবীর সকল জাতির তদনুরূপ সম্মান দেখা যায়। পুরাকালের ইতিহাসে স্পেনিস্ সাম্রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আর দ্বিতীয় ছিল না; বর্ত্তমান ব্রিটিষ সাম্রাজ্য তদপেক্ষা সুবিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সম্মুখে রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয়; এবং প্রাচীন গ্রীক রাজ্য ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

২। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য যে কয়েকটী কালেজ আছে, তন্মধ্যে নিউনহেম কলেজ একটী প্রধান। এই কলেজ হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্ত্রীলোক বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৬৬৭ জন জীবিতা আছেন। ইহাঁদের মধ্যে ৩৭৪ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। ১৯৮ জন পরিণীতা হইয়া প্রধানতঃ গৃহকার্য্যে ও সন্তানপালনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১২২ জন অবিবাহিতাবস্থায় স্ব স্ব গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন; ইহাঁদিগের আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা থাকাতে জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত কোন কার্য্য করিবার আবশ্যকতা নাই। ৫ জন চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে এবং একজন মালিনীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

৩। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে তাড়িত প্রবাহ নব্বই হাজার ক্রোশ গমন করে। পৃথিবীর বিষুবরেখার পরিমাণ সাড়ে বার হাজার ক্রোশ; এই রেখা যদি তার দ্বারা সপ্তবার বেষ্টিত করা যায়, এবং এই তারের এক প্রান্তে যদি তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত করা যায়, তাহা হইলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ তাড়িত প্রবাহ পৃথিবীকে সাত বার বেষ্টন করিয়া আসিবে।

৪। যাহারা অনেক দিন মদ্যপানের অভ্যাস করিতেছে, তাহাদের মদ্যপান করিবার জন্য একটা অদম্য তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই তৃষ্ণা দমন করিতে

পারিলে অনেকে মদ্যপানাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে। কোন কোন মদ্যপায়ী পানাভ্যাস ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও এই পানতৃষ্ণা দমন করিতে পারে না বলিয়া, এই অভ্যাসও পরিত্যাগ করিতে পারে না। কি প্রকারে মদ্যপান জন্য এই দুর্দমনীয় তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনে অনেকানেক ইয়োরোপীয় ভিষক্ চেষ্টিত আছেন। এই সকল ভিষকের মধ্যে এক জন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যখন মদ্যপান করিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা বা তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখন কতকটা উষ্ণ জল পান করিলে তাহা নিবারিত হয়। আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ কোন মদ্যপায়ীকে পানাভ্যাস হইতে বিরত করিতে উৎসুক হয়েন, তাহা হইলে উপরি-উক্ত উপায়ের সার্থকতা কতদূর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

৫। সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলম্ নগরে দীর্ঘতম দিন সাড়ে আঠার ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। স্পিটজ্‌বারজেন্ নামক স্থানে দীর্ঘতম দিন সাড়ে তিন মাস কাল স্থায়ী হয়। লণ্ডন নগরে ও প্রসিয়ার অন্তঃপাতী ব্রিচেন্ নগরে সতর ঘণ্টা কালের অপেক্ষা দিন বড় হয় না। নরওয়ের অন্তঃপাতী ওয়ার্ডবর্গ নামক স্থানে মে মাসের ২১এ তারিখ হইতে জুলাই মাসের ২২এ তারিখ পর্য্যন্ত একটী মাত্র দিন হয়। সাইবিরিয়ার অন্তঃপাতী টোবোলস্ক নামক স্থানে দিন উনিশ ঘণ্টা অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয় না এবং যখন হ্রস্ব হয়, তখন পাঁচ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা অল্প সময় স্থায়ী হয় না। ফিন্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী টোরনিয়া নামক স্থানে জুন মাসের ২১এ তারিখে দিবাভাগ বাইশ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয় এবং ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে তিন ঘণ্টার অপেক্ষাও অল্পকাল স্থায়ী হয়।

৬। জুতা ও মোজা পরিধানের আবশ্যকতা বহুল পরিমাণে অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের ন্যায় অতি শীতপ্রধান দেশেও দেখা যায় যে, যাহারা জুতা ও মোজা কখন ব্যবহার করে না, তাহাদের পদদ্বয়ে শীত লাগাতে কোন প্রকারে তাহাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা জুতা মোজা ব্যবহার করে, তাহারা উহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেই শর্দ্দী বা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকালেও মোজা পরিধানের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। এ দেশে মোজা পরিধানের ব্যবস্থা কোন কালে ছিল না, সুতরাং শীতপ্রধান দেশের প্রচলিত অভ্যাস এ দেশের পক্ষে অনুপযুক্ত। তবে কোন কোন বিশেষরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মোজা পরিধান প্রশস্ত হইতে পারে।

৭। লণ্ডন নগরের ব্রিটিষ মিউজিয়মের অন্তর্গত পুস্তকালয় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান

পুস্তকালয় বলিয়া প্রখ্যাত। এই পুস্তকালয়ে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রত্যহ গড়ে ৬৭০ জন পুরুষ ও মহিলা গমন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অনেকে সংবাদপত্র পাঠ করিতে গিয়া থাকেন। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ পুস্তক এই লাইব্রেরী হইতে ইহার চাঁদাদাতৃগণ পাঠার্থে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যান।

দুর্গোৎসবের আমোদ।

দুর্গোৎসব হিন্দুর ঘরে মহামহোৎসব। হিন্দু সমাজে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এমন হৃদয়োন্মাদী উৎসব আর নাই। এই উৎসব হিন্দু সমাজে নব জীবন প্রদান করে। দুর্গোৎসবে এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত উত্তেজনা কেন হয়, তাহা যেন ঠিক্ বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ নাই, কিন্তু অশ্বমেধের ফল আছে। দুর্গোৎসবে সেই ফল লাভ হয়। ফল,—দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্বর্গভোগ। স্বর্গভোগ কর্ম্ম-সাধকের চরম লক্ষ্য। এই জন্যই কর্ম্মিসম্প্রদায় এই উৎসবে প্রাণ ঢালিয়া দেন। যে কোন সমাজের পনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক কর্ম্মী। এই জন্যই দুর্গোৎসব হিন্দুসমাজ-ব্যাপক বলিয়াই বোধ হয়। এই উৎসবে যাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি নাই,—তাঁহাদেরও আনন্দ। কেননা দুর্গোৎসবে শিল্প-বাণিজ্যের সমধিক প্রসার বৃদ্ধি হয়। এই জন্য মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাজারে সর্ব্বত্রই দুর্গোৎসবের লহরীলীলা দৃষ্ট হয়। বটতলার পুস্তকালয় ও মুদ্রাযন্ত্র সকলে প্রায়ই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই দুর্গোৎসব লাগিয়াছে। ঐ উৎসবের ছড়া পাঁচালি এক পয়সা মূল্যের পুস্তকাকারে, কলিকাতা সহরের অলিগলি প্রতিদিন হাজার হাজার বিক্রীত হইতেছে। আমাদের, সভ্যভব্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকলে যে দুর্গোৎসব না লাগে এমন নহে। প্রতি বৎসরেই তাঁহারা কতই আমোদ প্রমোদ করেন, কতই রসের ছড়া কাটান, কতই মনোহর চিত্রাবলীতে স্ব স্ব পত্রিকা পরিশোভিত করিয়া থাকেন,—কেহ বা গোলাপী,—কেহবা গুলে আনার,—কেহ বা জরদা রঙ্গের কাগজ বাহির করেন; কেহবা দুর্গাকে কাঁটাচাম্‌চে ধরান; কেহবা লক্ষ্মীকে বাইসিকেলে চড়ান,—কেহবা কলাবউর মাথায় ফিরাঙ্গী খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া মানুষের কাঁধে চড়াইয়া স্নান করিতে পাঠান এবং পত্রিকাসম্পাদকগণ এ বৎসরও (ভারত দুর্ভিক্ষ, মারী, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ও যুদ্ধে বিষাদান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও) দুর্গোৎসব উপলক্ষে রঙ্গরস ও আমোদ প্রমোদ করিতে ছাড়িতেছেন না।

আমাদের তাদৃশ উৎকট কবিত্ব, বিভীষণ বিভাবনা, অদ্ভুত রসিকতা না থাকিলেও, বামাবোধিনীর শারদীয়া সংখ্যার পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ আমরা একটু চেষ্টা করিব না কেন? আমরা রঙ্গিন্ কথা বলিতে জানি না, সুতরাং কাগজেরও রং ফিরাইব না। শাদা কাগজে শাদা কথায় দুই একটী চুট্‌কি গল্প শুনাইয়া দিব। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এই, কেহ যেন আমাদের কোন কথায় "টিস্ টিস্" না করেন,—তাহা করিলে গল্প জমিবে না।

(১)

সর্পের একটী নাম পবনাশ,—কেননা সে বায়ু ভক্ষণ করিয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটু নিটন গোচের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই জন্য কখন বেঙটা,—কখন ইঁদুরটার প্রাণ দিতে হয়। কোন সময়ে একটা সাপ অনেক দিন অনাহারে নিদারুণ ক্ষুধার আবেগে একটা বেঙ ধরিয়াছিল। এই সময়ে তাহার পরমেশ্বরকে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়; কিন্তু কথা কহিতে গেলে হাঁ করিতে হয়,—হাঁ করিলেই বেঙ পলায়;—এজন্য সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। তিনি অন্তর্যামী,—তাঁহার নিকট জিহ্বার কথাও যা, মনের চিন্তাও তাই। "ঠাকুর, তুমি সকলই দেখিতেছ,—বড় ক্ষুধার সময় এই আহার পাইয়াছি,—যেন নির্ব্বিঘ্নে উদরস্থ করিতে পারি।"

বেঙই বা চুপ করিয়া থাকিবে কেন? সেও কহিল,—"ঠাকুর আমিত যমের মুখে পড়িয়াছি,—তুমি ভিন্ন এ বিপদে আমায় আর কে রক্ষা করিবে? সঙ্কট-মোচন-মধুসূদন আমায় রক্ষা কর।"

ঠাকুরের ব্যবসায় বড় ভয়ানক। এক-কালে এই দুই জনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। সাপকে কহিলেন,—"বৎস, যখন অনেক দিনের পর ক্ষুধায় কাতর হইয়া বেঙ্ ধরিয়াছ,—কিছুতে ছাড়িবে না,—উত্তমরূপে ভোজন কর,—আমি আশীর্ব্বাদ করিলাম।" বেঙকে বলিলেন,—"বাছা, ঘোর বিপদে পড়িয়াছ,—এখন যত ব্যাকুল হইবে,—ততই বিপদ ভারী হইবে, নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান কর।"

সাপ ও বেঙ উভয়েই প্রাণপণে পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিতে লাগিল। সর্প ভেকের উপর প্রচুর বল প্রয়োগ করিতে লাগিল,—ভেক মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। সাপ কিছুক্ষণ পরে বুঝিল,—বেঙ মরিয়া গিয়াছে—আর বল প্রয়োগ অনাবশ্যক। বিশেষ অনেকক্ষণ ধরিয়া বলপ্রয়োগ করায় সর্পের কবল নিতান্তই ব্যথিত হইয়াছিল। সে বিশ্রামার্থ একবার উত্তমরূপে বদন ব্যাদান করিল। আর তখন সে নিশ্চিন্ত,—কেন না বেঙ্ মরিয়া গিয়াছে। বেঙ্ দেখিল, এই সময়,—একটী বিরাশীসিক্কা ওজনের লম্ফ প্রদান করিল। সেই লম্ফে দশ হাত,—আর

এক লম্ফে আর দশ হাত। সাপের পেটের দায়—বেঙের প্রাণের দায়,—সুতরাং সাপ চেষ্টা করিয়াও আর বেঙ্‌কে ধরিতে পারিল না। বেঙ লাফাইতে লাফাইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

বর্ষাকালে বেঙ্ ডাকে, সেই সঙ্গে এই সাপের মুখ হইতে পলায়িত বেঙের বংশধরগণও ডাকে। যাঁহারা ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝিবার কলাবিৎ,—তাঁহারা শুনেন,—"বিপৎকালে সহিষ্ণু হইলে, বিপদ কাটিতে পারে,—কিন্তু বিপদে অধীর হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।" আর যাঁহারা বেঙের ভাষা বুঝেন না, তাঁহারা কেবল 'গ্যাঙরগ্যাঙ্,—গ্যাঙরগ্যাঙ্' শুনিয়া থাকেন।

(২)

কোন রাজপুত্র নূতন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীটী প্রৌঢ়। একদা যুবরাজ একখানি খুব ধারাল ছুরীর দ্বারা কলম কাটিতে কাটিতে অসাবধানতাবশতঃ একটী অঙ্গুলির খানিকটা কাটিয়া ফেলিলেন। অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল,—রাজপুত্র যন্ত্রণায় অধীর হইলেন,—চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। কিন্তু মন্ত্রী ধীর ও গম্ভীরভাবে আপন কার্য্য করিতেছিলেন,—রাজ-অঙ্গুলি কর্ত্তনরূপ সুবৃহৎ ব্যাপারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। মন্ত্রীর এইরূপ উদাসীনভাব দর্শনেই রাজপুত্র বিরক্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রীকে কহিলেন, "মহাশয়, আজ এমন একটা অমঙ্গল ঘটিল,—আপনার কি খবর হয় নাই?" মন্ত্রী কহিলেন "যুবরাজ, আমার নিকট এই খবর আসিয়াছে যে, উহা আপনার পরম মঙ্গল,—ঈশ্বরের রাজ্যে সকল ঘটনাই মঙ্গলদায়ক।" রাজপুত্র এ কথার মর্ম্ম না বুঝিয়া মন্ত্রীর প্রতি রুষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রত্যাশা ছিল, রাজ-অঙ্গে রক্তপাত দেখিয়া তিনি অনেকবার 'আহা! উহু!' করিবেন। মন্ত্রী তাহা করিলেন না। এই অপরাধে তাঁহাকে কিছু দণ্ড দিতে রাজপুত্রের ইচ্ছা হইল। প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারেন না। অচিরকাল মধ্যে মৃগয়া-ব্যপদেশে মন্ত্রীকে কোন নিবিড়বনমধ্যবর্ত্তী অন্ধকূপে কৌশলে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"মন্ত্রিবর, আপনি কূপে পতিত হইলেন বলিয়া দুঃখিত হইবেন না,—কারণ সকল ঘটনাই ঈশ্বরকৃত ও মঙ্গলদায়ক।" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই।"

রাজপুত্র মন্ত্রীকে কূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল এবং সেই বনের গুহ্যতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা তাহাদের আরাধ্যা কালিকাদেবীর মন্দিরে লইয়া গেল। তাহাদের কোন গুরুতর অভীষ্ট সিদ্ধির কামনায় একটী অক্ষতশরীর নরকে দেবীর নিকট বলি দিবার মানস ছিল। বহুদিন ব্যাপিয়া বহু অনুসন্ধানের

পর আজ তাহারা কেবল নরকে নয়—নরপতিকে পাইয়াছে। মহানন্দে তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটী প্রাচীন দস্যু কহিল,—"ওরে, তোরাত সকলে রাজপুত্র বলিদান করিবার জন্য আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিস্, উহার গায়ে কোন খুঁত আছে কিনা, আগে ভাল করিয়া দ্যাখ্।" বৃদ্ধ দস্যুর কথা শুনিয়া সকলেই রাজপুত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন স্থানে কোন প্রকার ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইল না,—কেবল সেই ছুরিকা-কর্ত্তিত অঙ্গুলিতে এক-খানি শোণিতপূয়-সমাকুল ক্ষত দেখিতে পাইল। সকলেই উৎকট আশা ভঙ্গ নিবন্ধন যারপর নাই ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইল। রাজপুত্র বলিদান করা হইল না,—তাঁহাকে একটী অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিল।

রাজপুত্র দৈবকৃপায় দস্যুহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এক দৌড়ে সেই অন্ধকূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি যত্নে মন্ত্রিবরকে উত্তোলন করিলেন। তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,—"মন্ত্রিবর, আমি আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে কূপে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কতই কষ্ট দিয়াছি,—আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার কথাই সত্য,—সেই অঙ্গুলি কাটা হইতেই আজ প্রাণরক্ষা হইয়াছে"। এই কথা বলিয়া দস্যুবিবরণ বিবৃত করিলেন।

মন্ত্রী কহিলেন,—"যুবরাজ আপনি আমাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই,—আজ আমারও প্রাণরক্ষা হইল। আমি কূপে পতিত না হইলে দস্যুগণ আমাকেও ধরিত এবং আমাকেই বলি দিত; কেননা আমার শরীরের কোন স্থানে কোন ক্ষত নাই। কূপ-পাতই আমার প্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছে।" তখন রাজপুত্র মন্ত্রিবরকে অগণ্য সাধুবাদ দিয়া কহিলেন,—

আজ বুঝিলাম, ঈশ্বরের রাজ্যে সকল ঘটনাই মঙ্গলদায়ক,—এই সত্য প্রাণে গাঁথা রহিল,—আর কখনই ভুলিব না।"

(৩)

একদা কোন সাধুর নিকটে কয়েকটী গৃহস্থ ও বিষয়াসক্ত যুবক বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একটী যুবক সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনিত আমাদিগকে ভজন সাধন করিতে উপদেশ দিতেছেন,—ভজনসাধন করা উচিত বটে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু করি কখন? অবকাশ কই? ঐ কার্য্যে একটু নির্জ্জনতা আবশ্যক।" সাধু সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"বাবা, তোমার বিবাহ হইয়াছে?"

যুবক কহিলেন,—"হইয়াছে।"

সাধু। তোমার বাড়ীতে যতই গোলযোগ থাকুক,—অথবা স্থানের অল্পতা যতই হউক, আর তুমি নিজে বিষয়কার্য্যে যতই ব্যস্ত থাক,—বাবা,

সত্য করিয়া বল দেখি, প্রতি দিন ষাইট দণ্ডের মধ্যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দুই চারিটী মনঃপ্রাণের গোপনীয় কথা কহিবার জন্য একটু সময় এবং একটু নির্জ্জন স্থান পাও কি না?

যুবক। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অধোবদনে কহিলেন, "আজ্ঞে, তা পাই বই কি।"

সাধু। তবে ভগবানের ভজন করিতে স্থান ও সময় পাওনা কেন?

যুবক। ভগবদ্ভজনের অবকাশ ও স্থান পাই না, তাহাই বলিতে পারি,—কেন পাই না, তাহাত বলিতে পারি না।

সাধু। তুমি বলিতে পার না,—কিন্তু আমি বলিতে পারি, শুনিবে কি?

যুবক। অবশ্যই শুনিব।

সাধু। তুমি আপনার প্রণয়িনী যুবতী স্ত্রীকে যতখানি ভালবাস,—ঈশ্বরের প্রতি যদি তোমার ততখানি ভালবাসা থাকিত,—তাহা হইলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নির্জ্জন স্থান ও একটু সময় অবশ্যই পাইতে।

(৪)

কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি একদা আপনার দিগ্‌গজ সভাপণ্ডিতকে ডাকিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিতপ্রবর, রাজকার্য্য করিতে করিতে বয়স শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু সংসারবন্ধন ত শিথিল হইতেছে না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ পূর্ব্বে সংসারধর্ম্মের আচরণে যত সুখ পাইতাম,—এখন আর তত সুখ পাই না। আপনাদের মুখে শুনিতে পাই, সংসার-বন্ধন মোচন না হইলে প্রকৃত সুখ হয় না। অতএব আপনি আমাকে বলিয়া দিন, কি করিলে আমার সংসারবন্ধন-মোচন হইবে?

সভাপণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পড়া ছিল। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে সংকল্প করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইত। কিন্তু এই রাজার বাড়ী কখন পাঠ করা ঘটে নাই। সম্প্রতি তিনি এই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, তাহারত সহজ উপায় পড়িয়া রহিয়াছে। সংকল্প করিয়া অয়ন-পরিমিত কাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করুন,—অনায়াসে সংসারবন্ধন মোচন হইবে। তবে এই কার্য্যে কিছু ব্যয়বাহুল্য হইবে।"

রাজা কহিলেন,—"ব্যয়ের চিন্তা আপনার কি? আমার অভীষ্ট যদি সিদ্ধ হয়, তবে রাজভাণ্ডার লুটাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনার আদেশে প্রধান মুন্‌সি তালিকা লিখিবেন।" সভাপণ্ডিত দেখিলেন, দশ টাকা উপার্জ্জনের এমন সুযোগ আর হইবে না। ছয় সহস্র মুদ্রা ব্যয়ের এক তালিকা প্রস্তুত করাইয়া রাজাকে দেখাইলেন। তালিকা রাজার অনুমোদিত হইলে শুভ দিনে পাঠ আরম্ভ হইল। মহাসমারোহে ছয় মাসে ভাগবত-ব্যাখ্যা শেষ হইল। প্রচুর

অর্থ, স্বর্ণাভরণ, রৌপ্যের ঘড়া, ঘটী, বাটী ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া সভাপণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দের পরিসীমা নাই। তিনি যখন এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, সেই সময়ে এক দিন রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিতজী, আপনি বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করিলে আমার সংসারবন্ধন মোচন হইবে। তজ্জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার মুখে ভাগবত শুনিলাম,—কিন্তু আমার মোচন হইল কই? ভাগবত শ্রবণের পূর্ব্বেও আমার মন যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। ইহার কারণ আপনাকে বলিতে হইবে। কল্য সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময় দিলাম,—ইহার মধ্যে যদি আমার প্রীতিজনক উত্তর দিতে পারেন ভাল নচেৎ আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" রাজার সক্রোধবাক্য শ্রবণে সভাপণ্ডিতের চক্ষু স্থির হইল,—ভয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গেল। বিষণ্ণবদনে গৃহে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। স্নান-আহ্নিক-ভোজন মাথায় উঠিল, দুশ্চিন্তায় শরীর অবসন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। অর্দ্ধনিদ্রিতবৎ শয়ান আছেন।

সভাপণ্ডিতের একটী মাত্র পুত্র। পুত্রটী গণ্ডমূর্খ ও বাতুল বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত। স্নানাহারের সময় দেখিয়া সেও এই সময়ে গৃহে আসিল। জননীর নিকট খাদ্য চাহিল। জননী কহিলেন,—"কর্ত্তা আজ রাজসভা হইতে আসিয়াই শয়ন করিয়াছেন,—এখনও স্নান করেন নাই,—স্নান-আহ্নিক করিতে কতই অনুরোধ করিলাম,—অসুখ হইয়াছে বলিয়া উঠিলেন না। আমার বোধ হয়, পীড়া হয় নাই,—কি দুর্ঘটনা হইয়াছে;—তুই একবার ডাক্ দেখি!"

পুত্রটীর নাম, বলাই। বলাই মাতার আদেশে কর্ত্তার ঘরে গেল এবং তাঁহার গায়ে হাত দিয়া কহিল,—"বাবা, ও বাবা, ওঠ না,—কি ঢং ক'রে প'ড়ে আছ,—ভাত শুকিয়ে গেল,—তুমি না খেলে আমাদেরও খাওয়া হবে না,—ওঠ,—নাও—কোষাকুষি ঠং ঠং কোরে ভাত খাও।"

কর্ত্তা কহিলেন,—"তুই পাগল, আমার জ্বালার উপর জ্বালা দিতে আসিলি কেন?

বলাই কহিল,—"তোমার আবার কি জ্বালা বলোই না শুনি।"

"তোকে আর কি বলিব?"

"কেন? আমি কি মানুষ নই?—না তোমার ছেলে নই? বলেই কেন দেখ না।"

কি মনে হইল! কর্ত্তা সেই পাগল পুত্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। বলাই শুনিয়া হাসিল এবং কহিল,—"এই কথা? ইহার জন্য তোমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ? আঃ আমার পোড়া কপাল! ইহার উত্তর আমি দিব,—তুমি এখন উঠে নাও খাও। বৈকালে রাজবাড়ী গিয়া বলিয়া আসিও, কল্য অপরাহ্ণে রাজার প্রশ্নের উত্তর হইবে। কিন্তু সে উত্তর রাজধানীর মধ্যে রাজসভায় বসিয়া হইবে না,—তাহা নগরপ্রান্তে বনমধ্যে

গিয়া দিতে হইবে। রাজার সঙ্গে কোন লোক জন থাকিতে পাইবে না। রাজাকে একাকী যাইতে হইবে, আর আমরা দুই পিতাপুত্রে তাঁহার সঙ্গে যাইব। বাবা, আমাকে কিন্তু চারিটা পয়সা এখনি দিতে হইবে, নতুবা উত্তর দিব না।" কর্ত্তা প্রাণদণ্ডই নিশ্চিত করিয়াছেন, তথাপি যেন পুত্রের কথায় বিশ্বাস হইল, এই ভান করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন,—কেননা তিনি না উঠিলে সাধ্বী পত্নীর ও পুত্রের আহার হয় না এবং আপনারও উদর জ্বালা ধরিয়াছিল।

এ দিকে বলাই পিতার নিকট চারিটা পয়সা লইয়া বাজার হইতে এক সের কোষ্টা আনিয়া দড়া পাকাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দুই গাছি উৎকৃষ্ট দড়া প্রস্তুত করিল। কর্ত্তাও যথাসময়ে রাজসদনে গমনপূর্ব্বক উত্তরপ্রদানের স্থান ও সময় ঠিক্ করিয়া আসিলেন। রাজাও দেখিলেন, যখন একটা লোকের প্রাণদণ্ডের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তাহার কোন ওজর রাখা উচিত নহে। অগত্যা সভাপণ্ডিতের তাদৃশ অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইল। রাজা, সভাপণ্ডিত এবং তৎপুত্র পাগল বলাই তিন জনে রাজধানী ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা কহিলেন,—"পণ্ডিতবর! আপনার প্রার্থনামতে আমি একাকী নিঃসহায় অবস্থায় এই নিবিড় বনের মধ্যে আসিয়াছি। সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই,—শীঘ্র আমার কথার উত্তর দিন।" পণ্ডিত কহিলেন,—"মহারাজ, আমার আর একটী প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমার এই পুত্র আপনার কথার যে উত্তর দিবে, তাহাই আমার উত্তর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; কেননা 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' আমার আত্মাই এই পুত্ররূপে অবতীর্ণ—অতএব আমি ও আমার পুত্র অভিন্ন।" রাজা হাসিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিত, আমি জানিতাম, আপনার পুত্রটীই বাতুল, এখন দেখিতেছি আপনিও তদ্রূপ। আপনি শাস্ত্রবিৎ হইয়া যে প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেন, আপনার নিরক্ষর বাতুল পুত্র সেই প্রশ্নের উত্তর দিবে, ইহা কি সঙ্গত প্রার্থনা হইল? আপনি উত্তর দিন, আর আপনার পুত্রই দিন, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। ওহে বলাই, তোমার বাপের কথা শুনিলেত? এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আর বিলম্ব করিতেছ কেন?" বলাই কহিল,—"মহারাজের অনুমতি হইল, এখন বাবার অনুমতি হইলেই উত্তর দেই। কি বল বাবা, উত্তর দিব নাকি?" সভাপণ্ডিত মহাশয় অনুমতি দিবামাত্র বলাই আপনার অঙ্গবস্ত্রের মধ্য হইতে দুই গাছি নূতন দড়া বাহির করিল এবং তাহার এক গাছি দ্বারা পিতার দুই হস্ত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দড়ার অপর প্রান্ত একটী বৃহৎ বৃক্ষে বন্ধন করিল। অনন্তর অপর দড়ায় রাজাকেও আর একটী বৃক্ষে

দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে রাজা কহিলেন, —"একি! বলাই, চলিলে যে?" বলাই কহিল—"যাইব না ত কি করিব বলুন।"

রাজা কহিলেন, "আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দাও।"

বলাই,—"কেন, বাবা রহিলেন, তিনিই আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন।"

"সে কিরে পাগল, তোর বাপেরও যে হাত বাঁধা,—তিনি কিরূপে খুলিয়া দিবেন?"

তখন বলাই রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"মহারাজ, এখন বলুন দেখি, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছি কি না?"

রাজা কহিলেন,—"বলাই, আজ বুঝিলাম তুমিত পাগল নও, তোমাকে যারা পাগল বলে, তারাই পাগল।"

তখন বলাই, রাজার বন্ধন খুলিতে খুলিতে বলিতে লাগিল,—"আমার হাত খোলা বলিয়া আমি আপনার বন্ধন খুলিতে পারিলাম, বাবার হাত বাঁধা বলিয়া তিনি তাহা পারিলেন না। সেইরূপ যিনি নিজে মুক্ত পুরুষ, তিনিই ভাগবত শুনাইয়া অপরকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারেন, বাবার মত সংসারবদ্ধ পুরুষের মুখে ভাগবত শুনিলে সংসারবন্ধন মোচন হয় না।"

কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের বর্ত্তমান জীবন।

পরোপকার-ব্রতে জীবন-উৎসর্গকারিণী শ্রীমতী কুমারী নাইটিঙ্গেলের নাম আমাদের পাঠিকাবর্গ সম্যক্ অবগত আছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী আমরা এই পত্রিকায় পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি এবং সময়ে সময়ে তাঁহার লোকহিতকর সৎকার্য্যের বৃত্তান্ত পাঠিকাগণকে জ্ঞাপন করিয়াছি। কুমারী নাইটিঙ্গেল বৃদ্ধা হইলেও আজও সুস্থদেহে সাধ্যানুযায়ী সৎকার্য্যসম্পাদনে কালাতিপাত করিতেছেন। কুমারী নাইটিঙ্গেলের এক্ষণে ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তিনি এক্ষণে লণ্ডন নগরের পশ্চিমভাগস্থ কোন পল্লীর একটী ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতেছেন। অল্পকাল হইল পৃথিবী-ভ্রমণকারী আমেরিকাদেশীয় এক জন ভদ্র লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। কুমারী তাঁহাকে বলেন, আমেরিকা হইতে তিনি সর্ব্বদাই অতি অনুগ্রহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি আমেরিকাবাসিগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমেরিকার চিকিৎসাগারসমূহের উন্নতিসাধনার্থ তিনি যে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাহা

সমীচীন মনে করিয়া তৎসমুদায় কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমেরিকার যে উপকার সাধিত হয়, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কুমারী নাইটিঙ্গেলকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। কুমারী উক্ত আমেরিকাবাসীকে ঐ প্রশংসাপত্র দেখাইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার স্বদেশের গবর্ণমেণ্টের সাধুবাদ করেন। উক্ত আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী বলেন;—"দেখিলাম শ্রদ্ধেয়া কুমারীর গৃহ ছবি, পুস্তক, রৌপ্য ও স্বর্ণপদক এবং অন্যান্য নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বা সৌন্দর্য্যসাধক দ্রব্যে পরিপূর্ণ। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তৎসমস্তই নূতন, পুরাতন, জীবিত, মৃত, দেশীয়, বিদেশীয় বন্ধুগণের প্রদত্ত উপহার। কুমারী তাঁহার সাক্ষাৎকারকারীকে বলিলেন,—"স্নেহশীল ও অনুরক্ত বন্ধুগণ আমাকে সর্ব্বদাই সদয়ভাবে স্মরণ করেন। ইহাঁদিগের অনেকেরই সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই,—কিন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহে ও স্নেহে যে আমি কত মুগ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। আপনি আমেরিকায় প্রতিগমন করিয়া আমার আমেরিকার বন্ধুগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবেন যে, তাঁহাদের প্রণয় ও অনুরাগব্যঞ্জক পত্রাদি পাইয়া আমি পরমানন্দ উপভোগ করি, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি জীবনে যে সামান্য সৎকার্য্য করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমি যথেষ্ট পুরস্কার পাইতেছি। সাধারণ নাগরিক চিকিৎসালয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের চিকিৎসাগারে রোগী ও আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা সম্বন্ধে আমি ক্রিমিয়ার সংগ্রামকাল হইতে যে সকল নিয়ম ও রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছি, তৎসমস্তই এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণে গভীর সুখ অনুভব করিতেছি।

কুমারী নাইটিঙ্গেল এই বৃদ্ধ বয়সে লেখনী চালনা দ্বারা সৎকার্য্যের যতটুকু সাহায্য করিতে পারেন, তাহা করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখী হইয়া রহিয়াছেন। কিছুকাল হইল তিনি ভারতের গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য একটী ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব ভারতীয় নানা সংবাদপত্রে বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছিল এবং সকলেই উহার প্রয়োজনীয় ও শুভফলদায়ী প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোন চেষ্টাই হয় নাই।

ব্রহ্ম মহিলা।

ব্রহ্মদেশে অবরোধপ্রথা প্রচলিত নাই। তথায় মহিলাগণ রাজপথে ও সকল প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। ফ্রান্স দেশের ন্যায় ব্রহ্ম দেশে স্ত্রীলোক-

দিগকে নানা দ্রব্যের দোকান খুলিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতে দেখা যায়। ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্রহ্মদেশীয় মহিলাগণ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নাই। বাল্যাবস্থায় ঘুঁড়ি উড়ান, নৃত্য এবং বাল্য-কালোচিত ক্রীড়ায় ব্রহ্মদেশীয় বালিকাগণ সময়াতিপাত করে। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বালিকাদিগের কর্ণ-বেধ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর হইতে বালিকা যুবতী নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই নিমিত্ত কর্ণবেধ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্র-বিৎ পণ্ডিতের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং তিনি যে দিন ও ক্ষণ ঐ ক্রিয়ার পক্ষে শুভ বলেন, সেই শুভ দিনে ও শুভ ক্ষণে উহা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুগণ পরিবার সহ নিমন্ত্রিত হয়েন। তাঁহাদেরই সম্মুখে স্বর্ণনির্ম্মিত শলাকা দ্বারা বালিকার কর্ণ বিদ্ধ করা হয়। কর্ণবেধকার্য্য কতকগুলি লোকের ব্যবসায়। তাহাদিগের দ্বারাই ঐ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কর্ণ বিদ্ধ করা হইলে উহা একটী কর্ণাঙ্গুরীয় দ্বারা সুশোভিত করা হয়।

ব্রহ্মদেশীয় মহিলা স্বয়ং মনোনীত করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন। পিতা মাতা বা গুরুজন কন্যার মনোনীত পাত্র সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না। তবে ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে একটী কু-সংস্কার প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা বালিকার মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার স্বাধীনতা কিছু খর্ব্ব হয়। যে বালিকা যে দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুসারে তাহার মনোনীত পাত্রের জন্মদিন শুভকর হওয়া আবশ্যক। যে বালিকা রবিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে যদি এরূপ ব্যক্তিকে স্বামিত্বে বরণ করে বুধবার যাহার জন্মদিন, তাহা হইলে বালিকার পক্ষে সে বিবাহ বড় অশুভকর হইবে। এইরূপ পাত্র ও পাত্রীর জন্মদিনের যোগ লইয়া শুভাশুভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় সংস্কার ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এই জন্য ব্রহ্মদেশীয় বালিকার পাত্র মনোনীত করিয়া বিবাহ করিবার যে স্বাধীনতা আছে, তাহা অনেকটা সীমাবদ্ধ বলিতে হইবে।

ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিবাহ-প্রথার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, উহাদিগের বিবাহে পুরোহিত উপস্থিত হয়েন না। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ চিরকৌমার্য্যব্রতাবলম্বী —তাঁহারা জীবনে বিবাহ করেন না এবং বিবাহানুষ্ঠানে কোন প্রকার যোগ দেন না। সুতরাং ব্রহ্মদেশে বিবাহ একটি ধর্ম্মশূন্য পারিবারিক অনুষ্ঠান। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিবসে পাত্রীর আলয়ে কন্যা ও বর পক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইলে কেহ সদালাপে প্রবৃত্ত হয়েন, কেহ বা মিষ্টান্নভোজনে ব্যাপৃত হয়েন, কেহ বা ধূম্রপানে নিযুক্ত থাকেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে,

কন্যা ও বরের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বর ও কন্যার নাম উল্লেখ করিয়া সভাস্থ সমবেত ভদ্রব্যক্তিগণকে জ্ঞাত করান যে, তাঁহারা দুই জনে অদ্য হইতে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে সভাভঙ্গ হয়, বর ও কন্যা সভা হইতে অবসৃত হয়েন এবং বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মদেশে স্বামীর যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি থাকে, স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীর তাহার অর্দ্ধাংশের উপর পূর্ণ অধিকার। স্বামী ও স্ত্রীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার ব্রহ্ম-দেশের সামাজিক প্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিবাহের পর কয়েক বৎসর স্বামীর উপর স্ত্রীর আধিপত্য খাটে। প্রথা আছে যে, বিবাহের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর স্বামী স্ত্রীর পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিবেন এবং স্ত্রীর ও শ্বশ্রূর ভরণপোষণ নিজব্যয়ে নির্ব্বাহ করিবেন। যত দিন এ অবস্থায় থাকিবেন, ততদিন স্বামীকে স্বীয় শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর এক প্রকার অধীন হইয়া থাকিতে হয়, স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ শ্বশ্রূর হস্তে অর্পণ করিতে হয়; সুতরাং এই স্বল্পকাল স্ত্রী ও শ্বশ্রূ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করেন।

অতি সহজেই ব্রহ্মদেশে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা যায়। মনোমালিন্য বা সামান্য দুর্ব্ব্যবহারের জন্য পতি স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী এবং পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন।

ব্রহ্মদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্য জাতীয়দিগের সহিত ব্রহ্মদেশীয়দিগের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় অনেক মহিলা চীন-দেশীয় পুরুষকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতীগণের পুত্র চীনজাতীয় এবং কন্যা ব্রহ্মদেশীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মদেশীয় মহিলাগণের স্বধর্ম্মে সবিশেষ নিষ্ঠা দেখা যায়। বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিকে ব্রহ্মবাসী "পেগোডা" নামে অভিহিত করেন। এই পেগোডায় বুদ্ধদেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্রহ্ম-মহিলা প্রত্যহ পেগোডায় গমন করিয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে অবনতজানু হইয়া করযোড়ে বুদ্ধদেবের স্তব আবৃত্তি করেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক ব্রহ্মমহিলা সন্ন্যাসিনীর ব্রত অবলম্বন করিতেন। সন্ন্যাসিনীদিগের বাসের জন্য সুপ্রশস্ত অট্টালিকা দেখা যাইত। এক্ষণে সন্ন্যাসিনী ব্রতধারিণী ব্রহ্মবাসিনীর সংখ্যা খুব অল্প। যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহারা বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির পূজার আয়োজন এবং মন্দির রক্ষণাবেক্ষণকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

ব্রহ্মমহিলার পরিচ্ছদ সুসভ্য বলা যাইতে পারে। গাত্রে আঙরাখা, পরিধানে সাড়ি এবং আঙরাখার উপর একটা ওড়না, ইহাই ইহাদিগের পরিচ্ছদ। ধনী বংশের মহিলাগণ বহুমূল্য রেশমের বস্ত্র বা অন্য কোন প্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রের পোশাক

ব্যবহার করেন। ইহাঁরা দীর্ঘকেশ রাখিয়া থাকেন এবং মস্তকের উপরিভাগে বেণী বন্ধন করেন।

ব্রহ্মমহিলাদিগের একটী কু-অভ্যাস আছে। ইহাঁরা সর্ব্বদাই চুরুটের আকারে ধূম্রপান করেন। অতি অল্পবয়স্কা বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল ব্রহ্মরমণীর মুখে প্রায় সর্ব্বদাই চুরুট দেখা যায়। চুরুট-গুলি প্রায় এক ফুট লম্বা। কখন কখন দেখা যায়, মাতার ক্রোড়ে চারি বা পাঁচ বৎসরবয়স্কা কন্যা উপবিষ্টা রহিয়াছে, মাতা চুরুটের ধূম্রপান করিতেছেন, এমন সময়ে নিজের মুখ হইতে তাহা বাহির করিয়া ক্রোড়োপবিষ্টা কন্যার মুখে ধরাইয়া দিলেন, কন্যা তাহা সাহ্লাদে পান করিতে লাগিল।

দড়ির পাক।

লেখক ও বক্তাগণ বিষ্ণুমায়ার সহিত সর্ব্বদাই রজ্জু বা দড়ির সাদৃশ্য দিয়া থাকেন। কেননা দড়ি যেমন এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সহিত বন্ধন করিয়া থাকে, মায়াও তদ্রূপ জীবকে জড় জগতের সহিত বন্ধন করিয়া রাখে। মায়া ও রজ্জুর যে কেবল বন্ধনাংশে সাদৃশ্য, তাহা নহে; উহাদের মধ্যে আরও একটী অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। তাহাই দেখাইবার জন্য আজ আমরা দড়ি পাকাইতে বসিলাম।

কোন স্থলে মায়া আছে—তাহার প্রভুত্ব নাই; কোথাও মায়া আছে, তাহার প্রভুত্বও আছে। 'যেখানে প্রভুত্বহীনা মায়া বিরাজ করেন, তাহাই পরব্যোমের পারঙ্গত নির্ম্মায়িক অপ্রাকৃত ধাম, বা ভগবদ্ধাম; আর যেখানে প্রভুত্বশালিনী মায়ার বিশাল অধিকার, তাহাই জীবলোক' শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। ভগবান্ অংশী—জীব অংশ;—জড়পদার্থের অংশী অংশের তারতম্য যেমন পরিমাণের অল্পাধিক্যমূলক,—চিন্ময় পদার্থে সে নিয়ম নাই। চিন্ময় পদার্থের অংশী-অংশের তারতম্য মায়াধিকারনিষ্ঠ। শাস্ত্রে মায়াহীন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' না হইতে পারিলেও জীবের সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া চরম শান্তি লাভ হয় না। জীব পরানন্দ লাভের জন্য কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিপথে যতই সাধন ভজন করুন না কেন, মায়াধীনতা ত্যাগ করিতে না পারিলে, কোন প্রকারেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। এই জন্য প্রজ্ঞাবান্ সাধকমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে মায়াবন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্ধামে মায়ার প্রভুত্ব নাই বটে,—কিন্তু মায়ারজ্জুর এক প্রান্ত, ভগবচ্চরণাধিষ্ঠিত সিংহাসনের এক পায়ে চাপা আছে, আর এক প্রান্ত জীবের গলায় বদ্ধ

হইয়া তাহাকে বানর নাচাইতেছে। কখন কখন ঐ গলবদ্ধ ফাঁসি এমন কসিয়া যায় যে, তদ্দ্বারা জীবের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাঁহারা জানেন, দড়ির এক প্রান্তে যত পাক খায়, অন্য প্রান্ত ততই এলাইয়া যায়—দড়ির কোন প্রান্তের পাক কসিতে হইলে অন্য প্রান্তে উল্টা পাক দিতে হয়, তাঁহারা মায়ারজ্জুতে উল্টা পাক দিয়া থাকেন। তাহাতে মায়ারজ্জুর যে প্রান্ত সংসারে আছে, তাহার পাক এলাইয়া যায় এবং যে প্রান্ত ভগবদ্ধামে, তাহার পাক কসিতে থাকে; অর্থাৎ যাঁহারা যে পরিমাণে সংসার-আসক্তি শিথিল করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই পরিমাণেই চিদাসক্তি বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণে চিদাসক্তি বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণেই ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি হইয়া পরানন্দের উদয় হইতে থাকে। অতএব যিনি যত পারেন, মায়া-রজ্জুতে উল্টা পাক দিতে থাকুন। সোজা পাক সকলেই দিতেছেন বটে, কিন্তু অন্য দিক্ যে একবারে এলাইয়া যাইতেছে—তাহা দেখিতেছেন না।

রাজা ক্রোরী সন্তোষ রায়।

এই উদারচেতা মহানুভব সামান্যাবস্থা হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং চিরকীর্ত্তি লাভ করিয়া মানবলীলা সম্বরণপূর্ব্বক অমর ভবনে গমন করিয়াছেন। অদ্য আমি ইহাঁর পরম পবিত্র সুবিস্তৃত জীবনের কিয়দংশ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভারত-বিখ্যাত মোগল সম্রাট্ মহাত্মা আকবর-সাহের রাজত্বের প্রারম্ভে হুগলীর অন্তঃপাতী কোনা-নামক গ্রামে কায়স্থ-কুল-সমুদ্ভূত গোবিন্দরাম পালিত বাস করিতেন। তাঁহার তিনটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ সন্তোষরাম, মধ্যম রাজারাম এবং কনিষ্ঠ মধুসূদন। সন্তোষরাম কোন্ সালে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না; আনুমানিক ইংরাজি ১৫৫০ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

সন্তোষরাম যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু, সেই সময় হইতে স্বীয় জননীকে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। জননী আহার না করিলে জল-স্পর্শ করিতেন না। তিনি প্রত্যহ জননীর চরণোদক পান ও ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিতেন। জননীকে দুঃখিত দেখিলে, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এবং যে উপায়ে হউক তাঁহাকে সান্ত্বনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ইহাতে গ্রামস্থ কি ইতর, কি ভদ্র, সকলেই সন্তোষরামকে প্রাণাপেক্ষা অধিক-

* ইনি ক্রোর টাকার অধিকারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত "ক্রোরী" এই উপাধিসূচক নামে এতদ্দেশীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত।

তর ভাল বাসিতেন। সন্তোষরাম শৈশব-কালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া রাজভাষা অর্থাৎ পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ পরিশ্রম ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ে সংস্কৃত ভাষায় ও বহুবিধ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তৎকালে তাঁহার তুল্য বিদ্যালঙ্কার-ভূষিত পুরুষ সে প্রদেশেই ছিল না। তিনি নদীতীরস্থ সুবিমল পবিত্র মারুত সেবন করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার মনের ইচ্ছা যে, অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইলেই নদীতটে বাসগৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিবেন। তাঁহার এ আশা অনতি-বিলম্বে ফলবতী হইল। কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পূত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে তাঁহার মাতামহের একটি প্রাসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এই প্রাসাদই তাঁহার সমুদয় সমৃদ্ধির মূল।

একদা সন্তোষরাম গঙ্গাস্নানোপলক্ষে ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হওয়াতে, অগত্যা তাঁহাকে মাতামহের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ক্রমে দিবাবসানে নিশা ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, প্রবল-বাত্যা মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কার করিয়া স্থাবর জঙ্গম কম্পান্বিত করিতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ে একখানি আরোহিপূর্ণ প্রকাণ্ড তরণী গঙ্গাভ্যন্তরস্থ বালুকা-ময় ভূমিতে বেগে সংলগ্ন হইয়া গেল। তখন নৌকারোহিগণ তীরে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় তাড়িতালোক-প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া হর্ষোৎফুল্লমনে তাহার দ্বার-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "হে গৃহস্বামিন্, অদ্য-রাত্রে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন।" ইহা শ্রবণে সন্তোষরাম কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, তদীয় ভৃত্যকে দ্বারোন্মোচন করিতে এবং আগন্তুকদিগকে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্য দ্বারোন্মোচন করিবামাত্র কয়েকজন মাঝি ও একজন সম্ভ্রান্ত নবাব-কর্ম্মচারীকে ঠিক্ দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, প্রভুর আদেশানুসারে তাহাদিগকে তৎ-সন্নিধানে আনয়ন করিল।

উক্ত নবাব-কর্ম্মচারীর সহিত সন্তোষ-রামের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় ছিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর, সন্তোষ-রাম শুনিলেন যে, তৎকালীন নবাব দায়ুদ খাঁর মাতা কোন কার্য্যবশতঃ নৌকা করিয়া মক্কায় যাত্রা করিতে-ছিলেন; অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা-প্রবাহে যাইতে না পারিয়া দৈবানুগ্রহে তীরে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইহা শুনিবামাত্র সন্তোষরাম সেই কর্ম্ম-চারীর সমভিব্যাহারে নবাব-জননীকে আনয়ন করিতে গমন করিলেন, এবং যাবতীয় নৌকারোহিগণকে সাদরে আহ্বান করতঃ নিজালয়ে আশ্রয় প্রদান

করিলেন। সরলহৃদয়া নবাব-জননী সন্তোষ-রামের এবম্বিধ সৌজন্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস উক্ত কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ সন্তোষরামের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া পুলকিত-চিত্তে তাঁহাকে একখানি স্বনামাঙ্কিত লিপি প্রদানপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। পত্রখানিতে এই মর্ম্মে লিখিত ছিল যে, "সন্তোষরাম, আমি তোমার ঈদৃশ অভ্যাগতোচিত সৎকারে পরম উপকৃত হইয়াছি। অতএব তুমি অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।" সন্তোষরাম এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব লিপিখানি প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া স্বীয় পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইয়া, পিতা-মাতাকে এই অভাবনীয় ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত নিবেদনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লিপিখানি দেখাইলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা-মাতা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

এদিকে নবাব-জননী স্বীয় পুত্র দায়ুদ খাঁর নিকট আত্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন এবং সন্তোষরাম যাহাতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হন, সে বিষয়ও বলিতে ত্রুটি করিলেন না। নবাব মাতৃ-নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সন্তোষরামের উপর সাতিশয় কৃপা-পরতন্ত্র হইলেন, এবং যাহাতে তিনি সৌভাগ্য-শালী হন, সে বিষয়েও মাতৃ-সকাশে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে নবাব-ভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে, সন্তোষরাম তাঁহার মধ্যমানুজ রাজারাম সমভিব্যাহারে নবাবালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ হঠাৎ তাঁহার প্রতি নবাব-জননীর দৃষ্টি পতিত হওয়াতে তিনি তাঁহাকে রাজসভা-গৃহে অবস্থান করিতে অনুমতি করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ একজন দূতী প্রেরণ করিলেন। নবাব পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, সন্তোষরামকে তৎসন্নিকটে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, নবাব তাঁহার প্রশান্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁহার সহিত সদালাপে পরম আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আকমহল পরগণার প্রধান অধ্যক্ষের পদ প্রদান করিলেন। তিনি নবাবের এইরূপ অনু-গ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে সুকৌশল ও দক্ষতার সহিত উক্ত পরগণার শ্রীবৃদ্ধি সাধন দ্বারা নবাব-সংসারে সকলের আদরণীয় ও সম্মান-ভাজন হইলেন এবং ক্রমে নবাবপ্রদত্ত রায় ও রাজোপাধিতে বিভূষিত হইলেন। অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ রায়োপাধি ধারণ করিতেছেন। কথিত আছে, ঠিক্ এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর সাহের প্রধানতম মন্ত্রী রাজা

টোডারমলের সহিত সন্তোষরামের সখ্য-ভাব জন্মে। রাজা টোডারমল সময়ে সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আকবরের সভায় যাইতেন। এইরূপে সন্তোষরাম সৌভাগ্যবশতঃ, মহাত্মা আকবরের শুভ দৃষ্টিতে পড়িয়া ক্রমে বঙ্গদেশের সুবেদারী পদ পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রাজারাম নবাবের কোষাধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘবচন্দ্র রায়ের সহিত সন্তোষরামের পরম সৌহৃদ্য ভাব ছিল। সময়ে সময়ে রাঘবচন্দ্র সন্তোষ-রামকে নদীয়ার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং তথাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু তিনি পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া রাজানুরোধে স্বীকৃত হন নাই। যাহা হউক, অবশেষে তিনি কোন গূঢ় কারণ বশতঃ নদীয়ার অন্তর্গত শ্রীনগরের নিকট-বর্ত্তী বহরমপুরনামক গ্রামে হর্ম্ম্যাবলী-সুশোভিত সুবিস্তৃত মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বহুল অর্থব্যয়ে নিজ বাটী সুদুর্গম-পরিখা-বেষ্টিত করিয়া গ্রামে ও নিজালয়ে বহুতর দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও তত্তৎ স্থানে দেবপ্রতিষ্ঠা, অতিথি-শালা ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আরও কতিপয় মহদনুষ্ঠানে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছিল। তিনি বৈদেশিক সদ্বংশজাত কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করতঃ ভূমি-দান, বৃত্তিদান, ও নিজ ব্যয়ে তাঁহাদিগের বাসোপযোগী অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করাইয়া গ্রাম সুশোভিত করিয়াছিলেন। এবং জনসাধারণের জলকষ্টনিবারণার্থ গ্রামের স্থানে স্থানে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সন্তোষরাম অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে স্বীয় পিতা মাতাকে তীর্থস্থান দর্শন করাইতে বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া অন্যান্য তীর্থ-স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক প্রত্যাগমনকালে শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে কতিপয় শালগ্রাম এবং তত্রত্য কোন সন্ন্যাসিপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া নিজ আলয়স্থিত ঠাকুরবাটীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। সেই সন্ন্যাসিপ্রদত্ত বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার জীবনে অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছিল। অসম্ভব বোধ হইবে বলিয়া এখানে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। তবে সে সকল ঘটনা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও দেবনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত আছে, মহাত্মা সন্তোষরাম এবং তাঁহার অনুজদ্বয় রাজারাম ও মধুসূদন সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক পুরাকালের রাজন্যবর্গের প্রথানুসারে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষান্তর্গত যাবতীয় হিন্দুতীর্থ

পর্য্যটন, ও তত্তৎ স্থানে এক একটি কীর্ত্তি স্থাপন পুরঃসর সন্তোষরাম শ্রীক্ষেত্রধামে ও রাজারাম কাশীধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অদ্যাবধি ৺ শ্রীক্ষেত্রধামে একটি দীর্ঘিকা বর্ত্তমান আছে, তাহাকে তথাকার লোকেরা ক্রোরীদীঘি বলিয়া থাকে; এবং ৺কাশীধামে একটি মন্দির আছে, তাহাকে তথাকার পাণ্ডারা রাজা-রামের মন্দির বলিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ মধুসূদনের কোথায় দেহাবসান হয়, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

দুঃখের বিষয়, যদিও মহাত্মা সন্তোষরাম বিপুলার্থ ব্যয় করতঃ বহুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের প্রভাবে সে সকলের অধিকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ধনক্ষয় বশতঃ সেই সুমহৎ ব্যক্তির বংশধরগণ অতি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক, সন্তোষরামের ভগ্নাবশেষ কীর্ত্তি যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তদ্দ্বারা তিনি যে এক জন ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। এবম্প্রকার সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহৎ ব্যক্তির নাম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইবে।

শ্রীবলরাম রায়।

সংসারপ্রান্তরে বটচ্ছায়া।

(গত প্রকাশিতের শেষ)।

রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, আমাদের প্রাণের শান্তি সর্ব্বদা বিনষ্ট করিয়া থাকে। আমরা এই সকল অবস্থার চাপে পড়িয়া আমাদের চিরশান্তিপূর্ণ অবস্থা হারাইয়া ফেলি, দুঃখ শোকে অভিভূত হইয়া পড়ি। শান্তি, প্রফুল্লতা, আনন্দ দ্বারা পরিবারস্থ সকলের দুঃখ, শোক, শ্রান্তি, ক্লান্তি হরণ করা দূরে থাকুক, আমরা তাহাদের শান্তি বিনষ্টই করি। দুঃখ ও বিপদের ঝড়ে শান্তির জ্যোতি অকম্পিত রাখা সহজ নহে। জীবনের জীবন সেই বিশ্বাধার পরম দেবতার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ যুক্ত থাকা চাই, নতুবা এ ঝরণা অনন্ত স্রোতে শান্তির সলিল উচ্ছ্বসিত করিতে পারিবে না। সেই পার্ব্বতীয় ঝরণা কখনও শুষ্ক হয় না, যাহা দ্রব হিম তুষারের অনন্ত স্রোতের সহিত যুক্ত। স্রোতোমুখে যত বৃহৎ বাধা আসুক না কেন, তাহা পথরোধ করিতে পারিবে না, খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের সেই অনন্ত শান্তিস্রোতের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা রোগ শোকে

দুঃখ দারিদ্র্যে স্থির থাকা অসম্ভব। নারীজাতির এই দুর্গতির অবস্থাতেও এই যোগস্থাপনের অনেক সুবিধা রহিয়াছে। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণের অধিক সুযোগ ও সুবিধা আছে। পুরুষগণ সংসারের নানা বিভাগে যাইয়া যেমন দেখিয়া শুনিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, তেমনি আবার বাহিরের ছুটা-ছুটিতে ধর্ম্মপ্রবাহের সহিত যোগ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—"সাধারণতঃ কোন পুরুষ সহধর্ম্মিণী ব্যতিরেকে চিরজীবন ধর্ম্মপরায়ণ কিম্বা ঈশ্বরভক্ত হইয়া থাকিতে পারেন না।" আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে বাহিরের কোলাহল নাই, ইহাতে ধর্ম্মের সহিতধ—র্ম্মপ্রবাহের সহিত যোগ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সুযোগ থাকিলে কি হইবে? মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে যে সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা আমরা কি প্রকারে শান্তি পাইব, অপরকেই বা কি প্রকারে শান্তি প্রদান করিব? আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকলই বা কি প্রকারে সম্পাদন করিব? বিশ্ব-বিধাতা অতি গুরুতর দায়িত্বই আমাদের উপর প্রদান করিয়াছেন।

সংসারের নানা বিঘ্ন বিপদে যখন স্বভাবতঃ জীবনের শক্তি ক্ষীণ এবং তেজ হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, তখন সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে পতিত হইয়াও আমাদিগকে অটুট শক্তি, অমিত তেজ, চিত্তের অকম্পিত স্থৈর্য্য এবং হৃদয়ের অটল, অক্ষুব্ধ শান্তি রক্ষা করিতে হইবে,—যেরূপ প্রতিকূল অবস্থাই আসুক না কেন, শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেই হইবে। নতুবা নারীজীবনের কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হয় না। দুর্ব্বলা রমণী জীবনের তমসাচ্ছন্ন, ঝটিকাপূর্ণ অবস্থাতেও সেই স্বর্গীয় আলোকের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সকলকে আলোক দেখাইবেন, নিজে ঝটিকার অতীত হইয়া সকলকে নিরাপদ, শান্ত, উদ্বেগশূন্য ও শান্তিপূর্ণ করিবেন। বড় কঠিন কথা। কিন্তু সর্ব্বশক্তির আকর বিশ্ববিধাতা রমণীকে উপযুক্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। রমণীর স্বাভাবিক প্রেম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই এই শক্তির মূল। দুর্ব্বল রমণী ভীষণ বিপদে, ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে স্থির, ধীর, শান্ত ভাবে, অতুল তেজের সহিত সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন, এরূপ বহু-দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। জনৈক ইংরেজ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "নারী সাধারণতঃ শক্তিহীনা, ও দীনা, কিন্তু বিপদ ও সঙ্কটের সময় তিনি দেবীর ন্যায় তেজোময়ী ও ক্ষমতাশালিনী।"

রমণী রোগে, শোকে, দুঃখে অধীর হইয়া সকলকে অধীর করিতে আসে নাই—রোগ শোকের ভিতর বিশ্বাস ও নির্ভরতার উজ্জ্বল ছবি দেখাইতেই আসিয়াছে। রমণী প্রেম ও বিশ্বাস বলে শোক দুঃখের অতীত। তাহার প্রেম ও বিশ্বাস তাহাকে বলিয়া দেয়, আত্মার

সহিত আত্মার বিচ্ছেদ নাই। জড় দূরত্ব এই নিত্য প্রেমের ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ করিতে পারে না। তাই জড়ীয় ব্যবধানে সে আকুল হয় না। মৃত্যু তাহার প্রিয়তম স্বামী পুত্র কন্যা, স্নেহময় পিতা-মাতা প্রভৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। আত্মার সম্বন্ধ অনন্ত জীবনের জন্য। জড় প্রলয়ে সে প্রেম বিনষ্ট হয় না। রমণীপ্রেম স্বার্থ চাহে না, সে ভালবাসিয়াই সুখী। অপ্রেমে অত্যাচারে তাহার সেই প্রেম কেন বিনষ্ট হইবে? প্রাণের শান্তিই বা কেন দূর হইবে? রমণীপ্রেম সকল অবস্থাতেই সহিষ্ণু। রমণীপ্রেম বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল। প্রেমই তাহাকে সকল দুঃখ কষ্ট অম্লানচিত্তে বহন করিতে সক্ষম করে,—কিছুতেই তাহার শান্তি বিনষ্ট হয় না। প্রেমময়ী রমণী সকল অবস্থাতেই শান্তিরূপিণী।

আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত শান্তির মূল। অবস্থার স্রোতে তাড়িত হইলে, প্রবৃত্তির দাসত্বে নিযুক্ত হইলে শান্তি নাই; বাহিরের কোন অবস্থার প্রভাব যখন আমাকে স্থির শান্তিপূর্ণ অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, নীচ প্রবৃত্তি সকল যখন আমাকে চালাইতে পারে না, তখনই আমি প্রকৃত স্বাধীন—প্রকৃত সুখী। অবিচলিত ভাবে শান্তি-স্রোতের সহিত যুক্ত থাকাই, জীবন-দেবতার অধীন হইয়া চলাই আত্মার স্বাধীনতা এবং তাহাতেই জীবনের অক্ষয় শান্তি। এই প্রবাহের সহিত যোগ করিবার সুবিধা আমাদের অধিক। তাই আমাদের অধীনতার ভিতরেও স্বাধীনতার শান্তির বীজ উপ্ত রহিয়াছে। নিজে নিজের অনুকূল হইলেই স্বাধীনতার বীজ পরিপক্ক ও অঙ্কুরিত হইতে পারে—শান্তি-পাদপের স্নিগ্ধ ছায়াতে সকলে স্নিগ্ধ ও শীতল হইতে পারেন। জড়প্রকৃতির ঘটনা, আত্মার উপরে কর্তৃত্ব করে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে শক্তিতে পরম পিতা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিলেন, আমরা তাহাকে পাদদলিত করিলাম—কি লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। মঙ্গলময় বিধাতা সকল অবস্থার মধ্যে শান্তি সুধা বিতরণে জীবনকে শীতল রাখিতে চাহেন, আমরা কেন তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব? কেন আমরা পূর্ণ আবেগের সহিত প্রাণের অনুরাগ তাঁহাতে অর্পণ না করিব? এই পূর্ণানুরাগেই জীবন শান্তিপূর্ণ হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, প্রাণের প্রিয়তম স্বামী পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, পূজ্যতম পিতামাতার জীবন শান্তিপূর্ণ হইবে—আমাদের গৃহ স্থির আনন্দ-নিকেতন হইবে। যাহা কিছু কল্যাণকর ইহা হইতেই উৎপন্ন হইবে—কল্যাণ ও শান্তিতে গৃহপরিবার ও জগৎ প্লাবিত হইবে। আমরা ইহার বাধা জন্মাইয়া কেন প্রিয়জনের জীবন অশান্তির তিক্ত রসে বিস্বাদ করি, নিরানন্দে মলিন করি?

রমণী সাগরের মত অক্ষুব্ধ হইবে। রমণী সম্পদ ও বিপদের অভিঘাতে জীবনের বেলাভূমি অতিক্রম করিবে না, পিতা পরমেশ্বরকে অতিক্রম করিবে না, সকল অবস্থাতেই তাহার শান্তি-উৎস প্রবাহিত হইবার পথ উন্মুক্ত থাকিবে। যে গৃহে রমণীহৃদয়ে শান্তি-উৎস অবিশ্রাম উৎসাহিত হইতেছে, সেই গৃহই শান্তি নিকেতন, সেই পরিবারই সুখী পরিবার। সুখী পরিবারের সকলেই সুখী। সুখী পরিবারের প্রতিবেশী, অতিথি অভ্যাগত, দাস দাসী সকলেই শান্তির আস্বাদ পাইয়া পরিতৃপ্ত। সুখী পরিবারের সংস্পর্শে যে একবার আইসে, তাহার প্রাণে সে শান্তির আভাস চিরদিন থাকিয়া যায়। কেহই এই প্রভাবের বাহিরে যাইতে পারে না। ইহার প্রভাবে সত্য সত্যই গৃহ স্বর্গধামে পরিণত হয়, পৃথিবীতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আমরা মার্কিন কবির বাক্যের সত্যতা দেখিতে পাই—"নারীর দোষে স্বর্গ হারাইয়াছি; যদি আমরা পুনরায় স্বর্গ পাই, তাহা হইলে নারীর সাহায্যে ও প্রভাবেই পাইব।" এই জন্যই অপর এক মহাত্মা বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতি দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণের স্বর্গ-দূতিকা।"

যেসকল মহাজন নারীজাতির অভ্যন্তরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শান্তির প্রতিমা দেখিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদের কথিত জীবন লাভ করিতে হইবে; এবং আরাম-দায়িনী শান্তিদায়িনীরূপে গৃহ শান্তিময় মধুময় ও আনন্দনিকেতন করিতে হইলে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইবে, আত্মার বিকাশের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে, ধর্ম্মে, প্রেমে ও বিশ্বাসে উন্নত হইতে হইবে। জীবনের বিকাশ—প্রকৃত ধর্ম্মজীবন—সুখশান্তির মূল। যদিও এই আদর্শ অতি উচ্চ, তথাপি ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর কিছুতেই শান্তি লাভ করা যায় না, অপর কাহাকেও সুখ শান্তি প্রদান করা যায় না। এই সংসার-মরুভূমিতে রমণীকে শান্তি-নির্ঝর করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। নারীজাতির উপর অতি গুরুতর ভার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, নারীজাতি উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া গৃহ পরিবার ও জগৎকে সুধাময় ও শান্তিপূর্ণ করিবে—রমণীহৃদয়-নিঃসৃত আনন্দ ও শান্তি-প্রবাহ উৎসারিত হইয়া সকল হৃদয়ের দুঃখ তাপ হরণ করিয়া সর্ব্বহৃদয় পরিতৃপ্ত করিবে। কবে আমরা এই উচ্চ আদর্শানুরূপ জীবন লাভ করিব? আর আমাদের উদাসীন থাকিবার সময় নাই। ঈশ্বর করুন, এই গৌরবান্বিত আদর্শ জীবন লাভ করিয়া রমণী গৃহে শান্তিদায়িনী রূপে প্রতিষ্ঠিত হউন—সংসারে শান্তির উৎস হইয়া নিজে শান্তি লাভে পরিতৃপ্ত হউন এবং সকলকে শান্তি-দানে পরিতৃপ্ত করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের

কৃপায় সত্য সত্যই "রমণী দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার-প্রান্তরে বট-ছায়া এবং জীবন পথের আতপত্র" হউন!

লক্ষ্যহীন জীবন।

জীবনের সুদূর প্রান্তরে
আছি আমি একাকী বসিয়া,
কত আশা কত যে নিরাশা
শূন্য প্রাণে যাইছে বহিয়া।
কত শত ফুটিতেছে ফুল,
কত যে ঝরিছে দিবানিশি,
অন্ধকার জীবন আমার,
যায় বুঝি অন্ধকারে মিশি!
বিশাল এ বিশ্বের মাঝারে
বিভীষিকা হেরি চারি ধার,
লক্ষ্যহীন পথভ্রান্ত হয়ে
ঘুরিতেছি করি হাহাকার।
শান্তি নাই শান্তি নাই, সুধু
নিরাশার অভ্রভেদী স্বর
পশিতেছে কর্ণে সদা, যেন
ঘোরতর অশনি-ঘর্ঘর।
একেলা এ মরুময় দেশে
নাহি পারি দাঁড়াইতে আর,
মরীচিকা হেরিয়া চৌদিকে
বহে সুধু শোক-অশ্রুধার।
অসীম অনন্ত শূন্যময়!
কোথা যাব, কোথায় আশ্রয়,
আরো আরো কতকাল পরে
পাব আমি শান্তির আলয়।
দয়াময়! তুমি হে ভরসা
আঁধার-বিষাদ-ঘন প্রাণে,
কত দিন রহিব চাহিয়া
প্রতীক্ষায় তব মুখ পানে?

শৈশব-সঙ্গিনী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে একজন পীড়িত যুবক বিছানায় শুইয়া আছেন। আর একটী যুবক সেই পীড়িতের গাত্রে অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

পীড়িত যুবক তাঁহার ক্লিষ্ট হাতখানিতে শুশ্রূষাকারীর হাতটী ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন "ভাই যোগেন্দ্র! তুমি আমাকে মরিতে দিলে না কেন? নরাধম আমি মরিয়া সুখী হইতাম, তুমি কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

যোগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "ওকি বল্‌ছেন সুরেশ বাবু, এখন এই ঔষধটা খেয়ে ফেলুন দেখি?" যোগেন্দ্র শিশি নাড়িয়া কাচের গ্লাসে ঔষধ ঢালিলেন, তার পর সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশ ঔষধের গ্লাস হাতে লইয়া বলিলেন "ভাই! আমার সহস্র বার প্রাণদানেও

তোমার এক দিনের ঋণ শোধ দিতে পারিব না; তুমি এই তরুণ বয়সেও দেবতা; তোমার তুলনায় আমি এক অধম, নরকের কীট!" যোগেন্দ্র বড়ই লজ্জিত হইলেন; তাঁহার মুখ লাল হইল। তাড়াতাড়ি, বিছানার উপরে যে সেক্ষপিয়রখানি ছিল, তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

কি করিয়া এ অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহা বলিতেছি। বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে কলিকাতায় বেলুনবাজ স্পেন্সার সাহেব বেলুনে উঠিয়াছিলেন। তাহা দেখিবার জন্য "লোকারণ্য" হইয়াছিল; কলিকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি তো ঘোড়া,গাড়ী আর কালো মাথায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রফুল্লকে পদাঘাত করিয়া, বেলুন-যাত্রার পূর্ব্ব দিন সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় সুরেশের কয়েক জন আত্মীয় ও বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সুরেশচন্দ্রকে বেলুন-যাত্রা দেখাইতে লইয়া যান; সে দিন কিন্তু "ব্যোমযান" দেখিবার কৌতূহল বা সাধ সুরেশের কিছুমাত্র ছিল না, তবে বন্ধুদিগের হাত এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গে কলের পুতুলের মত ঘুরিতেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সুরেশচন্দ্র হইতে অনেক দূরে থাকাতে আলাপাদি করিতে পারিলেন না; গোলমাল নিবৃত্ত হইলে সুরেশ বাবুর নিকটে উপস্থিত হইবেন, মনে মনে স্থির করিয়া, স্পেন্সার সাহেবের অপূর্ব্ব কার্য্য দেখিতে লাগিলেন।

সকলের মন বেলুনের প্রতি আকৃষ্ট, এমন সময়ে সুরেশের সর্দ্দি গর্ম্মি উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র তাহা দেখিলেন। তিনি এবং সুরেশের একজন বন্ধু বিধিমতে শুশ্রূষা করিয়া, সুরেশকে একটু আরাম করিলেন; তার পরে যোগেন্দ্র সুরেশকে নিজের বাসায় লইয়া আসিলেন।

যোগেন্দ্র সুরেশের স্নেহে ভ্রাতা এবং সেবায় ভৃত্য সদৃশ; নিজের কলেজ বন্ধ, দুর্ব্বল শরীরে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম; কিন্তু সে দিকে যোগেন্দ্রের ভ্রূক্ষেপ নাই, সুরেশের আরোগ্যই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে এতটা স্নেহ ও যত্ন পাইয়া সুরেশ যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। শেষে যখন শুনিলেন, সুরেশ জগতে যাহাকে পরম শত্রু মনে করেন, আজি সেই যোগেন্দ্রই সুরেশের জীবন-রক্ষাকারী, তখন সুরেশ, যোগেন্দ্রের পবিত্র প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মঙ্গলময় ভগবান্ যে মানবের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন, এ কথা বিপদের সময়ে আমরা না বুঝিলেও তাহার ফলভোগ করিতে বঞ্চিত হই না। এক একটী বিপদ আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া যায়, আমরা শত বর্ষ উপদেশ শুনিয়া কি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি না। আজি

ভগবানের কৃপায়, দারুণ বিপদে পড়িয়াই সুরেশ যোগেন্দ্রকে চিনিলেন; সেই কারণে আপনাকেও চিনিলেন; তাই বলিতেছি,মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য অমঙ্গলের জন্য নহে—কেবল মঙ্গলেরই জন্য।

সুরেশ যোগেন্দ্রকে যতই বুঝিতে লাগিলেন, আপনাকে যতই চিনিতে লাগিলেন, ততই অনুতাপের জ্বালায় অধীর হইতে লাগিলেন। তিনি সহস্র মৃত্যু-যাতনা অনায়াসে সহিতে পারিতেন, কিন্তু এ অনুতাপের যাতনা যেন সহিতে পারিতেছেন না!

এই যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সুরেশ যোগেন্দ্রের হাতে একখানি পত্র দিলেন; পত্র খুলিয়া যোগেন্দ্র পড়িলেন,

"শ্রদ্ধেয় সুরেশ বাবু!

আপনি সুশিক্ষিত; বহুজন্ম তপস্যা করিয়া আপনার মত জামাতা পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। আমি আপনাকে বিশেষ ভক্তি করি, সেই জন্য আপনাকে এক বিষয়ে সাবধান করিতেছি, আপনার পত্নী প্রফুল্ল কুমারীকে নিষেধ করিবেন, যেন যোগেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতা না করেন। যোগেন্দ্র নাথের অনেক সুখ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে বড় সহজ লোক নহেন; মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র!

আপনার বালিকা পত্নীকে এ কথা বুঝাইয়া দিবেন। আমার এই পত্রের কথা কাহারও কছে প্রকাশ করিলে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। অন্য ইতি। ১২৯৩ সাল।

বিল্বগ্রাম—নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী ঃ—"

ডাকের মোহর বিল্বগ্রামের। যোগেন্দ্রের বাড়ীও বিল্বগ্রামে। পত্র পড়িয়া যোগেন্দ্রের মুখ লাল হইল; একটী মাত্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সেক্ষপিয়ার পড়িতে লাগিলেন।

সুরেশ কাতরস্বরে কহিলেন "ভাই! আমাকে ক্ষমা করিলে কি?" যোগেন্দ্র হাস্যমুখে উত্তর করিলেন "আপনার অপরাধ কোথায়? এমন কথা শুনিলে কে না সন্দেহ করে?"

সুরেশের মলিন মুখে আশার ক্ষীণ আলোক প্রতিভাসিত হইল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন "বলিতে পার, এ হাতের লেখাটী কার?"

যোগেন্দ্র পুস্তকের উপরে চক্ষু রাখিয়াই, অতি সাধারণ ভাবে উত্তর করিলেন, "হাতের লেখাটী ঠিক্ আমার বিমাতার।"

সুরেশ শিহরিয়া উঠিলেন।

(ক্রমশঃ)।

ভুল-ভাঙা।*

১

বাবা! তুমি ভুলে গেলে হেন,
এ মা মোর সে মা হবে কেন?—
মা'র সেই চোখ মুখ,
মা'র রাঙা হাসিটুক,
আমি যে তা' চিনি বাবা, তুমি নাহি চেন?
বাবা! তুমি ভুলে গেছ কেন?

* বিমাতার প্রথম দর্শনে কোনও মাতৃহীন বালকের ভাব।

২

তুমি মোরে দি'ছিলে বলিয়া,
মা আমার এসেছে ফিরিয়া,
রাঙা মা আসিল যাই,
ছুটিয়া গেলেম তাই,
দেখিলাম মুখখানি ঘোমটা খুলিয়া ;
অচেনা, নূতন মুখ,
ফেটে গেল মোর বুক,
তাই তো চোখের জলে গেলেম ভাসিয়া !

৩

মোর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পিসী মা সে উঠিল কাঁদিয়া ;
ফেলিয়া হাতের শাঁখ,
কাপড়ে চাপিয়া নাক,
কাকীমা ঘরের কোণে দাঁড়াইল গিয়া ;
ওবাড়ীর চাঁপা দিদি,
বলিল "নিঠুর বিধি!
কাঁদা'লে অবোধ শিশু, কি পাষাণ হিয়া !"

৪

এরা বাবা, মিছা কথা কয়,
এ মা মোর সে মা কভু নয় ;
যে মা দুদুভাত মেখে,
খাওয়াইত চাঁদ ডেকে,
ভয় পেলে কোলে নি'ত, দূর হ'ত ভয় ;
যে মা সন্ধ্যাকালে শুয়ে,
বুকে মোর মুখ থুয়ে,
ঘুম পাড়ানীর গানে তুষিত হৃদয় ;
তুমি যে বলিতে যারে,
"দেবী তুমি এ সংসারে,
তোমা বিনা বাঁচিব না, জানিও নিশ্চয়"
আজ যে এসেছে এ তো সে মা মোর নয় ?

৫

মা'কে, বাবা, কেন ভুলে গেলে,
এ মা তুমি কোন্ খানে পেলে ?—
সে মা কি গহনা পরে,
সে মা কি ঘোমটা করে,
আমি কি তফাতে থাকি সে মা মোর এলে ?
সে যে মোর চুমা খায়,
ডাকে "যাদু ! কোলে আয়,"
সে যে বলে "তুই মোর বাপ ধন ছেলে !"
আমি কি তফাতে থাকি সে মা মোর এলে?

৬

কও বাবা, কোথা গেল মা' সে,
কি দিলে মা ফিরে বাড়ী আসে ?—
সবাই মায়ের কাছে,
কেমন আনন্দে আছে,
আমারি মা গেল কেন "বৈকুণ্ঠ,
কৈলাসে ?"
তুমি আজ এনে কারে
বলিলে এনেছ মা'রে,
তাই বাবা, মোর চোখে আরো জল আসে !

৭

বাবা ! আমি বুঝেছি এবার,
মা আমার আসিবে না আর।—
আর সে তেমন ক'রে,
কোলে লইবে না মোরে,
আদরে আঁচলে মুখ মুছাবে না আর !
আমারে লইয়া হায়,
শোবে না সে বিছানায়,
আর সহিবে না মোর নিত্য আবদার !
সে পিঠা-গাছের কথা,
টুনি পাখি-পায়ে ব্যথা,

আর কহিবে না সে তো নিকটে আমার !
আমি র'ব একা একা,
আর সে দিবে না দেখা,
আর কভু পোহাবে না এ পোড়া আঁধার ?
এ মা মোর সে মা নয়,
ওরা মিছা কথা কয়,
তুমি কেন ভুলে গেলে মুখখানি মা'র ?
আমি তো ভুলিনি বাবা, রাঙা হাসি তার।

কনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

গ্রন্থকালয় ও সাধারণ ... সন ১২১১ সালে প্রতিষ্ঠিত ... কলিকাতা

ভবের খেলা।*

(গত প্রকাশিতের পর)।

এই পৃথিবীতে যত কিছু কষ্ট দেখিতে পান, সকলই এই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল। আমরা হিন্দু জাতি, অদৃষ্টবাদী, আমরাও সকল কষ্টকেই কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল বলিব। যাহাকে অদৃষ্টজনিত কষ্ট মনে করি, তাহা ত আর কিছুই নহে,তাহাও এই জন্মান্তরের কর্ত্তব্যলঙ্ঘন জন্য কষ্ট। মূলে কোন প্রভেদ নাই। তবে মধ্যে যাহা করিয়াছি, যাহা অদৃষ্টরূপে আমার উপর ঝুলিতেছে, তাহা এখন নীরবে সহ্য করিব। এই তাস-খেলোয়াড়ের মত, যাহা পাইয়াছি, সুখই হউক দুঃখই হউক, অদৃষ্টস্বরূপে যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়াই খেলিতে থাকিব। কিন্তু এখন হইতে আর কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করিব না। তাহা হইলে, আমার অদৃষ্টও খণ্ডিত হইবে—দুঃখও বিদূরিত হইবে।

আমাদিগের কষ্টটা যে অনেকটা ঐহিক কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ফল, তাহাও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অদৃষ্টজনিত কষ্ট যে কষ্ট নহে, তাহা নহে। তাহার জন্য বড় একটা বেশী কাতর হইতে হয় না। তাহাকে অদৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, আমাদিগের কষ্ট পনর আনা দূর হয়। কিন্তু সেই অদৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারি কখন ? যখন সেই কষ্টের ঐহিক কোন কারণ দিতে পারি না। যখন দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি যে, ইহকালে কোন প্রকার কর্ত্তব্যলঙ্ঘন করি নাই, অথচ কষ্ট পাইতেছি, তখনই বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি যে, ইহা অদৃষ্টজনিত কষ্ট। যে মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিলাম, বুঝাইতে পারিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই কষ্টের তীব্রত্ব পনর আনা কমিয়া গেল—বোধ হয় বেশীই কমিয়া গেল। একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

মনে করুন আমি পুত্রশোকগ্রস্ত। কয়েক দিন হইল আমার একমাত্র পুত্রটী মরিয়া গিয়াছে। আমি শোক মোহে প্রপীড়িত হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। কেন করিতেছি ? প্রথমে তত বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন যেন মনে হয়, আমার পুত্রের এই মৃত্যুটি আমার কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের জন্যই ঘটিয়াছে।

* লেখকের মতামতের জন্য তিনিই দায়ী। বা, মো, স।

আমি ইহার উচিত মত তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। আমি ইহার যথা-ন্যায্য চিকিৎসা করাইতে পারি নাই, আমি ইহাকে যথানিয়মে পথ্য প্রদান করিতে পারি নাই, আমি ইহাকে যথা-নিয়মে সুশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, এইরূপ চিন্তাই আমার এই বর্ত্তমান দুঃখের পনর আনা কারণ। পুত্রের বিরহই অবশ্য শোকের যথেষ্ট কারণ, কিন্তু যেখানে জানিতে পারা যায় যে, এ বিরহ আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টজনিত, ঐহিক কর্ত্তব্যলঙ্ঘনজনিত নহে, তখন তাহার তীব্রতা বেশী থাকে না। সে শোক দুই দিনেই নিভিয়া যায়। যদি আমি মনে করিতে পারিতাম, আমার যাহা কর্ত্তব্য আমি সকলই প্রতিপালন করিয়াছি—যথাসাধ্য—জন্মব্যাপার হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আমার কোন প্রকার ত্রুটি ঘটে নাই, তাহা হইলে আমার শোক এখনই বিদূরিত হইতে পারে।

সকল প্রকার কষ্টই এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যায় যে, কষ্টভোগীর প্রথম কষ্টই তাহার কর্ত্তব্যলঙ্ঘনের ধারণা বা স্মৃতি। তদ্ভিন্ন যে টুকু অদৃষ্টজনিত কষ্ট মনে করা যায়, তাহা তেমন তীব্র নহে। তাহা যত ঘটনার উপরে আধিপত্য করে, মনের উপর তত আধিপত্য করে না। অদৃষ্টজনিত দারিদ্র্য কষ্টে ক্ষুৎপিপাসায় জর্জ্জরিত হইব সত্য, কিন্তু ঐহিক কর্ত্তব্য-লঙ্ঘনজনিত দারিদ্র্য কষ্টের ন্যায়, তাহাতে আমাকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম, সুখ দুঃখ সমস্তই এই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। এই কর্ত্তব্যই ভগবানের আজ্ঞা। ইহাদ্বারা যিনি পরিচালিত হয়েন, তিনিই যথার্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন। সকল ধর্ম্মের মূল সূত্রই এই—ইহাই বেদ—ইহাই বাইবেল। ইহাই পুরাণ, ইহাই স্মৃতি। ইহাই কোরাণ, ইহাই তন্ত্র। ইহাই গীতা—ইহাই গায়ত্রী। এই কর্ত্তব্য কি? তাহাতেই মতের বিভিন্নতা, কিন্তু এই কর্ত্তব্যপালনই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহাতে আর বিভিন্নতা নাই। তাই বলিতেছিলাম, ইহাই মানুষের একমাত্র দৃষ্টির বিষয় হওয়া উচিত—কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিই জগতের আদর্শ হওয়া উচিত। হউক না কেন সে মূর্খ, হউক না কেন সে অরসিক, হউক না কেন সে জরাগ্রস্ত, হউক না কেন সে কুটীরবাসী, তবু এই ভবের খেলায় সেই প্রকৃত খেলোয়াড়।

আপনারা সকলেই এই ভবধামে খেলিতে আসিয়াছেন, খেলিতেছেন। এই কথাটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খেলিবেন। ছক্কা পঞ্জা নাই বা হইল, হইলেও তাহাতে আহ্লাদ নাই, না হইলেও তাহাতে কষ্টের কারণ নাই, খেলায় কেবল মাত্র দেখিতে হইবে, ভুল না হয়। কেবল মাত্র দেখিবেন, কর্ত্তব্যলঙ্ঘন না হয়। এক জন চেষ্টা করিয়া বড় হইতে পারিয়াছে বলিয়া, শুদ্ধ তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া তাহার পক্ষপাতী হইব না, এক জন চেষ্টা করিয়া লেখাপড়া শিখিতে না পারিলে, চেষ্টা করিয়া ধনার্জ্জন করিতে না পারিলে, জগতের এক কোণে পড়িয়া আছে বলিয়া, তাহাকে ঘৃণা করিব না। আমার আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। এই ভবের খেলায় ইহা মনে রাখেন, ইহাই আপনাদিগের নিকট অনুরোধ।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি এল্।

পাকা পেয়ারার মোরব্বা

বা

পেয়েরার জেলী।

আবশ্যক জিনিষ—গাছপাকা পেয়ারা—
দোবারা চিনি—
মোটা কর্‌করে গামছা—
জাফরান-চূর্ণ—
ছোট-এলাচ-চূর্ণ—

প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

প্রথমে পেয়ারাগুলির বোঁটা এবং মুখের শুখনা ফুলগুলি কাটিয়া ফেলিয়া পাত্রে রাখ। জ্বালে পরিষ্কার ডেক্‌চিতে সম্ভবমত পরিষ্কার জলে চড়াইয়া তাহা ফুটিতে থাকিলে তাহাতে ঐ সমস্ত পেয়ারা ঢালিয়া দিতে হয়। পরে যখন দেখা যাইবে যে, সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া জল হইতে পৃথক্ করিয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে পর হাতে উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া লইয়া ঐ নূতন গামছাতে যেরূপে আঁব কাঁঠালের সত্ব ছাঁকিয়া লইতে হয়, সেইরূপে সত্ব বাহির করিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখ। তৎপরে জ্বালে চিনির রস করিবার জন্য ৵চিনি চড়াইয়া দাও। দুই কি তিন তার বন্দ ৵রস প্রস্তুত হইলে তাহাতে ঐ পেয়ারার সত্ব নিক্ষেপ করতঃ তাড়ু দ্বারা নাড়িতে থাক। অল্প আঁটাল হইতে দেখিলে তাহাতে জাফ-রাণ-চূর্ণ এবং ছোট-এলাচ-চূর্ণ দিয়া নামাইয়া লইয়া ব্যবহার কর। অম্ল মধুর স্বাদযুক্ত মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

লোহার কিম্বা পিতল বা তামার পাত্র কোন কারণে ব্যবহার করিও না।

গামছাখানি পূর্ব্ব হইতে জলে কাচিয়া শুখাইয়া রাখিতে হইবে। প্রস্তুত হইলে জারে ভরিয়া গ্লাস ষ্টপার ছিপি দিয়া মুখ আঁটিয়া রাখিলে নষ্ট হইবে না।

গৃহ-চিকিৎসা।

এগজিমা নামক চর্ম্মরোগ ও তাহার চিকিৎসা।*

আমার মেজ ছেলে এই রোগে প্রায় ২ বৎসর কষ্ট পায়। আমি নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়া হারি মানিয়াছিলাম, পরে নিম্নলিখিত চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য

* মেদিনীপুরস্থ কোনও পাঠিকার লিপি।

হইয়াছে। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি অনেক ঔষধ বিফল হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ ডাক্তারেরা বলেন, এ রোগ ঔষধে আরোগ্য হয় না। সব দাঁত উঠিলে আপনা আপনি ভাল হইয়া যায়।

যদিও রোগ মারাত্মক নহে, তবুও অতিশয় কষ্টপ্রদ ও শিশুকে বড় কুৎসিত করে। ইহাতে শিশু দিন দিন শুকাইয়া যায়।

অনেকেই দেখিয়াছেন যে ছেলেদের প্রবল জ্বরের পর কি বেশী সর্দ্দির পর অথবা অমনি অমনি অনেক চুলকানি বাহির হয়, ও সেই চুলকানি আপাদ-মস্তকে হয়। প্রথমে দেখিতে লাল লাল চাকড়া চাকড়া হয়। প্রথমে ছোট ছোট দেখায়, পরে সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া যায়। শিশু যত চুলকায়, তত রস বাহির হয় ও পাকে, কখন কখন শিশু চুলকাইয়া রক্তারক্তি করে। এই রোগের ইংরাজী নাম "এগ্‌জিমা"। এই রোগ জন্ম-স্নান ভাল করিয়া না হইলে হয়। বেশী ফ্লানেল প্রভৃতি শুধু গায়ে দিলেও হয়। ইহা একবার হইলে সব দাঁত না উঠিলে প্রায় নির্দ্দোষে ভাল হয় না। কখন কখন বেশী দিনও থাকে, বারম্বার হইতে হইতে ভাল হইতে থাকে।

শেষে সব গায়ের ঘা ভাল হইয়া মাথায় ও কানে পিঠে থাকে ও তার তাড়সে শিশুর জ্বর হয়।

১ম চিকিৎসা—গরম জলে ভাল সাবান অল্প ঘসিয়া একখানি পরিষ্কার নেক্‌ড়া ভিজাইয়া শিশুর সব গা পরিষ্কার করিয়া দিবে, পরে বেশ করিয়া মুছাইয়া দিয়া ভাল এরারুট সব গায়ে ও মাথায় মাখাইয়া দিবে। এই প্রকার ৭।৮ দিন হইলে ভাল হইয়া যাইবে।

২য় চিকিৎসা—যে দেশের নদী বা পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত, সেই জল গামলা করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, সেই জল দিয়া বেলা ১০টার পর শিশুকে স্নান করাইয়া দিবে। স্নানের পর ২।১ ঘণ্টা পরে অল্প নারিকেল তৈল গরম করিয়া শিশুর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে। স্নানের পূর্ব্বে তৈল দেওয়া নিষেধ। এ প্রকার দুই সপ্তাহ করিতে হইবে।

যদি দেশের জল লোণা না হয়, তাহা হইলে সে দেশে যে জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই জলে লবণ দিয়া রৌদ্রে গরম করিয়া লইলেই চলিবে। স্নানের পূর্ব্বে শিশুকে ভাল করিয়া দেখিবে। যদি শিশুর সর্দ্দি হয়, কি সর্দ্দির ধাত হয়, তাহা হইলে বদ্ধ ঘরে স্নান করাইবে। বেশ করিয়া মুছাইয়া গায়ে জামা দিয়া দিবে ও খানিক পরে বাহিরে আনিবে।

জল ও লবণের পরিমাণ—এক বাল্‌তি জলে এক তোলা লবণ দিবে।

যদি ইহার পরও কানে, পিঠে ও মাথায় রোগ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

খাঁটী সরিষার তৈল ৵ অর্দ্ধ পোয়া, নিমপাতা এক মুঠা, একটা লঙ্কার বীচি, তুঁতে এক রতি, মোম দুই তোলা।

প্রথমে সরিষার তৈল আগুনে চড়াইয়া নিমপাতা দিবে, পাতা ভাল করিয়া ভাজা হইলে লঙ্কার বীচি দিবে। পরে মোম ও তুঁতে দিবে এবং মোম গলিয়া গেলেই নামাইবে। যদি বেশী কঠিন হয়, তাহা হইলে অল্প তৈল মিশাইয়া লইলেই হইবে। যখন ব্যবহার করিবে, গরম জল দিয়া এক বার কি দুই বার ঘা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপরে মলম করিয়া লাগাইবে। যদি অন্য কোন ঘা থাকে, ঐ মলমে ভাল হইবে, ইহা খোসের পক্ষে খুব উপকারী।

পর্য্যায়ক্রমে সকল প্রকার চিকিৎসা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি ইহাতে অবশ্যই উপকার হইবে।

অদৃষ্ট।

(স্তোত্র)

অদৃষ্ট! তোমায় নমস্কার। তুমি জলে আছ, জঙ্গলে আছ, আকাশে আছ, পাতালে আছ—কোথায় নাই বলিতে পারি না। হে সর্ব্বব্যাপিন্! পুরাণে, তন্ত্রে, মন্ত্রে, ইতিহাসে, বেদ বেদান্তে, গদ্যে, পদ্যে,—তোমারই কীর্ত্তি বর্ণিত আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তোমারই আয়ত্ত, অতএব হে ত্রিকালজ্ঞ! তোমায় নমস্কার।

আমাদের দেশে মহাজনগণ প্রাচীন কালে ষোড়শোপচারে তোমার পূজা করিয়াছেন—বর্ত্তমান কালেও অনেকে করিতেছেন। তবে দুই এক জন শিক্ষাভিমানী নব্য যুবক দৈহিক বলাধিক্যে করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহারাও বয়স-তরঙ্গের ভাঁটাতে করিবেন। ইউরোপে, মার্কিনে ভারতের দৃষ্টান্তে তোমার পূজা আরম্ভ হইয়াছে; অতএব হে সর্ব্বোপাস্য দেবতে! তোমায় নমস্কার। অদৃষ্ট! তোমার মত সকলে পূজা করে, আমিও যে করি না, তাহা বলি না—আমিও অল্পাধিক করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তোমার ভাব রূপ এত লুক্কায়িত যে, দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব প্রার্থনা হে অদৃষ্ট! তুমি আমাকে প্রকাশ করিয়া বল "তুমি রাম, কি রহিম, ঈশা কি মুশা, জিহবা কি জোভ"—আমি তোমাকে সেই ভাবে পূজা করিব।

অদৃষ্ট! তোমার অবয়ব দেখিতে পাই না—কিন্তু তোমার কার্য্য সর্ব্বদাই মনুষ্য-মণ্ডলী মাঝে কথিত, অনুভূত ও চিন্তিত হইতেছে। তুমি কাহাকেও হাসাইতেছ, কাহাকেও কাঁদাইতেছ, কাহাকেও রাজ-রাণী করিতেছ, কাহাকেও ভিখারিণী করিতেছ; কাহাকেও প্রহরি-পরিবেষ্টিত তুঙ্গ সৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম

শয্যায় শয়ন করাইতেছ, আবার কেহ বা বৃক্ষতলবিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্রোপরি দেহখানি অবলুণ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। কেহবা স্বামী পুত্র লক্ষ্মী লাভ করিয়া ঐহিক সকল সুখ ভোগ করিতেছে, কেহ বা অনাথা নির্বন্ধু হইয়া পথে দাঁড়াইতেছে। কেহ বা, বিপুল অর্থরাশিতে নিমগ্ন থাকিয়া নানারূপ কুচিন্তার বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইতেছে; কেহ বা শাকান্ন উদরস্থ করিয়া বিমল সুখে নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বা সহস্ররূপ সহায় সম্পদ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে; কেহ বা একা বাহাদুর হইয়া সংসারক্ষেত্রে সুখে বিচরণ করিতেছে। কাহারও বা গগন-ভেদী প্রশংসাবাদেও পদে পদে বিপৎ-পাত হইতেছে, কাহারও খলস্বভাব নিন্দুকের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে তিলমাত্র ক্ষতি হইতেছে না। অদৃষ্ট! সকলি তোমারি মায়া—অতএব হে মায়াবিন্! তোমায় শত শত নমস্কার।

অদৃষ্ট! তোমাকে জানিয়াছে অনেকেই, কিন্তু কেহই দেখিতে পায় না। তুমি একবার আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে পূজা করি—পূজা করিলে লোকে আমাকে পৌত্তলিক বলিবে; বলুক, ক্ষতি নাই। তুমি একবার আমাকে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাও, আমি তোমার পূজা করিব। তোমার রুদ্র মূর্ত্তিতে আমি ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাই। হে বহুমূর্ত্তে। তুমি ভক্ত-বৎসলরূপে আমার সম্মুখে একবার দাঁড়াও, আমি তোমার পূজা করি।

অদৃষ্ট! জ্যোতিষিগণ তোমার পুরোহিত, তাহারা তোমার পৌরহিত্যে মনুষ্যদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখে। তাহারা যাহা বলে মনুষ্যগণ নিশ্চেষ্টভাবে তাহাই শুনে ও বিশ্বাস করে। তাহারা শুভ বলিলে শুভ, অশুভ বলিলে অশুভ, লোকে ইহাই মনে করিয়া থাকে। অতএব হে দৈবজ্ঞ-পূজিত ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে-তুষ্ট দেবতে! তোমায় নমস্কার। তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও, আমি তোমায় পূজা দিব।

অদৃষ্ট! লোকে-তোমার চক্রে পড়িয়া এই সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খায়। তুমি তাহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ না করিলে তাহারা কোথায় অগাধ জলে তলাইয়া যায়। অতএব হে ভবকর্ণধার! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার পূজা করিব।

শ্রীভুঃ—

অরণ্যপথে ব্যাঘ্র দর্শন।

কয়েক বৎসর হইল আমরা যখন হাজারি-বাগে থাকিতাম, তখন একরাত্রে কলিকাতা আসিব বলিয়া রওনা হইয়াছি। বগদরের রাস্তায় টাটি ঝরিয়া নামে একটা আড্ডা পার হইলেই ভেলয়ার জঙ্গলে পড়িতে হয়। যখন আমরা সেই জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছিলাম, তখন

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—ঘোর অন্ধকার। আমরা মানুষ-টানা বড় পাল্‌কি গাড়িতে আসিতেছিলাম। যেই মাত্র সেই জঙ্গলের মধ্যে আমরা একটা জঙ্গল-কাটা প্রশস্ত স্থানে আসিয়াছি, এক প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া আমাদের পথ আগ্‌লিয়া বসিল। বাঘ আসা মাত্র গাড়িটানা কুলিরা সকলেই চম্পট দিল, কেবল রহিলাম আমরা গাড়ির মধ্যে তিন জন, আর আমাদের সহিস কোচ-বাক্সের উপর। সহিস আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায় নাই, সে উপর হইতে বলিল "প্রকাণ্ড বাঘ ঘিরিয়াছে, বাঘ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।" আমরা তাহার প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকেও যাইতে বলিলাম, কিন্তু সে তাহা না করিয়া গাড়ির তলায় যাইয়া বসিল, এবং কতকগুলি শুখনা পাতা একত্র করিয়া দেশালাইয়ের সাহায্যে আগুন প্রস্তুত করিল; আর আমি, আমার দিদি মা এবং আমার দাদা গাড়ির মধ্যে "দুর্গা নাম" করিতে লাগিলাম। গাড়ির দরজার ছিটকিনি খুব জোরে আঁটিয়া দিয়া ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু বাঘ মহাশয়ও আগুন দেখিয়া একটু দূরে যাইয়া বসিলেন। কি হবে কিছুই উপায় উপলব্ধ হইয়া উঠিল না, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে শুনা যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই জন ঘোড়ায় চড়া সোয়ার এবং দুই জন ডাক হরকরা ঝম ঝম শব্দে আসিয়া উপস্থিত। সেই শব্দে পশুরাজও ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে তাহার লেজের আস্ফালনে এবং নৈরাশ্য-জনিত গর্জ্জনে সেই বনস্থলী কাঁপিতে লাগিল। যাহা হউক বাঘ চলিয়া গেলে কুলিরা আসিয়া জুটিল এবং গাড়ি টানিয়া চলিয়া গেল। ভগবান্ রক্ষাকর্ত্তা, নতুবা সে দিন যে আমাদের কি দশা হইত, তাহা তিনিই জানেন।

হেঁয়ালী।

আশ্বিনের হেঁয়ালী।

আদি শেষ বর্ণ যোগে রমণীর স্থান,
শেষ দুই বর্ণে কিছু টাকার সংস্থান।
আদি দুই বর্ণ যোগে মাঠ কি জঙ্গল,
সুখাদ্য জিনিষ আমি নামটী কি বল। ১
নৌকার উপরে যন্ত্র খাদ্য রাখিবার,
দেহমধ্যে কোন্ অঙ্গ বলগো তোমার? ২
আমি না থাকিলে গৃহ হয়ে যায় বন,
আমা লয়ে করে লোকে ঈশ্বর-সাধন।
রণে গিয়া আমি প্রাণ রক্ষার কারণ,
ক্ষণে যাহা পাই করি উদরে গ্রহণ। ৩
পুরুষ যদিও 'রাণী' উপাধি আমার,
মানুষ হইয়া বহি গর্দ্দভের ভার।
গিরি আসি মম পদ করেন প্রকাশ,
রাজত্ব করিয়া তবু যেন ক্রীতদাস। ৪
আদি দুটী বর্ণে পত্র শেষ দুটীতে ফল,
তিন বর্ণে কে আমি তা বল দিদি বল। ৫

শ্রাবণ ও ভাদ্রের হেঁয়ালীর উত্তর।

শ্রাবণ—(১) উকীল, (২) দারোগা, (৩) ব (অক্ষর), (৪) মশাল।

ভাদ্র—(১) গরুড়, (২) গামলা, (৩) বাটালী, (৪) া (আকার)।

নূতন সংবাদ।

১। ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদীর উপর একটী সেতু নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্ট ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। মহিস্থরে এক রেলওয়ে-বিভ্রাট ঘটিয়া ৮০ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আগামী ৭ই মার্চ্চ এবং এফ এ ও বিএ পরীক্ষা ২১ এ মার্চ্চ হইবে।

৪। স্পেন দেশের কাউণ্টেস মিরণ্ডা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মশিক্ষার্থ সিংহলে আসিতেছেন।

৫। রুসীয় সম্রাট ওয়ার্সা নগরে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তাঁহার গম্য পথের নিম্নে সুড়ঙ্গ খোলা হইয়াছিল, পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়াতে যাওয়া স্থগিত হয়।

৬। গত ২০শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে এক ঝড় হয়। ঝড়ের সময় ব্রজাঘাত হইয়া একটি বস্ত্রের কারখানা জ্বলিয়া গিয়াছে। ৬।৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার তাঁহার বিবিধ বিদ্যার পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক "ডি এল" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

৮। আগামী ২রা নবেম্বর শোণপুর মেলা বসিবে।

৯। মহারাণী হীরক জুবিলী উপলক্ষে যত উপহার পাইয়াছেন, ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তাহার প্রদর্শন হইবে এবং তাহা হইতে যে লাভ হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ যুবরাজ—হাঁসপাতাল ফণ্ডে দান করা হইবে।

১০। বর্দ্ধমান মহারাজার জন্য পঞ্জাবী এক কন্যা স্থির হইয়াছে, আগামী ডিসেম্বরে বিবাহ হইবে। কোর্ট অব ওয়ার্ড এতদুপলক্ষে ১৷৷০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১১। বিজয়নগরমের রাজমাতা রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ডবলিউ এ উইলক ম্যানেজার স্থির হইয়াছেন।

১২। সম্প্রতি চট্টগ্রামে ভয়ানক ঝড় হইয়া অনেক গৃহ পতিত এবং বহুসংখ্যক লোক ঘোর বিপন্ন হইয়াছে।

পুস্তকাদি-সমালোচনা।

১। পৌরাণিকী—"আলো ও ছায়া" প্রণেতৃ-প্রণীত। আলো ও ছায়া গ্রন্থকর্ত্রীর কবিত্বশক্তি বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত, নাটকরচনায় তাঁহার যে সুন্দর ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ পৌরাণিকীর অন্তর্গত একলব্য চিত্র। মহাভারত-পাঠকেরা জানেন একলব্য নামক ব্যাধ-সন্তান দ্রোণের নিকট শস্ত্রশিক্ষার্থী হন, কিন্তু দ্রোণ নীচজাতীয় বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যাখান করিলে, একলব্য অরণ্যমধ্যে মৃণ্ময় দ্রোণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গুরুভক্তি যোগে এরূপ ধনুর্বিদ্যা লাভ করেন যে, তাঁহার নিকট দ্রোণের প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুন পর্য্যন্ত লাঞ্ছিত হন। শিষ্যদিগের আবদারে দ্রোণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ব্যাধপুত্রের দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করেন এবং সে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা ছেদন করিয়া দেয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে একলব্য যেরূপে রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা নাটকাভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পৌরাণিকীতে আরও দুইটী সুন্দর কবিতা আছে।

২। রোগি-পরিচর্য্যা—শ্রীরাধাগোবিন্দ কর, এল, আর, সি, পি, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, বর্ত্তমান পুস্তকখানি তন্মধ্যে অন্যতম। লেখক একজন বিলাত-শিক্ষিত ডাক্তার এবং কলিকাতা মেডিকাল স্কুলের অধ্যাপক। তাঁহার লিখিত পুস্তকখানিতে শুশ্রূষার নিয়ম ব্যতীত শারীরবিধান, ঔষধাদি প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং ব্যাণ্ডেজ বন্ধন প্রভৃতির সুপ্রণালীবদ্ধ বিবরণ আছে এবং অঙ্গ মর্দ্দনের একটী স্বতন্ত্র প্রকরণ আছে। পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইয়াছে, বলা বাহুল্য।

বামারচনা।

ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্রজন দেখি হায়!
কেনগো দলিস্ পায়,
ক্ষুদ্র যারা এ জগতে তাহারা কি রহে না?
যে বিশ্বে তপন ভাসে,
যে বিশ্বে চাঁদিমা হাসে,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট জোনাকীরা
হাসে না?
যে বিশ্বে সমুদ্র রয়,
যে বিশ্বে জাহ্নবী বয়,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট নদীগুলি থাকে না?

যে বিশ্বে কোকিল-তান,
মাতাইয়া তুলে প্রাণ,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট দোয়েলেরা
গাহে না ?
যে বিশ্বে মলয় বায়,
জুড়ায় জগত-কায়,
সে বিশ্বে কি সান্ধ্য বায়ু ধীরে ধীরে বহে না ?
যে বিশ্বে চামেলী বেলী,
আনন্দে করিছে কেলি,
সে বিশ্বে কি ছোট ছোট যূঁইগুলি ফুটে না ?
যে বিশ্বে প্রেমিক-হাসি,
মাতায় মানবরাশি,—
সে বিশ্বে কি শিশু হাসি দেখি কেউ মাতে না ?
যে বিশ্বমাঝারে হায়,
ধনীর প্রাসাদ ভায়,
সে বিশ্বেতে দরিদ্রের কুটীর কি শোভে না ?

যে বিশ্বে সাধকদল,
বিভু পূজে অবিরল,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র নর ভগবানে ডাকে না ?
যে বিশ্বে মাধবী লতা,
জাগায় প্রেমের কথা,
সে বিশ্বে কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণগুলি রহে না ?
যে বিশ্বে বরিষা-ধারা,
করে সবে আত্মহারা,
ক্ষুদ্র শিশিরের বিন্দু সে বিশ্বে কি রাজে না ?
ভগবান-কাছে ভাই,
ছোট বড় কিছু নাই—
সবে তাঁর সম দয়া ভেদাভেদ রহে না।
তবে গো তোমরা হেন
ক্ষুদ্র জনে দল কেন,—
সবে প্রেম ঢাল, হৃদি স্বার্থে যেন ডুবে না।

মর্ম্মগাথা-রচয়িত্রী।

নিরাশায়।

আমার সাধের বাঁশরী হয়েছে নীরব,
সে মধুর তানে বাজে না আর ;
আর না ঢালিবে পুরাণ সে সব—
মৃদুল মধুর সুধার ধার ! ১
সে কুঞ্জ কানন শুকায়েছে এবে,
সরস কুসুম ফোটে না আর ;
আশার আলোকে বসিয়ে যেথায়
গেঁথেছিনু কত চিকণ হার ! ২
নিরাশার মেঘ আসিয়ে অকালে,
সুখের তপন ঢেকেছে মোর !
স্বপন প্রদীপ ডুবেছে আঁধারে,
ভেঙ্গেছে সুখের ঘুমের ঘোর !

বাসনা আকাশে নিরমল তারা,
বিকাশি কিরণ জ্বলে না আর,
জীবন তরণী হ'য়ে পথ-হারা—
চলেছে লইয়া দুঃখের ভার ! ৪
নিবিড় তিমির ঘেরেছে আমায়,
হৃদয় কুসুম শুকাল ওই !
নয়নের আলো নিভু নিভু প্রায়,
নাহি কোন (ও) আশা মরণ বই ! ৫
কে জানিত আগে, পাব এত জ্বালা,
জীবন তরণী বহিতে হেথা,
কে জানে কেমনে বিষাদ পবন,
ভগন তরী নে'যাবে কোথা। ৬

আশার ছলনে পাগলের পারা
শ্মশান সংসারে পশিনু যেই,
হেরিনু কেবল মরীচিকা মালা—
আশার পিয়াসা মিটিল কই ! ৭
জীবনের সুখ—স্বপনের আলো
নয়নের নীরে নিভিয়ে গেছে ;
না বুঝিয়ে প্রাণ পিয়েছিল সুরা,
এবে জ্ঞান-হারা হইয়ে আছে ! ৭

শ্রীক্ষীরোদবাসিনী ঘোষ।

বন ফুল।

তুলিওনা বোঁটা ছিঁড়ে
এ ক্ষুদ্র কুসুমটিরে,
বন-লতিকায় থাক্ বন-ফুল ফুটিয়া ;
মায়ের আঁচল তলে
থাকুক্ সে কুতূহলে,
কেন গো বধিতে চাও অসময়ে তুলিয়া ?
কেন গো নিদয় এত—
ইহ জনমের মত
চাহিছ নাশিতে ক্ষুদ্র কলিকাটী ছিঁড়িয়া ?
দূরে থেকে দেখ ভাই,
বোঁটা ছিঁড়ে কাজ নাই,
থা'ক্ সে আপন রূপে বন আলো করিয়া ;
শুধু দুদিনের তরে
এসেছে সে সংসারে,
এ ক্ষুদ্র জীবন তার সুখে যা'ক কাটিয়া,
ধরি তব দুটী পায়,
এ হেন বালিকা হায়।
বধিও না বধিও না বোঁটা ছিঁড়ে তুলিয়া,
বন-লতিকায় থাক্ বনফুল ফুটিয়া।

শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা রায়।

তুমি যদি রাখ পায়।

করুণা করিয়া নাথ,
তুমি যদি রাখ পায়,
তবে—আমি ত কাঙ্গাল নহি
নহি আমি অসহায়।
তুমি ত্রিলোকের পতি,
বসুমতী শ্রীচরণে
করিতেছে প্রণিপাত
নিয়ত সশঙ্ক মনে।
কোটি চন্দ্র, কোটি রবি
কোটি গ্রহ তারাচয়,
তোমারি আরতি করে
ঘুরিয়া দিগন্তময়।

কাননে অযুত পাখী,
তুলিয়া মোহন তান,
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে
তোমারি বন্দনা গান !
লইয়া চন্দন গন্ধ
মলয়জ সমীরণ,
ঘুরিছে উদাসী বেশে
খুঁজি খুঁজি ত্রিভুবন !
বসন্ত চরণযুগ
করিছে কুসুমময়
তোমারি করুণা নাথ,
বরিষে বারিদচয়।

আমিত কীটাণুকীট
অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম,
বিশাল সংসার মাঝে
হারাই অস্তিত্ব মম !
প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে
কত আসে, কত যায়,
আমি ক্ষুদ্র রেণুসম
মিশায়ে-যেতেছি তায়।
মরণ ধরিয়া কেশে
টানিছে শ্মশান পানে,
কত শত বিভীষিকা
জাগা'য়ে আকুল প্রাণে!
তাই—জুড়িয়া যুগল কর
ডাকিতেছি দীননাথ,
অধম সন্তানে কর
করুণা-কটাক্ষপাত।
এ জীবন কণা দিয়া
সাধিব তোমারি কাজ,
ভিখারীর এ বাসনা
পূর্ণ কর বিশ্বরাজ।
তুমি যদি দয়া করি
দীনহীনে রাখ পা'য়,—
তবে—কে বলে কাঙ্গাল মোরে
কে বলিবে অসহায় ?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ।

বিধবার দুঃখ।

আছে হেথা শান্তি নিরাশায় আশা,
স্নেহ প্রেম ভক্তি আছে অনন্ত পিপাসা,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে বিচ্ছেদে মিলন,
চন্দ্রের জোছনা আছে রবির কিরণ।
হরষে মাধুরী আছে আছে অশ্রুকণা,
আছে গ্রহ তারা কত না যায় গণনা।
সুখ দুঃখ সব আছে জ্ঞান পুণ্য ভাব,
ভূধর কানন আছে, কি আছে অভাব ?
সব যদি আছে তবে কেন সে আমার,
অতৃপ্ত পরাণ যাহে খোজে অনিবার।
কোথা মম প্রাণনাথ কোথা কত দূরে,
যার পাছে পাছে প্রাণ ভ্রময়ে আতুরে ?
যার জন্য অশ্রুনীরে ভাসে গণ্ডস্থল,
যার জন্য এ সংসারে ছেড়েছি সকল ?
দোলাইব কার গলে স্নেহ-ফুল-মালা,
কার মুখ দেখে হেথা জুড়াইব জ্বালা ?
কে আমার দুঃখ-অশ্রু কর পরশনে,
দেবে মুছি এসে আর স্নেহ সম্বোধনে ?
কি আশে রাখিব প্রাণ এমর ভুবনে,
কেবা দিবে সুখ শান্তি ভরি এ জীবনে ?
সমস্ত বাসনা হায়! দিছি বিসর্জ্জন,
তবু যেন কার তরে আকুলিত মন!
ইচ্ছা হয় উড়ে উড়ে মিটাই পিপাসা,
প্রাণনাথ সঙ্গে কহি ভাষা-হীন ভাষা।
ইচ্ছা হয় বাধা বিঘ্ন করি অতিক্রম,
দেখি সেই চন্দ্রানন ব্রহ্মাণ্ডে অসম।
আর নাই আর নাই প্রাণ! ধৈর্য্য ধর,
দেখ এই মহাশূন্যে তবে প্রাণেশ্বর।
এ জীবন মহা ভ্রম মহা অন্ধকার,
মহা শূন্যে দেখ প্রাণনাথের আকার।

শ্রীমতী অমলশশী বসু।

No. 394.

November, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৪ সংখ্যা। | কার্ত্তিক ১৩০৪—নবেম্বর, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পুনা হত্যার আসামী—হীরক জুবিলীর রাত্রিতে পুনায় যে দুইটী বড় সাহেবের শোচনীয় হত্যা হয়, দামোদর হরি চাপেকার নামে এক কীর্ত্তনিয়া ব্রাহ্মণ তাহার আসামী বলিয়া ধৃত হইয়াছে, এবং সে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে। তাহার দুই ভাই এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহারা পলাতক।

বোম্বাই সাময়িক পত্র—বোম্বাই প্রদেশের বহুসংখ্যক সংবাদপত্র-সম্পাদক রাজদ্রোহী বলিয়া ধৃত, এবং কেহ দ্বীপান্তরিত, কেহ কারানিক্ষিপ্ত, ও কেহ বা আদালতের বিচারে অর্পিত হইয়াছে। এরূপ সংবাদপত্র-বিভ্রাট এ দেশে কখনও হয় নাই। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মশা মারিতে কামান পাতিয়াছেন।

সীমান্তের গোলযোগ—অদ্যাপি ইহা মিটিতেছে না। দেখিয়া আমরা দুঃখিত ও ভীত হইতেছি। অসভ্যজাতিরা পরাজয় মানিয়াও মানিতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একটী যুদ্ধে অসম সাহস প্রকাশ করিতেছে। দুই পক্ষে হত ও আহত সংখ্যা যথেষ্ট। ভারতকোষ হইতে তিন কোটী টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, তাহা বাড়িবারই আশঙ্কা। আমাদের গবর্ণমেণ্টের মান রক্ষা হইয়া গোলযোগ মিটিলেই আমরা বাঁচি।

ঐতিহাসিক বিবাহ—লণ্ডনে গত ১৭ই অক্টোবর সুবিখ্যাত সার এডউইন আর্নল্ড এক জাপানী যুবতীর সহিত পরিণীত হইয়াছেন। জাপানী মহিলা ইংলণ্ডে সুশিক্ষিতা। আর্নল্ড যথার্থ আসিয়া-ভক্ত। আর্নল্ডের বয়স ৬৫ বৎসর।

বড় লোকের বড় কথা—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সাড়ে তিন কোটী টাকা জীবন-বিমা করিয়াছেন।

আগামী কংগ্রেস—আগামী ত্রয়োদশ

জাতীয় কংগ্রেস মধ্য-ভারতবর্ষে অমরাবতীতে বসিবে। মান্দ্রাজের অনরেবল্ সঙ্কর নায়ারের সভাপতি হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

মৃত্যু—বিলাতের অধ্যাপক এফ্ ডবলিউ নিউম্যান ৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিউম্যান ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রাচীন বন্ধু ছিলেন।

বাঙ্গালীর উচ্চ পদ—বাখরগঞ্জের সেসন জজ বিহারীলাল গুপ্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার হইয়াছেন।

ইংরাজ কেল্লা আক্রমণ—একজন বৌদ্ধ পুরোহিত কতকগুলি বদমায়েস লোকসহ ব্রহ্মদেশের ডফরিণ কেল্লা আক্রমণ করিতে আইসে। কয়েকজন সাহেব বিবিকে গুরুতর দাত্রাঘাত করিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা ধৃত হইয়া বিচারাধীন।

স্ত্রী রোগ-পরীক্ষক—দাদা ভাই নউরজির কন্যা এডিনবরা হইতে এল, আর, সিপি প্রভৃতি ডাক্তারি উপাধি পাইয়াছেন। সমুদ্রাগত ব্যক্তিগণের শরীর পরীক্ষার্থ তিনি একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী-বারিষ্টার—কানাডার মহিলারা বারিষ্টারী করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজে বিধবাবিবাহ—গত ১৬ই অক্টোবর ষড়্বিংশ বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম পল্লা ভট্টা, বয়স ২৫ বৎসর। কন্যার নাম পর্ব্বতাম্মা, বয়স ১৭ বৎসর। বর কন্যা উভয়েই বৈদিক-বংশীয় ব্রাহ্মণ।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ১৬ই জানুয়ারির সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণার্থ ইংলণ্ড হইতে সার জে নরমান্ লকিয়ার এবং কৃষ্টি নামক দুই সাহেব ভারতবর্ষে আসিতেছেন।

বোম্বাই মড়ক—বর্ষাবসানে মড়কের পুনরায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছে,বানর ও বিড়ালেরা এই রোগাক্রান্ত হইতেছে। কোন কোন ইউরোপীয় সম্পাদক বাহাদুর পরামর্শ দিতেছেন,স্থানীয় কপি ও মার্জ্জার বংশকে এককালে ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক।

তামাকে বীতরাগ—মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিকট তামাকের গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য। উইণ্ডসার প্রাসাদে আসিয়া কেহ ধূম্রপান করিলে গৃহ পরিষ্কার না করাইয়া তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন না।

বিবিধ তত্ত্বসংগ্রহ।

১। বেলুচিস্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে চিকিৎসক রোগীকে যে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করেন, তিনি স্বয়ং রোগীর সম্মুখে তাহার কিয়দংশ সেবন করিয়া থাকেন।

চিকিৎসক যে কোন প্রাণনাশকারী পদার্থ ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন নাই, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থলে চিকিৎসকের সহিত রোগীর আত্মীয়গণের এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া যদি রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসককেও রোগীর সহিত সহমরণে বাধ্য করা হইবে।

২। ইউরোপে এক প্রকার কাচ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার এক পার্শ্ব স্বচ্ছ এবং অপর পার্শ্ব অস্বচ্ছ। কিন্তু যে দিক্ অস্বচ্ছ, সে দিকে সূর্য্যালোক ঐ কাচে প্রতিবিম্বিত হয় এবং স্বচ্ছ দিকের মধ্য দিয়া তৎপার্শ্বে বিকিরিত হয়। এই প্রকার কাচের দ্বার প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার কাচের দ্বারযুক্ত গৃহের মধ্যে বাহিরের আলোক অবাধে প্রবেশ করে, কিন্তু বহির্দ্দেশ হইতে কেহ গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি বা দ্রব্য দেখিতে পায় না।

৩। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড।" এই ব্যাঙ্কে একখানি নোট আছে, তাহা ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে প্রচলিত হয়, এবং উহার মূল্য ৫৫৫ পাউণ্ড। আর একখানি ২৫ পাউণ্ডের নোট ঐ ব্যাঙ্কে রক্ষিত আছে ; উহা ১১১ বৎসর কেহই ভাঙ্গায় নাই। এ পর্য্যন্ত চারিখানি মাত্র ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নোট ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যেখানি ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রচলিত হয়,তাহা "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড" কৌতূহলকর দ্রব্যের হিসাবে ইহার কোষাগারে রাখিয়া দিয়াছেন।

৪। পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তাড়িত-বার্ত্তা বহনার্থ আটলাণ্টিক সমুদ্রের মধ্য দিয়া তার বিস্তৃত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত সমুদ্রের নিম্ন দিয়া এরূপ বারটী তার ফেলা হইয়াছে।

৫। বিপদ উপস্থিত হইলে সর্পিণী শিশু সর্পগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলে, এবং পরে নিরাপদ স্থলে গমন করিয়া তাহাদিগকে উদ্গিরণ করে। উদ্গিরণ করিবার পর দেখা যায়, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে ; গ্রাসিত হওয়ার নিমিত্ত কিছু মাত্র ক্লিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বহুদিন হইতে প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ এই তত্ত্বের সত্যতা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সচরাচর ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া অনেকে উহা বিশ্বাস করেন না। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার একজন সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক তথাকার এক জঙ্গলময় স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি শিশু সর্প পরিবেষ্টিতা একটা দীর্ঘকায়া কৃষ্ণবর্ণা সর্পিণী দেখিতে পান। তাঁহার পদশব্দে ভীত হইয়া সর্পিণী কয়েক হাত দূরে পলায়ন করে, এবং তৎপরে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে সে মুখ ব্যাদান করিয়া একে একে অষ্টাদশটী শিশু সর্প উদরসাৎ করে। উক্ত সাহেবের হাতে একটী বন্দুক ছিল ; তিনি সর্পিণীকে গুলি

করিয়া তৎক্ষণাৎ বধ করেন, এবং তাহাকে বাটী লইয়া গিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার শরীর ছেদন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গুলির আঘাতে কয়েকটী ছানার জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, এবং কয়েকটী অক্ষত-শরীরে জীবিত রহিয়াছে। এই শেষোক্ত কয়েকটী ছানা মুক্ত হইবামাত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। সর্পিণী ছানার জীবন রক্ষার জন্য যে তাহাদিগকে গ্রাস করে এবং গ্রাসিত হইলে যে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহা অষ্ট্রেলিয়ার এই বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

৫। মহারাণী বিক্টোরিয়া পরিবারস্থ লোকের সহিত জর্ম্মণ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, যিনি বর্ত্তমান জর্ম্মণ সম্রাটের মাতা, তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত ইংরাজী ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। রুষিয়া, গ্রীস, ও ডেনমার্কের রাজপরিবারস্থ সকলেই ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে ভাল বাসেন।

৬। জর্ম্মণির সম্রাট পরিবারে এই নিয়ম আছে যে, সম্রাটের প্রত্যেক পুত্র এমন একটী শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিবেন, যদ্দ্বারা আবশ্যক হইলে তিনি স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। বর্ত্তমান জর্ম্মণ সম্রাট ফটোগ্রাফি এমন সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছেন যে, যদি কখন তাঁহাকে জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি ফটোগ্রাফি দ্বারা বিপুল অর্থ অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন।

শৈশব-সঙ্গিনী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লরূপ মন্দার কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। সে নবস্ফুট কুসুমটী অকালে শুকাইতে বসিয়াছে। সুরেশের গৃহত্যাগের দিন হইতে আর প্রফুল্ল ভাল করিয়া ভাত খায় নাই, রাত্রিতেও ঘুমায় নাই, কেবল এক বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে—কেবল ভগবানের চরণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছে। বামুন দিদি কত সাধিয়াছে, ঝি কত ডাকিয়াছে, হারাণ চাকর কত মাথার দিব্য দিয়াছে, অভাগিনী প্রফুল্ল তবু উঠে নাই, বলে "আমার মাথা ঘোরে!" প্রফুল্লের কত যত্নের বাড়ী ঘর, সেই সুপরিষ্কৃত, সুসজ্জিত বাড়ী ঘর—এখন তাহারও দুরবস্থা কত!—উঠানে ময়লা জমিয়াছে; ফুল-বাগানে ঘাস গজাইয়াছে; ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর আরশুলায় বাসা করিয়াছে; শয়নের ঘরে ছবিগুলায় মাকড়সা জাল পাতিয়াছে; প্রফুল্ল আর সে সব কিছুই দেখে না! সে অষ্টাদশ-

বর্ষীয়া হেমপ্রতিমা, কেবল একদিন যমের সঙ্গে দেখা হইবে সেই আশায় বাঁচিয়া আছে!

জ্যৈষ্ঠ মাস, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তাহাতে দারুণ কাল মেঘ স্তরে স্তরে জমিয়া আরও অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়াছে। এই অন্ধকারের—এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে যোগেন্দ্রের হাত ধরিয়া সুরেশচন্দ্র প্রফুল্লের শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন।

'নিভনিভ' প্রদীপের আলোকে সুরেশ প্রফুল্লকে ঠাওরাইতে পারিলেন না; যোগেনকে চেয়ারখানি দিয়া নিজে প্রফুল্লের পায়ের কাছে বসিলেন; শেষে নৈরাশ্য-বিজড়িত ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "প্রফুল্ল! এ নরাধমকে একবার ক্ষমা করিতে পারিবে কি?" দৈববাণী শুনিলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, সেই চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রফুল্ল তেমনি চমকিয়া উঠিল, সোৎসুকে বলিল "তুমি! তুমি এসেছ?" সুরেশ প্রফুল্লের হাতে কি পায়ে ধরিতে যাইতেছিলেন জানি না, কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিয়াই চমকিত হইয়া বলিলেন, "প্রফুল্ল! তোমার জ্বর হইয়াছে?' প্রফুল্ল তাঁহার হাতখানি লইয়া নিজের মুখের উপরে রাখিয়া বলিল "জ্বর হইয়াছিল বুঝি, শরীরের ভিতরে কেমন একটা জ্বালা হইয়াছে।"

যোগেন্দ্র এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, ডাকিলেন "ফুলি!" প্রফুল্ল উত্তর করিল, "যোগেন দাদা! নাকি?" যোগেন্দ্র প্রফুল্লের কাছে গিয়া বসিলেন। তখন সাশ্রুনয়নে সুরেশ বলিতে লাগিলেন "প্রফুল্ল! যোগেন্দ্র দেবতা, তুমি দেব-বালা, আমিই নরকের কীট। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না; আমি আর তোমায় কাঁদাইব না।"

তখন স্বামীর হাতে হাত রাখিয়াই প্রফুল্ল বলিল "এই অমৃতমাখা কথাগুলি আমায় শুনাইতেই বুঝি ভগবান্ এতদিন আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন! কিন্তু হতভাগিনী আমি, আমার কপালে এত সুখ সহিবে কেন?" তার পরে যোগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল "ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, পরজীবনে তুমি যেন আমার সহোদর হও, আমি তোমার সহোদরা হই!" সুরেশ উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন "প্রফুল্ল! আমার প্রাণের প্রফুল্ল! তুমি কি আমায় ছাড়িয়া যাইবে?"

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল "আমার ইচ্ছা কি তোমায় ছাড়িয়া যাই? তোমাকে দেখিয়া আমার সাধ মিটে নাই, যদি একটু আগে বাড়ী আসিতে, তবু আর খানিক ক্ষণ দেখিতে পাইতাম! ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন আমি তোমারই দাসী হই! তুমি অমন অধীর হইও না, তোমার কাতরতায় আমার বুক ফাটিয়া যায়!"

তখন সুরেশ তাহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"প্রফুল্ল! রাগ করিয়া গেলে? প্রফুল্ল! আর তোমায় কাঁদাইব না, আর তোমার ননীর দেহে আঘাত করিব না! তুমি রাগ করিয়া যাইবে?"

যোগেন্দ্র কম্পিতহস্তে প্রফুল্লের হাত লইয়া নাড়ীর গতি দেখিতেছিলেন। শেষে বিকৃত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও ফুলি! আমার দিদিমণি! আমার জন্যই তোর জীবন নষ্ট হইল! আমার উপরে তোর আজীবন স্নেহের কি এই পুরস্কার! তোর আগে যেন আমার মৃত্যু হয়!"

ইহার পরে খানিক ক্ষণ নিষ্ফল চিকিৎসা হইল। সুরেশ ও যোগেন্দ্র উন্মত্তবৎ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল আর তাঁহাদিগকে শান্ত করিল না। সে যোগেন্দ্রের কোলের উপরে মাথা রাখিয়া, সুরেশের পায়ের উপরে হাত রাখিয়া, প্রফুল্লমুখে জন্মের মত চক্ষু মুদ্রিত করিল! বিশ্বজননী তাহার রোগ-যাতনার শান্তি করিলেন!

উপসংহার।

সুরেশ আর বিবাহ করিলেন না। এ সংসারের মধ্যে শোকার্ত্তদিগের একমাত্র ঔষধ, পরার্থে আত্মোৎসর্গ। সুরেশ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া পরহিতে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। বিবাহের "অভাব" ভুলিলেন।

যোগেন্দ্র এখন কলিকাতায়; তিনি খ্যাতনামা উকীল। অদ্যাপি বিবাহ করেন নাই, শুনিয়া সুরেশ তাঁহার বাড়ীতে আসিলেন। কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই! তুমি বিবাহ কর; তোমার ছেলে মেয়ে কোলে করিয়া সুখী হইব।"

যোগেন্দ্র আগে বিশেষ কিছুই বলিলেন না, শেষে সুরেশের জেদ ছাড়াইতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন—"যোগেন্দ্রের পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, যোগেন্দ্রকে বঞ্চিত করিবার জন্য, বিমাতা নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ সোণা, রূপা প্রভৃতি লইয়া নিজ পিত্রালয়ে চলিয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তাঁহার চক্ষুর পীড়া হয়; ভ্রাতার উপদেশে এক হাতুড়ে চিকিৎসককে দেখাইয়া এবং তাহার ঔষধ ব্যবহার করিয়া, বিমাতা জন্মের মত চক্ষু দুইটী হারাইয়া ফেলিলেন। বিমাতার মাতা পিতা ছিল না; তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়া তাঁহার গহনা ও টাকা সকল আত্মসাৎ করিয়া অন্ধ রমণীকে একান্ত নির্যাতন করেন। যোগেন্দ্র সেই সংবাদ পাইয়া বিমাতাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে বিমাতাকে স্নান ও আহার করাইয়া দেন। অবকাশকালে তাঁহাকে "মহাভারত" পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন।" এই সকল কথা বলিয়া যোগেন্দ্র সুরেশকে বলিলেন, "দেখুন, আমি বিবাহ করিয়া সংসারে জড়াইয়া পড়িলে মা'র কি দশা হইবে? আমার স্ত্রী যে হইবে, সে যদি স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে ওঁর দুঃখের সীমা থাকিবে কি? আর সুরেশ বাবু, বিবাহ করিব কাহাকে সুখী করিবার জন্য? আমার প্রাণের ভগিনী প্রফুল্ল কি আমার স্ত্রী পুত্রের সহিত খেলিতে আসিবে?"

সুরেশের চক্ষুতে জল আসিল, বলিলেন "ভাই! এ জগতে তুমিই ধন্য!"

যোগেন্দ্রের বিমাতাকে সুরেশ দেখিতে গেলে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "বাবা! আমিই প্রফুল্লের জীবন নষ্ট করিয়াছি, আবার আমার যোগেন্দ্রের সকল সুখ নষ্ট করিলাম! আমার উপায় কি হবে বাবা?"

সুরেশ ভাবিলেন, সম্পত্তি ও চক্ষুরত্নের বিনিময়ে নহে, যোগেন্দ্রের দেবত্বের জন্যই এ পাষাণ-প্রতিমা নব জীবন লাভ করিয়াছে।

লেখিকা শ্রীমা

সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা

সদুপদেশ।

১। জানিও যে, ধন বা যশোলাভে আমাদের জীবনের সার্থকতা নহে। পবিত্রতা, সাধুতা, অকপটতা যদি আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের মূলে বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে পার্থিব বা সাংসারিক হিসাবে সে সকল কার্য্যের সফলতা লাভ হইলেও, তাহাদের কোন মূল্য নাই। ধন বা যশে আত্মা সমৃদ্ধ হয় না, অতএব কেবল ইহাদের কোনটী কিম্বা দুইটিই লাভ করিয়া মনে করিও না যে, তোমার জীবন সার্থক হইল।

২। পরের মঙ্গলার্থ যদি তুমি কোন কার্য্য না করিতে পার, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইবে না। প্রেমবিহীন হৃদয় শুষ্ককাষ্ঠবৎ। অন্ততঃ নিজের আত্মার কল্যাণার্থ পরোপকার সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি কর।

৩। সংসারে মানুষ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তুমি যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, তখন সেই অবস্থোপযোগী কর্ত্তব্যকার্য্যের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতে সচেষ্ট হইবে।

৪। তোমার পক্ষে যাহা অতি ক্ষুদ্র কার্য্য, তাহাই যে বাস্তবিক ক্ষুদ্র কার্য্য তাহা নহে, এবং তোমার বিবেচনায় অতি বৃহৎ বা মহৎ কার্য্য যাহা, তাহাও যে প্রকৃত পক্ষে বৃহৎ বা মহৎ কার্য্য তাহা নহে। যে কার্য্যটী প্রকৃত পক্ষে স্বার্থ-সাধক, তাহাই ক্ষুদ্র কার্য্য এবং যে কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ম অনুযায়ী, তাহাই যথার্থ মহৎ কার্য্য।

৫। তুমি যতই ভাল লোক হও না কেন, তোমার দুই চারিটা দোষ থাকা খুব সম্ভব। অতএব তোমার কি কি দোষ আছে, তাহা বিশেষরূপে বুঝিয়া দেখিবে এবং সেই দোষগুলি যাহাতে ক্রমে ত্যাগ করিতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে।

৬। যদি কেহ তোমার নিন্দুক থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তোমার জীবনকে এরূপে নিয়মিত কর যেন লোকে তোমার নিন্দাকারীকে

মিথ্যাপবাদকারী বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারে।

৭। অপবাদকারীকে কখন ভয় করিও না, কেননা অপবাদ তোমার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার জীবন যদি বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়, তাহা হইলে যতই কেন লোকে তোমার অপবাদ রটনা করুক না, তোমার বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই।

৮। মানুষের এরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি যে, সে শতবার ভাল হইবার প্রতিজ্ঞা করে, এবং শতবার তাহা ভঙ্গ করে। যিনি স্বীয় চরিত্রকে উন্নত করিতে ইচ্ছুক, তিনি যদি দিনান্তে বা নিদ্রাগত হইবার পূর্ব্বে দিবসের কার্য্য সমালোচনা করেন, তাহা হইলে প্রত্যহই তাঁহার মনে অসম্পাদিত কর্ত্তব্য কার্য্য এবং সম্পাদিত অপকার্য্য জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যবোধকে এরূপ সতেজ করিয়া তুলিবে যে ধর্ম্ম, ন্যায় ও সুনীতির পথ হইতে তাঁহার স্খলিত হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিবে না।

৯। সকলেরই সহিত বন্ধুতা করিবে। সহৃদয়তা বন্ধুত্বের উপাদান। পদ বা ধনের দ্বারা সহৃদয়তা নিয়মিত হয় না। উচ্চ পদান্বিত ব্যক্তির যেমন সহৃদয়তা থাকা সম্ভব, নিম্নপদস্থ ব্যক্তিরও উহা তদ্রূপ থাকা সম্ভব। ধনীও যেমন সহৃদয় হইতে পারে, দরিদ্রও তদ্রূপ সহৃদয় হইয়া থাকে।

১০। কাহার মন কত উচ্চ বা কত নীচ, তাহা তাহার ধনলোভের তারতম্যানুসারে বুঝা যায়।

রাজকন্যা রাহুলা।

ত্রেতাযুগে রাহুলা নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। তিনি পরমা সুন্দরী—কেহ তাঁহার শরীরের গঠনে একটু খুঁত ধরিতে পারিত না। কিন্তু হইলে কি হয়, রাজকুমারী নিজের চক্ষুতে আপনাকে কুৎসিত দেখিতেন, এবং সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি দর্পণে মুখ দেখিতে যাইতেন, তাঁহার অন্তরের অসন্তোষের ছায়া মুখে আসিয়া পড়িত; গণ্ডস্থল স্ফীত, ললাট কুঞ্চিত এবং চক্ষু নিষ্প্রভ হইত। তাঁহার অকলঙ্ক মুখচন্দ্র কলঙ্কিত হইয়া যাইত, এবং তিনি অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন। কেন তাঁহার রূপ ভাল হইল না ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় থাক হইতে লাগিল, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু আরক্ত হইল। তাঁহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই, দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তিনি আদর্শে আপনার মুখ যত নিরীক্ষণ করেন, ততই আপনার কদর্য্যতা অধিক অনুভব করিয়া আকুল হন। তিনি রাজপ্রাসাদ হইতে পথপ্রান্ত নিরীক্ষণ করেন, কত সুন্দর সুন্দর সহাস্য মুখ চলিয়া

যাইতেছে, তিনি কেন এরূপ কুরূপ হইলেন! তাঁহার আক্ষেপের সীমা নাই। সকলের নিকটে দুঃখ করেন, এবং সকলের নিকটে জিজ্ঞাসা করেন, কিসে তাঁহার কুরূপ ঘুচিয়া সুরূপ হইবে, কিন্তু কাহারও নিকট সন্তোষকর উত্তর পান না।

রাজকন্যা শুনিলেন ভূষণ্ডী কাক নামে এক জ্ঞানী পক্ষী আছে। সে ত্রিকালজ্ঞ এবং ভবিষ্যৎ গণনায় সুদক্ষ। ভাবী শুভাশুভ ফল গণনার জন্য অনেক লোক তাহার নিকট আসিত। রাহুলা বহু অন্বেষণ করিয়া সুদূর অরণ্যস্থিত এক বটবৃক্ষে এই পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার চরণে প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পক্ষিরাজ! আমার রূপ ভাল কিসে হয় বলুন।" ভূষণ্ডী বলিলেন "নির্বোধ রাজকুমারি, রূপ অতি অসার তুচ্ছ বস্তু, তুমি তাহার জন্য কেন লালায়িত? জ্ঞান উৎকৃষ্টতর বস্তু, জ্ঞানের জন্য প্রার্থী হও, সুখী হইবে। বিশেষতঃ সৌন্দর্য্য রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমি কেমন করিয়া জানিব কোন্ রূপ তোমার চক্ষুতে সুন্দর হইবে? আমি তোমার চক্ষু বড় করিতে গেলে তুমি ছোট চক্ষু চাহিতে পার, আমি তোমার রঙ হরিদ্রাবর্ণ করিতে গেলে তুমি শ্বেতবর্ণ পছন্দ করিতে পার। বাছা! বাড়ী যাও, তোমার দর্পণে তোমার মনোমত একটী সুন্দরী বালিকার ছবি অঙ্কিত করিয়া আন, আমি তোমাকে সেইরূপ করিয়া দিব।"

রাহুলা একটু আশ্বস্ত হইয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! দর্পণে চিত্র করিবার ক্ষমতা আমার নাই, কিরূপে তাহাতে রঙ ধরিবে এবং মনোমত আকৃতি হইবে?"

বিহগবর বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি তোমাকে এক রঙের বাক্স দিতেছি। এ রঙ বরফের কৌটাতে রামধনু হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে, তুলিতে এই রঙ লইয়া দর্পণে ধরিলে তোমার ইচ্ছামত ছবি অঙ্কিত হইবে।" রাহুলা পরমানন্দে রঙের কৌটা লইয়া পক্ষিরাজকে পুনরায় প্রণাম করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহে গিয়া রাহুলা দর্পণ ও তুলি হস্তে কি প্রকার সুন্দর মূর্ত্তি আঁকিবেন ভাবিতে লাগিলেন। যত ভাবেন তাঁহার নিকট বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, মনে কিছু স্থির মীমাংসা করিতে পারেন না। আঁকিলেন চিনা রমণীর রঙ, রাজপুত রমণীর নাসিকা; —পছন্দ হইল না, পুঁছিয়া ফেলিলেন। আবার আঁকিলেন কর্ণাট ভামিনীর ওষ্ঠাধর এবং নেপাল কামিনীর দন্তপাঁতি—খাটিল না, মুছিয়া ফেলিলেন। আবার তুলি লইয়া আঁকিলেন শ্বেতদ্বীপ-কামিনীর চক্ষু এবং সিংহল রমণীর কেশদাম;—ঠিক্ হইল না, মুছিয়া ফেলিলেন। এইরূপ বার বার এক এক চিত্র কল্পনা করিয়া আঁকিতে যান, ছবি মনঃপূত হয় না, তাহা মুছিয়া ফেলেন। রাজকন্যা নিরাশ হইলেন। নিরাশ অন্তরে রাজ-প্রাসাদস্থিত চিত্রশালার ছবি সকল এক এক করিয়া

মানাযোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী ছোট বালিকার ছবি তাঁহার মনোমত হইল। তাহার চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, মুখে মৃদু হাস্য, আনন্দ বিষাদ মিশ্রিত। তিনি অবিলম্বে ভূষণ্ডীর নিকট গমন করিলেন, এবং সেইটীর কথা বলিলেন। ভূষণ্ডী বলিলেন, "স্বর্ণ ফ্রেমে বাঁধান ছোট মেয়েটীর কথা বলিতেছ। আমি তাহাকে চিনি। সে কুব্জ ছিল, এবং অনেক দিন বাত-বেদনায় ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। আমি তোমাকে তাহার 'মুখ' দিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তোমার জীবনের পরিবর্ত্তে তাহার জীবন তোমাকে লইতে হইবে এবং পৃষ্ঠে কুব্জ বহন করিতে হইবে।" রাজকন্যা সিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "না না, তাহা চাই না।"

রাহুলা ভূষণ্ডীকে বলিলেন "গ্যালারীর দক্ষিণ কোণে যে উজ্জ্বলচক্ষু, ফুটন্ত-গোলাপবৎ-মুখ মেয়েটীর ছবি আছে, আমি তাহার ন্যায় হইতে চাই।" ভূষণ্ডী বলিলেন "আচ্ছা, তাহা হইবে, কিন্তু তাহা হইলে তোমাকে তাহার মত জীবন ধারণ করিতে হইবে। সে একটী দুঃখিনী মেষপালিকা বালিকা! তুমি রাজবাটীর সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া উহার মত মলিনবেশে মেষ চরাইয়া বেড়াইতে চাও?" রাহুলা ভীত হইয়া বলিল "তা কেন? আমি দরিদ্র অবস্থায় থাকিতে পারিব না। আচ্ছা, পশ্চিম কোণে যে গর্ব্বিতমুখশ্রী রাজমুকুট-ধারিণীর ছবি আছে, আমি তাহার রূপ চাই।" ভূষণ্ডী বলিলেন "তাহার রূপ চাও ত তাহার ন্যায় জীবনও তোমার হইবে। ঐ রাজ্ঞীর দুর্ব্ব্যবহারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে চির-কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। তুমি কি সেই অবস্থায় থাকিতে চাও?" রাহুলা আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন "না, না, তবে তাহা চাই না।"

রাজকুমারী আর কোনও প্রস্তাব করিতে না পারিয়া বলিলেন "পক্ষিবর! আপনি জ্ঞানী, আমি আর কি বলিব? আমার জন্য যে ছবি ভাল হয়, আপনি পছন্দ করিয়া দিন।"

ভূষণ্ডী তখন নিজের নিকট একখানি ছবি ছিল, তাহা দেখাইয়া বলিল "দেখ দেখি ইহার মত হইতে চাও কি না?" রাহুলা দেখিয়া চমকিত ও অবাক্। বলিল "এমন রূপ ত দেখি নাই, এ কাহার ছবি?" বিহঙ্গবর বলিলেন "বৎসে! এ তোমারি ছবি। তুমি যখন আপনার রূপে আপনি সন্তুষ্ট হইবে এবং ঈশ্বর তোমাকে যে অবস্থা দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে শিখিবে, তখন তোমার এই অপরূপ রূপ প্রস্ফুটিত হইবে।"*

* কোনও ইংরাজী গল্প অবলম্বনে লিখিত।

সন ১২৯১ ... প্রতিষ্ঠিত ... কলিকাতা

ধর্ম্মের জয়।

(১)

পূর্ব্বকালে ভারতে একজন অতি যোগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু রাজা ছিলেন। রাজ-কার্য্য সমাধানের পর অবসর পাইলেই সভাসদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় কাল হরণ করিতেই ভাল বাসিতেন। এক দিন সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখন রূপ-গুণ-সম্পন্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী দেখিয়াছেন কি, না? এ প্রশ্নে সকলেই নীরব। পরে বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আমার স্ত্রীই জগতে আদর্শ রমণী;—তিনি রূপে সরস্বতী ও গুণে সাবিত্রী।" এই উত্তরে রাজা বয়স্যকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বয়স্য ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ সকলেই ধন্যবাদে প্রীত হইলেন। কিন্তু সকলের স্বভাব সমান নয়। কেহ বা অপরের ভাল দেখিলে সন্তুষ্ট হয়েন, কেহ বা তাহার সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করেন। সেই স্বভাবের লোক রাজার মন্ত্রীমহাশয়। তিনি বয়স্যের প্রতি রাজার ধন্যবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"আমি জানি, বয়স্যের স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল নহে। রাজা মহাশয় যদি আমাকে আজ্ঞা করেন, ও কয়েক মাসের অবকাশ দান করেন, তবে আমি বয়স্য-পত্নীর কুচরিত্রের কতকগুলি প্রমাণ দিতে পারি।" এই কথায় রাজা কিছু বিরক্ত হইয়া মন্ত্রীকে তিন মাসের অবকাশ দিলেন ও এই প্রকার আজ্ঞা দিলেন যে, উক্ত তিন মাসের মধ্যে বিশেষ প্রমাণ দিতে পারিলে বয়স্যের ফাঁসি ও মন্ত্রীর পুরস্কার হইবে, নচেৎ মন্ত্রীর সর্ব্বস্বান্ত ও প্রাণ-দণ্ড হইবে। সর্ব্বসমক্ষে রাজা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন।

(২)

বয়স্য তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়া কোন মতে বিচলিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ মনের সুখে রাজপ্রাসাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন;—পাছে মন্ত্রীর কোনও অমঙ্গল হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিছু ক্ষুণ্ণ দেখা যাইত। এ দিকে কুটিলবুদ্ধি মন্ত্রী কি করিয়া বয়স্যের সর্ব্বনাশ করিবে এই ভাবনায় আকুল হইয়া রাজ-ভবন পরিত্যাগ করিল ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু কষ্টে বয়স্যের গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। যেখানে বয়স্য-পত্নী তাঁহার দাসদাসী-পরিবৃত হইয়া পতিবিরহে মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিকটে একটী বাটী ভাড়া লইয়া অবলার সর্ব্বনাশের কূট মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইল। হায়! চতুরা মৃগীও ব্যাধের বাঁশীর সুস্বরে ভুলিয়া প্রাণ হারায়। কে জানে, আমাদের বয়স্য-পত্নীর সর্ব্বনাশ হইবে কি, না?

মন্ত্রীর সকল উপায়ই ব্যর্থ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আপনাকে বিফল-প্রযত্ন ও অবকাশের নির্দ্ধারিত সময় ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে অতিশয় ভীত হইল। ভীত হইল বটে, কিন্তু হতাশ হইল না। অধর্ম্মের গতি ও পরিণাম অতি শীঘ্র। কিন্তু তাহার এত বৃদ্ধি কেন? অতি উচ্চ স্থান হইতে পড়িলে উত্থানের আর ক্ষমতা থাকিবে না—সেই জন্যই এত বৃদ্ধি! সেই জন্যই বুঝি পরমেশ্বর তাহার পাপ-প্রাণে আবার আশার সঞ্চার করিলেন, তাহার পাপের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। এই সময়ে কোন প্রকারে একজন বেশ্যার সহিত মন্ত্রীর সদ্ভাব হইল ও মন্ত্রী তাহাকে উপদেশ দিয়া বয়স্য-ভবনে প্রেরণ করিল।

(৩)

বেশ্যা মন্ত্রীকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যুবতীর নিকট যাইয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করায় তাহার বাটীতে দাসী নিযুক্ত হইল। ক্রমশঃ দাসী বয়স্য-পত্নীর প্রিয় হইতে লাগিল। একদা নানা কথার পর দাসী বলিল—"আহা মা! তোমার স্বামী চির-কালই বিদেশে; তোমার এমন যৌবন বৃথা কাটিয়া যাইতেছে।" যুবতী কোন উত্তর করিল না। সতী পতির কথায় কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নির্ব্বুদ্ধি দাসী ভাবিল—যুবতীর কোনরূপ মনোবিকার ঘটিয়াছে এবং এই-বার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই ভাবিয়া পর দিন সেই কথার অবতারণা করিল, আরও বলিল "মা! তোমার সহিত একটী বিদেশী সাক্ষাৎ করিতে চাহে; তাহাকে আনিব কি? সে তোমার পতির সংবাদ জানে।" এই কথায় যুবতী ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে বাটী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। মায়াবিনী দাসীর করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া তাহার ভরণপোষণোপযোগী মণি-মুক্তা-খচিত তাঁহার গাত্রের একটী বহুমূল্য অঙ্গরাখা দান করিলেন। দাসী বিদায় হইল।

যুবতীর এইরূপ ব্যবহারে এখনকার অনেক বিদেশবাসী পতির যুবতী স্ত্রীগণ তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, বলিতে পারেন;—"না হয় বয়স্যপত্নী দ্বারের একটী কপাট বন্ধ করিয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিদেশীর মুখে পতির দুটো সংবাদ লইত। তাহাতে কি দোষ ছিল?" কিন্তু বয়স্য-পত্নীর সে বুদ্ধি যোগায় নাই। তিনি বিদেশীর নাম শুনিয়াই চটিয়া গেলেন, যদি দোষ করিয়া থাকেন, তবে মার্জ্জিত-রুচি যুবতীগণ যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

দাসী বয়স্য-পত্নী-প্রদত্ত অঙ্গরাখা লইয়া মন্ত্রীর নিকট আসিল এবং বিনিময়ে ও পুরস্কার স্বরূপ আশাতীত অর্থ পাইল। সে স্নানের সময় দেখিয়াছিল যুবতীর নাভি-পার্শ্বে একটী তিল আছে; সে কথাও মন্ত্রীকে বলিতে ভুলিল না। অঙ্গরাখাটী লইয়া ও দাসীপ্রমুখাৎ তিলের কথা শুনিয়া মন্ত্রিবর সানন্দে রাজধানী যাত্রা করিল।

(৪)

এবার আর মন্ত্রী পথে তত কষ্ট পাইল না;—মনের আনন্দই তাহার কারণ। যথা-সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সেই অঙ্গ-রাখাটী রাজার সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল —"মহারাজ! এই আমি বয়স্য-পত্নীর কু-চরিত্রের প্রমাণ আনিয়াছি। আমি বয়স্য-পত্নীর প্রণয়াবদ্ধ! আসিবার কালে ভাল-বাসার চিহ্ন স্বরূপ এই বহুমূল্য জামাটী উপহার দিয়াছে। তাহার নাভি-পার্শ্বে একটী তিল আছে। বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করুন, আশা করি, উনি সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।" রাজা বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বয়স্য দেখিলেন সকলই সত্য। সংসারে এক স্ত্রী ছিল—সেও ভ্রষ্টা। আর জীবনে প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া রাজাকে বলিলেন—"মন্ত্রীর কথা সত্য।" রাজার প্রিয় সহচর হইলেও রাজাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইল। বয়স্যের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ তাঁহাকে দুই মাস সময় দিলেন। সহসা স্বভাব পরিবর্ত্তনে স্ত্রীকে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিবার জন্য পাগলের বেশে তিনি বাটী চলিলেন। এত দিন পরে দেশে যাইতেছেন, লইয়া যাইতেছেন কি? না—এক মুষ্টি ভস্ম, স্ত্রীর মুখে মাথায় দিবার জন্য পথ হইতে তাহা লইয়াছেন। যুবতী সখীগণ সমভিব্যাহারে গৃহে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সহসা পতি সেই বেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন ও মুষ্টিমেয় ভস্ম স্ত্রীর মাথায় নিক্ষেপ করিয়া সবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন! এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইল। সতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গিনীগণকে বিদায় দিয়া পতির উন্মত্ততার কারণ জানিবার জন্য তখনই রাজধানী যাত্রা করিলেন। একাকিনী যুবতী বহু বিঘ্ন বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অতুলনীয়-রূপরাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া পরমেশ্বরের কৃপায় রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইলেন; এবং রাজ-প্রাসাদের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র কুটীর ভাড়া লইয়া চূড়ীওয়ালীর বেশে তথায় রহিলেন। সেই বেশে অবাধে গৃহস্থের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেন। একদা এক বাটীতে চূড়ী পরাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজ-বয়স্যের কথা উঠিল। কেহ বলিল—আহা! বিনা দোষেই বয়স্যের ফাঁসির হুকুম হইল। কেহ বলিল—কেন হবে না? সে কেন তার ভ্রষ্টা স্ত্রীকে মিছামিছি সতী বলে? কেহ বলিল—হতভাগীর দোষেই সব হইল; বয়স্যের দোষ কি? যুবতী এই কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনিল এবং তাহারই ঔৎসুক্যে, বাটীর গৃহিণী তাহার কাছে ঘটনার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। কোন্ দিন ফাঁসি হইবে তাহাও জানিয়া লইয়া রমণী বাটী হইতে বহির্গত হইল।

(৫)

অদ্য বয়স্যের ফাঁসির দিন। জল্লাদগণ

তাহাকে বধ্যভূমিতে আনিয়াছে। বধ্যভূমি জনতায় পরিপূর্ণ। কেহ দুঃখ প্রকাশ করিতেছে—কেহ স্ত্রী-চরিত্রে দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য তাহার প্রতি উপহাসের হাসি হাসিতেছে। পাত্র-মিত্র-পরিবেষ্টিত রাজাও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময় একটি অশ্বপৃষ্ঠারূঢ়া সুন্দরী যুবতী দ্রুতবেগে সেই বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিল। রমণী রাজাকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিল—বয়স্যকে ফাঁসি দিবার পূর্ব্বে একটী অভিযোগের বিচার করিতে হইবে। রাজাও ফাঁসি স্থগিত রাখিতে অনুমতি দিলেন।

মন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যুবতী বলিল—"মহারাজ! ওই ব্যক্তির নিকট আমি পাঁচ লক্ষ মুদ্রা পাইব। আমি একজন নাম-জাদা বেশ্যা, আমায় অর্থ দিলেই আমি চলিয়া যাই!" সকল দর্শকের দৃষ্টিই তাহার প্রতি পড়িল। নাম-জাদা বেশ্যা? কই কেহত কখন ইহাকে দেখে নাই! সকলেই অবাক্! মন্ত্রীও সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীর মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া আপনার মুক্তির জন্য বলিলেন—"মহারাজ! স্ত্রীলোক যাহা প্রার্থনা করিতেছে, তাহা সমস্তই মিথ্যা। এমন কি, আমি ইহাকে কখন দেখি নাই।"

রমণী জিজ্ঞাসিল—"দেখ নাই?"

মন্ত্রী—"না।"

রমণী—"দেখ নাই?"

মন্ত্রী—"না।"

র।—"দেখ নাই।"

ম।—"না। আমি পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে কখনও দেখি নাই।"

রমণী তখন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহারাজ! এখন বিচার করুন।"

মহারাজ—"তোমার কোন সাক্ষ্য নাই। কি প্রকারে বিচার করিব?"

রমণী—"আমার সাক্ষ্য আপনিই।"

ম—"কেন?"

র—"আপনার নিকট মন্ত্রী বলিয়াছে সে বয়স্য-পত্নীকে চিনে!"

এই কথায় সকলে নীরব! মহারাজও নিরুত্তর! মন্ত্রী কম্পিত! সতী তখন পতির হস্ত ধারণ করিয়াছে; তাহাকে আর কে বিনাশ করে? স্বয়ং কৃতান্তও সতীর নিকট পরাস্ত।

মন্ত্রীর পাপের ফল ফলিল। বয়স্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল। যুবতী রাজার নিকট মন্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা করাতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মন্ত্রী আর কর্ম্ম গ্রহণ করিল না: সে এই প্রকার অনুগ্রহে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যোগিবেশে অরণ্যে প্রবেশ করিল। এ দিকে মহারাজ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া বয়স্য-দম্পতীর জন্য প্রচুর অর্থ ও বৃত্তি দানের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা দেশে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন, পাপের গতি ও পরিণাম অতি দ্রুত। কিন্তু ধর্ম্মের গতি ও পরিণাম ধীরে ধীরে অতি উপাদেয়। তবে

মধ্যে ইহার পরীক্ষা বড়ই কঠিন। তাই বলি, পরীক্ষায় ভয় পাইবেন না। সহস্র সহস্র বিপদে বিতাড়িত হউন না কেন, সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন—"ধর্ম্মের জয়।"

খোকার খেলা।

খাবার ফেলে, খোকামণি, খেলায় দিচ্ছে মন,
খেলা পেলে, খাবার কথা, হয় সে বিস্মরণ।
খেলায় মেতে, সঙ্গি-সাথে, কচ্চে ছুটাছুটি,
ডগ্‌লা পুঁটী, খোকামণির, ধূলাখেলার যুটি।
ক্ষণে ক্ষণে, তাদের সনে, ঝগড়া-ঝাটি হয়,
ছুটে গিয়ে, মায়ের কাছে, কতই কথা কয়।
আবার এসে, হেসে হেসে, খেল্‌ছে লুকো-চুরি,
কর্ত্তা হয়ে, তাদের মাঝে, কর্চ্চে জারিজুরী।
দূরে দেখে, 'বাঘবাবুরে,' কচ্চে পলায়ন,
'বাঘবাবুজী,' ডেকে বল্‌ছেন, যাস্‌নে বাছা ধন!
মার আঁচলে, লাজের ছলে, লুকিয়ে রাখছে মুখ,
'বাঘবাবুরে' দেখে বুঝি, দুর্ দুর্ কচ্চে বুক।
ভেঙ্গে যায় সে, পোড়া লাজ, আর থাক্‌বে কতক্ষণ?
'বাঘবাবুটির,' কাছে এসে দিচ্চে দরশন।
ভঙ্গি করে, মধুর স্বরে, কাট্‌ছে ছড়া কত,
দেখবো না আর, হঠাৎ কবি, খোকামণির মত!
দাঁড়য়ে কাছে, 'বাঘবাবুটি,' শুন্‌ছে পেতে কাণ,
জুড়ে দিচ্ছে, খোকামণি, 'বাঘবাবুজীর' গান;
হেলে দুলে, রঙ্গরসে, ঢেলে দিচ্ছে মন,
আনন্দেতে, ঠাকুরমা'তার হচ্ছে নিমগন!
অধরেতে, ফুট্‌ছে খুকুর, কিবা মধুর হাসি,
সাধে কি গো, খুকুর খেলা, এত ভালবাসি॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত কয়েকটি কথা।

(৩৯১ সংখ্যা—১৫০ পৃষ্ঠার পর)

স্নান অগ্নি-প্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুস্কর, ওজোধাতুবর্দ্ধক, বলকারক এবং চুলকানি, মলা, শ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও অকালপক্কতা বিনাশক। শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, এ জন্য মানবগণের স্নান করিবামাত্রই জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হয়। শীতল জল

দ্বারা স্নান করিলে রক্তপিত্ত উপশমিত হয়। গরম জল দ্বারা স্নান করিলে বল বৃদ্ধি এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ জল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর তেজোহানি হইয়া থাকে। বায়ু ও কফের প্রকোপ সত্ত্বে উষ্ণ জলই হিতকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান, দুগ্ধপান, স্নিগ্ধ অথচ অল্প ভোজন এই সমস্ত নিতান্ত হিতজনক। প্রত্যহ আমলকী গাত্রে লেপন করিয়া স্নান করিলে নিশ্চয়ই বলী ও পলিত রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারা যায়। জ্বরে, অতিসারে, উদরাধ্মানে, পীনাসে, অজীর্ণরোগে এবং আহারান্তে স্নান করা অকর্ত্তব্য। স্নানের পর বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিবে, ইহাতে শরীরের কান্তি বৃদ্ধি এবং কণ্ডু ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়। গাত্রমার্জনের পর শরীর স্নিগ্ধ হইলে বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানানন্তর যথাযোগ্য অনুলেপনাদি কর্ত্তব্য। অনুলেপনের পর যথাবিধানে শরীর ভূষিত করিবে। স্বর্ণ ধারণ পবিত্রকারক, সৌভাগ্যবর্দ্ধক ও সন্তোষজনক। রত্নাভরণ ধারণ পুষ্টিকারক, ইহা গ্রহদোষ ও দুঃস্বপ্নবিনাশক। সূর্য্যের মাণিক্য, চন্দ্রের সুদৃশ্য ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলের প্রবাল, বুধগ্রহের মরকত মণি, শুক্রাচার্য্যের হীরক, শনিগ্রহের নির্ম্মল নীলকান্তমণি, এবং অপর গ্রহ দুইটীর গোমেদ ও বৈদূর্য্যমণি। তৎপরে আহারের সময় উপস্থিত হইলে তখন মঙ্গলজনক সামগ্রী গ্রহণ করিবে। আহারের পরিপাক হইয়া যৎকালে ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইবে, তখনই আহার করিবার উপযুক্ত কাল। মানবগণের স্বভাবতঃই আহার-ইচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ প্রভৃতি প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষুধার সময় আহার না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রসরক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি উপস্থিত হয়। পানেচ্ছা প্রতিঘাত করিয়া জলপান না করিলে কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, রক্তশোষ ও হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ দ্বারা জৃম্ভা, মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরের বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে। বাহ্য অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তির আহার্য্য বস্তুর অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও সেইরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি ক্লেদসমূহকে, তাহার অভাবে রস রক্তাদি ধাতুকে এবং ধাতুর অভাবে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্য ক্ষুধা হইলেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণ ও আদা ভোজন করিবে। ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও গুরু দ্রব্য ভোজন করিবে; এবং তাহার পর কোমল দ্রব্য ভোজন ও আহারের শেষ অবস্থায় দ্রব দ্রব্য পান করিবে। এই নিয়মে আহার করিলে

বল ও স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে সুস্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিবে। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই এ স্থলে স্বাদু বলা হইয়াছে। অতিশয় দ্রুত বা বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিবিধ গুরু দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। মাত্রা গুরু, স্বভাবতঃ গুরু ও সংস্কার গুরু, এই ত্রিবিধ গুরু পদার্থ। মাত্রা গুরু মদগাদি—ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণ অনুসারে গুরু হয়। মাসকলাই প্রভৃতি স্বভাবতঃ গুরু। পিষ্টকাদি সংস্কার গুরু। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে অর্থাৎ মাসকলাই, পিষ্টক, প্রভৃতি অর্দ্ধ মাত্রায়, এবং মদগাদি স্বভাবতঃ লঘুতা প্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় সেবন করা যায়। পেয়াদি তরল দ্রব্য, তক্র প্রভৃতি অতিশয় তরল দ্রব্য অধিক মাত্রায় খাইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না; কারণ পেয় সর্ব্বপ্রকারে লঘুগুরুযুক্ত।

শুষ্ক দ্রব্য চিপীটক প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভি দ্রব্য ছোলা প্রভৃতি—ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করে। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক, অতি শীতল ও অতি শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য। অত্যন্ত ক্লিন্ন অন্ন গ্লানিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় শীতাদি দোষযুক্ত না হয়, এমত অন্ন ভোজন করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে।

উদরগহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ুগমনাগমনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে। অত্যন্ত জল পান করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একেবারে জল পান না করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের প্রতিবন্ধকতা জন্মে। অতএব আহারের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে জল পান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের আগে জল পান করিলে শরীরের কৃশতা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়, ভোজনের মধ্যে জল পান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জল পান করিলে শরীরের স্থূলতা এবং কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন ও ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই বিশেষ নিষিদ্ধ। যেহেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি ভোজন করিলে গুল্ম রোগ হয়, এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জল পান করিলে জলোদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজনের পরে কিম্বা রাত্রিকালে বা অধিক পরিমাণে এবং জল ভিন্ন অথবা কেবল জল ছাতু ভক্ষণ করিবে না। আমিষ সংযুক্ত ছাতু, দুগ্ধমিলিত ছাতু, উষ্ণ ছাতু বর্জ্জনীয়। ছাতুর অবলেহ লঘুত্ব হেতু শীঘ্রই পরিপাক হয়। ভোজন শেষ হইলে খড়িকা গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করিবে। আচমন করিবার সময় দন্ত প্রভৃতিতে যে সকল মল থাকে, তাহা যত্ন-

পূর্ব্বক বাহির করিয়া পুনরায় আচমন করিবে; কারণ দন্ত সংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এই জন্য অল্পে অল্পে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি কোন পদার্থ দৃঢ়রূপে দন্তলগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্ত স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিবে না। আচমনক্রিয়ার পর জলসিক্ত হস্ত দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে, আহারের পর চক্ষুতে জল দিলে তিমির বিনষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বকথন।

কপিল বলিলেন "মাতঃ! তত্ত্ব সকলের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে জ্ঞান জন্মিলে হৃদয় প্রশান্ত হয়, প্রকৃতির গুণ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয়, চিত্তগ্রন্থি (অর্থাৎ অহঙ্কারাদি মনোবন্ধন) ছিন্ন হয় ও সংশয় সকল দূর হয়—যে জ্ঞানকে বুধগণ মুক্তির কারণ বলিয়া থাকেন, তোমার নিকট আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। যে অনাদি আত্মা বুদ্ধিযুক্ত (অর্থাৎ অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট), আত্মবাদিগণ তাঁহারই নাম পুরুষ বলিয়া থাকেন। সেই পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, সঙ্গবিরহিত, নির্গুণ ও বিশ্বের সহিত প্রকাশিত। বিষ্ণুর শক্তিরূপা অব্যক্তা ও গুণময়ী যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি লীলাবশে প্রীতি দেখাইয়া পুরুষের নিকট গমন করিলে পুরুষ অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সেই প্রকৃতি পুরুষ সঙ্গযোগে আপনার মায়াময় গুণ বিস্তারপূর্ব্বক নিজের সমরূপ বিচিত্রদর্শন প্রজা সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ তাঁহার এই শক্তিদর্শনে জ্ঞান-আবরণকারিণী মায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রকৃতির অধ্যাস হেতু গুণের পরিমাণে আপনাকে সকলের কর্ত্তা বলিয়া মানেন! মা! বাস্তবিক পুরুষ কেবল সাক্ষীমাত্র, তিনি কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল, সুখস্বরূপ ও স্বগত স্বচ্ছন্দ। তিনি কেবল কর্ত্তৃত্বজ্ঞানে অর্থাৎ আপনাকে কর্ত্তা মানিয়া জন্ম মরণ ও কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন! জননি! দেহ আর ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহারা যে যে স্বভাব পাইয়াছে, প্রকৃতিই তাহার কারণ, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এবং ভোক্তৃত্ব, সকলই একমাত্র অহঙ্কারের কার্য্য বটে, তথাপি কার্য্যমাত্রই জড়াবসান; এই জন্য তাহাতে প্রকৃতির প্রাধান্য। আর ভোগমাত্রেই জ্ঞানাবসান, এই জন্য তাহাতে প্রকৃতিগত চৈতন্যের প্রাধান্য।"

দেবহূতি বলিলেন, "হে পুরুষোত্তম! তত্ত্ব সকলের অনুক্রম বিশেষ করিয়া বল। স্থূল সূক্ষ্ম এই দুই কার্য্য যাহাদের পরিণাম, যাহারা এই বিশ্বের কারণ, সেই প্রকৃতি পুরুষের লক্ষণ যথাক্রমে আমাকে বুঝাইয়া বল।" কপিল বলিলেন, "জননি! এ তত্ত্ব নিগূঢ়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিতে ও বুঝিতে হইবে। যিনি প্রকৃতি, তিনি নিজে অবিশেষ অথচ তিনি বিশেষের প্রধান আশ্রয়। মাতঃ! সেই প্রধান ত্রিগুণজড়িত, অতএব তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। তাহা অব্যক্ত, অক্ষয় ও অকার্য্য—তাহা মহত্তত্ত্ব নয়, কার্য্য ও কারণ স্বরূপ কালাদিও বলা যায় না, তাহা নিত্য, সুতরাং তাহাকে জীবের প্রকৃতি বলা যায় না। উল্লিখিত প্রধানের বিবরণ বলিতেছি। কার্য্যরূপে তাহার চতুর্ব্বিংশগণ—তাহার পাঁচ, পাঁচ, চারি এবং দশ এই প্রকার চতুর্ব্বিংশ সংখ্যা, ক্রমে ইহাদের বিবরণ বলিতেছি শুন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণানুক্রমে এই পাঁচটী তন্মাত্র বলিয়া অভিহিত। শ্রবণ, নয়ন, ত্বক্, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া আখ্যাত। বাক্ পাণিপাদপায়ু ও জননেন্দ্রিয় পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত। এই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিলাম, এখন অন্তরিন্দ্রিয়ের চারি নাম বলিতেছি শুন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তিভেদে এই চতুর্ব্বিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যে চব্বিশ তত্ত্ব বলিলাম, ইহা সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশস্থল জানিবে। ইহা ভিন্ন কোন কোন মহাত্মা পুরুষ লইয়া পঞ্চবিংশ তত্ত্বের নিরূপণ করেন। দেবি! কালের বিষয়ে দুই মত আছে, কেহ কালকে ঈশ্বরের পরাক্রম বলেন, ঐ কাল হইতে দেহে অহংবুদ্ধি জন্মে। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, এমত মূঢ় জীবগণ এই কাল-ভয়ে সদা সশঙ্কিত। তাহারা আত্মার ভাব না বুঝিয়া জীয়ন্তে মৃতের ন্যায়। অপর ব্যক্তি বলেন যে, কাল স্বয়ং ভগবান্ এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রাণ। সেই ভগবান্ কে? তাহা বলিতেছি শুন। মায়িক অথচ যিনি নির্ব্বিকার, আপনি মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন—যিনি নিয়ন্তাস্বরূপ হৃদয়মধ্যে থাকেন—যিনি ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে আপনি সর্ব্বতঃ নির্লিপ্ত থাকিয়াও এই বিশ্বের ভিতরে বস্তু বিকারে স্থিত আছেন, তিনিই ভগবান্। অন্য জ্ঞানিগণ তাঁহাকে কাল বলেন। এই কালের সহিত ২৫শটী তত্ত্ব আছে, যাহার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, বিকার নাই ও বিগ্রহ নাই।

মা! তত্ত্ব সকল যে প্রকারে সমুদ্ভূত হইয়াছে, আর সেই তত্ত্বের যেরূপ লক্ষণ তাহা বলিতেছি। জীবের অদৃষ্টবল সঞ্চালিত প্রকৃতির গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ প্রকৃতিতে নিজ শক্তি স্থাপিত করেন, তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হয়। সেই মহত্তত্ত্ব স্বপ্রকাশ হিরণ্ময়, প্রবীণগণ

সেই তত্ত্বকে কূটস্থ লয়-বিক্ষেপ-বিহীন বিশ্বের অঙ্কুর বলিয়া গণ্য করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ছিল, মহত্তত্ত্ব ইহাকে এমন প্রকাণ্ড করিয়াছে। ইহা প্রলয়ান্ধকারে বিলীন ছিল, মহত্তত্ত্ব সেই অন্ধকার সমগ্র গ্রাস করিয়াছে। মহত্তত্ত্ব কাহাকে বলে এবং জ্ঞানিগণ উহাকে কি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন বুঝিলেত? যে চিত্ত সত্বগুণসমন্বিত, স্বরূপপ্রকাশক, স্বচ্ছ ও রাগাদিরহিত—যে চিত্তবলে ঈশ্বর উপলব্ধ হয়—যাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া সকলে অভিহিত করে, সেই মহত্তত্ত্বকে চিত্ত বলিয়া জানিবে। এই চিত্ত বৃত্তিভেদে নানারূপ। ইহাকে জ্ঞানিগণ অধিভূতরূপে মহৎ, অধ্যাত্মরূপে চিত্ত, উপাস্যরূপে বাসুদেব, অধিষ্ঠাতৃরূপে ক্ষেত্রজ্ঞ ও স্বরূপতঃ মহত্তত্ত্ব বলিয়া জানেন। ক্রিয়াভেদে ইহার স্বচ্ছত্ব, অবিকারিত্ব ও শান্তত্ব গুণাদি নিরূপিত হইয়াছে। চিত্তের স্বচ্ছতা জন্য শক্তি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। সুধীগণ, অবিকারিত্বের ফল সঙ্কল্প বিকল্পহীন, নিশ্চল, নিষ্কাম, ও অনন্ত আরাম বলিয়া জানেন। ভূমির সংসর্গভেদে জল যে প্রকার স্বচ্ছ, সুশীতল ও সুমধুর হয়, চিত্ত মহত্তত্ত্বের স্বরূপ ও বৃত্তিভেদে সেইরূপ হইয়া থাকে।

এখন অহঙ্কারের লক্ষণ বলিতেছি, তাহার উৎপত্তি-প্রকার শ্রবণ কর। ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া মহত্তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হয়, অহঙ্কার সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত। ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত এই অহঙ্কার গুণভেদে তিন প্রকার। সেই তিনটী গুণ বৈকারিক, তৈজস ও তামস নামে অভিহিত। তাহা হইতে মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি সংজাত হয়। যাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ ও সহস্রশীর্ষ, ঋষিগণ যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন, সেই পুরুষ মনোময় ভূতেন্দ্রিয়; ইহাতেই কর্ত্তৃত্বাদি গুণ জন্মে। এই অহঙ্কারের দেবতারূপ কর্ত্তৃত্ব, ভূতরূপ কার্য্যত্ব আছে। শান্তত্ব, ঘোরত্ব ও বিমূঢ়ত্ব, এই তিনটী কারণ, কারণ গুণত্রয়রূপে অহঙ্কারে বিরাজিত। আমি পূর্ব্বে তোমাকে যাহা বলিয়াছি, সেই অহঙ্কার যদি সৃষ্টির জন্য প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে মনস্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, মনের সংকল্প বিকল্প দ্বারা কামনার উৎপত্তি হয়। যোগিগণ এই মনস্তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর 'অনিরুদ্ধ' বলিয়া থাকেন। সেই সর্ব্ব কামনার আধার অনিরুদ্ধ। তাহার সহজ লক্ষণ সংকল্প ও বিকল্প, যোগিগণ অতি কষ্টে ইহাকে বশীভূত করেন। হে সাধ্বি! তৈজসতত্ত্ব যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন বুদ্ধিতত্ত্ব জন্মে, তাহা দ্রব্যস্ফুরণরূপ বিজ্ঞানের স্বরূপ। ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহরূপ বৃত্তিভেদে সংশয়, নিশ্চয় জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান ও নিদ্রা এই কয়েকটী বুদ্ধিতত্ত্বের লক্ষণ। বুদ্ধি যখন কোন বস্তু নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহাকে সংশয় বলে; যখন সে কোন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে, তখন তাহাকে নিশ্চয় জ্ঞান বলা যায়; যখন তাহার স্ফুরণ থাকে না, তখন তাহাকে নিদ্রা বলে; একে আর অনুমান হইলে তাহাকে মিথ্যা জ্ঞান বলে। মা! আরও ইন্দ্রিয়ের বিবরণ বলিতেছি শুন। জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে তাহা দুই প্রকার, ইহারাও তৈজসাহঙ্কারের বিকার, কেননা ইহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া অবস্থিত, কারণ ইহাতে জ্ঞানের ক্রিয়া শক্তি ও বুদ্ধির বিজ্ঞান শক্তি দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

রাজা ভবচন্দ্র।

অনেকেই রাজা ভবচন্দ্রের কথা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইনি কোথায় কোন্ সময় রাজত্ব করিতেন, বোধ হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

রাজা ভবচন্দ্রের অপর নাম উদয়চন্দ্র। তাঁহার পিতার নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নাম ধর্ম্মপাল। ধর্ম্মপাল কোন্ বংশীয় রাজা ছিলেন, এবং পালবংশীয় রাজাদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কি না, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ তাঁহারা এক বংশসম্ভূতই ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭৭৫ অব্দে এই বংশীয় এক জন নরপতি আসামে কামরূপে রাজত্ব করিতেন। রঙ্গপুর জেলাতে ডিমলা নামে একটি স্থান আছে। ডিমলা উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে এই ডিমলা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে পুলিশের একটি থানাও আছে। ডিমলার কয়েক মাইল দক্ষিণে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাবধি উহা "ধর্ম্মপাল" নামে প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মপালের পর গোপীচন্দ্র রাজা হন। কথিত আছে, গোপীচন্দ্রের এক শত স্ত্রী ছিল এবং তিনি সর্ব্বদা আমোদ কৌতুকেই মত্ত থাকিতেন। তাঁহার মাতা মিনাবতী সমস্ত রাজকার্য্য চালাইতেন। যৌবনের উন্মত্ততার অবসান হইলে গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। জনপ্রবাদ এই যে, অদ্যাপি গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন।

গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র রাজা হন। রাজা ভবচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। রাজা ভবচন্দ্রের ভবনে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা প্রতিদিন যথাসময়ে সেই দেবীর আরাধনা করিতেন। দেবীর নাম ভোগেশ্বরী। রাজা দেবীকে বড় ভক্তি করিতেন। কথিত আছে যে, রাজা এক দিন নিষিদ্ধ সময়ে সেই দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেবী তাহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া রাজাকে ও তাঁহার মন্ত্রীকে অভিসম্পাত করেন। দেবতার অভিশাপে রাজা ও মন্ত্রীর ঘোর বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে,—এমন কি সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ পায়।

সাধারণ পাঠাগার কলিকাতা

তদবধি ভবচন্দ্র প্রচলিত নিয়মের বিপরীত সব কাজ করিতেন। তিনি সারাদিন নিদ্রাতে কাটাইতেন ও সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন। তাঁহার রাজ্যে ক্রমে এই বিপরীত নিয়ম প্রচলিত হইতে লাগিল। রঙ্গপুরের কতক অংশ ও বর্ত্তমান আসামের কিয়দংশ ভবচন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। অদ্যাপি রঙ্গপুর জেলার স্থানে স্থানে রাত্রিতে হাট বাজার হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় হইতে লোকসমাগম হয়, আর রাত্রি ১০ কি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রয় বিক্রয় চলিতে থাকে। বগুড়া জেলার স্থানে স্থানেও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

রাজা ভবচন্দ্রের সাধারণ বুদ্ধি পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, তাঁহার মন্ত্রী এক বাক্সের মধ্যে বদ্ধ থাকিতেন; নাক, চোখ ও কাণ (তুলা) দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। যখন কোন গুরুতর কার্য্যে মন্ত্রণা আবশ্যক হইত, তখন তিনি বাক্স হইতে বহির্গত হইতেন।

একদা একটী শিকারী প্রকাণ্ড একটা বন্য শূকর বধ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করে। রাজা ও মন্ত্রী কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারেন না যে, জন্তুটা কি। অনেক বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত হইল যে, জন্তুটা হয় একটা বড় মূষিক হইবে, অনেক আহারে পুষ্ট হইয়াছে; না হয় একটা হস্তী, যক্ষ্মারোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কয়েকটী সওদাগর মালামাল লইয়া নৌকা-পথে যাইতেছিল। অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে তাহাদের নৌকা জলমগ্ন হয়, এবং তাহাদের সমস্ত জিনিস পত্র নষ্ট হয়। রাজার নিকট এই বিষয়ের দরখাস্ত উপস্থিত হইল। রাজা বিচার করিলেন যে, দেশে যত কুম্ভকার আছে, তাহাদিগকে সওদাগরের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, কেননা তাহারা যে স্তূপাকার মৃত্তিকা সাজাইয়া মৃৎপাত্র প্রস্তুত করে ও তাহাতে অগ্নি সংযোগ করে, তজ্জন্যই মেঘ আকৃষ্ট হয় ও বৃষ্টি হইয়া নাবিকদিগের ক্ষতির কারণ হয়।

নিম্নলিখিত গল্পটীই রাজার বিদ্যা বুদ্ধির উৎকৃষ্টতম সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে:—

দুই জন পথিক একদিন বৈকালে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজার পুষ্করিণীর ধারে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। তাহারা ক্ষুধাতে পীড়িত হইয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বে উনন করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিল। রাজার সে দিন সকাল সকাল নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দুটী লোক মৃত্তিকা খনন করিতেছে। তখন যে বৈকাল সময়, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি মনে করিলেন এত প্রত্যূষে এই দুইটি লোক সিঁধ কাটিয়া চুরি করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি আদেশ করিলেন, চোর দুটিকে শূলে দিয়া বধ করা হউক। দুটি শূল-কাষ্ঠ আনা হইল। একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, আর একটি নীচু। চোর দুটি রাজার

বুদ্ধিবিকৃতির কথা জানিতে পারিল। তখন তাহারা একটি উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা প্রত্যেকেই সেই উচ্চ শূলটিতে হত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল ও ভয়ানক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের এত আগ্রহের কারণ কি? তাহারা বলিল "মহাশয়! এই উচ্চ শূলটিতে যে ব্যক্তি প্রাণ হারাইবে, পরকালে সে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে, আর অপর ব্যক্তি তাহার মন্ত্রী হইবে।" রাজা মনে করিলেন যে, এই দুই পাষণ্ড পরকালে রাজা হইবে, আমি সে অধিকারে বঞ্চিত হইব! এই মনে করিয়া স্বয়ং সেই উচ্চ শূল-কাষ্ঠে উঠিলেন ও মন্ত্রী অপর কাষ্ঠে উঠিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।*

অদ্যাবধি অসভ্য ও অশিক্ষিত স্থানকে লোকে রাজা ভবচন্দ্রের মূলুক বলিয়া শ্লেষ করিয়া থাকে।

কৈলাস গোবিন্দ দাস, এম্, এ।

মহীসুর-রাজ্য।

মহীসুর রাজ্যের পরিমাণ ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল। ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩ শত ৪ জন। ভারতের করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে মহীসুর রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। মহিষাসুর হইতে মহীসুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মহীসুর দুইটী ভাগে বিভক্ত, পশ্চিম ভাগ ও পূর্ব্ব ভাগ। কানারী ভাষায় পশ্চিম ভাগের নাম মালনাদ্ অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং পূর্ব্ব ভাগের নাম ময়দান্, অর্থাৎ সমতল ভূমি। মালনাদ্ প্রদেশ পর্ব্বত ও উপত্যকাময়, অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ ও সুশোভিত, কিন্তু জনপদপ্রাচুর্য্য বিরহিত। ময়দান্ প্রদেশ লোকাকীর্ণ নগর, গ্রাম ও ধন ধান্যে পরিপূর্ণ। মহীসুর প্রদেশের

* এই গল্পের আর একটী জনপ্রবাদ শুনা যায়। তাহা এই যে, এক গুরু ভৃত্য সহিত শিষ্যবাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে রাজা ভবচন্দ্রের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা মধ্যাহ্নে আহারের জন্য এক পুষ্করিণীর ধারে উনন খুলিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইল যে, পুষ্করিণী চুরি করিবার জন্য দুই জন বিদেশী সিঁদ খুলিতেছে। রাজার বিচারে তাহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া শূলদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে তাহাদিগের বুদ্ধিকৌশলে তাহারা বাঁচিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ রাজা ও মন্ত্রী শূলে আরোহণ করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন।

বা, বো, স।

স্থানে স্থানে ৪ হাজার ফিট উচ্চ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট পর্ব্বত দেখা যায়। পূর্ব্বে এই সকল পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ হ্রদসমূহ হইতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগৃহীত হইত। প্রাচীন মহীসুর ভূপতিগণ এই সকল পর্ব্বতশৃঙ্গে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গস্থ সেনাগণ চতুর্দ্দিকস্থ জনপদসমূহের শান্তিরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। মহীসুর রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীদ্বয় প্রবাহিত। সমস্ত রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হ্রদ দেখা যায়। সুলকর নামক হ্রদটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার পরিধি ৪০ মাইল। এই রাজ্যে চাউল, ইক্ষু, তূলা ও যবের প্রচুর চাষ হইয়া থাকে।

অধিবাসিগণের মধ্যে ৪৬ লক্ষ ৩৯ হাজার হিন্দু, ২ লক্ষ ৫২ হাজার মুসলমান, ৩৮ হাজার খ্রীষ্টীয়ান, ১৩ হাজার শিখ, ৩৫ জন পারসী এবং ২১ জন য়িহুদী। হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ী। শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে জৈনদিগের প্রধান পুরোহিত বাস করেন; ঐ স্থানে গোমতেশ্বর নামক জৈন মহাপুরুষের প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি আছে।

মালনাদ প্রদেশের অল্পাংশ ব্যতীত রাজ্যের অন্যান্য সকল স্থানের লোকেরা কেনারী ভাষায় কথোপকথন করে।

মহীসুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অরণ্য মধ্যে চন্দনবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোলার নামক স্থানে কয়েকটী স্বর্ণ-খনি আছে। ঐ সকল খনি হইতে প্রতিবৎসরই কিছু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। চিনি, সুপারি, চাউল, কাফি, পান মহীসুর রাজ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

মহীসুর রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, রামায়ণোক্ত কিষ্কিন্ধ্যা এই মহীসুর এবং রাজা সুগ্রীব মহীসুরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারই সেনাপতি হনুমান সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ প্রচারকগণ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মহীসুরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধপ্রচারকগণের পর কতকগুলি জৈনধর্ম্মাবলম্বী মহীসুরে গমন করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় তথাকার অধিবাসিগণের মধ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। মহীসুরের নানা স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন জৈন মন্দির দৃষ্ট হয়।

বল্লাল নামক এক রাজপুত বংশ বহু শতাব্দী মহীসুরে রাজত্ব করেন। ১৩১০ সালে আলাউদ্দীন খিলিজী তাহাদের রাজ্য ধ্বংস করেন। কর্ণাটদেশীয় হিন্দু রাজারা আবার ইহার অধিপতি হন।

শেষোক্ত হিন্দুরাজবংশের শেষ রাজা কৃষ্ণরাজ। ইহাঁর রাজত্বকালে হাইদার আলি নামে একজন সামান্য মুসলমান বুদ্ধিচাতুর্য্যে মহীসুরের সেনাদলকে হস্তগত করিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ও আপনি তৎপদে অভিষিক্ত হন। হাইদার মহাবীরত্ব সহকারে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানও প্রবলপ্রতাপ ও মহাবীর ছিলেন।

শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের সময় টিপু সুলতান হত হইলে পর রাজা কৃষ্ণরাজ শৃঙ্খলমুক্ত হয়েন, এবং স্বীয় রাজ্যভার পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন। রাজা কৃষ্ণরাজ রাজকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন না এবং অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে এতদূর অযোগ্যতা দেখাইতে লাগিলেন যে, ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ হস্তে মহীসুর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৩১ সাল হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এই পঞ্চাশ বৎসর কাল মহীসুর রাজ্য ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন ছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট মহীসুর রাজ্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাজ প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছিলেন, ব্রিটিষ শাসনকালে এই ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধিত হয়। কৃষ্ণরাজ নানা প্রকার কর স্থাপন করিয়া প্রজা পীড়ন করিতেন, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল করের মধ্যে যেগুলি অন্যায় বোধ করিয়াছিলেন, সেইগুলি রহিত করিয়াছিলেন। রাজ্যের যে যে স্থানে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইলে প্রজার সুবিধা হয়, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট তত্তৎ স্থানে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও উৎকর্ষের জন্য অনেক স্থানে খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মহীসুরবাসীদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য একটী শিক্ষাবিভাগ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটিষ শাসনাধীনকালে, ১৮৭৬-৭৮ সালে, দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশে মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মহীসুরেও ঐ দুর্ভিক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের প্রাণ-রক্ষার জন্য মহীসুরের রাজকোষ হইতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় এবং দুঃস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে সে বৎসর খাজনা আদায় না করাতে রাজ্যের সাড়ে আটাইশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়।

১৮৮১ সালে মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ার গবর্ণমেণ্টের অভিমতানুসারে মহীসুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ইনি রাজা কৃষ্ণরাজের পোষ্যপুত্র ছিলেন। ১৮৬৮ সালে রাজা কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পরেই ইনি রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তখন নাবালক থাকাতে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন নাই। পেষ্টার নামক একজন সুশিক্ষিত ইংরাজ ইহাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। ইংরাজী ভাষা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ও ব্যবহারশাস্ত্রে ইনি সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হয়েন। অশ্বারোহণ ও ব্যায়ামেও

ইনি সুপটু হইয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে ইহাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে শ্রীযুক্ত আর, সি, রঙ্গ চার্লু ইহাঁর মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহাঁর পর শ্রীযুক্ত শেষাদ্রি আয়ার মন্ত্রী হয়েন। মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ার রাজ্যে শাসন সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের সকল তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুসন্ধান করিতেন এবং প্রজার সুখ ও উন্নতি সাধনার্থ সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। ইহাঁর রাজত্বকালে মহীসুর রাজ্য নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইয়া বার্ষিক একশত ছয় লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান নগরগুলিতে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে মহীসুর রাজ্যে সর্ব্ব-শুদ্ধ ৮৬টী মিউনিসিপালিটী আছে। রেল পথ খোলা হইয়াছিল; তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা হইতেছে। মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ারের গুণবতী সহধর্ম্মিণী স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতিনী। তাঁহারই প্রযত্নে ও মহারাজার উৎসাহে রাজপ্রাসাদেরই একাংশে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতি-ষ্ঠিত হয়। ইহার নাম মহারাণীর বালিকা-বিদ্যালয়। ১৮৮১ সালে যখন এই স্কুল প্রথম খোলা হয়, তখন ইহাতে আটাইশটী মাত্র ছাত্রী ছিল; এক্ষণে ইহার ছাত্রী-সংখ্যা ছয় শত। এই স্ত্রী-বিদ্যালয়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার ছাত্রীগণের মধ্যে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশীয়া যুবতী দেখা যায়। হিন্দু সমাজভুক্তা যুবতী ছাত্রী ভারতবর্ষের প্রায় অন্য কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। মহারাণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের ন্যায়, প্রজা প্রতিনিধি সভা মহীসুর রাজ্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য সদনুষ্ঠান। মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ারের উৎসাহে ও তাঁহার মন্ত্রী শেষাদ্রি আয়ারের আয়াসে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে একবার এই সভার অধিবেশন হয়। জাতীয় মহা-সমিতির ন্যায় ইহার অধিবেশন দুই দিন হইতে চারি দিন পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া হইয়া থাকে। এই সভায় রাজ্যের সকল মহকুমা হইতে প্রতিনিধি আসিয়া উপস্থিত হয়েন। অতীত বৎসরের রাজ্যসংক্রান্ত প্রধান ঘটনা ও কার্য্যসম্বন্ধীয় একটী বিবরণী রাজমন্ত্রী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধীয় কি কি নূতন নিয়ম বা আইন প্রবর্ত্তিত করা হইবে, মন্ত্রী মহাশয় তাহারও আভাস দেন। তৎপরে প্রতি-নিধিগণের মধ্যে স্ব স্ব মহকুমার অভাব সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা বর্ণনা করেন। তৎপরে মন্ত্রী মহাশয় তদ্বিষয়ে রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে কেহ, রাজ্যের যে কোন বিভাগের যে কোন ব্যবস্থা বা বিষয় পরিবর্ত্তন বা সংস্কার-সাধন জন্য যে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন। তৎপরে সেই প্রস্তাব মন্ত্রী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং পরে বিবেচনা ও বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া

থাকেন। এইরূপে প্রজা প্রতিনিধি সভা দ্বারা মহীসুর রাজ্যের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। মহারাজা রম রাজেন্দ্র উদিয়ারের রাজত্বসময়ে একটী অতি শুভফলদায়ক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। মহীসুরে বহুকাল হইতে শৈশববিবাহ প্রচলিত। শৈশব-বিবাহের নানা বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া মহারাজা ও তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী এই আইন করেন যে, আট বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে যে পুরুষ বিবাহ করিবে, তাহার দুই বৎসর কারাদণ্ড হইবে, এবং ৫০ বৎসরবয়স্ক কোন পুরুষ অনধিক চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিলে তাহারও উক্ত দণ্ড হইবে।

মহারাজা রাজেন্দ্র উদিয়ার সর্ব্বতো-ভাবে স্বীয় রাজ্যের উন্নতি সংসাধনে এতদ্রূপ মনোযোগী ছিলেন যে, দীর্ঘজীবী হইলে তিনি যে মহীসুর রাজ্যকে অতুল সুখসমৃদ্ধিশালী করিয়া যাইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ১৮৯৪ সালের ২৮এ ডিসেম্বর তারিখে দ্বাত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া মহীসুরবাসিগণকে গভীর দুঃখ ও নিরাশা সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। ভরসা করা যায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া রম রাজেন্দ্র উদিয়ার যে সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

মহীসুর রাজ্যে তিনটী প্রধান নগর আছে, —মহীসুর, বাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তন। মহীসুর রাজ্যের রাজধানী মহীসুর নগর। ইহা চামুণ্ডি গিরির পাদদেশে অবস্থিত। নগরটীর রাস্তা ঘাটের বন্দোবস্ত অতি সুচারু। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাজপ্রাসাদ দুর্গ অভিহিত স্থানটীর মধ্যে অবস্থিত। রাজসিংহাসন হস্তিদন্তনির্ম্মিত। সম্রাট আরঙ্গজীব উহা তাঁহার সমকালীন মহীসুরাধিপতিকে উপঢৌকন দেন। কিছুকাল হইল এই সিংহাসন স্বর্ণ ও রৌপ্য পত্র দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে। মহীসুরের রাজপরিবারের চিরন্তন প্রথা-নুসারে এই সিংহাসনে কেবল মাত্র উপবেশনেরই অর্থ রাজ্যাভিষেক। মহী-সুর নগরে অনেকগুলি চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়, একটী বাতুলাশ্রম এবং একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। সম্প্রতি একটী স্ত্রী-চিকিৎসালয়ও তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহীসুর নগরে দুইটী বৃহৎ কালেজ আছে; একটী মহারাজার এবং অপরটী খ্রীষ্টীয় মিসনারিগণের প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালোর নগরটীকে মহীসুর রাজ্যের অন্যতর রাজধানী বলা যাইতে পারে। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত বড় বড় আফিস এই নগরেই প্রতিষ্ঠিত। মহারাজার একটী প্রকাণ্ড প্রাসাদ কিছুকাল হইল এখানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নগরে সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেকগুলি বৃহৎ উদ্যান এবং কয়েকটী বিদ্যালয় আছে। নগরটী স্বাস্থ্য-কর জলবায়ুর জন্য প্রসিদ্ধ। এই নগরের লোকসংখ্যা দুই লক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক।

শ্রীরঙ্গপত্তন মহীসুরের প্রাচীন রাজধানী। ইহা কাবেরী নদীতটে সংস্থিত ও একটী দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে একটী প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরে বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুর এই মূর্ত্তি "শ্রীরঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতেই নগরের নাম শ্রীরঙ্গপত্তন। বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক রামানুজ ১১৩৩ সালে বল্লালবংশীয় কোন রাজার নিকট হইতে এই দ্বীপটী উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এখানে যে দুর্গ আছে, তাহা ১৪৫৪ সালে নির্ম্মিত হয়। ১৬১০ সালে শ্রীরঙ্গপত্তন মহীসুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নগর টিপু সুলতানের হস্তগত হইলে তিনি ইহা সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ এই নগর অধিকার করেন। যখন মহীসুর নগর মহীসুর রাজ্যের রাজধানী হয়, তখন শ্রীরঙ্গপত্তন ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত হয়।

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

(১) অনুক্রমণিকা।

ললনা গৃহের শান্তি—অশান্তির মূল,
সচ্চরিত্রা হ'লে সুখ, নাহি কোন ভুল।
সুখ শান্তি লভে সবে যাঁহার ব্যাভারে,
'গৃহদীপ্তি' নাম যোগ্যা তিনি পরিবারে॥

প্রাচীন জ্ঞানিগণ মনুষ্যজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয়ের বিধান করিয়াছেন। এতন্মধ্যে তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থার নাম গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে, মনুষ্যকে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর বিপদের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। প্রতি পদবিক্ষেপে, সংসারের নানারূপ বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইতে হয়। কর্ত্তব্যসাধনের জন্য অনেক সুখ, স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হয়। এবম্ভূত বহুবিধ বিঘ্ন বিপত্তি সমাকীর্ণ সংসারে বাস করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যসমূহ সুসম্পন্ন করা, সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কর্ত্তব্য নানা প্রকার। এ স্থলে সংক্ষেপতঃ, কেবল মাত্র তিনটী কর্ত্তব্যের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য এবং প্রতিবেশীদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন বালকের ক্রীড়া নহে। আত্মসংযম অভ্যাস করিতে

হইবে, নতুবা প্রবল বাসনাস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, প্রলোভনের প্রচণ্ড অগ্নিতে হৃদয়ের গুণরাশি ভস্মীভূত করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে এবং প্রকৃষ্ট শিক্ষা দ্বারা হৃদয়ের উৎকৃষ্ট গুণগুলি পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত করিতে না পারিলে, আত্মোন্নতি সাধন অসম্ভব। আত্মার ধর্ম্মভাব সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখিতে হইবে। যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিলে, প্রকৃত উন্নতি লাভ সহকারে ভাবী জীবন সুখময় হইবে, সেই সকল কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আপনাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রবল ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়-সেবা, কুপ্রবৃত্তি, অভিমান, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিনিচয় দমনপূর্ব্বক ধার্ম্মিক, বিনয়ী, পবিত্রাচারী এবং আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে।

পরিবারের মধ্যে জনক জননী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির প্রতি প্রেম, অন্যান্য আত্মীয়বর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান ও অনুরাগ এবং দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করা কম সাধনাসম্ভূত কার্য্য নহে। সচরাচর দেখা যায় যিনি পিতা মাতাকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূজা করিতে সক্ষম হইলেন, তিনি হয়ত ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি উপযুক্ত প্রেম প্রদর্শনে বিমুখ, অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে যথোপযুক্ত সম্মান ও অনুরাগের চক্ষে দেখিতে পারেন না। সাধারণতঃ এই দৃষ্ট হয় যে, যাহাদিগের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির আশা অপেক্ষাকৃত কম, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যহারের পরিমাণও কম হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা পারিবারিক কর্ত্তব্য অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর আত্মীয়বর্গের প্রতি অর্থাৎ যাহাদিগের নিকট হইতে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি হয় না, তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ মহত্ত্বের প্রয়োজন। পরিজনবর্গের সহিত প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হইয়া পরস্পরের উন্নতি বিধানপূর্ব্বক স্বকীয় গৃহকে অনুপম শান্তিধামে পরিণত করা সামান্য কার্য্য নহে।

দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার দ্বারা চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। তাহাদিগকে উপযুক্তরূপ খাটান যেরূপ উচিত, তাহাদিগের প্রতি স্নেহানুগত এবং সদয় ব্যবহার করাও তদ্রূপ একটী কর্ত্তব্য। ভৃত্যগণ গৃহকর্ম্মের প্রধান সহায়। সুমিষ্ট ও সদয় ব্যবহারে তাহাদিগেকে রীতিমত চালাইতে সমর্থ না হইলে, পারিবারিক সুখ শান্তির অনেক বিঘ্ন ঘটে। তাহাদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত না করিলে, তাহারা কোন কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে প্রফুল্লচিত্তে অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করে না। কেবল ভয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোনরূপে কার্য্য সম্পাদন করে; সুতরাং কার্য্যের শৃঙ্খলা থাকে না।

প্রতিবেশীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা সুখ শান্তিলাভের একটী প্রধান উপায়। ইহাদিগের উপর সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহারা যদি মাতাল, চোর,

প্রবঞ্চক অথবা কপটাচারী হয়, তবে গৃহস্থের যে কত বিপদ ও অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে যদি কেহ কুপথগামী হয়, তবে তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যখন তাহারা কোন অভাবে পতিত হন, তৎক্ষণাৎ সে অভাব পূরণার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কাহার কোন্ পীড়া হইল, কে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় আছেন, কাহার কোন জিনিষের প্রয়োজন, সর্ব্বদা এই সকল অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত তাহাদিগের সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

এই সকল কর্ত্তব্যের প্রতি সমভাবে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সহজ ব্যাপার নহে। প্রায়শঃ ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে, যিনি একদিকের কর্ত্তব্য আগ্রহ সহকারে সম্পাদন করেন, তিনি অপর দিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কতক পরিমাণে উদাসীন থাকেন। সকল দিকের কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খল-রূপে সম্পাদন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং নানাবিধ অনর্থ সংঘটিত হয় এবং প্রকৃত সুখশান্তি লাভ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। আড়ম্বরবিহীন হইয়া কার্য্য সাধন না করিলে কোনও কার্য্য প্রকৃতরূপে সংসাধিত হয় না।

বিপৎকালে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

সকলেই ১৮৫৭ সালের ভয়ানক সিপাহিবিদ্রোহের কথা শুনিয়াছেন। এরূপ ভয়ানক রাজবিদ্রোহ ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। কিছু সময়ের জন্য ইংরাজদিগের প্রবল শাসন-দণ্ডও কম্পিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে মিরাটে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিদ্রোহিগণ মিরাট হইতে দিল্লী গমন করে। অনতিকাল মধ্যেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অধিকাংশ স্থানই ইংরাজ-হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। সেই সকল স্থান পুনরধিকার করিতে ইংরাজদিগকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই বিষম বিপ্লবের সময় অনেক ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিক পুরুষ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সময়ের একটী ঘটনা অদ্য বর্ণন করিব।

বিপত্তিকালেই মনুষ্যের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, সুখ ও সম্পদের সময় উহাদিগের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় না। কোমলাঙ্গী ইংরাজ মহিলাগণ ও বিলাসপ্রিয় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ যে বিদ্রোহি-পরিবেষ্টিত হইয়া পানীয় ও খাদ্যের অভাব সহ্য করিয়া মাসাধিক কাল লক্ষ্ণৌ নগরের রেসিডেন্সি-গৃহে আবদ্ধ

থাকিতে পারিবেন এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারিত? অযোধ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ঐ প্রদেশের প্রধান নগর লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেন্সি-গৃহে অতি অল্প-সংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও রমণী সমবেত হন; তাঁহারা অতিমাত্র ধৈর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে প্রায় মাসাধিক কাল বিদ্রোহী-দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সার হেনরি লরেন্স এই সাহসী দৃঢ়চিত্ত ইংরাজ দলের নেতা ছিলেন। তাঁহাকে অধিক দিন অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় নাই। এই রেসিডেন্সি-গৃহেই বিদ্রোহীদিগের বিষম গোলাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজগণ এই ভগ্নপ্রায় রেসিডেন্সি-গৃহ আজিও অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছেন। যে গৃহে সার হেনরির মৃত্যু হয়, সেই গৃহ এখনও বর্ত্তমান। সার হেনরির ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি অতি বিরল। প্রাণান্ত সময়েও তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার কবরের উপর লেখা আছে যে "এই খানে সার হেনরি লরেন্স শয়ান আছেন—যিনি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" "Here lies Sir Henry Lawrence, who tried to do his duty." সার কলিন ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌ নগরস্থ এই ইংরাজ দলের উদ্ধারার্থ প্রেরিত হন। সার কলিন লক্ষ্ণৌ নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, রেসিডেন্সীতে যাইতে হইলে সিকান্দ্রাবাগ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান হস্তগত করা আবশ্যক। সিকান্দ্রাবাগের মধ্যে দুই সহস্রেরও অধিক বিদ্রোহী ইংরাজদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। সিকান্দ্রা-বাগ স্থানটী বর্গক্ষেত্রাকার অর্থাৎ উহা দৈর্ঘ্য প্রস্থে সমান। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে স্থানটী ৩০০ হাত হইবে এবং চতুর্দ্দিকে ২০ ফুট উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তরস্থ বিদ্রোহিগণের নিকট বহু-সংখ্যক কামান ছিল। ঐ সকল কামানের অনর্গল অনলবৃষ্টিতে সিকান্দ্রাবাগের সম্মুখীন হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু স্থানটী অধিকার না করিলেই নয়, সুতরাং সত্বর কলিন ঐ সুদৃঢ় প্রাচীরের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে হুকুম দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র ইংরাজ-দিগের কামান সকল সিকান্দ্রাবাগের সম্মুখে স্থাপিত হইল এবং গভীর গর্জ্জনে দিগ্বিদিক্ কম্পিত করিয়া প্রাচীরের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া দুই পক্ষে গোলাবৃষ্টি চলিল। বিদ্রোহিগণও পাশ্চাত্য সামরিক প্রথা অনুসারে সুশিক্ষিত, কামান বন্দুক প্রভৃতি চালাইতে তাহারাও প্রায় ইংরাজ সৈনিকদিগের ন্যায় ক্ষিপ্রহস্ত। বিদ্রোহি-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে অনেক ইংরাজ যোদ্ধা হত হইলেন। এই যুদ্ধে সার কলিন ক্যাম্বেল একটী বন্দুকের গুলিদ্বারা উরুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আঘাত অতি সামান্যই হইয়াছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য তিনি অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে সিকান্দ্রাবাগের দৃঢ় প্রাচীরে ছিদ্র হইল। ক্রমশঃ ছিদ্র

বড় হইল। এক দল হাইল্যাণ্ডদেশ-বাসী গোরা ও এক দল পঞ্জাবদেশীয় পদাতিক সৈন্য সেই ছিদ্র দিয়া সিকান্দ্রা-বাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য ছুটিল। এই দুই সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈনিকই অগ্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম প্রবেশকারীর মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও কেহ পশ্চাৎ-পদ হইল না। সর্ব্বপ্রথমে এক জন হাই-ল্যাণ্ড দেশবাসী গোরা সেই রন্ধ্র পথে প্রবেশ করিল, প্রবেশমাত্র শত্রুনিক্ষিপ্ত এক গুলির আঘাতে হত হইল। তদনন্তর একজন শিখ সর্দ্দার পরিখার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অসীম সাহস ও বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীর-মধ্যস্থ রন্ধ্রটী অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক জনের পক্ষে শত শত বিদ্রোহীর সহিত যুদ্ধ কখনই সম্ভব নহে। তিনিও বহুসংখ্যক বিদ্রোহীকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া নিজে হত হইলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য সৈনিক পুরুষ ঐ রন্ধ্রমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐ পথও বিজিত হইল।

সিকান্দ্রাবাগের উত্তরভাগে একটী সুদৃঢ় গৃহ ছিল। এই গৃহ লৌহময় সুদৃঢ় কবাট দ্বারা রক্ষিত এবং উহার ভিত্তিতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকাতে উহার মধ্য হইতে বহির্ভাগস্থ আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের উপর গুলি চালাইবার বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। বিদ্রোহিগণ যখন দেখিল যে, সিকান্দ্রা-বাগের সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া ইংরাজ সৈন্য প্রবেশ করিতেছে, তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহের মধ্যে পলায়ন করিল এবং উহার মধ্য হইতে যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিল। যখন প্রায় সমস্ত বিদ্রোহী ঐ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং লৌহদ্বার ভিতর হইতে অর্গল দ্বারা বন্ধ করিবার জন্য একটী কবাট বন্ধ করিয়াছে, তখন মোকারাব খাঁ নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান সৈনিক ঐ গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে বিদ্রোহীরা যদি ঐ দ্বার একবার বন্ধ করিতে পারে, তাহাহইলে ঐ গৃহঅধিকার করা সহজ হইবে না। বিদ্রোহিগণ অনায়াসে ঐ গৃহের ভিতর হইতে ইংরাজ সৈন্যের উপর গুলি চালাইতে পারিবে, কিন্তু ইংরাজ সৈনিকদিগের গুলি বিদ্রোহীদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। আবার গৃহের দৃঢ় ভিত্তি ভগ্ন করাও বহ্বায়াস-সাধ্য। মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মোকারেব খাঁ ঢাল সমেত তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্রোহিগণ দেখিল দ্বার বন্ধ করা তাহাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক, সুতরাং তাহারা মুহূর্ত্ত-মধ্যে তরবারির আঘাতে মোকারাব খাঁর বাম হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিল। হস্ত ছিন্ন হইল দেখিয়াও সাহসী যোদ্ধা কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইলেন না। অম্লান-বদনে দক্ষিণ হস্ত দ্বারের মধ্যে

প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ সেই হস্তও কাটিয়া ফেলিল। এইরূপে তিনি দুইটী হস্তই হারাইলেন। মোকারাব খাঁ নিশ্চিত জানিতেন যে, প্রবিষ্ট করিয়া দিবামাত্রই তাঁহার হস্ত কাটিয়া দিবে, তথাপি কর্ত্তব্য-প্রণোদিত হইয়া জন্মের মত হস্তদ্বয় হারাইলেন। যদি মোকারাব খাঁ এইরূপে স্বার্থত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সিকান্দ্রা-বাগ বিজিত হইত না। কর্ত্তব্যের অনু-রোধে এইরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

বিদ্রোহিগণ মোকারাব খাঁর দুইটী হস্তই কাটিয়া দিল বটে, কিন্তু দ্বার বন্ধ করিতে পারিল না। অন্যান্য সৈন্য আসিয়া জোর করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং তুমুল সংগ্রামের পর ঐ গৃহ অধিকার করিল। এই যুদ্ধে আমা-দিগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস উপস্থিত ছিলেন। তিনি উপরি-লিখিত ঘটনাটী স্বয়ং আত্মজীবন-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও উপরি-উক্ত কার্য্যের জন্য মোকারাব খাঁকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বারান্তরে কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বার্থ-ত্যাগের আরও দুই একটী দৃষ্টান্ত পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

উচ্ছ্বাস।

সখা তুমি কি বুঝিবে প্রাণের আবেগ মোর,
কি মোহে মজেছে মন কিসে সদা আছি ভোর।
কত ভাবি বসি বসি, কি ভাবিয়া হই সারা,
কি লাগিয়া প্রাণ কাঁদে কেন বা আপনা-হারা;
বুঝিতে চেয়েছি কত বুঝিয়াও বুঝি নাই,
পরাণ ডুবিয়া যায় বুঝিতে গিয়াছি যাই।
ভাবিব না মনে মনে কতবার করেছি,
দেখিব না চেয়ে চেয়ে কতবার ভেবেছি,
হাসিব না হাসি দেখে মুখ ফিরে চলে যাব,
ও ছবিটী প্রাণ হ'তে তুলে দিয়ে সুখ পাব—
যখনই ভাবিয়াছি তখনি অতীত কথা
স্মৃতির দুয়ারে আসি পরাণে দিয়াছে ব্যথা;
ধীরে ধীরে মনে আসে সেই হাসি সেই খেলা,
সেই অশ্রু সে বিষাদ সেই আনন্দের মেলা,
সেই কত অপরাধ, রাগিয়া অধীর হওয়া,
তখনই ক্ষমা দান তখনি তা ভুলে যাওয়া;
হেসে হেসে গলা ধ'রে কথা কওয়া মধুমাখা,
অভিমানভরে কভু অনিমেষে চেয়ে থাকা,
সেই কত প্রেমাবেশে বাহুপাশে জড়াইয়া
প্রেমের লহরীমাঝে দুয়ে মিশি এক-হিয়া।
সেই সব আরো কত কত কথা পড়ে মনে,
তাই ভাবি, সদা ম্লান ভাসি সদা দুনয়নে।
প্রাণের আবেগ মোর আমি ছাড়া কে বুঝিবে?
বুঝিবে না কেন শুধু "বল" বলে কাঁদাইবে।

পাকবিদ্যা।

পেরাগি প্রস্তুত করিবার নিয়ম।

উপাদান—ময়দা, ঘৃত, মাজা তিল, চিনি দোবারা, মিছরিচূর্ণ (বুকনি), বাদাম-চূর্ণ, কিশমিশ, জাফরাণচূর্ণ, গোলমরিচ (গোটা)।

যে প্রকার লুচির ময়দা প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পরিমাণে ময়ান দিয়া উত্তমরূপে ঠাসিয়া পরিমাণ-মত, বা ইচ্ছামত লেচি প্রস্তুত কর, কিন্তু সাধারণতঃ বড় আমড়ার ধরণে লেচিগুলি হওয়াই প্রসিদ্ধ। লেচি প্রস্তুত হইলে, তাহা পাত্রে রাখিয়া দাও। সুপক্ক নিখুত গলন ঝুনা নারিকেল কুরিয়া তাহাতে উপরি-উক্ত দ্রব্য সকল মিশাইয়া দোবারা চিনির এক বন্দ তার রসে পাক কর, ক্রমে 'পুর' দিবার মত হইলে তাহা পাত্রে রাখ। পরে ঐ ময়দার লেচিগুলি পাতলা করিয়া লুচির ধরণে বেলনা দিয়া বেলিয়া তাহার মধ্যে ঐ 'পুর" দিয়া অর্দ্ধ-গোলাকার গঠন করিয়া, চারি পাশ মুড়িয়া দাও, এখন জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া যখন দেখিবে যে পাকিয়া আসিয়াছে, তখন ঐ সকল গঠিত পেরাগি বেশ কড়া ধরণে ভাজিয়া লইলেই পেরাগি প্রস্তুত হইল। পেরাগি অতি উত্তম মিষ্টান্ন।

ময়দা ঠাসিবার সময় ইচ্ছামত অল্প মাজা তিল মিশাইয়া দিলে আরও সুতার হয়।

শ্রীমতী দেববালা সেন।

নূতন কলের সৃষ্টি।

১৮৪১ সালে কেম্ব্রিজ নগরে হলিস হাউ শিলাইয়ের কল প্রথম উদ্ভাবন করেন।

১৮০৩ সালে বৈদ্যুতিক বাতির প্রথম সৃষ্টি হয়। সার হাম্ফ্রি ডেভি ইহার প্রথম উদ্ভাবনকর্ত্তা। এডিসন এবং ব্রস ইহার উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন।

১৮০৭ সালে চার্লসটাউনের সামুয়েল মর্স টেলিগ্রাফের (তারের খবরের) উদ্ভাবন করেন। ১৮৪৩ সালে ইহার উন্নতি সাধন দ্বারা কংগ্রেসের প্রায় লক্ষ টাকা লাভ হয়।

১৭৬৩ সালে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রনির্ম্মাতা জেমস ওয়াট ষ্টীম এন্‌জিনের সৃষ্টি করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গঠন করেন। অদ্যাপি তাহা ব্যবহৃত হইতেছে।

১৬৭২ সালে কাঠের রেলের উপর রেলরোড প্রথম প্রস্তুত হয়। ১৭৩৮ সালে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হয়। ১৭৮৯ সালে প্রচলিত লৌহ রেলরোড তৈয়ার হয়। ১৭৬৯ সালে জেম্‌স ওয়াট লোকোমোটিবের প্রথম আদর্শ বাহির করেন। ১৮২৯ সালে জর্জ ষ্টিফেন্‌সন বর্ত্তমান আকারের লোকোমোটিভ উদ্ভাবন করেন, ইহাই রেলওয়ের পরিচালক।

১৭৯৩ সালে আমেরিকাবাসী রবার্ট ফল্টনের মনে বাষ্পীয়-পোতের ভাব প্রথম উদয় হয়। ১৮০৭ সালে ক্লারমণ্ট নামে প্রথম ষ্টীম-বোট তিনিই নির্ম্মাণ করেন এবং হড্‌সন নদী বাহিয়া নিউইয়র্ক হইতে আলবানীতে উপনীত হন। এখন বাষ্পীয় পোত সমুদ্রে, হ্রদে নদীতে অসংখ্য অসংখ্য চলিতেছে।

টেলিফোঁ বা দূরস্বন যন্ত্র যাহা দ্বারা তাড়িতযোগে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর বহুদূরে চালিত হয়, তাহা চিকাগোনিবাসী ইলাইসা গ্রে উদ্ভাবন করেন। আরও কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। টরপিডো ১৭৭৭ সালে বুসনেল কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

টেঁক ঘড়ি	১৪৭৭, পিটার হিলি	"
তাপমান	১৬০৯, ড্রাবেল্‌	"
দূরবীক্ষণ	১৬০৮, লিপারহিম	"
মুদ্রাযন্ত্র	১৪৩৮, গ্রান্সফ্লিস	"
অণুবীক্ষণ	১৫৯০, জেনসন	"
লিথোগ্রাফি	১৭৯৮, সেনিফেল্‌ডার	"
বৈদ্যুতিক সিক	১৭৫২, ফ্রাঙ্কলিন্‌	"
বারুদ	১৩২০, সোয়ার	"
বেলুন	১৭৮৩, মণ্টগল্‌ফিয়ার	"
বায়ুমান	১৬৪০, টরিসেলি	"
বায়ুযন্ত্র (এয়ার-ব্রেক)	১৮৭৪ ওয়েষ্টিংহাউস	"

কার্ত্তিকের হেঁয়ালী।

অঙ্গে নই, বঙ্গে নই, কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি ভাই মধ্যে আমি কনিষ্ঠ সোদর।
জগৎ যুড়িয়া পাইয়াছি অধিকার,
সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য প্রভাবে আমার। ১
তিন অক্ষরে নামে ফল জগতে বিদিত,
প্রথম ছাড়িলে শব বুঝাবে নিশ্চিত,
দ্বিতীয় ছাড়িলে কাষ্ঠ ঘর বাঁধিবার,
ছাড়িলে তৃতীয় বর্ণ খাইতে সুতার। ২
পরশপাথর আমি দুর্লভ ভূতলে,
ছুঁলে লোহা সোণা হয় শীলা যায় গলে,
এক ফোঁটা জল মম যে করয়ে পান,
কাঁদিয়া উঠায় সেই অনন্ত তুফান। ৩

নূতন সংবাদ।

১। ভূমিকম্পে বর্ণিওর নিকটস্থ সমুদ্র-ভাগে একটী দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে।

২। হরিদ্বারের নিকট কংখলে মড়কের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট এবার হরিদ্বারের মেলায় লোক সমাগম বন্ধ করিয়াছেন।

৩। চট্টগ্রামের ঝড়ে অন্যূন ৪ হাজার

লোক মৃত, এবং ৪০ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

৪। সীমান্ত যুদ্ধের সমাধা হইতে বিলম্ব হওয়াতে বড় লাটের ব্রহ্ম-ভ্রমণ আপাততঃ স্থগিত রহিল। তিনি এলাহাবাদ হইতে দার্জিলিঙ দর্শন করিয়া ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিবেন।

৫। পারিসে এক সংবাদপত্র মুদ্রিত হইতেছে, তাহার সম্পাদক, লেখক, মুদ্রাকর প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীলোক।

৬। সীমান্ত যুদ্ধে সেনাপতি লকহার্ট গিরিপথ সকল জয় করিতে করিতে টিরাতে উপস্থিত হইয়াছেন। শত্রুপক্ষ ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতেছে। কাবুলের আমীর ইংরাজ-পক্ষপাতিতা দেখাইতেছেন। হাদা মোল্লা সকল গোল-যোগের মূল। তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

৭। ফালক নামক এক জ্যোতিষী গণনা করিয়াছেন, ১৮৯৯ সালের ১৩ই নবেম্বর বেলা ৩টা তিন মিনিটের সময় পৃথিবীর ধ্বংস হইবে! জ্যোতির্বিদ্ করি গর্টন ইহাঁর পৃষ্ঠপোষক। ইহাঁদের আশঙ্কা সূর্য্য হইতে এক গ্রহ সবেগে পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িবে, তাহাতেই মহাপ্রলয় হইবে। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ভূত-গত, পৃথিবী অদ্যাপি অক্ষত আছে।

৮। প্লেগ নিবারণার্থ ডাক্তার হাফকিন ঐ পীড়ার টীকা দিতেছেন। ঘোড়া ও গাধার শরীরে প্লেগের কীটাণু প্রবিষ্ট করিয়া তাহার রসে এই টীকা দেওয়া হইতেছে।

৮। কাশিমবাজারের নূতন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চট্টগ্রামের বাত্যাপীড়িত-দিগের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৯। ভূকৈলাসের রাণী শ্রীমতী তারা-সুন্দরী দেবী নবদ্বীপ হাঁসপাতালে ৮০০ টাকা দিয়াছেন।

১০। মহারাণী বিক্টোরিয়ার পিতৃব্য-পত্নী ও যুবরাজ জর্জের শাশুড়ী টেকের ডচেস পরলোকগত হইয়াছেন।

১১। দার্জিলিঙ্ রেলনির্ম্মাতা ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

১২। বাবু রামনাথ সিংহ গয়ায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। মেঃ চন্দ্রশেখর সেন একজন বাঙ্গালী বারিষ্টার। তিনি সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকা-কারে মুদ্রিত করিয়াছেন।

১৪। ছোট লাট মেকেঞ্জী সুস্থ হইয়াছেন, ডিসেম্বরের শেষে স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করিবেন।

১৫। প্রতিনিধি ছোট লাট ষ্টিবেন্স সাহেব রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে-ছেন। তিনি সম্প্রতি চট্টগ্রামের বিপন্ন লোকদিগের অবস্থা দেখিতে গিয়াছেন।

১৬। আফ্রিদি যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইয়াছে। কুচবিহারের মহারাজা সুস্থ-শরীরে রণক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

বাগান বাস্তব পুস্তকালয় ও ... কলিকাতা

সমালোচনা।

১। বঙ্গের শেষ বীর—(ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। তিন শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। কলিকাতা ২৮নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

উপন্যাস-বর্ণিত পাত্রগুলির চরিত্র অতি মনোহর হইয়াছে। পুস্তকের নায়ক প্রতাপের প্রতাপ পাঠ করিতে করিতে পাঠক পদে পদে পুলকিত হইবেন। এত-দিন প্রতাপ একজন বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন দেখিতেছি তিনি একজন বরণীয় দেশহিতৈষী মহা বীর-পুরুষ। আর তাঁহার রাণী পদ্মিনী প্রকৃত প্রস্তাবে বীরপত্নী; সুতরাং সে চরিত্র পাঠেও মুগ্ধ হইতে হয়।

বঙ্গের শেষ বীরের ভাষা, ভাব, সৌন্দর্য্য, বর্ণনাপারিপাট্য ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসেরই উপযুক্ত হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনাদিও পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বামাবোধিনীর প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে ইহা পাঠার্থ অনুরোধ করি।

২। বীণাবাদিনী—(মাসিক পত্রিকা) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদিত। ইহাতে পরমার্থিক ও অন্যান্য প্রকার সঙ্গীত স্বরলিপি সহকারে প্রচারিত হইতেছে। গানগুলি সুনির্ব্বাচিত হইলে এরূপ পত্রিকা একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করিবে।

৩। সামুদ্রিক ও অদৃষ্ট—শ্রীযুক্ত বাবু রমণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সমূহ অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ফলিত-জ্যোতিষের পুনরুদ্ধার ও প্রচার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। ইহা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সত্য যদি তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, বৈজ্ঞানিক জগতে পরম সমাদর লাভ করিবেন। তাঁহার সামুদ্রিকের এবং 'অদৃষ্ট' নামক পত্রের কয়েকখণ্ড দর্শনে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। গুণগ্রাহীদিগের নিকট তিনি উৎসাহলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

বামারচনা।

স্মৃতি! ফিরে চাও।

কেন স্মৃতি, কেন খো'ল আর
জীবনের সুখের দুয়ার।
যে আঁধার অমানিশা, নিভায়েছে সুখ-আশা,
যে আঁধারে ডুবে গেছে
চির সুখ অভাগার।
সেই সে আঁধার নিয়ে অভাগা ভগন হিয়ে,

পড়ে আছে একপাশে
অনাথা কাঙ্গালি বেশে।
কেন স্মৃতি আশা সাথে, আ'স গো গভীর রাতে,
মুছিতে আঁখির জল,
জ্বালিতে আশার আলো।
কেন আ'স আর ?
ভুলেছি অনেক বার স্মৃতি! কাজ নাই আর,
আশার ছলনে তোর
ডুবেছে জীবন মোর,
কত নব আশা ফুটি অনন্ত অম্বরে ছুটি,
চাঁদের জোছনা আনি
ফুলময় হৃদি খানি।
সোহাগ আদর মাখি হৃদয়ে যতনে রাখি।
এমন শ্মশান প্রায়
জীবন যাতনাময়,
কোথা দিন সে সুখের কোথা আশা জীবনের?
সকলি গিয়েছে হায়!
জীবন যাতনাময়।
কোথা সে জোছনা-ভরা, প্রফুল্লতা-মাখা ধরা,
কোথা কোন উপবনে
শান্তিরূপ হৃদিধনে
লুকায়ে রাখিলি তুই, পিশাচী রাক্ষসী ?
বলি স্মৃতি পায়ে ধরে
আর না জাগাস ওরে,
আঁধার জীবন তার, আঁধারে যাউক মিশি।
নিভেছে জনম তরে
থাক সে আঁধার ঘরে,
আশার প্রদীপ তার সেত চাহে নাক আর,
চাহে না সে শরতের
জোছনার হাসি।
হারায়েছে হিয়া তার সেত চাহে নাক আর
যৌবনের সুখপূর্ণ
ভালবাসা-বাসি।
তবে কেন স্মৃতি আর নিভাইতে অভাগার
অন্তিম জীবনদীপ
সুখে নাহি দাও ?
শেষের নিঃশ্বাসে তার, মাখাও না বিষ আর,
সুখীদের কাছে, স্মৃতি!
যাও ফিরে যাও।

শ্রীসরলা দত্ত, মেদিনীপুর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ঊষা তিমির নাশিল,
তপন কনক-কান্তি জগৎ ভাতিল।
ফুটিয়ে কুসুম কলি,
হাসিয়ে পড়িছে ঢলি
সুরভি সমীর বহি চৌদিক্ মাতিল।
ভ্রাতার উৎসব আজি
সুগন্ধি পুষ্পেতে সাজি
পরিপূর্ণ করি, ভগ্নী গেহেতে ফিরিল।
সোদরে পূজিবে বলে
আদরে স্নেহেতে গলে
নিজ মনোমত মালা যতনে গাঁথিল।
অতি সন্তর্পণ করি,
মাঠের নীহার ধরি
সুগন্ধি চন্দন সহ ঘসিয়া আনিল।

মিষ্টান্ন, বসন লয়ে
অতি কুতূহলী হয়ে
ভাইপাশে যত বোন ছুটিয়া আসিল।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে
আমরাও ভাই বোনে
মিলিত হয়েছি সবে আজি এক সনে।
ধান, দূর্ব্বা, লয়ে করে
শুধু আশীর্ব্বাদ তরে
আসিয়াছি দুই বোনে আনন্দিত মনে।
মাতা, পিতা, দারা, সুত,
ভাই, বন্ধু আছে যত
সবাই প্রাণের বস্তু সুখের কারণ,
শুধু ভগ্নী বিনা আর
কা'র নাহি অধিকার
ভাই ফোঁটা ধরাতলে মধুর বন্ধন!
ভাই-ভালে দিয়ে ফোঁটা
ঘুচাব "যমের কাঁটা",
মঙ্গল আশীষ যত হৃদয়-নিহিত।
আয়ু, মান, ধন, জন,
লভি প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
ক্রমশঃ হউন সবে জগতে বিদিত।
ভ্রাতার গৌরব শুনি
ভগ্নী মনে ধন্য গণি,
তাঁহার সুখেতে সুখী, সদা পুলকিত।
সুচরিত্র যশো-বায়
দেহ পরশিয়া যায়,
গুণের গরিমা সবে গাবে অবিরত।

২

পুণ্যের প্রভাবে ধরা হবে আলোকিত।
দুঃখী ভারত-মাতার
হয়ে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার
ভারত-হিতৈষি-গুণে হও গুণান্বিত।
স্বদেশ-বৎসল যত
হয়ে তাঁহাদের মত
ভারত-মুকুট রূপে হও পরিণত।
এ শস্যশ্যামলা ধরা
আজি হায়! অন্নহারা
অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ নরনারী যত।
অস্থির কঙ্কাল সার,
দুর্ব্বহ জীবনভার,
স্মরিলেও মনে হয় আতঙ্ক উদিত।
দয়ার মূরতি হয়ে,
দুঃখ দূর কর গিয়ে,
প্রাণপণে সাধ ভাই পরহিত-ব্রত।
এক-ঐক্যতায় ভবে
অসাধ্য সাধন হবে,
ধরাতলে কীর্ত্তি ভাই, রহিবে সতত।
দীর্ঘজীবী হয়ে সবে পাল মহাব্রত,
ভগ্নীর আশীষ এই স্মরিও নিয়ত।

শ্রীস—দেবী।

কে তুমি রমণী!*

কে তুমি রমণী বসি
এ বিজন দেশে,
গাহিছ দুখের গীত,
সকরুণ-ভাষে;

* শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত "বাসনা" নামক পুস্তক পাঠে লিখিত।

জলন্ত উল্কার সম
হৃদয়-যাতনা
উচ্ছ্বসিত পরাণের
গভীর কল্পনা
ফুটিয়া উঠিছে তব
অক্ষরে অক্ষরে,
তাই পরাণের মাঝে
বিঁধে স্তরে স্তরে।
জগতে তোমার বুঝি
কেহ আর নাই,
প্রেমমাখা হিয়া খানি
দহিছে সদাই;
অথবা সকলি ছিল
ভুলেছ সকল;
তাই আসিয়াছ হেথা
লয়ে আঁখিজল।
কাতরে সান্ত্বনা-বাণী
হেথা নাহি পাবে;
তোমা পানে কেহ আর
ফিরে নাহি চাবে।
কেটেছ মমতা-পাশ,
দলেছ দু পায়,
এসেছ চলিয়া হেথা
ভুলে সমুদায়—
না ভাবিয়া পরিণাম
ভেসেছ অকূলে,
কূল নাহি পাবে আর
এ বিশ্ব খুঁজিলে;
অকূল-কাণ্ডারী হরি
সেই প্রেমাধার,
পতিত-পাবন তিনি
উপাস্য সবার,
কর তাঁর উপাসনা
পাসরি সকল;
পাবে মোক্ষ ফল—পাবে
সান্ত্বনার স্থল।

শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী রায়।

নিরুপমা।

সুকোমল প্রেমময়ী তুমি গো রমণী,
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি মন্দার কলিকা!
পতিগত-প্রাণা সতী পূর্ণিত বিকাশ,
প্রণয়ের প্রীতিময়ী কুসুম-মালিকা।
ভালবাসা, যে না বাসে নাই বা বাসিল,
আমিত তাঁহার দাসী তাঁহার চরণে,
আজন্ম লুণ্ঠিত রব সেই মুখ চাহি—
ত্যজিব জীবন ওই চরণ সদনে।
সদ্ভাব পূরিত মন যেমতি তোমার,
পাতার মর্ম্মর শব্দে উঠে চমকিয়া,—
স্বভাবের পুরস্কার লভিলা অশেষ—
বিধাতা দিলেন শেষে প্রণয় আনিয়া।
পাইয়া শক্তির শক্তি—হৃদয়ের ধন
বড় সুখে কেটে গেল সমস্ত জীবন।

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

No. 395. December, 1897.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৫ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ ১৩০৪—ডিসেম্বর, ১৮৯৭। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সীমান্ত যুদ্ধ—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধ এক প্রকার শেষ হইয়াছে এবং ইংরাজ সেনাপতি টেরা অধিকার করিয়া বিপক্ষদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। ভারতের সীমা পশ্চিমে আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

বাঙ্গালীর বীরত্ব-গৌরব—কুচবিহারের মহারাজা প্রায় দুই মাস কাল নানা বিপদ্ ক্লেশের মধ্যে সীমান্ত সৈনিক-শিবিরে যাপন করিয়া যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ আপনার বীর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

তিলকের অদৃষ্টদোষ—তিলক মোকর্দ্দমার যে বিলাত আপিল হইয়াছিল, প্রিভি কৌন্সিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বিলাতে এরূপ বিষয়ের বিচার হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িত।

প্রয়াগে রাজ-সমাগম—লর্ড এল্‌গিন সস্ত্রীক ও সদল প্রয়াগে পৌঁছিয়া একটী দরবার করেন। তাহাতে উত্তর পশ্চিমের ছোট লাটকে জি, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সার মাক্‌ডোনাল্ড যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে ইনি অতি উচ্চ গৌরবের উপযুক্ত।

চিনে জর্ম্মাণ সৈন্য—চিনের কাইচোতে জর্ম্মণ সৈন্যদল উপস্থিত হওয়াতে তত্রত্য দুর্গরক্ষক ৫০০ সৈন্য পলায়ন করিয়াছে।

কেম্ব্রিজে ব্রহ্মোপাসনা—মাননীয় বাবু আনন্দমোহন বসু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র-দ্বয়কে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। কেম্ব্রিজে বাঙ্গালী ছাত্রগণ তাঁহার গমন উপলক্ষে তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট—প্রেসিডেণ্ট

গারফিল্ড কাঠুরিয়ার ছেলে ছিলেন এবং তজ্জন্য গৌরব করিতেন। যুক্তরাজ্যের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিন্‌লী গৌরব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা স্কট্‌লণ্ডের একজন গরিব শিক্ষক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—সুইজর্লণ্ডে স্ত্রী-ডাক্তারের সংখ্যা ৪০টী। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একটী "স্ত্রী-ডাক্তার সভা" স্থাপন করিয়াছেন। ইউরোপে এরূপ সভা এই প্রথম।

মহারাণী পুরস্কৃতা—ইংলণ্ডে যে রাজকীয় ফলপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর ফল সংগ্রহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনি এক রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন!

আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত—আমেরিকার এক কৃষক আপনার পরিশ্রমে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া ইলিনইস প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৩ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ইহাঁর নাম করিংটন। ইহাঁর পাঠানুরাগের জন্য ইনি 'দার্শনিক' বলিয়া আখ্যাত।

নূতন রেলওয়ে—হাবড়া-আমতা ও সিয়াখালা রেলওয়ে খোলার উৎসব গত ২৭এ নবেম্বর সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিনিধি ছোট লাট এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এ রেলওয়েটী এদেশীয়দিগের গৌরবের আর একটী পরিচায়ক।

বীরাঙ্গনাদিগের পুরস্কার—"Royal Humane Society"—"রাজকীয় দয়া-নিদর্শনী" সভা নামে এক সভা জলমজ্জন হইতে একটী ভদ্রলোক, একটী বালিকা ও একটী বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য ৩টী স্ত্রীলোককে রৌপ্য ও পিত্তল পদক পুরস্কার দিয়াছেন। রমণীরা আপনাদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া বিপন্নদিগকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। ইহাঁদের নাম কুমারী ফুলার্টন, কুমারী জোয়ান হারিস ও কুমারী লাউসা ব্রাইট।

হত্যাকারী ধৃত—লাহোরের আর্য্য-ধর্ম্ম-প্রচারক পণ্ডিত লেখরামকে যে মুসলমান হত্যা করে, সে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। অবিলম্বে ইহার বিচার হইবে।

দেবহূতির প্রতি কপিলের উপদেশ।

প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্বকথন।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৬১ পৃষ্ঠার পর)

হে জননি! ঈশ্বরের প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলেই শব্দতন্মাত্র উদ্ভূত হয়, তাহা হইতে শব্দ ও বোধকারী শ্রবণেন্দ্রিয় জন্ম গ্রহণ করে, আকাশের যে সূক্ষ্ম বিচরণ গুণ, তাহাই শব্দের বিশেষ লক্ষণ। সেই শব্দ অর্থের বাচক ও দৃশ্যাদৃশ্য যত বস্তুর জ্ঞাপক। জননি! কালক্রমে আকাশের বিকৃতি

স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হইল, তাহা হইতে বায়ু আর ত্বক্ জন্মিল। ত্বকের সাহায্যে স্পর্শবোধ উৎপন্ন হইল, স্পর্শত্ব হইতে শীতল, উষ্ণ ও কঠিন প্রভৃতি সমীচীন বোধ হইল। চালন, মেলন, শব্দ, গন্ধ প্রবহণ আর শীত উষ্ণাদি যাহা অনুভূত হয়, তাহা বায়ুর সাহায্যে নিশ্চয় জানিবে। বায়ু ইন্দ্রিয় সকলকে সঞ্চালন করে, রাগাদির স্ফূর্ত্তি যাহা, তাহাও বায়ুবলে জানিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, রূপগ্রাহক চক্ষু তাহা হইতে উৎপন্ন হইল। তাহার বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। আকার, বিকার, দান, বস্তুর বিকাশ, বিস্ফুরণ, বিলোড়ন, প্রাশস্ত্য, প্রকাশ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিপাক, শোষণ ও সরণ ইহারা তেজের বৃত্তি। রূপতন্মাত্র বিকৃত হইয়া রসতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। জিহ্বা আর জল তেজের বিকারে জন্মে, এই জিহ্বাই সর্ব্ব রস গ্রহণের স্থল। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, মধুর ও লবণ ইত্যাদি রস জিহ্বাতেই আস্বাদন হইয়া থাকে। শুষ্ক বস্তু আর্দ্র ও একত্রীকরণ, তৃষ্ণাজনিত ক্লেশকে প্রশমন, কাঠিন্যকে মৃদু ও সমোচ্চ সংস্থান করা জলের বৃত্তি। সেই রসতন্মাত্র বিকৃত হইয়া গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। গন্ধগ্রাহী ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও বসুমতী একত্রে উদ্ভূত হইল। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, উহা নাসিকার বিষয়; সেই গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সুখদ সুগন্ধ, ঘৃণার্হ দুর্গন্ধাদি সংসর্গভেদে এরূপ ভাল মন্দ যে হয়, ইহা পৃথিবীর বৃত্তি। আকাশের গুণ শব্দ, শ্রবণের বিষয়। যাহা ত্বকে বোধ হয়, তাহা বায়ুর গুণ—স্পর্শ। তেজের গুণ—রূপ, উহা নয়নের বিষয়। সলিলের গুণ রস, উহা রসনার বিষয়। এই সকল গুণাদির পরস্পর সম্বন্ধ থাকার জন্য পরপর ভূতেতে তাহাদের স্থিতি জানা যায়। আকাশে একমাত্র শব্দগুণ আছে; বাতাসে শব্দ ও স্পর্শ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আছে; আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ গুণ পৃথিবীতে জড়িত আছে।

মহত্তত্ত্ব আদি সপ্ততত্ত্বগণ যখন পরস্পর সম্মিলিত হইল, তখন আদিম অচ্যুত জগদীশ্বর সেই সকল তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব সকলকে পরস্পর যুক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে এক অচেতন অণ্ডের উৎপত্তি হইল। সেই অণ্ড হইতে বিরাট পুরুষের উদ্ভব হইল। তাহা বহির্ভাগে দশগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং জলাদি আবরণ পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত এই অণ্ডে ভগবানের মূর্ত্তির স্বরূপ লোক সকল বিস্তৃত রহিয়াছে। অনন্তর সেই দেবের প্রধান মহান্ দেব হিরণ্ময় অণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নানা ছিদ্র প্রকটিত করিলেন। তাহাতে প্রথমে তাঁহার মুখ উদ্ভূত হইল, তৎপরে সেই মুখ হইতে বাক্য জন্মিল, বাক্যের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল, অনন্তর নাসাদ্বয় নির্ভিন্ন হইল, পরে সেই নাসিকা হইতে প্রাণ-বায়ু-বিশিষ্ট ঘ্রাণেন্দ্রিয়

জন্মিল। তাহার পর চক্ষুর্দ্বয় জন্মিল, চক্ষুর্দ্বয় হইতে দীপ্তিমান্ সূর্য্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে কর্ণেন্দ্রিয় ও দিক্‌দশ একে একে প্রকাশ পাইল। তৎপরে বিরাট পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ত্বক্, লোম, শ্মশ্রু ও কেশ উৎপন্ন হইল। পরে ওষধি সকল জন্মিল * * *। তার পর জল, অনন্তর পায়ু নির্ভিন্ন হইল, পায়ু হইতে অপান বায়ু এবং অপান হইতে মৃত্যু প্রকাশ পাইল। অনন্তর দুই হস্ত উদ্ভূত হইল, হস্ত হইতে ক্রিয়াক্ষম বল জন্মিল। তার পর বলের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। অনন্তর গতি-শক্তি-সমন্বিত পদদ্বয় উৎপন্ন হইল। চরণের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তৎপরে আবিষ্ট হইয়া জীবকে গতিযুক্ত করিলেন। তার পর নাড়ী সকল জন্মিল। নাড়ী হইতে রক্ত, রক্ত হইতে নদী জন্মিল, পরে উদর উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিল। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে রসের আধার সমুদ্র উদ্ভূত হইল। অবশেষে হৃদয় জন্মিল। হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে হৃদয়ের শুদ্ধি ব্রহ্মা জন্মিলেন। জননি! তৎপরে অহঙ্কার জন্মিল। অহঙ্কার হইতে রুদ্র, রুদ্র হইতে ধ্যানের আধান চিত্ত, চিত্ত হইতে জ্ঞানের আধান ক্ষেত্রজ্ঞ জন্মিল। একে একে ইন্দ্রিয়াদি দেবদল আবির্ভূত হইলেও বিরাট পুরুষের উত্থান হইল না। অনন্তর ঐ সকল দেবতা পরাভব মানিয়া যাহার যে ইন্দ্রিয়-দ্বার অধিকৃত ছিল, তিনি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন—অগ্নি বাগিন্দ্রিয় দিয়া মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তবু সে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার অচল রহিলেন। পরে বেগময় বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাটের বৃহৎকায় উত্থিত হইল না। অপান আশ্রয় করিয়া মৃত্যু পায়ুপথে প্রবেশ করিলেন, পুরন্দর হস্তদ্বয়ে ও বিষ্ণু পদ-দ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি সেই বিরাট-শরীর সলিল-আশ্রয়ে অচলপ্রায় স্থির হইয়া রহিলেন। রক্ত দিয়া নদী-সমূহ নাড়ীতে গত হইল, তবু বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। সমুদ্রও ক্ষুধা তৃষ্ণা লইয়া উদরে প্রবেশ করিল, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। তার পর সুধাকর শরীরে প্রবেশ করিলেন, তাহাতেও বিরাট দেহ উত্থিত হইল না। অনন্তর বুদ্ধি দ্বারা প্রজাপতি ও রুদ্র অভিমানভরে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তথাপি বিরাট দেহ জলময়ী শয্যার উপরে অচলপ্রায় রহিল। অবশেষে চৈত্য অর্থাৎ আত্মা নিজবলে যেমন হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমনি বিরাট দেহ সবিক্রমে সচেতন হইয়া উঠিল। এই ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত ব্যতীত প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রসুপ্ত পুরুষকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। এই হেতু যোগ-প্রবৃত্তা বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা এই আত্মাতে বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিবে। শ্রীকুমুদিনী রায়।

সেফালি।

পুনঃ আসিলাম বোন
তোমারি শীতল কোলে।

আজ বিজয়ার পূর্ব্ব রাত্রি। অদূরে সুমধুর তানলয়যুক্ত ঐকতান বাদ্যধ্বনি নিশীথকালে এই চন্দ্রনক্ষত্রশালী শারদ নীলাকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। শোকসন্তপ্ত বিষাদের ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে কে যেন আশার জ্যোতি জ্বালিয়া দিল। আমি কোথায়, আমার প্রাণ-প্রতিম কোথায়, এই চিন্তায় ঘোর প্লাবন-বারির ন্যায় নয়নে অশ্রু বহিতেছিল, হঠাৎ সেই প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। ভাবিতেছি এ কি মায়ার খেলা, না আশার সুমধুর গীতধ্বনি? ঘোর বিষাদের ঝটিকা হৃদয়ে বহিতেছিল। এই ভীষণ ঊর্ম্মি-মালাপূর্ণ সাগরে কর্ণধারবিহীন তরির ন্যায় এ ভগ্ন জীবন-তরি বুঝি আর বাঁচে না। প্রতি মুহূর্ত্তেইত সেই ভাবে মন আন্দোলিত হইতেছিল, এমন সময় ভগ্নি সেফালি! তোমার ভুবনমোহন সৌরভ-রাশি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুদূর শৈশবের মধুর ক্রীড়াকাননে লইয়া চলিল। বোন! তুমি আজও এই ভ্রূকুটী-পূর্ণ সংসারে স্নেহভরা কুসুম-কোমল শুভ্র হৃদয়খানি আমার জন্য তেমনি করিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছ। তোমার শাখাতে আজ রোগ-শোক-দগ্ধা জীর্ণ শীর্ণ তরণী কি বাঁধিতে দিবে না?

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কিছু নয়!"

শৈশবের অধীত এই কবিতাটী স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তোমার সুগন্ধে সকল বিষাদ ভুলিয়া গেলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পাপিয়া চাতকের মোহন-গীতি কাণে গরল ঢালিতেছিল; সেফালি, তোমার শীতল ছায়াতে আসিয়া তাপিত প্রাণ শীতল হইল। ভাবিতেছি জীবনত উদ্দেশ্যবিহীন নয়। আশা কুহকিনী নয়, রক্ষয়িত্রী দেবীরূপে এ মলিন আত্মার সম্মুখে আবির্ভূতা। মানস-কানন হইতে কত সুরভি কুসুম চয়ন করিয়া তাহার চরণে উপহার দিলাম। এই ভগ্ন তরণী ভীষণ সংসার-সাগরের ঝটিকাঘাতে কেমন করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে, রাক্ষসগণ ঘোর বিজন অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে তাহাই দেখিয়া অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতেছে, কেবল ক্ষুদ্রকায় খদ্যোতটী লতা-বিতান ভেদ করিয়া যে স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখাইল, তাহাকে আমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ের ধ্রুব-তারারূপে মানিয়া লইলাম। এ পথ-ভ্রান্ত পথিককে ঐ শারদ-কৌমুদী-বিধৌতা মধুর যামিনী—নীলাকাশের দুটী তারা, মধুর ঝিল্লিরব, সকলেই একতানে বলিতেছে

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর, নিরাশ হয়োনা হয়োনা;
পাখীর ক্রন্দন শুনি, আসিবেন জননী,
চির দিন দুঃখ রবে না রবে না।"

এই স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনি বধির কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সখি! এ নির্ব্বাণোন্মুখ

জীবন-দীপটা লইয়া : তোমার তলায় আসিয়া পড়িলাম। এ শারদীয়া নিশীথের গভীর যামিনীযোগে তোমার শীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সুখ দুঃখের কত জীবন্ত ছবি এ ঊষর হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিতেছে, কোন্ ভাষায় তাহা বলিব? নীরব প্রকৃতি নীরব ভাষায় আমার দুঃখ দেখিতেছে, শুনিতেছে। সেফালি বোন, তুমিও নীরব ভাষাতেই আমার তাপিত বক্ষে সমবেদনার সুশীতল ধারা বর্ষণ করিতেছ। সেফালি! আজ সুদূর অতীতের শৈশবচ্ছবি জীবন্ত অবস্থায় নয়ন সম্মুখে মায়াপটের ন্যায় বিদ্যমান। দেখ বোন, এমনই চন্দ্রমাশালিনী মধুর শারদীয়া কত যামিনীতে তোমার তলায় সুখ দুঃখের স্রোতে ভাসিতাম, তাহা তুমি জান। সেই স্নেহের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অস্ফুট কোরকটী যখন ঘুমন্ত অবস্থায় বিধাতার উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইবার আশায় এ হৃদয়কে শোকের ঘন মেঘে ঢাকিয়া চলিয়া গেল, তখন বোন সেফালি, তুমিত এ মলিন আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলে। সেই অবিনাশী আত্মা যখন দেব দেবেশের গৃহে মহাযাত্রা করিল, তখন তাহার সুন্দর দেবশরীর তোমার শুভ্র কুসুমে ভূষিত হইয়া আপনার পবিত্রতা যে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাই তোমার পূজা ও পিতৃপূজা একই বলিয়া জানিয়াছি। তাই তোমার নাম আমার কর্ণে এত মধুর।

প্রকৃত জীবন।

জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে মানুষ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানুষের প্রায় সকল কার্য্যের মূল এখানে—এই জন্যই যত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম। অবশ্য আমরা যে কেবল স্ব স্ব জীবনের জন্যই খাটিতেছি, তাহা নহে; আত্মীয় স্বজন সকলের জন্যও খাটিতেছি। তবে মোটের উপর বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে আমরা জীবনের জন্যই সব কাজ করিতেছি। জীবনের জন্যই এত আশা, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, উদ্যম সত্য; কিন্তু যে জীবন না হইলে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার অভাবে আমরা মনুষ্য-নামেরই যোগ্য হইতে পারি না, আমাদের এত চেষ্টা যত্ন কি তাহারই জন্য? সেই প্রকৃত জীবনের জন্য? প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের এবং স্বামী পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজনের জন্য যে এত ব্যস্ত, এত চিন্তিত, এত নিবিষ্টচিত্ত এবং এত যে পরিশ্রান্ত, তাহা কি সেই জীবনের জন্য? প্রভাতে কি এই অমর জীবনের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা

লইয়াই শয্যা ত্যাগ করি এবং সায়ংকালে ইহার উদ্দেশ্য কত দূর সম্পন্ন হইল চিন্তা করি? হায়! এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যদি এই জীবনের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, যত্ন ও চেষ্টা থাকিত, তবে জীবন আজও এত মৃত, এত হীন থাকিত না। যে জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, যে জন্য জীবনের সকল শক্তি পাইয়াছি, তাহা আজও এত অসম্পন্ন রহিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া কেহ ভাবিতে পারে না যে, আমরা জীবনের জন্য ভাবি বা খাটি। পার্থিব জীবনের জন্য আমরা লালায়িত, পার্থিব ভোগ ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আয়োজন, বহু ব্যবস্থা, বহুতর চিন্তা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে। কিন্তু এ আয়োজন, ব্যবস্থা ও চিন্তা প্রকৃত জীবনের কিছুই পুষ্টি ও বিকাশ সাধন করিতে পারে না। ইহাতে আমার বা অপর কাহারও অনন্ত জীবনের উন্নতি সাধনের সহায়তা হয় না।

আমরা সকলেই জীবন ধারণ করিতেছি, কিন্তু আমাদের জীবন প্রকৃত জীবন নহে। এই যে আমরা চলিতেছি, ফিরিতেছি, খাইতেছি, সংসারের নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছি, নিজের স্বার্থ পৃথিবীর নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতেছি, ইহা কখনও আমাদের প্রকৃত জীবন নয়; বরং ইহা অনেকটা জীবনের বিকৃতি। একটু চিন্তা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাইব। পশু পক্ষী তরু লতার জীবনে দেখিতে পাই তাহারা বর্দ্ধিত হয়, আর শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশ করে। বৃক্ষ ফল ফুল প্রদান করে, পশু পক্ষী স্বভাবের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা কার্য্য সাধন করে। আমাদেরও শরীর বর্দ্ধিত হইতেছে, বলবান্ হইতেছে, সুন্দর ও কার্য্যক্ষম হইতেছে, কিন্তু ইহাই কি আমাদের সমস্ত? আমরাত কেবল শরীর নই, শারীরিক এ জীবন ছাড়াও ত আমাদের জীবন আছে! সেই জীবন আত্মার জীবন, তাহার অধীন শরীর মন সমস্ত। আত্মার জীবন সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত না হইয়া কেবল শরীর পুষ্ট হইলে কি হইবে? তাই আত্মার পুষ্টি চাই, আমাদের জীবনে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা বর্দ্ধিত হওয়া চাই—আর বিশেষ ভাবে সেই হৃদয়ের শোভা সৌন্দর্য্য বিকশিত হওয়া চাই—যে জন্য জগতে রমণী-নাম প্রসিদ্ধ। মহাত্মা লুথার বলিয়াছেন "দয়ার আবাসভূমি রমণীহৃদয় অপেক্ষা কোমলতর সুন্দরতর পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই।" বাস্তবিক রমণীর বিশেষত্ব তাঁহার হৃদয়ের কার্য্যে, স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে। সর্ব্বপ্রথমে একটী রমণীহৃদয় হইতেই "হস্পিটাল" বা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভাব উত্থিত হয়, —সর্ব্বপ্রথমে একটী মহিলা ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং রোগীদিগের সুন্দররূপ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া যান। সেবা শুশ্রূষা দ্বারা অপরের দুঃখ মোচন করিতে রমণীহৃদয়ই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর। জনৈক

মহাত্মা বলিয়াছেন "নারী ভালবাসিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যে কার্য্যে দয়া, স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপনা হয় না, সে কার্য্যে কখনও তিনি সুখ ও সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।"

জীবনের অর্থ উন্নতি, ঊর্দ্ধদিকে অবিরাম গতি, চারি দিকে অবিশ্রান্ত সম্প্রসারণ, চতুর্দ্দিকের বস্তুর সহিত অনন্ত যোগ। কিন্তু এই উন্নতি শুধু শরীর সম্বন্ধে নয়; পার্থিব বস্তুর সহিত যোগে নয়। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অতীত যে মহান্ ঈশ্বর, তাঁহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধে—সেই যোগেই আত্মার জীবন। বৃক্ষাদির জীবন যেমন তাপ, আলোক, রস ও বায়ুর উপর, পশু পক্ষীর জীবন যেমন তাহাদের আহারের উপর নির্ভর করে, আমাদের জীবনও তেমনি জ্ঞান প্রেম পবিত্রতার পরম আধার সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করে। তাঁহা হইতে যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মা মৃত হইয়া পড়ে, উহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। তাই পৃথিবীর অতুল ধনরত্ন, শরীরের অমিত তেজোবল, কিছুতেই প্রাণের ভিতরের গভীর হাহাকার—ভীষণ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারে না, আত্মার অনাহার-জনিত মৃত্যু নিবারণ করিতে পারে না।

পরম দেবতা পরমেশ্বরই আমাদের জীবন-তরুর রস। সলিলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ লতা যেমন তাহার শ্যামল শোভায় ও সতেজ ভাবে এবং সুরসাল সুন্দর ফল ফুল ভরে অবনত হইয়া নয়ন মন মোহিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যে জীবন সেই প্রেমময় প্রভুর প্রেম-সলিলের নিকটে থাকিয়া সেই রস দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, তাহার তেজ, স্ফূর্ত্তি, শক্তি, তাহার কার্য্যোৎসাহ ও জীবন্ত মধুর ভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে। সেই দেবানুপ্রাণিত জীবনের এমনই তেজ যে, তাহা মৃত প্রাণেও জীবন সঞ্চার করে। তাহার সংস্পর্শে যে আসে, সেই জীবন লাভ করিয়া যায়।

কোথায় জীবন, আর কোথায় মৃত্যু, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। যদি আমাদের জীবনের উন্নতি না দেখি, তবেই জানিব মৃত্যু আমাদিগকে ধরিয়াছে। যেখানে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার অভাব, সেইখানেই মৃত্যু। যেখানে নীচতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, সেখানেই মৃত্যু। যদি দেখি আমার প্রাণের সংকীর্ণতা, অপ্রেম ও স্বার্থপরতাতে আমার প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, কাহারও নিকট হইতে নিজের দোষের কথা শুনিয়া আমি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছি, অন্যের কুব্যবহারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা হইলে বুঝিব আমি মরিয়াছি। যখন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া চিন্তাবিহীন মূর্খের ন্যায় অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, বুঝিতে হইবে তখন আমরা মৃত। যেখানে পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধি স্থাপনের

প্রমাণ পাইব, জানিব সেখানে মৃত্যুরই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যে জীবনে তেজ নাই, উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, জীবনপথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, ঘোর শীতলতায় হৃদয়, মন, প্রাণ অবসন্ন, সে জীবন নিশ্চয়ই মৃত। যেখানে দেখিব অন্যের দোষ দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোমলতা ও প্রেমের পরিবর্ত্তে ঘৃণা আসিতেছে, নিজেরে দোষ সত্ত্বেও তীব্র যন্ত্রণা হইতেছে না—আপনার প্রতি ঘৃণা জন্মিতেছে না, সেখানে বুঝিতে হইবে মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছি। যেখানে অন্যের সুখ অপেক্ষা আপনার সুখ বেশী মনে করিতেছি, সেখানে আমার মৃত্যু। যেখানে রোগে, শোকে, ঘোর দুর্দ্দিনে সেই দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না, সেখানে আমার মৃত্যু। আত্মার অভ্যন্তরে সেই পরমাত্মা পরম প্রভুর সহিত যোগের অনেক প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যে আমরা উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট, ইহাই আমাদের ঘোর মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ সহস্র বাধাসত্ত্বেও তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবার জন্য চেষ্টা করে, কোন বাধাই তাহার সে চেষ্টা নিবারণ করিতে পারে না। সংগ্রামহীনতাই মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। আমাদের জীবনের ভাব যদি এরূপ হয় যে, সংসারের সহস্র বাধা আসুক, নিজ-জীবনের উন্নতি করিবই করিব, কোন বাধাই সে উন্নতির গতি রোধ করিতে পারিবে না, সেই জীবনাধার দেবতার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ।

আমরা দেখিয়াছি, এই জীবন ভিন্ন আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই—জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি নাই। জীবনের গতি রুদ্ধ রাখিয়া হয় ত সংসারের দশটা স্বার্থ-বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, সাংসারিক সুখের উপকরণ সংগ্রহ ও তাহা ভোগ করিতেও পারি, কিন্তু তাহাতে চিরকাল তৃপ্তি পাইব না। ক্ষণিক শারীরিক তৃপ্তি, এবং জীবনের অসাড়তা ও মৃতভাব হেতু হয়ত আত্মার অতৃপ্তি কিছুদিন প্রকাশ পাইবে না, কিন্তু তাহা অধিক দিন অপ্রকাশিতও থাকিবে না। সব বিলাসিতা, সব স্বার্থ, সব আমিত্ব, পাপের দাসত্ব, ক্ষণিক সুখভোগ ভেদ করিয়া, আত্মার গভীর অতৃপ্তি প্রকাশিত হইবেই, সেই অতৃপ্তি প্রাণকে ব্যাকুল করিবেই। ইহাই জীবনের নিয়ম। আমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াও এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি না। ইহা সেই জীবন-দাতারই বিধান। জীবনের উন্নতিতেই আনন্দ ও তৃপ্তি, অভাবেই নিরানন্দ ও অতৃপ্তি।

আবার দেখিয়াছি, আমাদের শিশু সন্তান, আত্মীয় স্বজন এবং জনসমাজ উন্নত, পবিত্র ও সুস্থ করিবার ভার রমণীর উপর। জনৈক ফরাসী মহাপুরুষ (লামার্টিন) বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে যত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার মূলে স্ত্রীলোকের প্রভাবময় কোমল হস্ত দেখিতে পাইবে।" কিন্তু আমরা ইহাও দেখিয়াছি

যে, "যেমন তেমন" স্ত্রীলোকের শক্তিতে তাহা হয় নাই। আমাদের ন্যায় বিকৃত জীবন দ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্য হয় নাই, হইবেও না। যাঁহারা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। নিজের জীবন না থাকিলে অপরের জীবন লাভের সাহায্য করা অসম্ভব। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইবে—জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতায় উন্নত হইতে হইবে। প্রখর রবিতাপে উপযুক্ত সলিলাভাবে গাছগুলি যেমন শুষ্ক হইয়া যায় এবং জীবিত থাকিলেও তাহা যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, তাহাতে ফল ফুল ধরে না; তেমনি আমাদের প্রকৃত জীবনের অভাবে আমাদের শিশু সন্তান বালক বালিকাগণ এক একটী বিকলাঙ্গ জীব হইবে—আমাদের পরিবার সুখ, শান্তি, পবিত্রতা হারাইয়া মরুভূমি সদৃশ হইবে, তাহাতে আর সুন্দর ফল ফলিবে না। আমরা নিজের উন্নতির জন্য দায়ী, অপর সকলের উন্নতির জন্যও দায়ী। আমাদের উপর অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার সকল ন্যস্ত রহিয়াছে, অথচ প্রকৃত জীবন লাভ না হইলে তাহার কোনটীই সম্পন্ন হইতে পারে না। জীবনের বিকাশ সাধন ভিন্ন নিজের কি অপরের—কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। যদি জীবন উন্নত ও উপযুক্ত করিতে না পারি, তবে যতই কেন পরিবারস্থ সকলের জন্য ভাবি না, কাঁদি না, বা খাটি না, তাহাতে তাহাদের কোন কল্যাণই হইবে না। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হই না কেন, জীবনের উন্নতির অভাবে সবই বৃথা, কিছুতেই আমার বা অপর কাহারও শক্তি ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে না। তাই আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। জীবনের বিকাশ সাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলে—এই অমূল্য জীবনের মূল্য বুঝিলে জীবনলাভের উপায় জানিতে কষ্ট হইবে না। এই এক আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই তাহা হইতে আর সব হইবে। "যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে পথও আছে।" কিন্তু আকাঙ্ক্ষার অভাব হইলে চেষ্টা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন জীবনলাভের আশাই বা কোথায়? বিশেষতঃ এই উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই জীবনের প্রধান লক্ষণ। আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনই প্রকৃতপক্ষে মৃত। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এই আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে।

জীবনদাতা দয়া করুন্, আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া পরিবারে ও জনসমাজে জীবনের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কৃতার্থ হই। তিনি মহিলা জাতিকে আশীর্ব্বাদ করুন্, মহিলা জাতি জীবন্ত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হউক।

শ্রীসু।

সন ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন দেশে ঠিক্ এরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদিও বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা চতুর্দ্দিকেই প্রচণ্ড আঘাত পাইতেছে, তথাচ ইহা এখনও এতদ্দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হিন্দুদিগের মধ্যেই এই প্রথার আধিক্য দৃষ্ট হয়।

একান্নবর্ত্তিতার অনেকানেক শুভ ফল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং দুই চারিটী দোষও নেত্রগোচর হয়। নিম্নলিখিত গুণগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন।

৩। সমদর্শিতা।

৪। স্বার্থ-ত্যাগ।

৫। একতা।

৬। চরিত্রোন্নতি।

১। অভিভাবকের বাধ্যতা। অন্ধকে হস্তধারণপূর্ব্বক চালাইয়া লইয়া গেলে, সে যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গম পথেও গমন করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ যাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহারা পরিবারস্থ পূজাই, জ্ঞানী ও বৃদ্ধদিগের আদেশানুসারে চলিলে সঙ্কটময় সংসারপথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। বৃদ্ধগণ বহুদর্শী; তাঁহারা এক দিকে কপটাচারী, প্রতারক, স্বার্থ-পর, দুর্নীতি-পরায়ণ, অহংকারী, নিষ্ঠুর, নীচাশয়, ধর্ম্মদ্বেষী এবং অপর দিকে ধার্ম্মিক, উদারচেতা, সরল, সাধু ইত্যাদি নানা প্রকার মনুষ্যের সঙ্গে বাস করিয়া ও ইহাদের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সংসারপথে কিরূপ ভাবে বিচরণ করিলে কীদৃশ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। এতাদৃশ বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আদেশানুসারে চলিলে চরিত্রে কোনও দোষ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। আদেশ প্রতিপালনের ক্ষমতা দ্বারাই ভাবী জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। সাধারণ ব্যক্তিদিগের এই সংস্কার যে, শাসনকার্য্য অতিশয় সুখজনক এবং আজ্ঞাবহন অতিশয় কষ্টসাধ্য ও দুঃখকর ব্যাপার। কিন্তু আমরা যদি মনুষ্যের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করি, তবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া অনুমিত হইবে; কারণ শাসনকর্ত্তাকে সর্ব্বদা বহুচিন্তায় অভিভূত থাকিতে হয়। গুরুজনের আজ্ঞাপালন

করিলে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি হইতে সুরক্ষিত থাকা যায়।

যে পরিবারে সকলেই এইরূপে সম্মানার্হ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, সে পরিবারে কলহ, অশান্তি, ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না; এবং সকলেই স্বীয় স্বীয় উন্নতির সঙ্গে পরস্পরেরও উন্নতি সাধন করিতে থাকে।

২। গুরুজনের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন। জনক, জননী বা শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন, সবিনয়ে আলাপ, নতশীর্ষে আজ্ঞাবহন, উপদেশ অনুসরণে তৎপরতা, তাঁহাদিগের সুখ সাধনার্থ সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার, এই সকল গুণে ভূষিত হওয়া প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাঁদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শনে বিমুখ হইলে, চরিত্র নানা দোষে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। ইহাঁরা নিঃস্বার্থ স্নেহাধার। সন্তানের জন্য ইহাঁরা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন। ইহাঁদিগের ন্যায় সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী জগতে আর কেহই নাই। ইহাঁরা আমাদিগের অমঙ্গল নিবারণ এবং মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। এমন হিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহশীল গুরুজনের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শনে যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখ হয়, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জগতে নাই। আর যে ব্যক্তি ইহাঁদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করিতে সমর্থ হয়, সেই ধন্য—তাহারই জীবন সার্থক হয়। স্ত্রীলোকমাত্রেই বিদিত আছেন যে, একটী সন্তান মানুষ করিতে কত ক্লেশ ও কিরূপ আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শরীরের রক্ত জল না করিলে একটী সন্তানও পালন করা সম্ভব নয়। যাঁহারা এত কষ্ট করিয়া লালন পালন করেন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব অপেক্ষা জীবনের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

৩। সমদর্শিতা। হঠাৎ একটী মহৎ কার্য্যে উদারতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে শুভকামনার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে, হৃদয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। আত্মপর-ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য হইয়া পরিবারের সকলকে অনুরাগের চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য, নতুবা সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব। সদাশয় না হইলে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা কখনই সম্ভব নয়। সমদর্শী ব্যক্তি সকলেরই ভক্তি এবং অনুরাগ ভাজন হন। তাঁহার নিকট ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, উচ্চ, নীচ জ্ঞান নাই। তিনি সমভাবে সকলকে স্নেহ করেন ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন। এই জন্যই সকলে তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার শত্রু বিরল, কারণ তিনি নিজে সকলের প্রতি সুহৃদ্‌ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সরল ব্যবহার করেন। যে পরিবারে সমদর্শিতা নাই, সেই পরিবারে সুখশান্তির আশা বৃথা। সমদর্শিতা স্বকীয় এবং অপরাপর পরিবারবর্গের সুখশান্তি বর্দ্ধনের একটী প্রধান উপায়।

৪। স্বার্থত্যাগ। তিনিই সৌভাগ্যবান্ এবং ধন্য, যিনি অপরের সুখ সাধনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারেন; যিনি নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা অপরের সুখ বিধান করেন। তিনি পরিবারের সকলের অভাব অনুসন্ধান করিয়া, তাহা মোচনার্থ স্বীয় সর্ব্বস্ব দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। পরিবারের মধ্যে কেহ কোনও বিপদে পড়িলে, তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে বিমুক্ত করেন; কেহ পীড়িত হইলে, তিনি নিজের সুখ বিসর্জ্জন করিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহার আরোগ্যের জন্য প্রাণপণে ক্লেশ স্বীকার করেন। যাহার ধনের সচ্ছলতা নাই, তিনি তাহাকে স্বোপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দান করেন। এই গুণটী উপার্জ্জনের জন্যই অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। স্বার্থত্যাগ সমধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই ইহা এত বড় মহদ্‌গুণ ও সকলের এত সুখবর্দ্ধক। পরিবারের মধ্যে স্বজনবর্গের প্রতি যতই এই গভীর অনুরাগ, ততই তাহার মূলে স্বার্থ-ত্যাগ নেত্রগোচর হইয়া থাকে। মাতৃস্নেহ এত আদরণীয় কেন? কারণ মাতা সন্তানের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে সতত প্রস্তুত।

৫। একতা। একতাবিহীন পরিবার বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। একতা থাকিলে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পাদিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অভাব সুন্দররূপে পূর্ণ হয়, সুতরাং সৌভাগ্য আপনা হইতেই আগমন করে। একতা-সমন্বিত পরিবার যদ্রূপ অনায়াসে সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, একতা-সমন্বিত জাতিও তদ্রূপ ক্রমশঃ মহোন্নতি লাভ করিতে থাকে। যে জাতির পরিবারসমূহ একতাপূর্ণ, সে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। একতা দ্বারা পৃথিবীতে কত প্রকার অত্যদ্ভুত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা গণনা করা অসাধ্য।

৬। নির্ম্মল চরিত্র। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও রমণীয় পদার্থ নির্ম্মল চরিত্র। বিদ্বান্ এবং ধনবান্ ব্যক্তি গভীর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মানলাভে বিফলকাম হন, চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সম্মান প্রদান করে। চরিত্র ব্যতীত শুধু বিদ্যা অথবা ধন দ্বারা মনুষ্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসভাজন হওয়া অসম্ভব। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে লোকমণ্ডলী প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করে না। ধনবান্ ব্যক্তি সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া যশোলাভ করিতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যমণ্ডলীর আন্তরিক অনুরাগ ও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন না। চরিত্রবান্ ব্যতীত অপর কেহই মানবমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা

ও বিশ্বাসভাজন হইতে সমর্থ হন না। সাধুতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি, সমদর্শিতা, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, কর্ত্তব্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ অভ্যস্ত হইলে, চরিত্রের উন্নতি-লাভ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, শৃঙ্খলাপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আত্মদৃষ্টি জাগরূক থাকে; বিনীত হইবার জন্য পদে পদে শিক্ষালাভ হয়; অসৎপথে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে পারে না, কারণ সর্ব্বদাই অভিভাবকদিগের শাসনে বাস করিতে হয়। বহু-পরিবার-বেষ্টিত হইয়া বাস হেতু বহুদর্শিতা জন্মে এবং চরিত্র ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইতে থাকে। ভাবী জীবনে উন্নতি-শৈলে আরোহণ করিবার উপযোগী গুণাবলী একান্নভুক্ত পরিবারেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। যিনি পরিবারের মধ্যে সমস্ত আত্মীয়মণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব সুখদ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন, তিনি উন্নত জীবন লাভ করিয়া, স্বদেশীয়দিগের সুখশান্তির পথ প্রসারিত করিতে সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই।

একান্নভুক্ত পরিবারের অভিভাবক যদি সদাশয়, জ্ঞানবৃদ্ধ, সরল, সমদর্শী ও নির্ম্মলচরিত্র হন এবং সুনিয়মানুসারে সকলকে পরিচালিত করিতে পারেন, তবে সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সুখশান্তি উপভোগে সমর্থ হন; নতুবা বিপরীত ফল ফলে এবং বহুলোকের একত্র বাস নানা প্রকার অনর্থকের হেতু হইয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মব পুস্তকালয় ও সাধারণ
সন ১২৯৩ সালে
প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

সদুপদেশ।

(৩৯৪ সংখ্যা—২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

১১। যদি তোমার বন্ধুর সহিত মনান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট গমন কর এবং তোমার বিরক্তি বা বিরাগের কারণ তাঁহাকে খুলিয়া বল। এই উপায় অবলম্বন করিলে দেখিবে যে, যে মনান্তর চির-বিচ্ছেদে পরিণত হইত; তাহা গাঢ়তর প্রণয় ও বন্ধুত্বের কারণ হইবে।

বন্ধুর নিন্দা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলী দিও, শত্রুর নিন্দা-বাদেও উৎসাহ বা প্রশ্রয় দিও না।

১২। কখনও এরূপ ভাব দেখাইও না যাহাতে লোকে তোমাকে যাহা তুমি নহ, তাহা মনে করে।

১৩। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, সে পথের একমাত্র সম্বল জ্ঞান ও ধর্ম্মানুরাগ।

১৪। প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকিলে দুঃখ

দারিদ্র্যের সময় প্রসন্নতা থাকে, অতুল সম্পদের সময় মদমত্ত হইতে পারি না, এবং মৃত্যুকালেও প্রাণ হইতে আশা ও আনন্দ অন্তর্হিত হয় না।

১৫। তোমার অন্তরঙ্গ, আত্মীয় ও বন্ধু তোমার প্রতি এমন কিছু অন্যায়াচরণ করিতে পারেন না, যাহা অপরিমার্জ্জনীয় ও ক্ষমার অতীত।

১৬। যদি দুঃখের সময় অধীর হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের তীব্রতা দ্বিগুণিত হইবে। অতএব দুঃখের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে।

১৭। বিদ্যা ও জ্ঞান যৌবনের অলঙ্কার, এবং বার্দ্ধক্যের আনন্দ, সুখ ও শান্তি। সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনে ও বিদ্যালাভে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিবে।

১৮। স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করায় যে সাহসের প্রয়োজন, স্বাধীনতার সহিত চিন্তা করায় তদপেক্ষা অধিক সাহস আবশ্যক। দেখিও স্বাধীন চিন্তা হইতে বিমুখ হইও না।

১৯। অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হউক, অন্ততঃ তোমার নিজের সুখ ও শান্তির জন্য হৃদয়ে ঘৃণাকে স্থান দিও না। যখন বিদ্বেষ-পূর্ণ ঘৃণা তোমার মনের আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তখন কি তোমার মনোরাজ্যে ঘোর অশান্তির ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকে না?

২০। লোকের বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ও জীবন দ্বারা যে সত্য প্রতিপাদিত হয়, তাহাই শিক্ষা করিবে। ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও অনন্ত কালের সুখ শান্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনপথে স্খলিতপদ না হইয়া অগ্রসর হইতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে তোমার অপেক্ষা সুখী ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই।

২১। তোমার যাহা দোষ বা দুর্ব্বলতা আছে, তাহা গোপন রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, স্পষ্টভাবে তাহা ব্যক্ত করিও; দেখিবে ইহাতে তোমার হৃদয় ভারশূন্য হইবে এবং তোমার চিরাভ্যস্ত দোষ ও ক্ষীণতা পরিবর্জ্জনের প্রতি চেষ্টা নিয়োগ করিতে তুমি অধিকতর উৎসাহী হইবে।

এক বর্ষ।

(২৮শে কার্ত্তিক—১৩০৪ সাল)

আজ সবে এক বর্ষ
ছাড়িয়া নন্দন বন,
আমাদের দেশে, তুমি
আসিয়াছ যাদুধন!
এখনো মন্দার-গন্ধ
মাখা আছে কচি গায়,
স্বরগ-শিশির-জলে
ভিজা ভিজা আছে কায়;
আননে জাগিছে নব
ত্রিদিবের শশধর,
দুনয়ন শোভে দু'টি
মানসের ইন্দীবর;

দেবতারা যত চুমা
দিয়াছিল স্নেহ-ভরে,
রয়েছে গোলাপী গালে
সেই চিহ্ন থরে থরে!
স্বরগ কাকলী মুখে
অফুট আধেক ভাষা,
মধু-মাখা, সুধা-মাখা
শুনিলে মিটে না আশা!
তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি,
ধীরে ধীরে আলগুচি,
মোহিনী ভঙ্গিমা হেরি
শত ব্যথা যায় ঘুচি!
নিবা'তে এ মরমের
নিদারুণ হুতাশন,
দয়াময় বিধি বুঝি
গড়িলা ও চন্দ্রানন!
তাই
পরশি অমৃত-কণা
জুড়াইল তপ্ত বুক,
সোণালী করেছে ধরা
তোর অই সোণা মুখ!
নিখিল জগতখানি
প্রাণের সোহাগ তার
"অর্ঘ্য" রূপে দেয় নিতি
তব শিরে উপহার!
ভাঙা মেঘে রাঙা শশী
তোমা পানে চেয়ে হাসে,
ঊষা রাণী ফুল-মালা
তোমারে পরা'তে আসে!
তোমারে শুনা'তে, পাখী
গাহে সুললিত গান,
আমরা রাখিতে তোমা
খুঁজিয়া না পাই স্থান!—
(যবে) চারিটী মুকুতা-মাঝে
সোণা হাসি উঠে ফুটি,
প্রকৃতি উল্লাস-ভরে
হেসে হয় কুটি কুটি!
"দাদায়! দাদায়!" বলি
কচি হাত ঘুরাইয়া
ডাক যবে চাঁদে, ধরা
সুখে যায় বিগলিয়া!
পরাণে অমিয় তুমি,
মরমে আশার আলো,
তরুণ অরুণ সম
মনোরম জ্যোতিঃ ঢালো।
চিরজীবী হয়ে থা'ক
জগত-নাথের বরে,
ভূতলে দেখুক স্বর্গ
তোমারে পরশি নরে!
পিতৃকুল মাতৃকুল
তো'হতে উজল হোক্,
হোন্ দৃপ্ত পরিতৃপ্ত
পরলোক-বাসী লোক;
বিদ্বান্ যশস্বী কৃতী
দেবতার ভক্ত হও,
আর কিবা দিব? মম
এই শুভাশীষ লও;
শুভ জন্মদিনে তোরে
কবিতায় গাঁথি হার
পরাইনু দীন আমি,
কি কোথা পাইব আর?
কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

জ্বরের বিষয়।

সাধারণ জ্বরের লক্ষণ।

শরীরে উত্তাপ, মনে বিরক্তি ভাবের উদয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্ভাব নির্গমন, এই সকল চিহ্ন প্রকাশ হইলে জ্বর বলে।

সপ্ত রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের তরুণাবস্থা, অষ্টাহ হইতে দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বরের মধ্যাবস্থা, ত্রয়োদশ দিন হইতে পুরাতন অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বাত-শ্লেষ্মা জ্বরে বা সান্নিপাতিক জ্বরে এ প্রকার নিয়ম নহে। তৎপক্ষে সময়ে সময়ে এক-চল্লিশ দিন পর্য্যন্তও তরুণাবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

জ্বর নানা প্রকার, তন্মধ্যে কয়েকটীর লক্ষণ ও পাঁচন নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রসস্থ জ্বরে বমন ও লঙ্ঘনাদি মহৎ পথ্য। অসহ্য ক্ষুধা হইলে শাস্ত্রোক্ত যবের মণ্ড, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে সাগু, এরারুট, এই প্রকার অতিলঘু, এমন কি লঙ্ঘনের মধ্যেই যেন গণ্য হয়, এরূপ পথ্যই বিধি। ঔষধ ব্যতিরেকে কেবল পথ্য দ্বারা সকল রোগেরই নিবৃত্তি হয়।

যখন যে দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) প্রবল দেখিবে, তখন সেই দোষঘ্ন পথ্য প্রয়োগ করিবে। যখন যে দোষের হ্রাস দেখিবে, তখন সেই দোষবর্দ্ধক পথ্য প্রয়োগ করিবে।

পিত্তজ্বর।

লক্ষণ—নাড়ীর তীক্ষ্ণ বেগ, হরিদ্রা-বর্ণ তরল মল নির্গমন, অনিদ্রা, বমি বা বমির বেগ, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ও নাসিকায় পক্ক ব্রণ তুল্য বেদনা, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখ তিক্ত ও পচা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, মূর্চ্ছা, দাহ, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু, এই সকলের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে পৈত্তিক জ্বর কহে।

পর্পটাদি পাঁচন।

ক্ষেত পাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায়ের পরিমাণ মিলিত ২ তোলা। এই দুই তোলা ছেঁচিয়া ৩২ তোলা জল দিয়া মৃদু পাকে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া এক বা দুই বারে সেবন করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি পাঁচন।

ইন্দ্রযব, কটফল, মুথা, আকনাদি, কটকী এই সকল দ্রব্যের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পিত্ত-জ্বরে পান করিবে।

ধন্যা পটোল।

ধনে ১ তোলা, পল্‌তা ১ তোলা একত্র কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান বিধি। সামান্য সামান্য জ্বরে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

ধন্যা শর্করা।

পিত্তজ্বরে গাত্রদাহ থাকিলে বা অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হইলে ধনে রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন সেই জলে কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া অল্প অল্প পান করিলে দাহাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বাতিক জ্বর।

লক্ষণ—কম্পন, নাড়ীর দ্রুত গতি, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, মাথা কামড়ানি, বক্ষোবেদনা, গাত্র-বেদনা, খাদ্য ভোজনে মুখের বিরুদ্ধ আস্বাদ, মলের কঠিনতা, হাই তোলা, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বাতজ জ্বর বলে।

কিরাতাদি পাঁচন।

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, শুণ্ঠী। ইহার ক্বাথ (পাঁচন) সেবনে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

দাস্যাদি পাঁচন।

নীল ঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামলতা, আকনাদি, শুঁঠ, বেণার মূল, চিরতা, গজপিপুল, বলাড়ুমর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়সোড়া, ধনে, মুথা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, কণ্ঠকারী, ক্ষেত-পাপড়া, কুশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, কুড়। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন।

গব্য ঘৃত গরম করিয়া ভোজন করিলে বাতিক জ্বরে অনেক উপকার দর্শে।

লবঙ্গ, ওকড়ার রস, বড় এলাচি, বেল পাতার রস, মুথা, প্রত্যেকের এক কাঁচ্চা, এবং মরিচ অর্দ্ধ কাঁচ্চা, এই কয়েক দ্রব্য এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ পোয়া করিয়া খাইলে বাতিক জ্বর সারে।

কফ জ্বর।

লক্ষণ—গাত্রে কাঁটা বাহির হওয়া ও লোমাঞ্চিত-শরীর হওয়া, গুরুতর শীত, আলস্য, নাড়ী মৃদুগতি, মুখে মধুর আস্বাদ, মল ও মূত্র ঈষৎ শুক্লবর্ণ, দেহ ভারী, লালা বমন, অতিশয় নিদ্রা, মুখ নাসিকা দিয়া জলস্রাব, অরুচি, কাশ, চক্ষু শ্বেতবর্ণ, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কফজ জ্বর বলে।

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজপিপুল, বৃহতী, এই নিম্বাদি পাঁচন পানে কফজ্বর নষ্ট হয়।

কষায়তম।

ধনে ১ তোলা, চিরতা ২ তোলা, যোয়ান ।০ সিকি তোলা, ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, গাঁটবাদ গুলঞ্চ ২ তোলা, সিনকোনা বার্ক ১ তোলা, মুথা ॥০ আধ তোলা, শুঁঠ ।০ চারি আনা, নিমছাল ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মল পরিষ্কার না থাকিলে সোণামুখীর পাতা ৵০ দুই আনা, নচেৎ অল্প চিরতা, কট্‌কী ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এই ১০৵ দশ তোলা দুই আনাকে কুটিয়া

১৬০ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ।৵০ দেড় পোয়া আন্দাজ জল থাকিতে নামাইবে। পরে সমস্ত বকাল চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া ফেলিবে। তৎপরে সেই ক্বাথ রোগীকে ২।৩ বারে পান করিতে দিবে। ইহা সাধারণ জ্বরে আশুফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

সন্নিপাত জ্বর।

লক্ষণ—কখন দাহ, কখন শীত, সন্ধি-স্থানে বেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষু ছল ছল করা, চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া, কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ, কর্ণের ভিতর বা মূলে বেদনা, কণ্ঠে কাঁটা বাহির হওয়া, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাশ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, এবং খুস্‌খুসে কাশি, থুথু উঠা, মাথা চালা, তৃষ্ণা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, ঘর্ম্ম, মূত্র এবং মল অল্প ও বারবার নির্গত হওয়া, রোগীর দেহ কৃশ না হওয়া, কৃষ্ণ' পীত মিশ্র বর্ণের গোলাকার চিহ্ন গাত্রে বহির্গত হওয়া, উদর ভারী; এই সকল চিহ্নের মধ্যে অধিক চিহ্ন যে রোগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সান্নিপাতিক জ্বর বলে।

বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূলের ছাল। ইহাকে দশমূল পাঁচন বলে। ইহার ক্বাথে সন্নিপাত জ্বর, কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা, ও পার্শ্ববেদনা নষ্ট করে। ইহা পিপুল চূর্ণের সহিত সেবনে কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা উপশমিত হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচন।

বিল্বছাল প্রভৃতি দশমূলের দশখানা, শঠী, কাঁকড়া শৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামন-হাটী, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, কট্‌কী, এই সমুদয়ে মিলিত দুই তোলা। ইহা সেবনে সন্নিপাত জ্বর, হৃদয়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, এবং বমি নষ্ট হয়।

বাতপিত্ত জ্বর।

লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অল্প নিদ্রা, মস্তক ব্যথা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমন, লোমাঞ্চিত দেহ, অরুচি, অন্ধকার দেখা, হাইতোলা, অধিক বকুনি, এই সকল লক্ষণের মধ্যে অধিক লক্ষণ যে জ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই বাতপিত্ত জ্বর কহে।

মুস্তকাদি পাঁচন।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, সুঁদি ফুল, চিরতা, বেণামূল, রক্ত চন্দন, ইহার পাঁচন অল্প মাত্রায় চিনি যোগপূর্ব্বক সেব্য। ইহা সেবনে বাতপিত্ত জ্বর সত্বর নষ্ট হয়।

চন্দনাদি পাঁচন।

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, বেণার মূল, পল্‌তা ও বালা, ইহার পাঁচন কিঞ্চিৎ চিনি যোগ করিয়া পেয়। ইহাতে বাতপিত্ত জ্বর, বমি, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি নিবারণ হয়।

বিষম জ্বর।

লক্ষণ—জ্বর সহসা নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইলে তাহাকে বিষম জ্বর কহে।

ভার্গ্যাদি পাচন।

বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়,

শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, এবং দশমূলের দশখানা। ইহাদের ক্বাথে বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর, সোথ এবং অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাদি পাঁচন।

কণ্টকারী, শুণ্ঠি, গুলঞ্চ ইহার ক্বাথ অবতরণ করিয়া ॥০ তোলা পিপ্পলী চুর্ণ যোগ করিয়া পান করিলে বিষম জ্বরাদিতে বিশেষ উপকার দর্শে।

আগন্তু জ্বর।

লক্ষণ—গুরুতর আঘাতবশতঃ, অভিশাপবশতঃ, অধিক শ্রমবশতঃ, কামবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, ভয় ও শোকবশতঃ যে জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাকে আগন্তু জ্বর কহে।

প্রহারোদ্ভব আগন্তু জ্বরে ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত পান ও মর্দ্দন বিধি।

সঙ্গীত।

সুরট মল্লার একতালা।

(মন) কেন ভ্রম অন্ধকারে। কে রাখিবে সে সময়ে?
(কর) ভ্রমণে বিরাম, ভাব অবিরাম,
ভবারাধ্য সারাৎসারে॥
(ওরে) অতি ভয়ঙ্কর সংসার কানন,
পদে পদে হয় পদের স্খলন,
মায়াময় রাজ্যে রিপুদস্যুগণ,
সদা পথিকে সংহারে॥
কুমতি কণ্টক লতাতে বেষ্টিত,
অভ্রভেদী পাপ বৃক্ষ আছে কত,
তার মাঝে মাঝে কূপ শতশত,
পূর্ণিত কাল ভুজঙ্গে,—
(আবার) বিশ্বাস করিয়ে যাহাদের সঙ্গে,
ভ্রমিছ বিপিনে প্রণয়প্রসঙ্গে,
তারা তোমার নয়, জানিবে নিশ্চয়,
মিত্রভাবে শত্রু ফিরে॥
সময় পাইলে, সেই রিপু (শত্রু) ছয়জন,
করিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ,
শেষেতে অবশ্য বধিবে জীবন,
এখনও দেহেতে আছে তব বল,
বশীভূত আছে ইন্দ্রিয় সকল,
এই বেলা মন হরি হরি বল,
অন্তিমে সম্বল হবে।—
যমযুদ্ধে যদি জয়ী হবি মন,
নাম ব্রহ্ম অস্ত্র কর রে ধারণ,
অস্ত্রের প্রভাবে, পরাজিত হবে,
রবিসুত তখন রে॥
সম্মুখেতে তব ভীষণ আঁধার,
ঘোর ভবসিন্ধু তাহাতে আবার,
শ্রীহরি কাণ্ডারী, হরি-নামের তরী,
ধর্ম্মধন রাখ গোপনেতে ভরি,—
নবীন বলে মন ত্যজ কুসঙ্গ,
জ্ঞানালোক পাবে কর সাধু সঙ্গ,
বৈরাগ্য অসিতে কর শত্রু ভঙ্গ,
যদি হেরিবে সে পরাৎপরে॥

রত্ন।

(৩৮৫সংখ্যা—৩২১পৃষ্ঠার পর)

পুষ্পরাগ।

ইহাকে পদ্মরাগও বলা যায়। ইহা লোহিত, পীত, নীল ও ধূম্র এই চতুর্ব্বিধ বর্ণের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পীতবর্ণ পুষ্পরাগ বৃহস্পতির প্রীতি ও বুধের শান্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। এই মণি হীরক অপেক্ষা অল্প কঠিন এবং কেবল হীরক দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে। ইহার গুণ অম্লত্ব, শীতত্ব, বাতনাশিত্ব, দীপনত্ব এবং কান্তিপ্রজ্ঞাকারিত্ব। যে সকল পুষ্পরাগ উত্তম পীতবর্ণ, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ ঘনকান্তিবিশিষ্ট ও নির্ম্মল, তাহারাই ব্যবহারোপযোগী। শোণ পুষ্পসদৃশ-সুন্দর, স্বচ্ছ ও চিক্কণ হইলে তাহা পরম হিতকর। যে পুষ্পরাগ কৃষ্ণবিন্দু-অঙ্কিত, রুক্ষ, শ্বেত, মলিন, লঘু, দীপ্তিহীন ও কর্করযুক্ত, তাহা ব্যবহার করিলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পুষ্পরাগ অনেক দেশে জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ জাত পুষ্পরাগ মণিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পরীক্ষা।—জাত্য পুষ্পরাগ হইলে তদ্দ্বারা স্ফটিক বিদীর্ণ করা যায় এবং কষ্টি প্রস্তরে ঘর্ষিত হইলে উহা অধিকতর দীপ্তিমান্ হয়।

হীরক।

ইহা সমস্ত রত্ন অপেক্ষা কঠিন এবং তন্নিমিত্ত ইহার অপর নাম বজ্র। ইহা শ্বেত, লোহিত, হরিত, পীত, নীল, কৃষ্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের হইয়া থাকে, এবং স্বভাবের রসায়নক্রিয়ার একটী অনুপম দৃষ্টান্ত; যেহেতু যে উপাদানে অঙ্গার প্রস্তুত হয়, সেই উপাদানে হীরকও নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহা এত কঠিন যে, কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হয় না। হীরক কেবল হীরক দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। গুরুত্ব অন্য রত্নের একটী প্রধান গুণ, কিন্তু লঘুত্ব হীরকেরই শুভ লক্ষণ। সূর্য্যরশ্মি অন্যান্য রত্ন ভেদ করে, কিন্তু উৎকৃষ্ট হীরকে কেবল মাত্র প্রতিবিম্বিত হয়। বোধ হয় পার্থিব পদার্থের মধ্যে ইহার সদৃশ সুন্দর ও চাকচিক্যশালী আর কিছুই নাই। ইহা শুক্রের প্রীতি ও শান্তি উভয়ের নিমিত্ত প্রশস্ত।

(ক্রমশঃ)

হিমালয় দর্শন।

হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং প্রকৃতির অসীম লীলাক্ষেত্র। দূর দেশ হইতে বিদেশীয় পর্য্যটকগণও আসিয়া হিমালয় দর্শনে আপনাদিগের নয়ন সফল করিতেছেন। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি হিমালয় ও ইহার স্বর্ণোজ্জ্বল

মুকুট কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার চক্ষু ধারণ করা বৃথা। হিমালয়ের দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য ও বর্ণনার অতীত। চিরদিন কবিগণ ইহার সৌন্দর্য্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধকগণ ইহার কন্দরে যোগ তপস্যা করিয়া ইহার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন। সম্প্রতি কবিবর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় দার্জ্জিলিং ভ্রমণে গিয়াছিলেন। হিমালয়ের অলৌকিক শোভা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্বরূপ "হিমালয় দর্শন" নামে সংস্কৃত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতা সকলের বাঙ্গালা অনুবাদও দিয়াছেন। আমরা পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদনার্থ কয়েকটী সানুবাদ কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কবি হিমালয়ের নমস্কার সূত্রে ইহার মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন:—

ব্যাপ্য স্থিতঃ স্বশিরসা শশিসূর্য্যলোকং
পাদেন নাগভুবনং বপুষা দিশো যঃ।
আশ্চর্য্যজাতমখিলং মিলিতঞ্চ যত্র
বন্দে বিরাড়্ বপুষমীশমহং গিরীণাং॥

যিনি মস্তকদ্বারা চন্দ্রসূর্য্যলোক, পদদ্বারা নাগলোক এবং দেহায়তনে দশ দিক্ ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান; জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু যে স্থানে সম্মিলিত, সেই বিরাট্‌মূর্ত্তি গিরিরাজ হিমালয়কে নমস্কার।

ঝঙ্কারিনির্ঝরশতানি যদীয়মুচ্চৈ
রুদ্ঘোষয়ন্তি জয়শব্দমনন্তবিশ্বে।
যঃ শ্বেতচামরশতৈরিব শারদাভ্রৈঃ
সংবীজ্যতে তমহমদ্রিপতিং নমামি॥

গগনভেদী ঝঙ্কাররবে শত শত নির্ঝরমালা অনন্ত বিশ্বমধ্যে যাঁহার জয় বিঘোষিত করিতেছে, শরদের শুভ্র মেঘ খণ্ড সকল শত শত শ্বেত চামরের ন্যায় যাঁহাকে বীজন করিতেছে, সেই গিরিনাথ হিমালয়কে নমস্কার।

যৎ কীর্ত্তিতোঽয়ং কিল 'দেবতাত্মা'
সত্যং হি তন্মাত্র বিকল্পলেশঃ।
পাপং মনো মে কথমন্যথেমং
দৃষ্ট্বৈব জাতং বিরজঃ প্রফুল্লম্॥

কবিরা এই হিমালয়কে যে দেবতাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে কথা সত্য; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইনি যদি দেবতা না হইবেন, তবে ইহাঁকে দেখিবা মাত্র আমার পাপকলুষিত চিত্ত এরূপ নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হইল কেন?

হিমালয় মেঘের রাজ্য। এখানে মেঘে মস্তকের উপর আকাশ রচনা করে, আবার পদনিম্নে আকাশের ভ্রম জন্মায়। মেঘ সকল চারি দিক্ হইতে আসিয়া গাত্র স্পর্শ করে এবং গৃহের মধ্যে ধূম্রের ন্যায় প্রবেশ করে। কবি তাহার সুন্দর বর্ণনা করিতেছেন।

অসৌ গিরির্বারিদজন্মভূমিঃ
অনন্তমেঘালিবিহারভূমিঃ।

মেঘপ্রবেশস্য নিবারণায়
রুদ্ধেষু গেহেষু জনা বসন্তি॥

এই হিমালয় মেঘের জন্মভূমি এবং অনন্ত মেঘমালার লীলাক্ষেত্র। মেঘ প্রবেশ নিবারণ করিবার জন্য এ স্থানের লোকেরা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া বাস করে।

অধস্তলং শারদবারিবাহৈঃ
শুক্লীকৃতং ভাতি নভো যথৈব।
গৌরীগুরোর্ভক্তিভরেণ মন্যে
পদস্য মূলে পতিতং নভোঽস্য॥

ইহার অধোদেশ শারদীয় মেঘমালায় শুভ্রবর্ণ হইয়া ঠিক্ আকাশের ন্যায় দেখাইতেছে; যেন আকাশ ভক্তিভরে এই গৌরীপিতা হিমালয়ের পদতলে পতিত হইয়াছে।

অস্মিন্ গিরৌ কুজ্‌ঝটিভিঃ সমন্তাৎ
সমাবৃতে তির্য্যগধস্তথোর্দ্ধং।
একার্ণবে ভাতি যথা নিমগ্নং
সাকাশপাতালমশেষবিশ্বং॥

এই ভূধরের অধোভাগ, ঊর্দ্ধভাগ ও তির্য্যক্ সমস্তই যখন কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়, তখন জ্ঞান হয়,—সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে ডুবিয়াছে, আকাশ পাতাল সকলি একাকার।

হিমালয়প্রদেশবাসী লোকদিগের স্বাস্থ্য, বল ও সুখসচ্ছন্দ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

অস্মিন্ হিমাদ্রৌ বসতাং শরীরং
হৃষ্টঞ্চ পুষ্টঞ্চ নিরাময়ঞ্চ।
সুশিক্ষিতাভ্রুগ্নবিশীর্ণদেহাৎ
বরং হি মূর্খা অপি পার্ব্বতীয়াঃ॥

এস্থানের অধিবাসীরা সদাই নীরোগ, হৃষ্ট পুষ্ট ও প্রফুল্লচিত্ত। এই সকল পার্ব্বত্যজাতি অশিক্ষিত হইলেও, রুগ্ন ও ভগ্নদেহ সুশিক্ষিত সভ্যগণ অপেক্ষা সুখী।

দৃঢ়া বলিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ স্ত্রিয়শ্চ
নিধায় পৃষ্ঠে বৃষবাহ্যভারান্।
নতোন্নতান্ দুর্গমশৈলমার্গান্
ক্রামন্তি দূরানবলীলয়ৈব॥

স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা এক এক জন এক একটী বলদের বোঝা পৃষ্ঠে করিয়া, বন্ধুর, দুর্গম, সুদূর পার্ব্বত্য পথ সকল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতেছে।

যেষাং সকৃদ্দর্শনমাত্রমেব
শিরো বিঘূর্ণত্যতিভীষণত্বাৎ।
অহো সহেলং গিরিসঙ্কটানি
তীর্য্যন্তি বালা অপি পার্ব্বতীয়াঃ॥

যে সকল ভীষণ গিরিসঙ্কটের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেও মাথা ঘুরিয়া যায়, পার্ব্বত্য শিশুরাও সে সকল গিরিসঙ্কট অনায়াসে পার হইতেছে।

হিমালয়ে উদ্ভিদরাজি ও জলস্রোতের কেমন আশ্চর্য্য শোভা বর্ণিত হইতেছে:—

অস্মিন্ গিরৌ নিত্যফলপ্রসূনাঃ
বৃক্ষলতা নিত্যনবীনপত্রাঃ।
বহন্তি নিত্যং শতনির্ঝরীণাং
ধারা দ্রবাণামিব রাজতানাং॥

এ স্থানে বৃক্ষ ও লতার নিত্যই ফল

পুষ্পের শোভা, নব-পল্লবের শোভা নিত্য নিত্য, দ্রবীভূত রজতধারার ন্যায় শত শত নির্ঝরধারা এ স্থানে নিত্যই প্রবহমাণ।

যুগান্তরাণামপি সাক্ষিণোস্মিন্
শালা বিশালাঃ সুরদারবশ্চ।
উদ্বাহবো যোগিজনা যথৈব
প্রসার্য্য শাখা ইব যোগমগ্নাঃ॥

এই পর্ব্বতে প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ও দেবদারু দৃষ্ট হয়; এই সকল বৃক্ষ বহুকালের পুরাতন যুগযুগান্তরের সাক্ষিস্বরূপ; ইহারা ঊর্দ্ধে শাখা বিস্তার করিয়া যেন ঊর্দ্ধবাহু যোগিগণের ন্যায় মহাযোগে মগ্ন হইয়া আছে।

হিমালয়ে এক সময়ে কত প্রকার বিচিত্র দৃশ্য, তাহা এখানে চিত্রিত হইয়াছে:—

ক্বচিৎ তুষারৈশ্চিরদুর্গমোহয়ং
সুখেন গম্যঃ ক্বচিদেষ জীবৈঃ।
অহো বিচিত্রং! সমমেব ধত্তে
ঘনান্ধকারাতপবর্ষণানি॥

কোন স্থান চিরতুষার-রাশি-সমাবৃত, প্রাণিমাত্রেরই অগম্য; কোনও স্থানে জীবগণ সুখে বিচরণ করিতেছে। একই সময়ে দেখিতে পাইবে,—কোনও স্থানে ঘোর মেঘান্ধকার, কোথাও রৌদ্র, কোথাও বৃষ্টি, অহো কি আশ্চর্য্য!

ন চোচ্চতায়াঃ নচ নিম্নতায়াঃ
বিচিত্রতায়াশ্চ ন যত্র সীর্মা।
একত্র বৈচিত্র্যমশেষরূপং
দ্রষ্টুং বিধাত্রা কিমু নির্ম্মিতোহয়ং॥

এই হিমালয়ের উচ্চতারও সীমা নাই, নিম্নতারও সীমা নাই, বিচিত্রতারও সীমা নাই। আহা! বিধাতা সকল প্রকার বৈচিত্র্য এক সঙ্গে মিলিত দেখিবার জন্যই কি ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

কাঞ্চনজঙ্ঘা কবির তুলিকায় এইরূপ লোকাতীত সৌন্দর্য্যে চিত্রিত:—

উদীয়মানারুণরাগরক্তঃ
কর্পূরগৌরো ধবলাচলোঽয়ম্।
বিশ্বেশ্বরী-ব্রহ্মময়ী জনন্যাঃ
ভাতি জ্বলৎ স্বর্ণময়ীব মূর্ত্তিঃ॥

কর্পূরের ন্যায় বিশুভ্র এই ধবলাচল যখন নবোদিত অরুণালোকে রঞ্জিত হয়, তখন মনে হয়, যেন বিশ্বেশ্বরী ব্রহ্মময়ী মার জ্বলন্ত স্বর্ণময়ী প্রতিমা শোভা পাইতেছে।

বিদ্যোতিতশ্চন্দ্রমরীচীজালৈঃ
আভাতি রাত্রৌ ধবলাচলোঽয়ং।
পুঞ্জীকৃতানন্তনিরঙ্কচন্দ্রা
সৃষ্টির্বিধেঃ স্বপ্নময়ীব কাপি॥

রাত্রিকালে এই ধবলাচল যখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন দেখিলে জ্ঞান হয়, যেন অনন্ত কোটী নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র স্তরে স্তরে পর্ব্বতাকারে রাশীকৃত!!! যেন বিধাতার কি এক অনির্বচনীয় স্বপ্নময়ী সৃষ্টি!

হিমালয় সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্য প্রচার এবং ভারতের মহিমা ঘোষণার জন্য দণ্ডায়মান, কবি এই ভাবে বলিতেছেন:—

অকথ্যসৌন্দর্য্যলবং যদঙ্গাৎ
ত্বং মোহনং রূপমিদং বিভর্ষি।
অনন্তসৌন্দর্য্যমহানিধিং তং
জগৎপতিং দর্শয় শৈল! মহ্যম্॥

হে ভূধর! তুমি যাঁহার অঙ্গের কণামাত্র সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া এই ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়াছ, সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মহানিধি ব্রহ্মাণ্ডপতিকে আমায় দেখাও।

শৈলেশ কিং ভারতভূমিমাতুঃ
মহামহিম্নো ধ্রুবলোকমধ্যে।
বিঘোষণার্থং শির এবমুচ্চৈঃ
কৃতং ত্বয়া দারিতসপ্তলোকং॥

হে শৈলরাজ হিমালয়! জননী ভারতভূমির মহান্ মহিমা ধ্রুবলোকমধ্যে ঘোষণা করিবার জন্যই কি তুমি মস্তক এত উচ্চ করিয়াছ? তোমার মস্তক কি তাই সপ্ত লোক ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে?

হিমালয়-দর্শন কবিরত্ন মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির অন্যতম নিদর্শন। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত এবং অন্তঃকরণ সদ্ভাবে পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

কলালাপ।

(৩৮৮ সংখ্যা,—২৫ পৃষ্ঠার পর)

১৬। তর্কুকর্ম্ম,—টেকো দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করার নাম তর্কুকর্ম্ম। পূর্ব্বকালে কি ভদ্র, কি ইতরবংশীয়া প্রাচীনা স্ত্রীগণ টেকো দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতেন। সেই সূত্র দ্বারা চিক্কণ বস্ত্র নির্ম্মিত হইত এবং ব্রাহ্মণজাতীয়া প্রাচীনাগণ স্বহস্ত-নির্ম্মিত সূত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপবীতও প্রস্তুত করিতেন। এককালে ঢাকা অঞ্চলে এই তর্কুকর্ম্মের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মলমল খাস্, জগন্নাথ মস্‌লিন্ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্ত্র যে সূত্রে নির্ম্মিত হইত, সেই সূত্র বালিকা ও কিশোরীগণ ভিন্ন অন্যে প্রস্তুত করিতে পারিত না। সমস্ত দিবসের মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণের কয়েক দণ্ড মাত্র ঐরূপ সূত্র নির্ম্মাণের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল বস্ত্রের সূক্ষ্মতার বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক থান কাপড় একটী অঙ্গুরীর মধ্য দিয়া যাইতে পারিত এবং রাত্রে ঐ বস্ত্র অনাবৃত স্থানে রক্ষা করিলে প্রাতে উহা শিশিরে অদৃশ্য হইয়া যাইত। উহার এক একটী থান সহস্রাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হইত। কোন সময়ে সপ্তস্তরে তাদৃশ বস্ত্র পরিধান করিয়া আরঙ্গজেবের পুত্রী রোসিনারা পিতার সম্মুখীন হইলে পিতা তাঁহাকে নগ্না বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সে অপূর্ব্ব সূত্রশিল্প ভারতে অনেক দিন হইল লোপ পাইয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা ছিল, বিলাতী সূত্র ও বস্ত্রের আমদানীতে তাহাও গিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের উপবীত পর্য্যন্তও বিলাতী বাণ্ডিলের সূতায় প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা ইছাপুর অঞ্চলের ব্রাহ্মণবংশীয়া রমণীদিগের উপবীত প্রস্তুত করায় বড়ই আমোদ ছিল। নিজে নিজে সূতা কাটিতেন এবং সেই সূতায় উপবীত নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করিতেন। কখন কখন শতাধিকহস্তমিত একটী একটী উপবীত বড় এলাচির খোসার মধ্যে স্থাপন করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে উপহার প্রদান করিতেন। এখন তর্কু-সূত্র দ্বারা দেশের বস্ত্রাভাব দূর করা অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষায় মহা ব্যস্ত, তাঁহাদের অন্ততঃ উপবীতগুলি দেশীয় তর্কু সূত্র দ্বারা নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টা করা উচিত।

১৭। তক্ষণ,—এই শব্দের প্রকৃত অর্থ রেঁদা দ্বারা কাষ্ঠ পরিষ্কার করা। রেঁদা সূত্রধরের অস্ত্র, এই জন্য তক্ষণশব্দে এক্ষণে সূত্রধরের সমস্ত কার্য্যই বুঝাইয়া থাকে। মনুষ্যসমাজে তক্ষণ প্রধান ও প্রয়োজনীয় শিল্প। মানবসমাজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তক্ষণ কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কি দরিদ্রের পর্ণকুটীর, কি সম্রাটের ইন্দ্রভবন, তক্ষণকার্য্যের কিছু না কিছু নিদর্শন না আছে, এমন গৃহই নাই। তদ্ব্যতিরেকে পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে সর্ব্বত্রই তক্ষণ দেদীপ্যমান। অতএব সূত্রধর জাতি জনসমাজের বিশেষ আদরণীয় ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেশীয় সূত্রধরের বড়ই দুরবস্থা। কলিকাতাবাসী ২।৩ ঘর সূত্রধর ব্যতীত মফঃসলে ঐ জাতির গৃহে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ ঐ জাতির অমিতব্যয়িতা চিরপ্রসিদ্ধ। অন্যজাতীয় গৃহস্থের গৃহে অপব্যয়ের লক্ষণ দেখিলে, লোকে ছুতরের ঘরের সঙ্গে তাহার তুলনা করে। ঘরে একদিনের উপযুক্ত চাউল নাই, অথচ সূত্রধর একদিনের সমস্ত উপার্জ্জন এবং তাহার উপর আরও কিছু কর্জ্জ করিয়া প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য ক্রয় পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে গৃহে ফিরিল। সূত্রধরগৃহিণী কাঠা পালি হাতে করিয়া চাউল ধার করিতে বাহির হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই শুনা যায়। সহর অঞ্চলের সূত্রধরদিগের ঐরূপ অপব্যয়ের উপর পানদোষ ও আনুষঙ্গিক অপরাপর দোষ আছে। "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা ভরসা করি, দেশীয় মেলা মহোৎসবের অধ্যক্ষগণ ঐ জাতির নৈতিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষেও দৃষ্টি রাখিবেন।

১৮। বাস্তবিদ্যা,—ভদ্রাসন ভূমির শুভাশুভ নির্ণায়ক শাস্ত্র। যে কারণে দেশীয় জ্যোতিষ মুমূর্ষু, সেই কারণেই বাস্তবিদ্যা লুপ্তপ্রায়। পূর্ব্বকালে কোন স্থানে ভদ্রাসন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে, বাস্তবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা অগ্রে ভূমির

পরীক্ষা করান হইত। এরূপ শুনা যায়, ভূমির নিম্নে কৃষ্ণমার্জ্জার, কৃষ্ণাশ্ব, পেচক প্রভৃতি প্রাণীর অস্থি নিহিত থাকিলে ঐ ভূমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা হইত না। কখন বা ঐ সকল অস্থি উদ্ধার করিয়া ভূমিকে পরিশুদ্ধ করা হইত। গৃহস্থের গৃহে নিরন্তর বিবিধ উৎপাত ও অমঙ্গল সংঘটিত হইতে থাকিলে, গৃহভূমির নিম্নে ঐরূপ কোন অশুভজনক পদার্থ আছে, এরূপ অনুমান করা হইত। বাস্তবিৎ পণ্ডিতগণ, ঐ পদার্থ বাটীর কোন্ দিকে কত মাটীর নীচে আছে, তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত বাস্তুভূমি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে বিবৃত আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঐ শাস্ত্র কুসংস্কারমূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় এখন আর উহার নামও শুনা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষ এইরূপে অশ্রদ্ধাস্পদীভূত হইয়াও পুনরায় অল্প অল্প জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে! তাহার কারণ, হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ইংরাজের কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস হইয়াছে। ঐরূপে বাস্তবিদ্যাতেও যে দিন ইংরাজের বিশ্বাস জন্মিবে, সেই দিন আমরাও আবার শ্মশান হইতে বাস্তবিদ্যার শব টানিয়া গৃহে আনিব এবং পরম যত্নে তাহাতে জীবনসঞ্চারের চেষ্টা করিব। শ্রীপঞ্চমী মেলার অনুষ্ঠাতৃগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হউন না কেন?

১৯। রূপ্যরত্ন পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ জ্ঞান এবং আকর জ্ঞান—এই চতুর্ব্বিধ কলাই এক শ্রেণীর বিদ্যা। প্রথমোক্ত তিনটী বিদ্যা এ দেশীয় স্বর্ণকার ও সুবর্ণ বণিক্‌দিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। অধুনা অন্যান্য জাতীয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও ঐ বিদ্যা অল্প স্বল্প শিক্ষা করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদির ব্যবসায় করিতেছেন। দেশীয় স্বর্ণ-রৌপ্য-রত্ন-ব্যবসায়িগণের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের সীমা যতদূর,—ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ও সেই সীমার মধ্যেই চলিতেছে—কদাচ তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহারা যদি ২০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণকে ২৫৲ বা ১৫৲ টাকার বলিয়া বুঝেন, আমাদিগকেও তাহা সেই সেই মূল্যে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বসাধারণেরই ঐ সকল বিদ্যায় এক প্রকার জ্ঞান থাকা উচিত; কেননা গৃহস্থমাত্রেরই ঐ সকল বস্তুর সহিত অল্প বিস্তর সম্বন্ধ আছে। "আকর জ্ঞান"—এই বিদ্যাটী এ দেশে লোপ পাইয়াও এখন ইউরোপ আমেরিকার সভ্যদেশ সকলে একটী প্রধান বিদ্যারূপে আদৃত হইয়াছে। অনেকে ঐ বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিতেছেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃদঙ্গার, পারদ, হরিতাল, লবণ, তাম্র, অভ্র, হীরক, অয়স্কান্ত, স্ফটিকাদি মণিগণ, চূর্ণপ্রস্তর, শ্লেট্ প্রস্তর ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ ভারতের ভূগর্ভে জন্মিয়া থাকে। বিদেশীয়েরা এ দেশের খনি হইতে ঐ সকল পদার্থ

উত্তোলন করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে; —কিন্তু আকরজ্ঞান না থাকায় ভারতবাসিগণ "ভ্যাভ্যা গঙ্গারামের" ন্যায় তাহা কেবল চাহিয়া দেখেন। কেহ কেহ বা খনিজসংগ্রাহক কোম্পানীর দপ্তরে কেরাণিগিরি করিয়া উদর পোষণ করেন। বরাকরের কল কারখানা কিরূপ কাণ্ড এবং তথায় কি হইতেছে, কেহ তাহার সংবাদ রাখেন কি? ইউরেপীয় খনিজ বিদ্যারূপ "হাড়গিলে" পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে তত্রত্য পাহাড় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া মিশ্র ধাতুপিণ্ড প্রদান করিতেছে এবং সেই খাতুপিণ্ড সকল ঐ কারখানায় গালাই হইয়া বিভিন্ন ধাতুরূপে পরিণত হইতেছে! বর্ত্তমান কালে বিলাতই লক্ষ্মী সরস্বতীর বিলাসক্ষেত্র,—তথায় ঐ সকল বিদ্যারই বিলক্ষণ চর্চ্চা আছে। সিবিলিয়ান্ হইতে—ব্যারিষ্টার হইতে এ দেশের অনেকেই বিলাত গিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষি, শিল্প, ধাতু ও মণিবিদ্যা, খনিজবিদ্যাদি শিক্ষা করিতে এদেশের কয়জন বিলাত গিয়া থাকেন? যে কয় জন কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গুরুমহাশয়গিরি—কেহ কেহ কেরাণিগিরি করিতেছেন। একজন বুঝি জমীন্দারের ম্যানেজার হইয়াছেন। যত দিন এ দেশীয়গণের বিলাতগমন আরম্ভ হইয়াছে, ততদিনের মধ্যে শুনিতে পাই, একজন মাত্র জমীন্দারপুত্র খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শিখিলে কি হয়, দেশে আসিয়া যে জমীন্দার,—সেই জমীন্দার! যেমন একের পোষাক অন্যের শরীরে খাটে না, তেমনি বোধ হয়, বিলাতের বিদ্যা এ দেশে ফলবতী হইবে না। যখন এককালে এ দেশে ঐ সকল বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এদেশীয়গণ অবশ্যই উহার ফল ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ ঐ সকল মরা বিদ্যাকে আর একবার বাঁচাইবার চেষ্টা করুন। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিত সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিদেশীয় রাজনীতির মরীচিকাময় মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই দিকে আসুন।

২০। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ,—যে শাস্ত্র দ্বারা তরু-গুল্ম-লতার রোগ নির্ণয় ও তৎপ্রতীকার করা যায়, তাহার নাম বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ। ইহা কৃষিবিজ্ঞানের শাখা বিজ্ঞান বিশেষ। কৃষিকার্য্য ও উদ্যানকার্য্যের উন্নতিকল্পে উহা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, তাহা উহার নাম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভারতীয় লোক সমাজ এককালে যে কি আশ্চর্য্য উন্নতি লাভ করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদির নামগুলিই তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এক্ষণে দেশীয় কৃষির উন্নতি সাধন বিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এবং কতিপয় শিক্ষিত বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। রাজনৈতিক দৃষ্টি সহকারে দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় কৃষির উন্নতি সাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে, শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রগুলির আবিষ্কার ও প্রচার বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিবেন।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক দিন অপরাহ্ণে গঙ্গার বালুকাময় পুলিন-প্রদেশে তেজকুমার নামক এক বয়স্ক যুবা ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিল। গঙ্গার তটস্থ ভূমির চারি পাশে বিবিধ কুসুমতরু ও রমণীয় উদ্যান-বৃক্ষ রোপিত। তটস্থ কুসুমোদ্যানে ভ্রমরা-গুঞ্জনের সঙ্গে মৃদু-সমীর-সঞ্চালিত লতিকা-দামের মৃদু নিনাদ উত্থিত হইতেছিল। কপোতাক্ষি গঙ্গাবাণের জলে পূর্ণ-যৌবনার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলে কূলে বহিয়া যাইতেছিল।

তেজকুমারের মনে আজ একটি বহুদিনকার পুরাণ স্মৃতি জাগরিত—আজ তাঁহার মন একটি সুখের ভাবনায় নিমগ্ন। তেজকুমার সুখের আতিশয্য বশতঃ কখন দ্রুত-পাদক্ষেপে, কখন বা মৃদু পাদসঞ্চালনে চলিতেছে, কখন বা কুসুম তুলিতে গিয়া রোরুদ্যমান প্রজাপতিকে ধরিয়া ফেলিতেছে, কখন বা ভ্রমরকে উড়াইতে গিয়া নবপল্লবিত শাখা ভাঙ্গিয়া আনিতেছে। তখন তাহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন ও উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত ছিল, সহসা কুসুমসন্নিভ একটি বিষাদময়ী বালিকামূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজকুমার বালিকার মুখে আজ এক নূতনতর দুঃখের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাইয়া করুণ স্নেহের কণ্ঠে কহিল "সেফালি! তুই কি আর কখনও হাস্‌বি না?" বালিকা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু সে হাসি বিদ্যুতের ন্যায় একবার জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। বালিকা চোখের জল সামলাইতে গিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল "দাদা! তুমি শীঘ্র এস, বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন।"

তেজকুমার বালিকার সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার কম্পিত অধর কারণ জিজ্ঞাসা করার অগ্রেই তাহার পিতা পিনাকী কহিলেন "অদৃষ্টের লিপি কেহ কোন দিন খণ্ডন করিতে পারে না, অতএব শীঘ্র জন্মভূমির নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হও।"

তেজকুমারের বুঝিতে অধিকক্ষণ বিলম্ব হইল না। সে ক্ষণকাল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত রহিয়া কহিল, "আমি প্রস্তুত আছি।"

সেফালিও এতক্ষণ হেম-প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহার বিষাদক্লিষ্ট পাণ্ডু মুখের উপর সন্ধ্যার কিরণ খেলা করিতেছিল, সন্ধ্যার বাতাসে তাহার শিথিল অঞ্চল দুলিতেছিল, চুলের ঝাপটা নড়িতেছিল। পিতা তাহার দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন "কি দেখিতেছ, প্রস্তুত হইয়া আইস।" গৃহের চারি দিকে বন্য পাদপাবলি নূতন কিশলয়ে সজ্জিত হইয়াছিল, রসালঁ তরুনিচয় সুরভি মুকুলাঙ্কুর প্রসব করিতেছিল, বালিকা তাহাদের প্রতি একবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল "চলুন, আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশ বড় মেঘাচ্ছন্ন, সন্ধ্যাতারা একবার জ্বলিয়াই নিভিয়া গেল। প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন শিলাঘাত ও বজ্রপাতের ভয়ে প্রাণ সশঙ্কিত। একটি বিস্তৃত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছে।

এই ঘোর ভয়াবহ সময়ে এই দুর্গম বনপথে তিন জন মনুষ্য দ্রুতবেগে চলিতেছিল। প্রতিপদে তাহাদের পদস্খলন হইতেছে, দণ্ডে দণ্ডে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, কিন্তু তবুও তাহারা চলিতেছে। হায়! আজ তাহারা আশ্রয়শূন্য পর দেশের অপরিচিত পথিক, এ দুর্দ্দিনে তাহাদিগকে কে আশ্রয় দিবে? সেই সময় বজ্রনাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের ধ্বনি ধ্বনিত হইল। তাহাদের পার্শ্ব দিয়াই ভীমবেগে বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, অমনি ভয়বিহ্বলা সেফালি বজ্রমুষ্টিতে দাদার হস্ত ধরিয়া কহিল "বড় ভয় করে।" তেজকুমার এক হাতে ভগ্নীর হস্ত, অপর হাতে পিতার হস্ত ধরিয়া কহিল "ভগবান্ সহায় হও, এ ভীষণ দুর্দ্দিনে কি আমাদের কোথাও আশ্রয় নাই?—একটিও বন্ধু নাই?"।

"হাঁ আছে, এই দিকে এস, এখনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বার তোমাদের জন্যই উন্মুক্ত।"

এই দুর্দ্দিনে দুঃসময়ে দ্বিযাম রজনীতে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে এই কোমল মনুষ্যকণ্ঠ তাহাদের কর্ণে দেবাদেশের ন্যায় ধ্বনিত হইল। সহসা ঈশ্বরের প্রসাদস্বরূপ তাহাদের সম্মুখে বিদ্যুদালোক জ্বলিয়া উঠিল। সেই স্বর্গীয় আলোক একটি কুটীরের মুক্ত দরজা দেখাইয়া দিয়া গেল। তাহারা তন্মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞহৃদয়ে সানন্দচিত্তে কুটীরের ভিতর প্রবেশ করিল। কুটীরের কক্ষে ক্ষীণ দীপালোকে একজন তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান ছিল।

সে রজনী প্রভাত হইল। প্রকৃতি যেন রণরঙ্গে সমস্ত রাত্রি নৃত্য করিতে করিতে এখন প্রভাতের বাতাসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বৃক্ষের একটি লতাও নড়িতেছে না, একটি পাতাও ঝরিতেছে না, সমস্ত কানন নিস্তব্ধ—নীরব। কুটীরের পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া তেজকুমার ও তাহার পিতা গভীর চিন্তামগ্ন। সেফালি কেবল শুষ্ক অধরে ঈষৎ হাসিরেখা অঙ্কিত করিয়া নিরতিশয় আনন্দ উৎসাহে চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ শান্তবদনা প্রকৃতিকে সে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। সেই নিবিড় বনস্থলী সুন্দর শৈলমালায় সমলংকৃত। একটি ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মের নিম্নদেশে বিষাদিনীর ক্ষীণ আশার ন্যায় একটি ছোট নদী বহিয়া যাইতেছিল। সেই চঞ্চল নদীবক্ষে প্রকৃতির অঙ্গচ্যুত অলঙ্কারের ন্যায় বিকসিত শ্বেত পুষ্পনিচয় নিপতিত হইয়া ভাসিয়া যাতেছিল।

এই গিরিবর্ত্মের নিম্নভূমিতে কি জীবন্ত শান্তি, কি স্বর্গীয় মধুরতা! সেফালি ধীরে ধীরে গিয়া সেই নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম সৌন্দর্য্যরাশির উপর উপবেশন করিল, তাহার চারি পাশে ছোট ছোট বৃক্ষগুলি ফুটন্ত কুসুমভারে সজ্জিত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলভার বহন করিয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট দেবতার পূজার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আজ এই শান্ত প্রভাতে সকলি আর্দ্র, সকলি পরিম্লান। দেখিতে দেখিতে বালিকার ম্লান বদনও চক্ষুজলে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার কহিল "পিতঃ! তুমি কি সন্ন্যাসীকে পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলে?

পিনাকী। হাঁ, এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বে আমাকে হঠাৎ পলায়নের পরামর্শ দেন।

তেজ। তিনি আরও কি কিছু বলিয়াছিলেন?

পিনাকী। এ বনবর্ত্মে প্রবেশ করা তাঁহারই আদেশ।

তেজ। এ কুটীর কি তাঁহারই?

পিনাকী। জানি না।

তেজ। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে সন্ন্যাসী কোথায় অন্তর্হিত হইলেন?

পিনাকী। তাহাও বলিতে পারি না।

তেজ। তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথায়ও দেখিয়াছ বলিয়া তোমার প্রতীতি হয় না?

পিনাকী। না, তাঁহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তেজ। বন্দুকের গুলি বোধ হয় আমাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিল।

পিনাকী। শুনিয়াছি সেই দুর্দ্দান্তই আমাদিগের পথরোধ করিবার জন্য স্থানে স্থানে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছে। কল্যকার অন্ধকার অরণ্যগর্ভে যদি আমরা অতর্কিতভাবে নিহত হইতাম, তবে আর কে জানিতে পারিত? চক্রীর চক্র এমনি ভয়ানক!

তেজ। কি আশ্চর্য্য! সেফালি স্বর্গের পরী হইয়া সেই বিষম নরককুণ্ডে নিপতিত হইবে? রমণী-মনের কি অপ্রতিহত বেগ!

ঊষাকল্প শশীর ন্যায় সেফালির পাণ্ডু মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পিনাকী কহিলেন, অমর-বাঞ্ছনীয় আকাশের

উজ্জ্বল নক্ষত্র সংসারের ঘোর আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া চিরকাল লাঞ্ছিত হইবে। অদৃষ্টের লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে?

তেজ। জ্ঞানবুদ্ধিসমন্বিত মানবের এ সব নৃশংসোচিত কার্য্য কি দুঃখাবহ! ভগবান্ ইহার নিরাকরণ করুন। এইখানেই কথাবর্ত্তা শেষ করিয়া কন্যা পুত্রের সহ পিনাকী তথা হইতে দ্বিগুণতর একটী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথাকার নিভৃততম প্রদেশে বনপাদপসমূহের বিশাল শাখা পল্লবে একটী অপূর্ব্ব কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ঘনশৈলমালার অভ্যন্তর দিয়া মুকুল পল্লবে সজ্জিত একটী রমণীয় পথ চলিয়া গিয়াছে। একদিন প্রভাতে তেজকুমার সেফালিকে কিছু না বলিয়া সেই পথে চলিয়া গেল—বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূর গেল। সম্মুখে এক খানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। তথায় একটী আম্র বৃক্ষের নীচে শুভ্রপট্টবস্ত্রপরিহিতা একটী রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ছিল। তেজকুমার সে রমণীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার মনের মধ্যে একটী পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। যতই সে রমণীকে দেখিতে লাগিল, ততই তার পুরাতন স্মৃতি মনে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল। তাহার সেই উৎকণ্ঠা দেখিয়া রমণী বিস্ময়ে কহিল "বাছা! তুমি কে?"

তেজ। এই গ্রামের নাম কি ছায়াপথ?

রমণী। হাঁ।

তেজ। আপনি আমাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন?

রমণী (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিল) হাঁ দেখিয়াছি।

তেজকুমারও কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল "আপনারই সুভগা বলিয়া একটী মেয়ে আছে না?"

রমণী। হাঁ আছে, কেন?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তেজকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপে আপন কুটীরে প্রত্যাগত হইল, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। তেজকুমার কুটীরে গিয়া সেফালিকে কহিল "সেফালি আজ আমি ছায়াপথে গিয়াছিলাম।"

সেফালি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল "কি ছায়াপথে গিয়েছিলে?"

তেজ। হাঁ পূর্ব্বে জানিতাম না, ছায়াপথ এখান হইতে এত কাছে।

সেফালি। সেখানে নূতন কি দেখিলে? আমার যাইতে বড় ইচ্ছা করে। বাবার সঙ্গে গিয়া সেখানে প্রায় দুই বৎসর ছিলাম না? সেখানকার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। তুমি কি তোমার পূর্ব্বপরিচিত লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ?

তেজ। না সেফালি! কাহারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই।

সেফালি। আর এক দিন যাবে বুঝি?

তেজ। যাব না? অবশ্য যাব।

সেফালি—দেখ সাবধানে চলা ফেরা করিও, শত্রু পদে পদে। (ক্রমশঃ)

সংখ্যাবিষয়ে বিচিত্র সংস্কার।

সকল দেশেই সংখ্যা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার দেখা যায়; লোকে কোন কোন সংখ্যাকে শুভজনক ও কোন কোন সংখ্যাকে অনিষ্টকর মনে করিয়া থাকে। বিযোড় সংখ্যা ১, ৩, ৫ এবং যোড় সংখ্যা ২, ৪, ৬ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ফলজনক বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হয়। সুরতী খেলা, জ্যোতিষী গণনা এইরূপ অনেক স্থলেও সংখ্যাবিশেষ বা কয়েক সংখ্যার সমবায় বিশেষ সুফল বা কুফলজনক বলিয়া স্থির করা হয়।

প্রথম ৯টী সংখ্যা সম্বন্ধেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সংস্কার আছে, তাহা এক এক করিয়া বলা যাইতেছে।

১ (এক)—অদ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া পবিত্র। যবদ্বীপবাসীরা ১ সংখ্যাকে অতি সৌভাগ্যজনক বলিয়া গণনা করে। ইহারা কৃষি সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য এক একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। শস্যসংগ্রহকালে এক দিনে যত শস্য কাটিতে পারে, তাহা গ্রহণ করে; অবশিষ্ট শস্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

২ (দুই)—প্রাচীন খ্রীষ্টানেরা এই সংখ্যাকে অতি কুলক্ষণজনক মনে করিতেন, কারণ বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বর দ্বিতীয় দিনে নরকের সৃষ্টি করেন। অনেক ইংরাজ বংশ এই সংখ্যাকে অশুভজনক মনে করিতেন। ২য় হারল্ড যুদ্ধে নিহত হন, ২য় উইলিয়ম ও ২য় এডওয়ার্ড ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারান। ২য় এথেল্‌রেড, ২য় রিচার্ড, ২য় জেম্‌স সিংহাসন পরিত্যাগে বাধ্য হন। ২য় হেন্‌রী, ২য় চার্লস, ২য় জর্জ অনেক প্রকারে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হন। ইউরোপের অন্যান্য রাজাদের মধ্যেও এই সংখ্যার কুফল ফলিয়াছে। ফ্রান্স, নাভার, স্পেন, আঁজো এবং সেবয়ের ২য় চার্লস, ইহাঁদের সকলেরই পরিণাম মন্দ।

৩ (তিন)—এই সংখ্যা সম্বন্ধে লোকের অদ্ভুত বিশ্বাস দেখা যায়। পিথাগোরাস-নামক প্রাচীন পণ্ডিতের মতে ইহা পূর্ণ সংখ্যা, ইহা আদি, মধ্য ও অন্তবোধক। খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, হিন্দুদের ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত ও অনুষ্ঠানের সহিত এই সংখ্যার যোগ আছে। ত্রিপত্র বলিয়া বিল্বপত্রের সম্মান। স্বস্তি ও শান্তিবাচন প্রভৃতি ৩ বার করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৪ (চারি)—চতুর্ব্বেদ বলিয়া ৪ সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে পবিত্র। ৪ পাতাওয়ালা দূর্ব্বা কোন কোন জাতিমধ্যে বিশেষ সুলক্ষণসূচক।

৫ (পাঁচ)—হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচের

যথেষ্ট সম্মান আছে। পঞ্চ কন্যা, পঞ্চ যজ্ঞ, পঞ্চ পুণ্যশ্লোক, পঞ্চামৃত প্রভৃতি কথা প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের দিবসে ৫ বার নমাজের বিধি আছে।

৬ (ছয়)—রোমে ৬ সংখ্যা দুর্ভাগ্য সূচক। রোমের ৬ষ্ঠ রাজা সার্ব্বিয়স্ টলিয়সের মৃত্যু শোচনীয়। পোপ ৬ষ্ঠ অর্ব্বাণের সময় খ্রীষ্টান সমাজ বিভক্ত হয়। ৬ষ্ঠ আলেকজেণ্ডার অতি দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ষড়ৈশ্বর্য্য, ষড়রিপু, ষড়গুণ, ষড়দোষ প্রভৃতির গণনা প্রসিদ্ধ।

৭ (সাত)—এই সংখ্যার সহিত যত নিগূঢ় মতের যোগ আছে এত আর কোন সংখ্যায় দেখা যায় না। সপ্তলোক, সপ্তর্ষি, সপ্ত মাতা প্রভৃতি এ দেশে যেমন সাতের মহিমাসূচক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে সেইরূপ সাত দিনে জগতের সৃষ্টি বলিয়া সাতের বিশেষ মহিমা। ইহুদীদিগের মতে ৭টী ধর্ম্ম ও ৭টী পাপ। ইহুদীদের অনেক পর্ব্ব ৭ দিনব্যাপী। ইলাইসা প্রভৃতি ইহুদী ঋষি ৭ বার জর্ডনে স্নান করিতেন। যিশু বলিয়াছেন ৭ বার নয়—সপ্ত-সপ্ততি বার ক্ষমা করিতে হইবে। মন্দির ও দেবতা প্রভৃতিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম অনেক জাতির মধ্যে দেখা যায়। একজন প্রাচীন লেখকের মতে ৭ সংখ্যার ৪টী গুণ:—(১) ইহা অজাত এবং অন্য কাহারও উৎপাদক নয়; (২) ইহার মধ্যে সকল মিলন; (৩) ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ সংখ্যা-বাচক; (৪)—ইহা পূর্ণসংখ্যায় গঠিত এবং তদ্‌গুণসম্পন্ন।

কোরাণে সপ্ত স্বর্গের বর্ণনা আছে। প্রাচীন রুসীয়েরা কবরের উপর ৭ ধাপ-ওয়ালা সিড়ি গাঁথিত, মৃত ব্যক্তি ইহা দ্বারা ৭ ধাপে স্বর্গে উঠিবে। হিন্দু বিবাহে সপ্তপদী গমন না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। কন্যা ৭ পাক দিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করে।

৮ (আট)—অষ্ট ধাতুর অনেক গুণ। অষ্ট দিক্‌পাল আট দিক্ রক্ষা করেন। ঈশ্বরের অষ্টোত্তর শত নাম প্রশস্ত। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম অর্থাৎ আট অঙ্গ ভূমিতে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। শুভ কার্য্যে অষ্ট বসুধারা দিতে হয়।

৯। মধ্য যুগের খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকদের মতে ৯টী পৃথিবী, ৯টী স্বর্গ, ৯টী নরকের নদী, ৯ প্রকার স্বর্গের দূত।

স্কটলণ্ডবাসীদের মতে দুরন্ত গোরুকে জলের তরঙ্গে ৯বার ডুবাইলে সে শান্ত হয়। ৯টা হাঁড়িচাঁচা (Magpie) পক্ষী দর্শন কুলক্ষণ। ইংলণ্ডে কোন দাসী একটা শুঁটীতে ৯টা মটর পাইলে তাহা জানালার ধারে রাখিয়া দেয়। তাহার বিশ্বাস, যে তাহা প্রথম দর্শন করিবে, সেই তাহার বর হইবে। বিলাতের নিম্ন শ্রেণীর বিশ্বাস গমের ৯টা বীজ চারিপাতাওয়ালা দূর্ব্বার উপর রাখিলে পরীদর্শনে সমর্থ হওয়া যায়। হিন্দু জ্যোতিষে নবগ্রহের ফলাফল অনুসারে জীবের ভাগ্য নির্ণীত হয়। নবরাত্রি কীর্ত্তন বৈষ্ণবদের মতে মহা ফলপ্রদ।

গৃহকর্ম্ম।

কচি লাউয়ের পায়স।

কচি টাটকা লাউ	একটী,
ঘৃত	৵০ একছটাক,
খাঁটি গাভিদুগ্ধ	৵৪ চারি সের,
দোবরা চিনি	৵৷৷০ অর্দ্ধ সের
কিসমিস	৵০ একছটাক,
পেস্তা	ঐ
বাদাম	ঐ
ছোট এলাচ কর্পূর	সম্ভবমত।
লবণ	অল্প।

প্রস্তুত করিবার প্রকরণ।

লাউটির খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া পাত্রে রাখ। পরে একখানি পরিষ্কার ধারাল বঁটিতে ঐ খণ্ড গুলি খুব সরু সরু অথচ লম্বা লম্বা ধরণে কুটিয়া কিঞ্চিৎ লবণ মাখাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। তাহার পর ঐ সকল লাউ চূর্ণ খুব জোরে নিঙ্গড়াইয়া তাহা হইতে জলীয় ভাগ যত নির্গত হইয়া যায়, ততই ভাল। লবণ কেবল জল কাটাইবার জন্য অতি অল্প দিতে হয়, যেন তাহার আস্বাদ মাত্র না থাকে।

এদিকে জ্বালে পিতলের পরিষ্কার একখানি কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া পাকিয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল অলাবু-চূর্ণ ছাড়িয়া দিয়া খুন্তি দ্বারা নাড়িতে হয়। একটু বাদামি রঙ্গের মত ভাজা হইলে তাহা নামাইয়া পাত্রে রাখ। পরে জ্বালে দুধ চড়াইয়া ফুটিয়া আসিলে যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিল, সেই সময় ঐ লাউ-চূর্ণ তাহাতে দিয়া অল্পক্ষণ পরে চিনি এবং তাহার পরেই ঐ সকল উপকরণ (কর্পূর ভিন্ন) তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতেছে, সেই সময় তাহাতে কর্পূর এবং ছোট এলাচ চূর্ণ গন্ধ দ্রব্য দিয়া নামাইয়া লও। এই প্রকারে অলাবুর পরমান্ন প্রস্তুত হয়। অল্প উষ্ণ খাইলে ইহা উপাদেয় দ্রব্য।—দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন গত ১০ই ডিসেম্বর সদল কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

২। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় কলেজের ইতিহাসাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বোষ্টন নগরের পশুশালায় সিংহের গৃহে আমেরিকার এক বরকন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে!!

৪। বিলাতের বারিষ্টারী পরীক্ষায় এবার ২৫ জন ভারতবাসী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। বর্দ্ধমানের রাজা শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ কুমার বিজয়চন্দ্র মহাতাপ বাহাদুরের শুভ বিবাহ রাজধানীতেই সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ইনি লাহোরের এক বিখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশের কন্যা।

৬। সুচুথোবী নাম্নী দ্বাদশবর্ষীয়া এক হিন্দুস্থানী বালিকা উত্তর পশ্চিম হইতে মান্দ্রাজে পীড়িতা মাতাকে দেখিতে যায়। তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া তাহার এত আনন্দোচ্ছ্বাস হয় যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে!!!

৭। আমেরিকার জর্জ এম পুলম্যান নামক এক ধনাঢ্য মহাত্মার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ৭৬ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধকোটী টাকা নানা প্রকার সাধারণহিতকর কার্য্যে দিয়া গিয়াছেন; অথচ আপনার পুত্রেরা তত উপযুক্ত নয় বলিয়া তাহাদিগকে ধনের অল্পাংশ দিয়াছেন।

৮। মেং বি এল গুপ্তের মধ্যমা কন্যা চারুলতা লণ্ডন সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি ১০০ সংখ্যার মধ্যে ৯৩ পাইয়াছেন।

৯। এ বৎসর বিসুবিয়স পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছে।

১০। লেডী ডফরিণ ফণ্ড হইতে অন্যূন ৮০টী দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলা ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মেডিকাল স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছেন।

১১। গতবর্ষে বঙ্গদেশের জমীদারেরা নানাপ্রকার দাতব্য কার্য্যে ১১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। ছোট লাট সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকাঞ্জী স্বীয় পদ পুনর্গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতিনিধি সি, সি, ষ্টিবেন্‌স সাহেব বড় লাটের কৌন্‌সিলের অতিরিক্ত সভ্য হইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিলাত যাইবেন।

১৩। গত ৪ঠা ডিসেম্বর গ্রীশ ও তুরস্কের সন্ধিপত্র কনষ্টাণ্টিনোপলে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বামারচনা।

সারা দিন চেয়ে থাকি।

সারাদিন পথ পানে
শুধু চেয়ে থাকি;
ক্ষীণদৃষ্টি হীন-তারা
সদাই আপন-হারা,
ক্ষণমাত্র রুদ্ধ নহে অশ্রুভরা আঁখি,
নিশি দিন শুধু আমি পথ চেয়ে থাকি।

শুনেছি বিশ্বের মাঝে
হয়ে আছ লীন,
দিবা নিশি ঊর্দ্ধে বসি,
বরষিছ স্নেহরাশি,
তবুও করুণা তব যাচি দীন হীন,
পথে রাখি আঁখি তোমা ডাকি সারাদিন।

হে প্রভু তোমার প্রেম
প্রতি মুখে সাজে;
রবির প্রতিভাননে
কোমল চাঁদ-বদনে
তারকা কনকমুখে নীলিমার মাঝে,
তোমার মহিমা দেব সর্ব্বত্রই রাজে।
প্রকৃতি-পরাণ মাঝে
তোমার নিবাস,
কুসুমে সৌরভ হও,
পবিত্রতা আনি দাও
মানবের তপ্ত প্রাণে ছড়ায়ে সুবাস,
তবে কেন মম হৃদে জাগেগো নিরাশ?
তুমি ত রয়েছ পিতা
সকল আলয়ে,
মায়ের স্নেহের বুকে
কত প্রেম কত সুখে
জীবের জীবন সদা রাখ বাঁচাইয়ে;
দেখে শুনে তবু আছি পথ নিরখিয়ে।
তোমার মঙ্গল ছায়া
জীবনে জীবনে,
যৌবন ঊষার কালে
পতি পত্নী দোঁহে মিলে
লভে তব প্রেমকণা বিবাহ-বন্ধনে,
সদাই বিরাজ প্রভু জাগ্রত স্বপনে।
তোমার সুন্দর ছবি
প্রতি মুখে ভাসে,
শিশুর অধরপুটে
স্বরগের জ্যোতি ফুটে
অতুল সৌন্দর্য্য শোভা ধরায় বিকাশে,
পূর্ণ তুমি আছ দেব প্রত্যেক নিঃশ্বাসে।
তুমিত রয়েছ কাছে
দৃষ্টি নাহি হয়;
আকুল বিষণ্ণমনে
সুধাই জগতজনে
"কোথায় কোথায় পিতা বল গো আমায়?"
সারাদিন কাঁদি কাটি তব প্রতীক্ষায়,
কোথায় কোথায় পিতা আছহে কোথায়?
মুক্ত কর দৃষ্টি স্থূল হেরিগো তোমায়,

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
শাহারণপুর।

সে যে ঠাকু'মার।

সে যে ঠাকু'মার
অঞ্চলের কোটি নিধি,
মরতে দেছেন বিধি,
শুনাইতে ঠাকু'মারে তাঁর সমাচার;
তার সে বিমল হাসে
ঠাকু'মার প্রাণ ভাসে,
সুখ, সাধ, সবি আসে পরাণে তাঁহার।

সে যে ঠাকু'মার
প্রভাতে কনক রবি,
সন্ধ্যার সুন্দর ছবি,
শারদ গগনে যেন আলো চাঁদিমার;
দেব-শিশু সুকুমার,
এসেছে গৃহেতে তাঁর,
এই কথা প্রাণে তাঁর জাগে অনিবার।

সে যে ঠাকু'মার
লইয়াছে সন্ধ্যা, স্মৃতি,
লইয়াছে স্নেহ, প্রীতি,
লইয়াছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা যা ছিল তাঁহার ;
কোটি চুমো লয় নিতি,
তবুত না হয় তৃপ্তি,
তবুত দুরন্তপনা, তবু আবদার !
সে যে ঠাকু'মার ;
দুদণ্ড বিহনে তার,
জীবন ধারণ ভার,
তা বিনে চলে না যেন তাঁহার সংসার।
তা বিনে জগৎ শূন্য,
সে করে কামনা পূর্ণ,
তাই নাম "জগবন্ধু" রেখেছেন তার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
তোর ওই শোভারাশি,
তোর ও অমিয় হাসি,
হেরিলে উথলে মোর হৃদি পারাবার ,
শুধুই আমারি কেন,
এ বিশ্ব-সংসার যেন
তোমারে হেরিলে লভে আনন্দ অপার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু
তুমি নাই ঘরে যার,
শূন্যময় ত্রিসংসার,
অপূর্ণ, বিষাদ-ভরা হৃদি খানি তার ;
এ জগতে কি যে তুমি,
বর্ণিতে অক্ষম আমি,
সে অমর শক্তি নাই মোর কবিতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
সুন্দর কুসুমরাশি,
সে সৌন্দর্য্যে যায় ভাসি,
সে ওরে তোমার কাছে মাগি লয় হা'র ;
সে ওরে পড়িছে ঝরে,
সরমে সলাজে মরে,
পবিত্র সুন্দর শিশু সৃষ্টি বিধাতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
নাম তব "জগবন্ধু"
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
এই সদা মনে রেখ হৃদয়ে তোমার ;
কাজ কর নাম মতে,
সুযশ লভ জগতে,
তোর লাগি এই ভিক্ষা পায় বিধাতার।

আশীর্ব্বাদিকা শ্রীমতী রেবা রায়,
কটক।

শোকোচ্ছ্বাস।

(মা অন্নপূর্ণা)

কত খেলা খেলেছিলে আসি ধরাতল,
সে সব স্মরিয়া জ্বলে উঠে শোকানল।
কখন কাঁদিতে বসি, কভু মুখে মৃদুহাসি,
ত্যজিয়া এ দুখরাশি করিলে গমন।
পীড়িত স্বামী যে তোর করিছে রোদন॥
বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে অনায়াসে চলে গেলে
ধূলায় লুণ্ঠিত তব বসন ভূষণ ;
কেবা তাহা তুলে রাখে করিয়া যতন।
সব জ্বালা পরিহরি, গিয়াছ অমরপুরী,
দীক্ষিতা হইয়া গেলে অমর সদন॥
শাঁখাশাড়ী রত্ন জ্বলে, সিন্দুর পরিয়া ভালে,
তুমি নাই ঘরে যার,
শূন্যময় ত্রিসংসার,
অপূর্ণ, বিষাদ-ভরা হৃদি খানি তার ;
এ জগতে কি যে তুমি,
বর্ণিতে অক্ষম আমি,
সে অমর শক্তি নাই মোর কবিতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
সুন্দর কুসুমরাশি,
সে সৌন্দর্য্যে যায় ভাসি,
সে ওরে তোমার কাছে মাগি লয় হা'র ;
সে ওরে পড়িছে ঝরে,
সরমে সলাজে মরে,
পবিত্র সুন্দর শিশু সৃষ্টি বিধাতার।
ওরে ক্ষুদ্র শিশু !
নাম তব "জগবন্ধু"
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
এই সদা মনে রেখ হৃদয়ে তোমার ;
কাজ কর নাম মতে,
সুযশ লভ জগতে,
তোর লাগি এই ভিক্ষা পায় বিধাতার।

আশীর্ব্বাদিকা শ্রীমতী রেবা রায়,
কটক।

শোকোচ্ছ্বাস।

(মা অন্নপূর্ণা)

কত খেলা খেলেছিলে আসি ধরাতল,
সে সব স্মরিয়া জ্বলে উঠে শোকানল।
কখন কাঁদিতে বসি, কভু মুখে মৃদুহাসি,
ত্যজিয়া এ দুখরাশি করিলে গমন।
পীড়িত স্বামী যে তোর করিছে রোদন॥
বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ফেলে অনায়াসে চলে গেলে
ধূলায় লুণ্ঠিত তব বসন ভূষণ ;
কেবা তাহা তুলে রাখে করিয়া যতন।
সব জ্বালা পরিহরি, গিয়াছ অমরপুরী,
দীক্ষিতা হইয়া গেলে অমর সদন॥
শাঁখাশাড়ী রত্ন জ্বলে, সিন্দুর পরিয়া ভালে,

চন্দনের ছড়া পড়ে সুগন্ধি কুসুম,
অকালে পুষ্পটী ছিঁড়ে নিয়া গেল যম॥
কে হেন সাবিত্রী আছে, তুলনা তোমার কাছে ?
নারীকুলে শিক্ষা দিয়া ছাড়ি আত্মজন,
অন্নপূর্ণা গিয়াছ কি কৈলাস ভুবন ?
তব মুখ মনে হলে ঝরে দু নয়ন,
কাকে দেব তোর সব ভাবি অনুক্ষণ।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

"হতাশ।"

হায় বিধি কি করিলে এত আশা কেন দিলে ?
আশায় ভুলায়ে কেন রাখিলে আমায়।
এ ধনে কে চেয়েছিল এ প্রার্থনা কে করিল ?
একবার দেখাইয়ে লুকালে কোথায় ?
নাহি পাব যে রতনে লোভ দিলে কেন মনে,
হৃদয়ে হানিয়া শেল লইলে কাড়িয়া ?
সে দিনের কথা যেন দেখিতেছি প্রতিক্ষণ,
সে কথা স্মরিলে প্রাণ যায় যে ফাটিয়া॥
এমন করিবে বিধি জানিতাম আগে যদি,
দেখিতাম দিবানিশি সে চাঁদ বদন।
দারুণ শোকেতে হায় ! পরাণ পাগলপ্রায়,
বিষাদ-সাগরে ডুবে আছি অনুক্ষণ॥
পরাণের যত আশা যত আকিঞ্চন তৃষা,
আর কভু উঠিবে না হৃদয়েতে মোর।
যা'হ'বার হয়ে গেছে স্মৃতিটুকু পড়ে আছে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর॥
কেন এত আশ্বাসিয়ে আশানল জ্বালাইয়ে,
অকালে সে আশাদীপ করিলে নির্ব্বাণ।
আর কি-হে পাইব না, এ জনমে দেখিব না
আবার কি পাব দেখা স্নেহভরা ধন ?
ওহে হরি দয়াময় ! দাও মোরে পদাশ্রয়,
সকাতরে ডাকিতেছি আমি হে তোমারে।
দুঃখিনী তনয়া বলে, পায়ে ঠেলে অবহেলে
জ্বলন্ত অঙ্গারে ফেলে দিও না আমারে॥
যে জ্বালাতে প্রাণ জ্বলে, তাহাতো নিভে না জলে,
নিভিবে না এ যাতনা থাকিতে জীবন।
যত সাধ মনে ছিল, সবত এবে মিটিল,
এখন তোমার আমি চাই শ্রীচরণ॥
কাতর অন্তরে বলি দাও মোরে পদধূলি,
কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা মম হো'ক উপশম।
অন্তরেতে শোকানল, দাহ করে হৃদিস্থল,
পিঞ্জরেতে বদ্ধ আমি বিহঙ্গিনী সম॥
একবার মনে হয় যেখানে দু চোক যায়
ছুটিয়া চলিয়া যাই শান্তি যদি পাই।
যথা নাহি ভালবাসা, নাহি সংসারের আশা
এমন সুখের ঠাঁই কোথাও কি নাই ?
মনের বাসনা যত, একে একে হল গত,
এখন পড়েছি আমি অগাধ তিমিরে।
চারিদিক হোতে যেন, ঝড় বহে সন্ সন্,
নিরাশার মেঘ আসি ঘিরেছে আমারে॥
হেন আশা দেখাইয়ে, এমায়ায় ভুলাইয়ে
উন্মাদের প্রায় মোরে কোরোনা হে হরি॥
মিছামিছি দিয়া ধন কাঁদাও না আর প্রাণ
তোমার চরণে আমি এ প্রার্থনা করি।

ভগ্নপ্রাণা কুমকুম কুমারী।

দিনমণির প্রতি নলিনীর উক্তি।

কে তুমি সোণার থালা পূরবগগনে
উদিতেছ ধীরে ধীরে পুলকিত মনে,
গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় রক্তিম আকার?
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।১

শৈলেন্দ্রশিখর হতে হইয়া স্খলিত,
অথবা উদয়াচল হইতে প্রেরিত—
মন্দ মন্দ ঊর্দ্ধ দিকে করিছ বিহার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।২

মধ্যাহ্নসময়ে আস যথা কেন্দ্রস্থল
মাধ্যাহ্নিক তেজঃপুঞ্জ প্রচণ্ড প্রবল;
কেন্দ্রস্থল হতে আহা, চলিলা আবার
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৩

একি! পুনঃ নিম্নগতি হেন ভাবান্তর—
প্রখর কিরণ তব এবে ক্ষীণতর;
পশ্চিম গগন পানে গতি অনিবার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৪

আহা কিবা মনোহর ধরেছ মূরতি,
হাসিছে তোমায় হেরি মধুর প্রকৃতি,
আহা কি রূপের ছটা প্রাণি-প্রীতিকর!
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৫

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নকাল; সোণার কিরণে
হাসিছে বিটপিদল প্রফুল্ল বদনে,
খেলিতেছে ঊর্ম্মিমালা উল্লাস অপার—
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৬

খেলিছ তরঙ্গ সনে ভাসায়ে কিরণ,
কি খুজিছ বারিগর্ভে হইয়া মগন?
কে সেজেছ নানারঙ্গে বিবিধ প্রকার!
আর কেহ নও তুমি প্রাণেশ আমার।৭

মন্দ মন্দ কোথা যাও ত্যজি অসময়,
অন্তরে তোমায় হেরি অন্তরেতে ভয়।
তুমিতো আমার নাথ ওহে দিনমণি,
আমিও তোমার প্রিয়া বিকচ নলিনী।৮

কিরণময়ী দেবী।

প্রাণের দেবতা।

কি তুমি বুঝি না আমি তবু বার বার
সাধ হয়, ওই পদে থাকি লুটাইয়া;
সহস্র আঘাতে যবে ভাঙ্গিবে এ বুক,
দেখি যেন ওই মুখে অজস্র অমিয়া।
তুমি কি দেবতা মোর? প্রাণের ঈশ্বর
অথবা উষার আলো ত্রিদিবের জ্যোতি,
ফুলের সুবাস কিংবা অমৃতের ধার
কি তুমি বুঝিতে মোর নাহিক শকতি!

আকাশে হীরক-কণা, নক্ষত্রের প্রায়
কে তুমি ঢালিলে আলো আঁধার হৃদয়ে,
নীরব কমলদলে ভ্রমরের মত
কেন দেও শত সুধা আননে ঢালিয়ে?
যেখানে থাক না কেন হৃদয়-আধার!
আমার হৃদয়ে তুমি চির সমুজ্জ্বল
যত দিন মৃত্তিকাতে এ মাটি না মিশে,
ভাসিবে মানস-সরে শ্বেত শতদল।

কুসুমকুমারী দেবী।

No. 396 January, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৬ সংখ্যা। } পৌষ ১৩০৪—জানুয়ারী, ১৮৯৮। { ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গের ছোট লাট—সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জী সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গের ছোট লাটের পদ পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন। লেডী মেকেঞ্জী আগামী মার্চ্চ মাসে আসিবেন।

রাজদর্শন—মর্ব্বির ঠাকুর মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া রাজপরিবারের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। তিনি রাজ্ঞী কর্ত্তৃক কে সি আই ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

সুন্দর নিয়ম—নরওয়েতে এক আইন আছে যে, কোনও ব্যক্তি ৩টী চারা গাছ রোপণ না করিয়া সেই জাতীয় একটী বৃক্ষ ছেদন করিতে পারিবে না।

চিন-জর্ম্মণ বিগ্রহ—চিনেরা ২ জন জর্ম্মণ পাদ্রীকে হত্যা করাতে এক জর্ম্মণ রণতরী কিয়াওচ নামক স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে। জর্ম্মণ সম্রাট্ যে ক্ষতিপূরণ চান, চিন সম্রাট্ তাহা দিতে অস্বীকৃত। যুদ্ধের সম্ভাবনা।

ভারত অতিথি—ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবরীর মাতা ক্লিবলণ্ডের ডচেস আর একটী সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন।

কুচবিহারের সম্মাননা—গত ১৭ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউন হলে কুচবিহার মহারাজার অভ্যর্থনার্থ এক সায়ংসমিতি হইয়াছিল, তাহাতে অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হন।

গুণের পুরস্কার—ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক জগতে যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে বঙ্গদেশীয়

গবর্ণমেণ্ট উহাঁর জন্য মাসিক ২০০ টাকা অতিরিক্ত বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন।

সূর্য্যগ্রহণ—আগামী ২২এ জানুয়ারী প্রাতঃকালে ৮টার সময় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইবে।

জাপানের সৈনিক ব্যবস্থা—জাপানের ব্যবস্থানুসারে ১৭ হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষকে সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম আছে।

মৃত্যু—আমরা শোকার্ত্ত-হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মনোনীত সভাপতি এবং সমাজ-সংস্কারক ও নারীজাতির উন্নতি সংসাধক দলের অন্যতম অগ্রণী বাবু দুর্গামোহন দাস গত ৪ঠা পৌষ পরলোকগত হইয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে বঙ্গমাতা একটী কৃতী পুত্র হারাইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, বারিষ্টার, উকীল সকলে একত্র হইয়া ইহাঁর জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি যেমন একজন উপার্জ্জনশীল উকীল ছিলেন, সেইরূপ দেশহিতকর অনেক কার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। ইনি যে উইল করিয়াছেন তাহাতে বিবিধ সৎকার্য্যে অনেক অর্থ দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বামাবোধিনীর লেখক ও লেখিকা যশোহরনিবাসী উকীল বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভগিনী কুমুদিনী রায় এই উভয়েরও অকাল মৃত্যু সংবাদে আমরা শোকার্ত্ত হইয়াছি। ঈশ্বর পরলোকগত আত্মাদিগের শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

প্রকৃত স্ত্রী।

জগতে কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেরই এক একটী দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব যদি যথোচিত কর্ত্তব্যাচরণ করিত, তাহা হইলে সংসার কত সুখের হইত! নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য না করায় সুখময় সংসার দুঃখময় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। দায়িত্বানুসারে সকল কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করা দূরের কথা, আমাদের উপর যে এক একটী গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, আমরা তাহা স্মরণও করি না। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যই সুখ দুঃখের ভিত্তি স্বরূপ। অতএব নিজ কর্ত্তব্যানুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে সংসার যে দুঃখময় হইবে—"এ পাপ জীবনের অবসান কত দিনে হইবে" বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সংসারে আমাদের এক এক জন নারীর হস্তে আমাদের স্বস্ব পতির জীবনের ভার অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহাকে সুখী করা ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মঙ্গল সাধন করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে আর একটী

জীবনের ভার লওয়া কি কম দায়িত্ব? আর এক জনের সুখ শান্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া চলা কি সহজ কার্য্য? কিন্তু সে কার্য্য সহজই হউক, আর দুরূহই হউক, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং স্বামীর সুখের পথে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু হায়! আমরা এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি কি? নিশ্চয়ই পারি না। পারি না বলিয়াই সংসারকে দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। যদি আমরা নিজ কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে সংসারেই স্বর্গ-সুখ লাভ করিতাম। যদি আমরা নিজ দায়িত্বানুসারে কার্য্য করিতে পারিতাম, তাহাহইলে আমরা (স্ত্রীজাতি) প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারিতাম। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী-জীবনে অধিকতর সুখ আর কি আছে? কিন্তু হায়! আমরা সে সুখের পবিত্র পথ অন্বেষণ করিতে যত্ন করি কই? সে সুখের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে শ্রম যত্ন চেষ্টা সতর্কতা ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্য গুলি আবশ্যক। কিন্তু আমরা এই দ্রব্য কয়টী ব্যয় করিতে সক্ষম হই কি? "না সহিলে ক্লেশ কোথা মিলেরে রতন" আমরা কি একবার একথা স্মরণ করিয়া থাকি? সতত আমরা যে সুখকে সুখ মনে করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে তাহা অসুখ ও অশান্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের সুখের প্রথম পথ বিবাহ, দ্বিতীয় পথ স্বামী ও স্ত্রীর নিজ দায়িত্বানুসারে কার্য্য করা।

বিবাহ জীবনের প্রধান মহোৎসব। এই মহোৎসবে স্বামী ও স্ত্রীর হৃদয় আনন্দ সলিলে ভাসমান হয়। কিন্তু আমরা যে মহোৎসবকে সুখের সোপান ভাবিয়া তাহাতে আরোহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই, সেই মহোৎসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে হৃদয় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত হয়। যাঁহারা এই মহোৎসবের গুরুত্ব বুঝিয়া যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য ও সুখী। বিবাহের পর মুহূর্ত্ত হইতেই মানব জীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজন অবলা রমণীর উপর একজন যুবকের সুখ শান্তি আশা ভরসা অর্থাৎ জীবনের সমস্ত নির্ভর, ইহা কি কথার কথা? যাহাতে স্বামীর সংসার সুশৃঙ্খল থাকে, যাহাতে তিনি সর্ব্বদা সুখ শান্তি লাভ করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহার জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ লাভ করিতে পারে, স্ত্রীর পক্ষে তাহা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রমণী এই দুরূহ কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী। যে রমণী এই সকল কর্ত্তব্যাচরণে পরাঙ্মুখ, ঈশ্বর বা অগ্নি সাক্ষী করিয়া—ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদ মন্ত্র পড়াইয়া স্বামীকে গ্রহণ করিলেও আমরা তাঁহাকে প্রকৃত স্ত্রী বলিতে বাধ্য নহি। প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়। হয় ত অনেক পাঠিকা ভগিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন "স্বামীকে ভালবাসে না, এরূপ রমণী জগতে অতি অল্পই আছেন।" কিন্তু

প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, স্বামীকে ভালবাসেন এরূপ রমণীই জগতে অতি দুর্লভ। স্বামীকে ভালবাসিতে হইলে নিজের স্বার্থ বলি দিতে হয়, কিন্তু হায়! এই স্বার্থপর জগতে কয় জন রমণী নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে চাও, তাহা হইলে যে কার্য্যে তুমি সুখী হও, সে কার্য্য যদ্রি তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র বিরক্তিকর হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিও। তিনি যাহা খাইতে ভাল বাসেন,তাহা খাওয়াইও, তিনি যাহা দেখিতে ভালবাসেন তাহা দেখাইও। মূল কথা সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মনোরঞ্জন করিও। যদি স্বামীকে ভালবাসিবে—প্রকৃত স্ত্রী হইবে, তবে নিজের সুখ দুঃখের দিকে আদৌ লক্ষ্য করিও না। তোমার সুখ দুঃখের জন্য তোমার স্বামী দায়ী, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যাচরণ করিবেন, অতএব সে দিকে তোমার লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন কি? তুমি কেবল প্রকৃত স্ত্রী হইবার জন্য নিজের কর্ত্তব্যাচরণ করিয়া যাও। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী যেমন এক এক জনকে এক একটী আত্মীয় বলিয়া ভালবাসা যায়, স্বামীকেও তেমনি এক জন আত্মীয় ভাবিয়া সচরাচর রমণীগণ স্বামীকে ভাল বাসিয়া থাকেন। সচরাচর আত্মীয়দিগের সহিত তুল্য করিয়া স্বামীকে যে ভালবাসা যায়, সে ভালবাসাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যইেতে পারে না এবং স্বামীকে সেরূপ ভালবাসা অর্পণ করিয়া স্ত্রী কখনই প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারেন না। যে স্ত্রী স্বামীকে "সর্ব্বস্ব" বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছেন, "স্বামী ব্যতীত এ জগতে আমার অন্য আত্মীয় নাই" ভাবিতে পারিয়াছেন, যে স্ত্রী নিজের স্বার্থ বলি দিয়া নিজের সুখান্বেষণে বিরত হইয়া স্বামীর সুখ শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত স্ত্রী হইতে হইলে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়। স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটী সম্বন্ধ। কোন্ সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর কোন্ প্রকার ভালবাসার অধিকারী এখন তাহাই বলিব। সম্মানের সহিত হৃদয়ে যে ভালবাসা জন্মে, তাহার নাম ভক্তি। সমতুল্য ব্যক্তির প্রতি যে ভালবাসা জন্মে, তাহার নাম প্রণয়। এইরূপ আমরা অনেক প্রকার ভালবাসা দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রীতি, প্রেম, প্রণয় ও ভক্তি এই চারিটী ভালবাসাকে আমরা প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি।

কি পুরুষ কি রমণী, সকলেই এই ভালবাসা এক এক জনকে এক একটী অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বামীর সহিত স্ত্রীর চারিটী সম্বন্ধবশতঃ স্বামী একাই স্ত্রীর নিকট হইতে চারিটী ভালবাসার অধিকারী। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশাংশি-সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী সম্বন্ধ; তৃতীয়তঃ সখা সম্বন্ধ, চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। অংশাংশি অর্থাৎ শ্রম লাঘব করিবার জন্য যিনি কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য করেন,

তিনি অংশী। স্বামীর সহিত স্ত্রীর বাটনা বাটা, কুটনা কোটা ইত্যাদি কার্য্যের বিভাগ নহে। যে সকল কার্য্যের বিভাগ বশতঃ স্বামীর সহিত স্ত্রীর অংশি-সম্বন্ধ, সে সকল কার্য্য দুরূহ অর্থাৎ যশ মান ধন জ্ঞান সুখ শান্তি ধর্ম্ম—স্বামী এই সকল কার্য্যেরই অংশিদার। যাহাতে সুখ শান্তি সন্তোষ উপার্জ্জন হয়, সে কার্য্য তুমি করিলে, যশ মান ধন জ্ঞান ধর্ম্ম—তোমার স্বামী উপার্জ্জন করিলেন; তোমার স্বোপার্জ্জিত সুখ শান্তি সন্তোষের অংশ স্বামীকে অর্পণ করিলে, তিনি তোমাকে তাঁহার উপার্জ্জিত যশমান ধন জ্ঞান ও ধর্ম্মের অংশ দান করিলেন, সুতরাং স্বামীর সহিত তোমার (স্ত্রীর) অংশি-সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর প্রীতির অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ সন্তানোৎপাদনের জন্য স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নামই স্ত্রী-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর প্রেমের অধিকারী। তৃতীয়তঃ সখা-সম্বন্ধ। মঙ্গলের জন্য যিনি সৎ পরামর্শ দান করেন, মানব যাঁহার নিকট হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দুঃখের কথা সুখের কথা কহিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে, তিনিই সখা। স্বামী স্ত্রীতে এই ভাবটুকু বিরাজিত থাকে, সুতরাং স্ত্রীর স্বামীর সহিত সখা সম্বন্ধ। চতুর্থতঃ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ অতি গুরুতর। এই সম্বন্ধ শুধু ইহ লোকের জন্য নহে, পরলোকেও এই সম্বন্ধ অক্ষয় হইয়া থাকে। মানব জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে মৃত্যুই গুরুতর পরিবর্ত্তন বলিয়া লক্ষিত হয়। অন্য সম্বন্ধ তিনটী ইহ জীবনের সহিত শেষ হয়—মৃত্যুর পর অনন্তে বিলীন হয়। কিন্তু শেষোক্ত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধটী মৃত্যুতে শেষ হয় না। এ সম্বন্ধ অনন্ত কালের জন্য। স্বামী স্ত্রীর প্রাণে প্রাণে ও আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা জন্মে, সেই ভালবাসার নামই আধ্যাত্মিক ভালবাসা বা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই পবিত্র সম্বন্ধের অভাব, তাঁহারা প্রকৃত স্বামী স্ত্রী নহেন। "স্বামী একটী স্বতন্ত্র জীব ও আমি একটী স্বতন্ত্র জীব" যত দিন স্ত্রীর হৃদয় হইতে এই ধারণা অন্তর্হিত না হয়, ততদিন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের অভাব থাকে এবং ততদিন স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্য নহেন। যখন স্ত্রী বুঝিতে পারিবেন স্বামীর আত্মার সহিত আমার আত্মা অভিন্ন, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উদয় হইয়াছে এবং এই সম্বন্ধ উদয় হইলে স্ত্রী প্রকৃত স্ত্রী নামের যোগ্য হন। দেহের নাশ আছে, কিন্তু আত্মার নাশ নাই, সুতরাং আত্মায় আত্মায় ভালবাসার জন্য যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উদয় হয়, তাহা অনন্ত কালের জন্য অক্ষয় হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এই সম্বন্ধের জন্য স্বামী স্ত্রীর পূজনীয় দেবতা স্বরূপ ও ভক্তির অধিকারী। যে স্ত্রী স্বামীর সহিত এই পবিত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্যা—

তিনিই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চ। রমণীকুল-শিরোমণি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ইত্যাদি রমণীগণ প্রকৃত স্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া আজও তাঁহাদের নাম জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভগিনীগণ! ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা? তাই বলি প্রকৃত স্ত্রীর আসন অতি উচ্চ। আইস ভগিনীগণ! আমরা সেই আসনে স্থান লাভের চেষ্টা করি। প্রকৃত স্ত্রী হওয়া অপেক্ষা রমণী-জীবনে উচ্চতর সুখ নাই—রমণীর এ সুখ অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এই পবিত্র সুখটুকু লাভের জন্য যে শ্রম চেষ্টা যত্ন সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন, আইস ভগিনীগণ! নিজ নিজ স্বার্থ বলি দিয়া সেই টুকু শিখিতে চেষ্টা করি। প্রকৃত স্ত্রী হইয়া আর্য্য মহিলাগণ চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; আমরা যদি প্রকৃত স্ত্রী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও ধন্যা ও কৃতার্থা হইব।

ধর্ম্ম নীচগামী।*

ধর্ম্ম নীচগামী বলিয়া কোনও পুরাণে নাই। তবে কাব্য অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতরে আছে। আর শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ধর্ম্মং মহাপুরুষ! পাসি যুগানুবৃত্তম্।
ছন্নঃ কলৌ যদভব স্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥"

এই প্রমাণে কোন কোন পণ্ডিত ধর্ম্মকে—কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়া টানাটানি করেন। তা যাহাই হউক, কিছু কম ৪০০ শত বৎসর হইল মেদিনীপুরস্থ "দৌর" পরগণার মধ্যে জনার্দ্দন নামক জনৈক উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উপযুক্ত কালে তাঁহার পত্নীর গর্ভে সন্তান সন্ততি না হওয়াতে ব্রাহ্মণ সেই মনস্তাপে এই কলিকালে কোন্ দেবতার উপাসনা করিলে পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে, কোন এক অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অধ্যাপক মহাশয় তদনুসারে ব্রাহ্মণকে বলেন;—

"ধর্ম্ম চারিযুগ বর্ত্তমান। কিন্তু যুগে যুগে এক এক পাদ ক্ষয় হইয়া এক্ষণে এক পাদ ধর্ম্ম ছন্ন ভাবে সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। বস্তুতঃ তিনি মনুষ্য-চক্ষের অগোচর। সেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক তেজোময় ধর্ম্মের আরাধনা করিলে অবশ্যই তোমার কামনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু সাকার মূর্ত্তি পূজা ব্যতিরেকে বৈষয়িক বা ঐহিক কামনা পূর্ণ হইবার নহে। সাকার মূর্ত্তিতে ধর্ম্মের পূজা

* কোনও সাহিত্য সভার প্রশ্নমতে ধর্ম্ম যে কারণবশতঃ নীচগামী, তাহার কথা।

করিতে হইলে গণ্ডকী-নদী-জাত, ভূত-ভাবন ভগবানের যেরূপ শালগ্রাম শিলা মূর্ত্তি আছে, সেইরূপ খণ্ড প্রস্তরে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য।"

বিপ্রবর অধ্যাপক মহাশয়ের এইরূপ ব্যবস্থা ও উপদেশ লাভে অত্যন্ত প্রীত হইয়া একটী খণ্ড প্রস্তরে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীধর্ম্ম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত একমনে এক ধ্যানে প্রতিদিন তাঁহারই সেবা ও পূজায় রত হইলেন।

কিছু দিন পরেই দৈববলে বা শ্রীধর্ম্মের অনুগ্রহে তাঁহার পত্নীর গর্ভে এক এক বৎসরান্তর ৪টী পুত্র হয়। ব্রাহ্মণ পুত্র-মুখ সন্দর্শনে যারপর নাই আনন্দিত হইয়া আদরে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামাই, মধ্যমের নাম লীলাই, তৃতীয়ের নাম সেতাই, ও চতুর্থ পুত্রের নাম কংসাই রাখিলেন।

রামাইয়ের বয়স যখন ৮ বৎসর ও অন্যান্য পুত্রের বয়স তদপেক্ষা ন্যূন, তখন ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পতি-পরায়ণা ব্রাহ্মণী পতির সহিত চিতারূঢ় হন।

নিঃসহায় বলিয়া ও অন্যান্য বিঘ্ন বশতঃ রামাইর উপনয়নের কাল গত হওয়াতে দেশের অধ্যাপকগণ উপনয়নের ব্যবস্থা দিলেন না এবং সেই কারণে রামাইর উপবীত সংস্কার হইল না। অসংস্থান প্রযুক্ত রামাই কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতারও যথাকালে উপনয়ন দিতে পারিলেন না—কেবল পিতার স্থাপিত শ্রীধর্ম্মকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহার সেবা ও পূজায় রত হইয়া কষ্টে সৃষ্টে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের গাঢ় অনুরাগ ও বিশ্বাস ছিল।

ক্রমে সকলের বয়স যখন পরিপক্ক হইল, তখন তাহাদিগকে উপবীতহীন দেখিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ সকল "অপাংক্তেয়" অর্থাৎ একঘরিয়া করিলেন। সমন্বয়ে তাহাদিগকে লইয়া কেহই ভোজন করিতেন না এবং তাহাদিগকে কোন ব্রাহ্মণই কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। অব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই অবজ্ঞা করিতেন। রামাই সেই মনোদুঃখে এক দিন ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

"হে ভ্রাতৃগণ! আমরা ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি পুরাণাদিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নানা কুচক্রে পতিত হইয়াও একমাত্র ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কুরুযুদ্ধে জয় এবং স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃধর্ম্ম পালন আর ধর্ম্মপূজা করিয়া সমাজে আমাদিগের এতই শাস্তি! তবে আর ধর্ম্মপূজা করিবার প্রয়োজন কি? যখন ধর্ম্মের পূজা করিলে নীচ হইতে হয়, তখন এমন পাপ ধর্ম্মকে ঘরে রাখা উচিত নহে। যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ-ঔরসে আমাদিগের জন্ম হইয়া থাকে, তবে আমাদের অভিশাপে ধর্ম্ম অবশ্যই নীচগামী হইবেন।"

এই বলিয়া রামাই মনের ঘৃণায় ভ্রাতৃ-

গণের সম্মুখেই ধর্ম্ম ঠাকুরকে লইয়া "যাও তুমি নীচগামী হও" এই অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক নিকটস্থ সরোবরজলে প্রক্ষেপ করিলেন। যে দিন এই ঘটনা হয়, সেই দিনের রাত্রেই সুষুপ্তি অবস্থায় শ্রীধর্ম্ম দেব রামাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এই কথা বলেন;—

"রামাই দুঃখিত হইও না; আমি তোমাদেরই আরাধ্য। তোমার পিতৃদেবই মর্ত্ত্য লোকে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি তোমার অভিশাপ গ্রহণ করিলাম, অতঃপর নীচের গৃহে থাকিয়া নীচের পূজা গ্রহণ করিব। তোমরা আমার সেবা করিয়া কখনও পতিত হইবে না। উপবীতের পরিবর্ত্তে তাম্র-বলয় অথবা অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তে ধারণ কর, এবং তোমার ভ্রাতৃগণও তামা ধারণ করিয়া আমার পূজা করুক। শালগ্রাম শ্রীবিষ্ণুর যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে, সেই রূপ খণ্ড প্রস্তরে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ও এক এক নাম দিয়া নদ নদী জলাশয়ে এবং দেশ বিদেশে পরিত্যাগ কর। অধম, উত্তম, মধ্যম, যে কোন জাতি তাহা প্রাপ্ত হইবে, সেই আমার পূজা করিবে। যে আমার পূজায় অবহেলা ও প্রসাদ হেলন করিবে, সে মহাব্যাধিগ্রস্ত হইবে। যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আমি অবস্থিতি করিব, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তোমাদের ভক্ষ্য ভোজ্য ও কন্যাদি আদান প্রদান হইবে।

যদিও আমার ধ্যান ব্যতীত পূজার অন্য পদ্ধতি নাই, কিন্তু তোমাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভায় চতুর্ব্বর্ণেই আমার পূজা করিবে এবং ভবিষ্যতে আমার কৃপায় অনেক কবি জন্মিয়া গীতচ্ছলে ধর্ম্মপুরাণ প্রকাশ করিবে, পূজার পদ্ধতিও প্রচারিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্গোপ, মালাকার, কুম্ভকার, তেলী, তামলী, মোদকাদি নবশাক, আর বাগদী, ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি, রজক, জেলিয়া, দুলে, মালা, কলু, বাইতি, জুগী, কৈবর্ত্ত, মাঝি, মেটে, এবং অন্ত্যজ জাতি বলিয়া যাহারা পরিগণিত, তাহারাও আপনাদের খাদ্যানুসারে যথাযোগ্য উপহার দিয়া আমার পূজা করিলে কোন প্রত্যবায় হইবে না। নেপাল রাজ্যের লোকেরা যেরূপে আমার পূজা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, বঙ্গেও আমার সেইরূপ পূজার অভিলাষ। তোমার নিকট এই সকল কথা প্রতিশ্রুত হইতেছি; অন্যথা হইবে না। শীঘ্র আমাকে জল হইতে উদ্ধার কর।"

রামাই এইরূপ ধর্ম্মের স্বপ্ন দানে হাতে আকাশ ও প্রাণে ধর্ম্মের বল পাইয়া স্বপ্নভঙ্গে প্রাতঃকালেই কনিষ্ঠ ভাইদিগকে লইয়া সরোবর অন্বেষণপূর্ব্বক জল হইতে ধর্ম্মকে উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব মত সেবা পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি শুভ দিন দেখিয়া তাম্র-বলয় ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতাদিগকেও ধারণ করাইলেন।

অনন্তর, চারি ভ্রাতায় যুক্তি করিয়া খণ্ড প্রস্তরে (প্রস্তরফলকে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-

মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শান্তিনাথ, দলমাদল, চাঁদরায়, রাইবাঘিনী, কালাচাঁদ, রাজ্যধর, রূপরায়, মোহনরায়, যাত্রাসিদ্ধি, বাকুড়ারায়, খুদিরায়, দলুরায়, শ্যামরায়, স্বরূপনারায়ণ, হিরণ রায়, ফতে সিং, শীতল সিং, রাজবল্লভ, রাজাধিরাজ, জগৎ রায়, ঝুঝরিরায়, খোড়ারায়, কালুরায়, খেলারাম, কাঁকড়া বিছা, শঙ্কাসুর, আঁধার ফুলী, প্রভৃতি সহস্র সহস্র স্থানে সহস্র সহস্র ধর্ম্মমূর্ত্তি সৃজন করতঃ, নদ নদী জলাশয়ে এবং দেশে বিদেশে পরিত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মের প্রত্যাদেশে যে সকল জাতি জল স্থল হইতে ঐ সকল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহারা আপন আপন গৃহে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন ও তাম্রবলয় ধারণ করিয়া ধর্ম্মের পূজা করিতে লাগিল। সেই হইতেই রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক সর্ব্বত্রই ধর্ম্মপূজা প্রচলিত হয় এবং ধর্ম্ম নীচগামী হন।

ইহার মধ্যে একটি কথা আছে; অনেক ধর্ম্ম-পণ্ডিত নিজ নিজ কর্ম্ম-দোষ এবং সেবাপরাধে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তাই, কথায় বলে যে, "ধর্ম্মের ঘরে কুঠের অভাব নাই।" যাহার ঘরে ধর্ম্ম আছে তাহার ঘরে ২। ১ জন কুঠেও আছে। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

ধর্ম্মযজ্ঞ—এতদ্দেশে পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তিতে ধর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া একটা মহাসমারোহ পর্ব্ব হয়। সে যজ্ঞের ব্যাপার এই:—ধর্ম্ম যে কোন জাতির বাটীতে থাকুন না কেন, ঐ দিনে কোথাও খিচুড়ি, কোথাও অন্ন ব্যঞ্জন ও মাংস মৎস্যাদি, কোথাও পলান্ন, কোথাও পায়সান্নাদি রাশীকৃত প্রস্তুত হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতির বাটী হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ স্থানে লইয়া গিয়া ঐ ভোগ সমর্পণ করেন। যতই লোক উপস্থিত হউক না, কেহ প্রসাদে বঞ্চিত হইবে না। সেই দিন ধর্ম্মের দ্বার অবারিত। প্রসাদ বিতরণ কালে, গ্রাম্য লোকেরা অসংখ্য ঘটী বাটী ইত্যাদি পাত্র উপস্থিত করে। পাচক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পাত্রবিশেষে ভোগ প্রদত্ত হইলে শ্রীবিষ্ণু প্রসাদের ন্যায় "প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং"—লোকে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করে। প্রসাদ হেলন করিলে মহাপাপ হয়।

পূর্ব্বে পূজার কোন পদ্ধতি-পুস্তক ছিল না। ধর্ম্মের অনুকম্পায় প্রথমতঃ ময়ূর ভট্ট সাধক কর্ত্তৃক পূজার পদ্ধতি-পুস্তক প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক সংস্কৃত নহে; কেবল ৭। ৮ পাতা ভাষা পুস্তক। উহার ভিতর কোন প্রসঙ্গ নাই, কেবল ধর্ম্মের স্তুতিপাঠ আছে মাত্র। ধর্ম্মের পূজারী অর্থাৎ পণ্ডিত তাহা অভ্যাস করিয়া ধর্ম্মের পূজা ও স্তুতিপাঠ করে।

তাহার পর দ্বিতীয় কবি এখান হইতে ১০ ক্রোশ ব্যবধান জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাইতি নিবাসী ৺ রূপরাম চক্রবর্ত্তী এবং এস্থান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান হুগলী জেলার অধীন পশ্চিমপাড়ানিবাসী তৃতীয় কবি দ্বিজ খেলারাম, চতুর্থ কবি

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বিজুড়নিবাসী ঘনরাম, পঞ্চম কবি কেতুগ্রামনিবাসী প্রভুরাম, ষষ্ঠ কবি দ্বিজ রামাই পণ্ডিত, সপ্তম কবি জেলা বাঁকুড়ার অধীন এখান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান গোকুলনগর চামচ্যানিবাসী ৺ রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অষ্টম কবি এই স্থানের সমীপবর্ত্তী বেল-ডিহা-নিবাসী ৺ মাণিকরাম গাঙ্গুলী, নবম কবি এখান হইতে ৩ ক্রোশ ব্যবধান আনুড় নিবাসী ৺ মাণিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নয় জন কবিকৃত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ এতদ্দেশে প্রচারিত হয়। অন্যান্য দেশেও অনেক কবি জন্মিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন।

কবি মাণিকরাম গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত পুস্তকের বন্দনায় আছে;—

বন্দিব ময়ূর ভট্ট আদি, রূপরাম
দ্বিজ শ্রীমাণিক রচে শ্রীধর্ম্মপুরাণ॥ ,,

ইহাতেই বেশ উপলব্ধ হয় যে, ময়ূর ভট্ট আদি ও রূপরাম দ্বিতীয় কবি। তৃতীয় কবি খেলারাম, ইনি নিজ গ্রন্থ-সূচনায় লিখিয়াছেন;—

ভুবন শকে বায়ু, মাস সরের বাহন
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥
হে ধর্ম্ম! এ দাসের পুরাও মনস্কাম
গৌড় কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম॥
তোমার কৃপায় যদি, গ্রন্থ পূর্ণ হয়।
অষ্ট মঙ্গলায় দিব, সব পরিচয়॥

ভুবন ১৪, বায়ু ৪৯, মাস ধনু অর্থাৎ পৌষ মাস। ইহাতেই পাওয়া যায়, ১৪৪৯ শকের কিছু পূর্ব্বেই রামাই পণ্ডিত কর্ত্তৃক বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার হইয়াছিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন গ্রন্থখানি বহুদিন যাবৎ অত্রত্য শ্যামবাজার গ্রামের ৺ দলু রায় ধর্ম্মের খট্টাসনে বস্ত্রাবরণে গুপ্ত থাকিয়া ধর্ম্মপূজারী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ চন্দন-চর্চ্চিত জলে সেঁতাইয়া গিয়া ভিতরের ও শেষের অনেক পত্র জমাট ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা উদ্ধারের কোন উপায় নাই এবং বহুস্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও উক্ত পুস্তকের আদর্শও নাই।

এতদ্দেশের গায়কগণ ঘনরাম, রামাই, মাণিকরাম ও রামচন্দ্রের কৃত ধর্ম্মমঙ্গল গীত শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মপূজার উৎসবে গান করে। এতদ্দেশে (১) গ্রহভরণ, (২) পশ্চিমোদয়, (৩) ধর্ম্মগাজন (৪) সয়লা এই কয়েক প্রকার ধর্ম্মোৎসবে মহাঘটা ও ধর্ম্মপুরাণ অর্থাৎ পালাগীত হয়।

(ক্রমশঃ)

সন্তান পালন।

সন্তান পালন একটী গুরুতর কার্য্য। পিতা মাতার সাংসারিক শত শত দায়িত্বের মধ্যে এটী একটী গুরুতর দায়িত্ব। যে জনক জননী এই গুরু ভার বহনে অক্ষম, তাঁহারা পিতা মাতা পদের যোগ্য নহেন। সন্তান যাহাতে

সুশিক্ষা লাভ করে, নীতি ও ধর্ম্মকে মানবজীবনের সার বস্তু জানিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ হয়, বাল্যকাল হইতে পিতামাতার সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তানগণ মাতার নিকটেই অধিকাংশ সময় থাকে, সুতরাং প্রত্যেক জননীই সন্তানের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। জননীর কার্য্যকলাপ ও চরিত্র দেখিয়া সুকুমারমতি সন্তান নিজ চরিত্র গঠন করে; সুতরাং সন্তানের ভাবী জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিমতী জননী বিশেষ সাবধানে নিজ কার্য্য সমাপন করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান বলেন যে, "আমার জ্ঞান ও উন্নতির এক মাত্র মূল আমার জননীর প্রদত্ত শিক্ষা।" যে জননীর সত্যের প্রতি আদর নাই, বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা নাই তাঁহার সন্তান যে সত্যপ্রিয় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে, ইহা আশা করা যায় না। অতি বাল্যকাল হইতেই সন্তানের চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে প্রহার দ্বারা সন্তানকে শাসন করেন। প্রহার দ্বারা সন্তানকে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত না করিয়া সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সৎপথে চালিত করা উচিত।

সন্তানকে সত্যপ্রিয় করিতে হইলে, পিতামাতাকে সর্ব্বপ্রকারে সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। ধার্ম্মিক সত্যপ্রিয় পিতা মাতার সত্যপ্রিয়তা ও ধর্ম্মভাব বাল্যকাল হইতেই যে সন্তানের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই সন্তান উত্তরকালে পিতা মাতার ও স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয়।

সন্তানকে পাঠে অনুরাগী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। মহামতি সার্ উইলিয়ম জোন্স যখন বাল্যকালে কোন বিষয় জানিবার অভিপ্রায়ে জননীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন বুদ্ধিমতী জননী উত্তর করিতেন যে "তুমি পড়িলেই জানিতে পারিবে।"* বাল্যকাল হইতে জননীর নিকট কেবল পড়িবার কথা শুনিয়া তাঁহার পাঠের ইচ্ছা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠে নিবৃত্ত হয়েন নাই। অনেক পিতা মাতা সন্তানকে পাঠে অনুরক্ত করিতে গিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, তাঁহাদের সন্তান কেবলমাত্র পাঠ করিবে, সে আর কোনও কর্ম্ম করিবে না। ব্যায়াম ও অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা শরীর যে সুস্থ ও সবল হয় এবং তাহার অভাবে যে শরীর দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা তাঁহারা অনেকে ভুলিয়া যান। সন্তানকে যেমন নীতি ও কর্ম্ম শিক্ষা দিবে, যেমন তাহাকে পাঠানুরাগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্যও সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাহার অঙ্গসঞ্চালনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সচ্চরিত্র, পাঠানুরাগী

*সার উইলিয়ম জোন্সের মাতার বাক্য—"Read and you will know"—সন্তান যতবার কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিত, মাতার ঐ একই উত্তর।

বালকগণের সহিত সন্তান প্রতিদিবস রীতিমত সময়ে ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। কুসঙ্গ হইতে সন্তানকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। বালকগণের মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। যাহাতে বালকদিগের অন্তরে ভীরুতা প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সন্তানকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহসী ও দৃঢ় করিতে হইবে। একটী ইংরাজ মহিলা এক দিবস আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়া হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তৎপরক্ষণেই সেই ঘোড়াতে আরোহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা তাঁহার ভ্রাতাকে চাবুক মারিবেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে "ইহাই আমাদের জাতীয় বল।" এ দেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমাদের দেশীয় কোন ব্যক্তি সহসা কোন ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ঘোড়ায় চড়া দূরে থাকুক, তিনি জীবনে আর কখনও অশ্বারোহণ করেন কি না সন্দেহ। আর এক দিবস আমি একটী ইংরাজ মহিলার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছি, নিকটে তাঁহার একটী একবৎসর-বয়স্কা বালিকা খেলা করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখি যে, বালিকাটীর পশ্চাতে একটী কুকুরশাবক তাড়া করিতেছে। সে আমাদিগের চেয়ারের চতুর্দ্দিকে দ্রুতপদে ঘুরিতেছে এবং কুকুরশাবকও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। বালিকা অবশেষে জননীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে অমনি জননী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি! তুমি একটা কুকুরশাবকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমার সাহায্য চাও? তুমি মানুষ, উহাকে ঠেলা মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে পার না? ভীরু! তোমার এতটুকু সাহস নাই?"

৫ বৎসরের বালিকার প্রতি জননীর কি উক্তি!! আমাদের দেশ হইলে জননী দূর হইতে বালিকাকে বলিতেন—"পালা পালা, যেন কামড়ায় না।" সেই সংস্কারবলে আমরা একটা কুকুর দেখিলে দূরে পলায়ন করি। আমাদের দেশের জনক জননীগণ সন্তানগণকে অধিকতর দুগ্ধ খাওয়াইবার ও তাহাকে শক্ত করিবার ইচ্ছায় বাল্যকাল হইতে ভূত প্রেত প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এমন করিয়া ফেলেন যে, ভবিষ্যতে তাহারা একটি স্থানে বাহির হইতে পারে না। সন্তানের নিকট সাহসিকতার দৃষ্টান্তপূর্ণ কাজ করিলে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়।

(ক্রমশঃ)

বাগান বান্ধব পুস্তকালয়ও সাধারণ গ্রন্থাগার
সন ১২১১ সালে প্রতিষ্ঠিত
কলিকাতা

গো-পরিচর্য্যা।

(৩৮৫ সংখ্যা—৩১৯ পৃষ্ঠার পর)

আয়ুর্ব্বেদমতে গোগণের চিকিৎসা।

গোগণের শৃঙ্গরোগে—শৃঙ্গবের, বলা ও মাংসকল্কে সিদ্ধ সমাক্ষিক তৈল সৈন্ধব লবণ যোগে প্রদান করিবে।

সর্ব্বপ্রকার কর্ণশূল রোগে—মঞ্জিষ্ঠা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ সহিত সিদ্ধ তৈল রসুন যোগে প্রদান করিবে।

দন্তশূল রোগে—বল্বমূল, অপামার্গ, পাটলা, ধাতকী ও কুটজ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া দন্তমূলে প্রদান করিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দন্তশূলহারক দ্রব্য সকল ঘৃতযোগে পাক করিলে তাহাই মুখরোগহারক ঔষধ হয়।

জিহ্বা-রোগে—সৈন্ধব লবণ প্রশস্ত। হৃৎশূল, বস্তিশূল, বাত ও ক্ষয়রোগে—গোগণকে ঘৃতমিশ্রিত ত্রিফলা প্রদান প্রশস্ত।

সর্ব্ববিধ কোষ্ঠরোগে এবং শ্বাস ও কাশ রোগে—শৃঙ্গবের ও ভার্গী একত্রে বাটিয়া সেবন করাইলে রোগ বিনষ্ট হয়।

ভগ্ন স্থান সংমিলনের নিমিত্ত লবণযুক্ত প্রিয়ঙ্গু বাটিয়া প্রলেপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ভগ্ন-ক্ষত রোগে—হরিতালচূর্ণ, তৈল ও ঘৃত সহিত পাক করিয়া প্রদান করিবে।

কফরোগে—মধুর সহিত ত্রিকুট সেবন করান উচিত।

মাসকলাই, তিল, গোধূম, ঘৃত এ সকলের পিণ্ড করিয়া লবণযোগে সেবন করাইলে বৎসগণের পুষ্টিকারক হয়।

দেবদারু, বচা, জটামাংসী, গুগ্‌গুরা, হিঙ্গু ও সর্ষপ এই সকলের ধূপ গোগণের হিতকর।

অশ্বগন্ধা, তিল ও নবনীত একত্র করিয়া সেবন করাইলে গাভীগণ ক্ষীরবতী হয়।

নিরন্তর গৃহে বাঁধিয়া রাখিলে যে বৃষ মত্ত হয়, তাহাকে হিঙ্গু খাওয়াইলে তাহার মত্ততা আরোগ্য হয়।

গোগণকে মধ্যে মধ্যে লবণ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

গর্ভাবস্থা।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে গাভীকে প্রসব করাইবার জন্য মনুষ্যকে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না, কেবল প্রসব হইবার সময় গাভীকে সমতল ও প্রশস্ত স্থানে রাখা উচিত, পাছে স্থানের সংকীর্ণতা ও উচ্চনীচতা প্রযুক্ত আঘাত লাগিয়া বৎসের অপকার হয়।

গাভীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে গৃহস্থকে একটু সাবধানে থাকিতে হইবে। যদি কিছু সাহায্য আবশ্যক হয়, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

গর্ভ হইতে নিঃসরণকালে বৎসের পৃষ্ঠদেশ ঊর্দ্ধদিকে এবং দুইখানি আগ-

পায়ের মধ্যে নাসিকা থাকা, এই প্রকার অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থা কহে।

গর্ভাবস্থায় গাভীকে পুষ্টিকর আহার দিয়া অত্যন্ত মোটা করা উচিত নহে। এই সময়ে গর্ভের শোণিত ও রসাদি সঞ্চালন বন্ধ হওয়াতে উদরে বেদনা হয়, তাহাতে গাভীর জীবননাশের সম্ভাবনা।

গর্ভ পূর্ণ হইবার সময় এই পীড়া কখন কখন উপস্থিত হয়। রক্তমোক্ষণ অথবা বিরেচন দেওয়া অপেক্ষা এই সময়ে কিছু আহার কম করিয়া দেওয়া উচিত। খৈল অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে বৎসের ঘূর্ণী রোগ হইবার সম্ভাবনা।

প্রসবকাল।

গাভী যদি সহজে প্রসব না হয়, তাহা হইলে অবসন্ন হইবার পূর্ব্বে যাহাতে সহজে প্রসব হয়, তজ্জন্য মানুষের সহায়তা করা উচিত।

যিনি গাভীকে প্রসব করাইতে সহায়তা করিবেন, তাঁহার হাত ও বাহু গরম জল ও ঘি দিয়া মলিয়া নরম করিতে হইবে।

অসঙ্গত অবস্থায় বৎসকে নির্গত করা উচিত নহে।

বৎসের পা ধরিয়া টানিবার কালে সাবধানে থাকিবে, যেন তাহাকে কোন আঘাত না লাগে।

নাভী ছিঁড়িয়া গিয়া শোণিত নির্গত হইলে কোন ভয় নাই।

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড ১ম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপে দ্বিজ সম্বোধিয়া আকিলিসে
বলিলা তখন—"দেবরাজ-প্রিয় তুমি
হে বীর-কেশরী আকিলিস্! ইচ্ছিয়াছ
হইতে বিদিত—কেন ক্রুদ্ধ ফিবিয়াস
করেছে আনত তার কালমৃত্যুরূপী
ভীষণ কার্ম্মুক। কিন্তু বীর বলিবার
আগে এক ভিক্ষা—হও হে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
আজি মোর কাছে; আর ক্ষমতা বীরত্ব-
বলে তব আজি, করাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
নৃপতি-পুঙ্গবে। বলিব হে বীরবর
হেন গূঢ় কথা সব বিজ্ঞজন যাহা
লুকায়ে রাখিতে চায়, কিম্বা প্রকাশিব
সে সব কঠোর সত্য, যাহা নৃপতির
পক্ষে হবে নিঃসন্দেহ মহাগ্লানিকর।
জেনো বীরবর! ইহা অতি দুঃসাহস,
প্রজাগণ যবে, হয়ে সমধিক জ্ঞানী
দেয় উপদেশ নৃপতিরে, কোথা কোন
কার্য্যে তাঁর ঘটিয়াছে ভ্রম, প্রজার এ
দুঃসাহসে, সেই রোষানল জ্বলি উঠে
নৃপতি অন্তরে, যদিও ক্ষণিক বলি

তাহা মোরা ভাবি মনে, কিন্তু বীরবর!
জানিও নিশ্চয়, নরপতি অবশেষে
এ হেন দুঃসাহসের লন প্রতিশোধ।"
—বলিয়া এতেক যবে নীরবিলা বীর,
পিলিডাস* তবে সম্বোধিয়া ক্যালকাসে†
বলিলা তখন, "তব অন্তর হইতে,
অবাধে করহ ব্যক্ত, হে জ্ঞানিপ্রধান,
যাহা তুমি সবিশেষ আছ অবগত,
তব ওষ্ঠদ্বয়, যাইছে করিতে ব্যক্ত
যাঁর শুভবাণী, কিম্বা যাঁর নামে তুমি,
এনেছ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গ্রীকগণে হেথা,
দিবসের অধিপতি সেই আপোলোর
নামে আমি তব কাছে করিনু শপথ
অলংঘনীয়, যতক্ষণ আকিলিস-দেহে
বহিবে জীবনশ্বাস, এ অগণ্য গ্রীক-
দল মাঝে নাহি কারো এতেক সাহস
যেই হানিতে যাজকে হইবে সাহসী
কিম্বা রাজেন্দ্র আপনি স্পর্শিবে না কভু
হে যাজক! তব ওই সুপবিত্র শির।"
এরূপ উৎসাহ লভি, ক্যালকাস তবে,
এইরূপে আকিলিসে করিলা উত্তর;—
"কাল মৃত্যুরূপী এই ভীষণ মড়ক
ঘটেনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গে, কিম্বা বলিদানে
মোসবার কোনরূপ অবহেলা হেতু।
নৃপতি আপনি করেছেন উত্তেজিত
জনধ্বংসকর এই ভীষণ মড়কে,
আপোলোর প্রতিহিংসারূপে মূর্ত্তিমান্
ক্ষতিগ্রস্ত যাজকের তরে জেনো সবে।
যদবধি নরপতি বিনা অর্থপণে,
অর্পিতে যাজকে তাঁর কৃসিসা বালারে
প্রেরণ না করিবেন স্বদেশে তাহার,
তদবধি দেবরোষ, কিম্বা মহামারী,
কিম্বা ওই প্রবর্দ্ধিত চিতার অনল,
হবে না নির্ব্বাণ কভু। হয়ত মোদের
স্তুতি বন্দনায় আর পূজা বলিদানে,
পারেন যাজক পূজ্য, ক্ষমিতে তখন,
কিম্বা এই প্রায়শ্চিত্তে, কালগ্রাস হতে,
পারেন আপোলোদেব, সুপ্রসন্নচিত্তে,
অবশিষ্ট গ্রীকগণে দিতে অব্যাহতি।"
বলিয়া এতেক যবে নীরব যাজক,
ভীষণ ভ্রূকুটি করি, চমকি নৃপতি
উঠিলেন সমুজ্জ্বল সিংহাসন হতে,
পূরিল হৃদয় তাঁর দীপ্ত ক্রোধানলে,
ক্রোধভরে আঁখিদ্বয় জ্বলে ধক্ ধকি,
মহারোষে নরপতি দন্ত কড়মড়ি
গভীর গর্জনে পুরোহিতে সম্বোধিয়া
করিলা উত্তর, "হে দৈবজ্ঞ এখনও
মো'সবারে তুমি দেখাইছ ভয় ঘোর
ভাবী অনিষ্টের, এখনও জ্ঞাতসারে
মম মর্ম্মভেদী বার্ত্তা করিছ প্রচার,
এখনও তুমি, পৌরহিত্য-গর্ব্বে মত্ত
হইয়া তোমার, উত্তেজিছ নৃপতিরে
হইতে কুপিত। ইহার কারণ তুমি
আপোলোর দৈববাণী করিছ প্রকাশ
শিখাইতে গ্রীকগণে নৃপতির প্রতি
এবে হইতে বিদ্রোহী, আর হে বিমূঢ়,
ইহার কারণ, অসত্য ভবিষ্য বাক্যে
তব, কলঙ্কিছ মোর রাজশ্রী—গৌরব,
দেবতা হয়েছে রুষ্ট, আর পুরোহিত

*আকিলিস।

†গ্রীক পুরোহিত ক্যালকাস, ইহাকে পূর্ব্বে ব্যালকান্ বলা হইয়াছে।

হইয়েছেন হতমান এই সে কারণে
মোর পুরস্কার—মোর রূপসী বালারে
অর্পি নাই আমি, প্রদত্ত সুবর্ণ হ'তে
লাবণ্যের তার হইয়াছি সমধিক
অনুরাগী বলি। অতুলন সেই বালা—
সৌন্দর্য্য লাবণ্য গুণে, আর সুনিপুণ
সকল বিদ্যায়, ক্লাইনেসট্রার* রূপ
ছিলনাকো এতাধিক মনোমত মম
যবে সে প্রথম তার যৌবন বিকাশে
তুষেছিল মোরে। তথাপি দেবতাগণ
যাচে যদি তারে, মোরা প্রেরিব তাহারে
স্বদেশে তাহার, কারণ চাহি না মোরা
আপনার স্বার্থলাভ, কিন্তু জেনো চাহি
সবার মঙ্গল। মোরে সবে অশুভের
ঘৃণিত কারণ বলি করহে লাঞ্ছিত,
প্রজার নিধন হ'তে বরঞ্চ নৃপতি
সহিবেন ক্ষতি তাঁর যত। সদ্য আমি
ত্যজিব ও বন্দিনীরে মম, যেই এত প্রিয়,
আর ন্যায্যমতে আছিল আমার।
কিন্তু যবে সকলের মঙ্গল কারণ
অর্পিব তাহারে আমি, সকৃতজ্ঞচিতে
গ্রীকগণ সবে মোর এই ক্ষতি গুরু
করুক পূরণ। করেছেন তিনি বৃথা
রণ—বৃথা নিজ রক্তপাত বিনা পুরস্কারে
—দিওনা হে নৃপতিরে করিবারে হেন
অভিয়োগে অগৌরবকর।" শুনি এবে,
নৃপতির এইমত উত্তর বচন,
জলদগম্ভীরে উত্তরিলা আকিলিস,
"হে অতৃপ্ত নরপতি! নিতান্ত ক্ষমতা-
প্রিয় তুমি, কিন্তু ততোধিক হে লোভার্ত্ত
হয় অনুরাগ তব পরস্ব হরণে।
ইচ্ছিছ নৃপতি তুমি, গ্রীকগণ সবে
অর্পিবে তোমারে, বহু ঘোরতর রণে
জয়লাভ তরে, উপযুক্ত পুরস্কার
রূপে ন্যায্যমতে যেই ধন সবে মিলে
লভেছে তাহারা, বহু রণক্ষেত্রে হত
বীর যোদ্ধা হতে, বহু হায়! নগরীর
বিলুণ্ঠিত ধন, করেছি গ্রহণ যাহা
সম অংশে মোরা, কাড়িয়া লইতে তাহা
করেছ মনন। এরূপ শঠতা জেনো
যথেচ্ছচারীর, ক্রীতদাসগণ শুধু
পারে সহিবারে। তথাপি মোদের যদি
নেতৃদলপতি বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির
তরে শুধু করেন সমর, তবে ওই
ইলিয়ন নগরীর বিলুণ্ঠিত ধন,
তাঁর ক্ষতি যত সব করিবে পূরণ,
যবে যোভের আদেশে মোদের বিজয়ী
এই সৈন্যদল বল উচ্চ দুর্গরাজি
তার করি ভূমিসাৎ, জয়কেতু উড়াবে গগনে।

(ক্রমশঃ)

*আগামেমননের পত্নী।

শেষ বিচার।

"আখেরে জানিবে বান্দা হিসাবের কালে।"

খৃষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন মনুষ্য এই পৃথিবীতে যে সকল কার্য্য করেন, এক দিন তাহার শেষ বিচার হইবে। তখন বিশ্বাসী অনন্তস্বর্গের অধিকারী হইবেন এবং অবিশ্বাসী অনন্ত নরক দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা এরূপ কথা বলুন, না বলুন, মৃত্যুর পর মনুষ্যের যে পাপ পুণ্যের বিচার হইবে এবং তদনুসারে তাহার দণ্ড বা পুরস্কারের ব্যবস্থা হইবে, এ বিশ্বাস কোন না কোন আকারে সকলের মধ্যেই দেখা যায়। এইজন্য পরলোকে বিশ্বাস যেমন মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, ইহলোকের কর্ম্মের ফলাফল পরলোকে ভোগ করিতে হয়, এ বিশ্বাসও সেইরূপ স্বাভাবিক।

এই জগতের একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষী, ন্যায়বান্, ও মঙ্গলবিধাতা। গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, মানব এবং উচ্চলোকবাসী উন্নত দেবতা, সকলের উপরেই তাঁহার দৃষ্টি, সকলের প্রতি তিনি ন্যায়কারী এবং সকলের দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করিতেছেন। অচেতন বস্তু সকল অন্ধভাবে তাঁহার নিয়ম পালনে বাধ্য, এজন্য তাহাদের কোনও দায়িত্ব নাই। জড়, উদ্ভিদ এবং ইতর জন্তুতে এই বাধ্যবাধকতার ভাব দেখা যায়। কিন্তু মানবের অবস্থা অন্যরূপ। মানবের কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য পুরুষত্ব বা কর্তৃত্ব শক্তি আছে। এইজন্য মানুষ আপনার ভালমন্দ কার্য্যের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের নিকট তাহার কার্য্যের হিসাব দিতে হইবে।

ন্যায়বান্ ঈশ্বরের রাজ্যে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড হইবেই হইবে। কিন্তু ইহজীবনে কি তাহা সর্ব্বত্র সকল সময় সংঘটিত হয়? কত পাপাত্মা ঘোরতর পাপাচরণ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে ও গৌরবের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আর কত পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী ধর্ম্মরক্ষার জন্য অশেষ যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করিতেছেন! পৃথিবীর এই বিচার শেষ বিচার, কে এ কথা বলিবে? সামান্য মানুষ-রাজার রাজ্যে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন না হইলে সে রাজা দোষভাগী হইয়া থাকেন; আর মহারাজাধিরাজ বিশ্বরাজের রাজ্যে অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে?

সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর ঠিক্ হিসাবকারী। তিনি মানবের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক কার্য্য গণনা করিতেছেন, তাঁহার নিকট কিছুমাত্র ঢাকা রাখা যায় না। তাঁহার বিচারও তেমনি সূক্ষ্ম, এইজন্য "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" মানুষ বুঝিয়াছে। এই সূক্ষ্ম বিচারে ইহলোকে তিনি পাপপুণ্যের ফল বিধান করিতেছেন, আবার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও তিনি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য আশ্চর্য্য। অমৃত বৃক্ষ যে রোপণ করিয়া পোষণ করে, তিনি তাহাকে বহুকাল কেবল কষ্টদুঃখ বহনের ভার দেন, কিন্তু পরিণামে অমৃত ফল দিয়া তাহার সকল

পরিশ্রম সার্থক করেন। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, সে আপাততঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী এবং যথাসময়ে হইবেই হইবে। মানুষ-বিচারকের বিচারে ভুল হয়;—কত সময় নির্দ্দোষীর দণ্ড ও দোষীর অব্যাহতি হইয়া থাকে, গুরু পাপে লঘু দণ্ড ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডও হইয়া থাকে। কিন্তু ন্যায়বান্ ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে ঠিক্ ওজন হয়; যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহার তেমনি ফল বিচার হইয়া থাকে। তিনি চুল চিরিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করেন, তাঁহার বিচারে কখনও কোনও অন্যায়, ভ্রম বা পক্ষপাত হইতে পারে না।

"আখেরে জানিবে বান্দা হিসাবের কালে" এই বাক্যটী প্রত্যেক হিসাবদায়ী প্রাণী অর্থাৎ মনুষ্যের মনে রাখা উচিত। ইহা মনে রাখিলে হিসাব করিয়া সকল কার্য্য করা যায়—যাহার প্রতি যাহা ন্যায়-সঙ্গত, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করা যায়—অন্যায়াচরণে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা মনে রাখিলে জীবনকে ছেলের হাতের খেলার জিনিষ মনে করিয়া যেমন তেমন করিয়া ব্যয় করা যায় না। জীবন ঈশ্বরের অমূল্য দান, এই দানের সদ্ব্যবহারের জন্য আমি জীবনদাতার নিকট দায়ী। জীবনের এক মুহূর্ত্তকালের যদি অপব্যবহার করি, তাহার জন্য দণ্ড-ভাগী হইতে হইবে। যিনি কেবল ইহকালের বিচারক নহেন, পরকালেরও বিচারক, তাঁহার বিচারে খাঁটি থাকিতে পারিলে আর ভয় কি?—ভাবনা কি?

সকল ধর্ম্মই পাপীকে ভয় দেখাইয়া পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মৃত্যুর পর নরকভোগ বা তাদৃশ অন্য কোন ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর যেমন দণ্ডদাতা পিতা, তেমনি তিনি করুণাময়ী জননী। তিনি যে ইহকালের পরিমিত পাপের জন্য মানবাত্মাকে অনন্তকাল দণ্ড দিবেন, ইহা মনে করা যায় না। পিতা মাতার তাড়না যেমন সন্তানের সংশোধনের জন্য, তাঁহার দণ্ড ব্যবস্থাও পাপীকে পবিত্র করিয়া তাঁহার প্রেমক্রোড়ে লইবার জন্য। তথাপি পাপীর প্রত্যেক পাপের জন্য তাহাকে ধর্ম্মের দণ্ডাঘাত সহ্য করিতে হইবে, অনুতাপের তুষানলে পুড়িতে হইবে, এবং হৃৎপিণ্ড গলাইয়া অশ্রুর তর্পণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যত নরক-যন্ত্রণার ভীষণ বর্ণনা আছে, তাহার কোনওটীই আত্মগ্লানির যন্ত্রণার সমতুল্য নহে। মানুষ যে পাপ করে, যখন তাহার জন্য চেতনা হয়, তখন তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। যত পাপ স্মরণ, ততই গভীর হইতে গভীরতর অন্তর্দাহ। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের এই ব্যবস্থা। ইহকালে অনেক স্থলে হাতে হাতে পাপের ফল ভোগ হয় দেখা যায়, কিন্তু আবার অনেক স্থলে দেখা যায় না। এখানে মানব পাপের অসাড়তায় ও সংসারের মোহ কোলাহলে অচেতন হইয়া থাকে।

যে এখানে জাগিল না, যে এখানে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল না, বিচার-পতি পরকালে তাহাকে জাগাইবেন এবং তাঁহার ন্যায় দণ্ড বিধান করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইবেন। অতএব সময় থাকিতে থাকিতে সকলে জাগ, এখানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাও, পরলোকে দণ্ডের হাত এড়াইবে এবং অপার সুখশান্তি ভোগ করিবে। পাপভারাক্রান্ত হইয়া যে পরলোকে যাইবে, বিচারপতির মহাবিচারে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। সে বিচারকালে আর কেহ থাকে না "খোদা আর বান্দা" ঈশ্বর ও মানবাত্মা; ঈশ্বর বিচার করিয়া ফল বিধান করেন, আত্মা বিচারিত হইয়া যথোচিত দণ্ড ভোগ করে।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতং॥

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে, একাকী স্বীয় দুষ্কৃতির ফলও ভোগ করিয়া থাকে।

সন ১২৯৩ সালের প্রতিলিপি

কলালাপ

(৩৯৫ সংখ্যা,—৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

২১। তণ্ডুল-কুসুম-বলি বিকার,—তণ্ডুল-ফুল-ফল-পত্রাদি দ্বারা নানাপ্রকার পূজোপহার নির্ম্মাণ করা। এখন দ্রব্যময় উপহার দ্বারা দেবপূজা করেন, এরূপ আচারী হিন্দু হিন্দুসমাজে অল্পই আছেন। ঈশ্বর-দত্ত পদার্থ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করা এখন উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এককালে নানাবিধ উপাদেয় বস্তু দ্বারা পূজোপহার নির্ম্মাণ করা একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং তাহা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিতে হইত। খৃষ্টান্‌দিগের রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়মধ্যে পূজোপহার প্রদান-প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের আদিম প্রবর্ত্তক বোধ হয়, হিন্দুগণের পূজাপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। পূজাঙ্গরূপে হউক, না হউক, একটী পুরাতনী ও মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া এই কলাটীর পুনঃসংস্কার হওয়া মন্দ নহে।

২২। মণি-ভূমিকাকর্ম্ম,—বিবিধ বেশ-রচনা এবং কাচ, প্রস্তর স্ফটিকাদি দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ। বিবিধ বেশরচনা বিষয়ক ব্যাখ্যা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। মহা-ভারতের পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, ময় নামক কোন দানব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ময়-নির্ম্মিত সভাগৃহ কিরূপ আশ্চর্য্য ও মনো-হর, তাহাও মহাভারতে বর্ণিত আছে। কুরুক্ষেত্রের যে মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয়

পাইয়াছিল, ময়নির্ম্মিত সভাগৃহই তাহার বাহ্য নিদান। ঐ সভাগৃহের মণিভূমিকায় মহারাজ দুর্য্যোধনের মহান্ ভ্রম জন্মিয়াছিল। জলভাগে স্থল ও স্থলভাগে জল ভ্রম হইয়াছিল। ভিত্তিতে দ্বার ও দ্বারে ভিত্তি বোধ হইয়াছিল। ভ্রমবশাৎ জলে বস্ত্র আর্দ্র হইয়াছিল, মস্তকে ভিত্তির আঘাত লাগিয়াছিল। মহাভারতে ইত্যাকার বর্ণনা আছে। দুর্য্যোধনের ঐ সকল ভ্রমবিজৃম্ভিত কার্য্য দর্শনে ভীমাদি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাহাতে দুর্য্যোধনের অতিশয় ক্রোধ ও অভিমান জন্মিয়াছিল। এই ক্রোধ ও অভিমান হইতেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি জন্মে। কপট পাশক্রীড়া ঐ প্রবৃত্তির ফল। ময়নির্ম্মিত সভাতলে দুর্য্যোধনের লাঞ্ছনা দর্শনে সভাস্থ সকলেই ভাবী মহানিষ্টের শঙ্কা করিয়াছিলেন। সেই দূরদর্শী ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের শঙ্কা বিফল হয় নাই।

এই মণিভূমিকাকর্ম্ম যে বর্ত্তমানে এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ক্রিষ্ট্যাল্ প্যালেস" এবং রাজা বদ্রিদাসের মাণিকতলাস্থিত ঠাকুরবাড়ী ঐ বিদ্যার নিদর্শন। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য প্রস্তরময় গৃহ ও দেবমন্দিরাদি আছে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ মণিভূমিকা কর্ম্ম নহে। ঐ বিদ্যাজাত গৃহাদিতে একটু বিশেষ বৈচিত্র আছে। যদিও ঐ বিদ্যার বিশেষ প্রচলন এখন নাই, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ ক্ষতিও নাই। তাদৃশ গৃহাদির নির্ম্মাণ কদাচ হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঐ বিদ্যাবিৎ লোকও খুঁজিয়া পাইবেন।

২৩। উদকবাদ্য—তাল সংযোগে বাদ্য। সপ্তদশসংখ্যক কাচের বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের তাল রক্ষা করিয়া কিরূপে তালতরঙ্গবাদ্যের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তালপূর্ণ বৃহৎ পাত্র, মৃন্ময় বা ধাতুময় কলস ও হণ্ডিকা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে মৃদঙ্গাদির ন্যায় মধুর বাদ্যের সৃষ্টি হয়। এই বাদ্য ঢোলক, তবলা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ হইতেও কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। এখন আর উহা প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা ঐ সকল যন্ত্র-বাদ্য শিক্ষা করেন, তাঁহারা অনায়াসে সর্ব্বপ্রকার উদকবাদ্যের অনুশীলন করিতে পারেন। উহাতে ব্যয়াধিক্য বা কার্য্যসঙ্কট কিছুই নাই। বিশেষতঃ শ্রীপঞ্চমীমেলায় গীতবাদ্যের অনুশীলন যত অধিক হয়, ততই ভাল।

২৪। উদকঘাত,—জলস্তম্ভনী বিদ্যা। এই বিদ্যাপ্রভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা জলমধ্যে অবস্থান করা যাইতে পারে। মৎস্য ধারণ, মৌক্তিকাদি উত্তোলন, জলমগ্ন বস্তুর উদ্ধার এবম্বিধ কার্য্যে ঐ কলার সবিশেষ উপযোগিতা আছে। তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ঐ বিদ্যা দ্বারা বিপদ্ হইতেও আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তিকে দস্যু বা হিংস্র জন্তুতে আক্রমণ করে, আর তাহার ঐ বিদ্যা জানা থাকে, সে নিকটস্থ জলাশয়ে

প্রবেশ করিয়া অনায়াসে প্রাণরক্ষা করিতে পারে। গদাযুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন জলস্তম্ভনী বিদ্যার প্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত ছিলেন। শুনা যায়, ঠগি-কমিসনার ব্ল্যাকিয়ার সাহেবের শাসনকালে, অনেক অপরাধী জলমধ্যে আশ্রয় লইয়াও ধৃত হইয়াছিল। তাহারা জলস্তম্ভনী বিদ্যা জানিত না,—এক একটা সছিদ্র কৃষ্ণবর্ণ দগ্ধহণ্ডিকা (কেলেহাঁড়ী) মাথায় দিয়া জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়া দিন যাপন করিত। ঐরূপে লুক্কায়িত একটা দস্যু দৈবাৎ ধৃত হওয়াতে দস্যুগণের নবাবিষ্কৃত আত্ম-গোপন-কৌশল এককালে বিফল হইয়া যায়। ঐ বিদ্যা জানা থাকিলে তাহারা ধরা পড়িত না।

২৫। বিশেষকচ্ছেদ্য,—শারীরিক বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য দর্শনে মানুষের মানসিক সুখ সচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন মনে সুখ থাকে না, তখন শারীরিক বেশবিন্যাস দূরে থাকুক, আহার বিহার শয়নাদি অপরিহার্য্য নিত্য কার্য্যও ভাল লাগে না। কিন্তু কলালাপে দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ বেশ বিন্যাস ও শয়নসাচ্ছন্দ্য সম্পাদনার্থ কয়েকটী কলার সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক সুখানন্দের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা ধারাবাহিকরূপে সেই কলা কয়টীর উল্লেখ করিতেছি। "বিশেষকচ্ছেদ্য" এই কলাটীর অর্থ,—তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা। যাঁহারা প্রতিদিন আহ্নিক পূজার পূর্ব্বে দ্বাদশাঙ্গে তিলক ধারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে,
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌচ মধুসূদনম্
ত্রিবিক্রমং কন্ধারেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

ব্রহ্ম যে সর্ব্বভূতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। তিলক-ধারণকালে দ্বাদশাঙ্গে অনন্তনাম ব্রহ্মের দ্বাদশটি নাম স্মরণ করিবার বিধি আছে। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণু, বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধারে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম কন্ধরে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিদেশে দামোদরকে স্মরণ করিবে। চন্দন, গোপীমৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি অনেকগুলি বস্তু দ্বারা তিলক ধারণ করা হয়। এই তিলকে নানাবিধ বিচ্ছেদ রচনা করা বা নক্সা কাটার নাম বিশেষকচ্ছেদ্য। মনে প্রচুর পরিমাণে ভক্তি-রস না থাকিলে আর ঐ সকল কার্য্য হইয়া উঠে না।

২৬। কেশশিখরাপীড়যোজন,—বেণীরচনা, কবরীবন্ধন, চূড়াধারণ, কেশকুঞ্চনাদি দ্বারা মস্তকের বেশ বিন্যাস। রজত কনক দাম, পত্রকুসুম মাল্যাদির সংযোজনও উহার অন্তর্গত।

কাণ সহকারে এই কলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঢাকা অঞ্চলের স্বর্ণকারেরা রমণীগণের বহুবিধ শিরোভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ফুল, কাঁটা, ভ্রমর, প্রজাপতি, চিরুণী, বাগান ইত্যাদি। বিলাতী বিলাসিনীগণ যদিও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কেশকবরীতে কিছু ধারণ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের টুপিতে এই কলার চূড়ান্ত বিলাস দেখা যায়। কোন কোন মেম সাহেবের টুপির উপর এত লতা-পাতা-ফল-ভ্রমর-প্রজাপতি দৃষ্ট হয় যে বোধ হয়, যেন এক একটী বাগান মাথায় করিয়া চলিয়াছেন। আপীড় শব্দে পাখীর পাখা। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে হিন্দু রমণীগণ মস্তকে বিবিধ পক্ষীর পালক ধারণ করিতেন। এখন সভ্য মেমেরা ও অসভ্য রমণীরা পক্ষীর পালক দ্বারা মস্তকের বেশ রচনা করিয়া থাকেন।

২৭। কর্ণপত্রভঙ্গ,—শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণী নামক টীকায় চতুঃষষ্টি কলার ব্যাখ্যা আছে। তাহাতে এই কলাটিকে কর্ণের চিত্রময় অলঙ্কার বলা হইয়াছে। কর্ণের ধাতুময় ও মণিমাণিক্যময় বিবিধ আভরণ ও তন্নির্ম্মাণের বিদ্যা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রময় আভরণত কিছুই দেখা যায় না। উড়েরা কাণে শ্বেত ও রক্তচন্দনের ২।৪ টা বিন্দু ধারণ করে এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কর্ণের নিম্নভাগে রক্ত চন্দনের এক একটী গোলাকার ফোঁটা ধারণ করেন, ইহাই দেখা যায়। ফলে এই কলাটীর অর্থ ভাল বুঝা গেল না।

২৪। শয়ন রচন,—পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ। যদিও খাট, তক্তপোষ, চৌকি, কোচ, নৌকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্ববর্ণিত তক্ষণের অন্তর্গত, তথাপি শুদ্ধ শয়নার্থ পর্য্যঙ্কাদি নির্ম্মাণ একটি পৃথক্ কলার মধ্যে পরিগণিত। "একবিদ্যা সুশিক্ষিতা"। একজনে পাঁচ কাজ করিলে কোন কাজ ভাল হয় না। এই জন্য কেবল শয়নবিলাসিগণের শয়নাধার নির্ম্মাণার্থ একটী পৃথক্ কলার সৃষ্টি হইয়াছিল।

২৯। চিত্রাযোগ—বিবিধ অদ্ভুত বিষয় প্রদর্শন। ছায়াবাজী, ম্যাজিক্, সহরবিন, নখদর্পণ ইত্যাদি ব্যাপার এই বিদ্যার ফল। রাত্রিকালে অল্পালোক-ভাসিত স্থানে বস্ত্রাবাস মধ্যে কাষ্ঠ, কাগজ, তালপত্রাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা লইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করে। সেই সকল ক্রীড়াশীল পুত্তলিকার ছায়া বস্ত্রে পতিত হয়। বহিঃস্থ দর্শকগণ তদ্দর্শনে আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার নাম ছায়াবাজী।

ম্যাজিকের প্রকরণ প্রায় ঐরূপ, কিন্তু উহা উচ্চ শ্রেণীর ক্রীড়া। ইহাতে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উপকার আছে। উহার সহিত খগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের সম্পর্ক থাকায় উহা দ্বারা দর্শকগণের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, উল্কাপাত, চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ইত্যাদি গুরুতর বিষয় সকল ম্যাজিকে প্রদর্শন করা হয়। অনেক প্রাচীন ইউরোপীয় অধ্যাপক

এ বিষয়ে বিশেষ কৌতুকী ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে ম্যাজিক দ্বারা জ্যোতিষ ও খগোলের গুরুতর তত্ত্বনিচয় শিক্ষা দিতেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের পূর্ব্বতন ইন্স্পেক্টার (পরে ডিরেক্টর) উড্রো সাহেবের এ বিষয়ে বড়ই আমোদ ছিল। তিনি স্বসমকালীন অনেক হাই স্কুলে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উড্রো সাহেবের পর তাঁহারা কিছুদিন এখানে সেখানে ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন। এখন আর উহার বড় একটা আলোচনা দৃষ্ট হয় না। শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণ এই প্রয়োজনীয় কলাটীর শিক্ষা ও আলোচনা বিষয়ে মনোযোগ করেন, ইহা নিতান্তই প্রার্থনীয়।

সহরবিনের প্রচলন উত্তমরূপই আছে বোধ হয়। পৃথিবীস্থ বড় বড় নগর, রাজধানী, পর্ব্বত, জলপ্রপাত, প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঝটিকা ও ভূকম্পকালীন প্রকৃতির অবস্থা, বৃহৎ বৃহৎ নদ নদী, পৃথিবীর বিস্ময়কর সপ্ত পদার্থ, আধুনিক বড় বড় সেতু, লৌহবর্ত্ম, সমুদ্রে ঝড়, অরণ্যে সিংহ-ব্যাঘ্র-বন্যশূকর-গণ্ডারাদি শিকার,—ইত্যাদি বহুবিধ আশ্চর্য্য পদার্থের আলোকচিত্র (Photograph) অণুবীক্ষণজাতীয় কাচ নলিকা দ্বারা প্রদর্শনের নাম সহরবিন্। অধিকাংশ হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীপুরুষ যেখানে সেখানে এক একটী পয়সা লইয়া উহা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এক একটী পয়সা খরচ কাহারও গায়ে লাগে না,—অথচ উহার দ্বারা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ হয়। বিশেষতঃ ভূগোলশাস্ত্র অধ্যয়নকালে মানচিত্র দর্শনে স্থান সন্নিবেশাদির যেরূপ স্থূল অভিজ্ঞতা জন্মে, সহরবিন্ দর্শনে বিশেষ বিশেষ বস্তুর একটু বিশেষ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। যিনি চিরকাল হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সীতকুণ্ড, জ্বালামুখী, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র, নায়গেরা, বিসুবিয়স্, লণ্ডন, পারিস, প্রভৃতির নাম শুনিতেছেন, —কখনও দেখেন নাই,—দেখিবার আশাও নাই, তাঁহারা সহরবিনে কথঞ্চিৎ সেই সকলের বিন্দুমাত্র সংস্কারও লাভ করিতে পারেন। সহরবিন্ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থনিচয়ের বিচিত্র চিত্র দর্শন যে এত সহজ হইয়াছে, তাহা ইংরাজের গুণে,—দেশীয়দিগের তাহাতে কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই। যাহাই হউক, যাহাতে ঐ কলাটী বজায় থাকে এবং তাহার ক্রমশঃ আরও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী মেলার অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে ঐ মেলাস্থলে নানাস্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সহরবিন্ আইসে এবং বহুসংখ্যক লোকে সচ্ছন্দে তাহা দর্শন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

নখদর্পণ নামক ব্যাপারটী এককালে এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। উহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড। বোধ হয়, প্রকৃত

"চিত্রাযোগ", এই নখদর্পণ ক্রিয়ায় পর্য্যবসান পাইয়াছিল। কেননা ইহার সহিত বাস্তবিকই একটু যোগবলের সংস্রব ছিল। এইরূপ শুনা গিয়াছে, যিনি যাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার আপন দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখরদ্বয় মধ্যে, চিত্রাযোগ কলাবিৎ ব্যক্তি তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। উহার প্রকরণ এইরূপ ছিল;—দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ পাশাপাশি করিয়া আপন চক্ষুর উপর ধরিতেন এবং কলাবিদের উপদেশমত চিত্ত সংযত করিয়া ঐ নখদ্বয়ের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। কলাবিৎ তাঁহার নিকটে বসিয়া মনে মনে মন্ত্রাদি পাঠ ভিন্ন আর কিছুই করিতেন না। ক্রমে দর্শনেচ্ছু ব্যক্তি অভীষ্ট বস্তুর দর্শন পাইতেন। অপহৃত দ্রব্যাদির পুনঃপ্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অন্বেষণ, প্রোষিত পতির এবং সৈরিন্ধ্রীর গতি প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ, প্রয়াণ (যুদ্ধযাত্রা) কারীর শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়েই নখদর্পণ ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। চোর অপহৃত দ্রব্যের সহিত কোথায় কি রূপে অবস্থান করিতেছে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তি কোন্ দেশে কি করিতেছে, বিদেশী পতি বিদেশে এবং পতিবিরহিণী ভার্য্যা গৃহে কি করিতেছেন, যোদ্ধা রণভূমিতে কি অবস্থায় আছেন, ইত্যাদি বিষয় নখদর্পণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু "হস্তলাঘব" নাম্নী কলার বিষয় আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি তাহার সহিত তুলনা করিলে, "নখদর্পণের" বিবরণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল কলার এককালে লোপ হইয়াছে। তত্তদ্বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, এই জন্যই সত্য বিষয় সকল অসত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

পূর্ব্বকালে আমাদের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল সংসারেই কেমন সুখশান্তি ও ধর্ম্ম ভাব বিরাজিত থাকিত এবং সংসারধর্ম্মকেই তাঁহারা স্বর্গের সোপান বলিয়া জানিতেন। কেননা সংসারধর্ম্ম হইতে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করা যায়, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম হইতে হয় না। সদ্‌গুণের বশীভূত হইয়া সুচারুরূপে সংসার প্রতিপালন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সেই জন্যই তাঁহাদের সময়ে সংসারধর্ম্ম এত সুখের ছিল ও প্রত্যেক গৃহস্থই একরূপ এক একটি আদর্শ পরিবার ছিলেন। অশান্তি ও অসচ্ছন্দতা কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না এবং ধর্ম্মচ্যুত হইয়া কখনও কোনও কর্ম্ম করিতেন না।

তাঁহাদের সময়ে মনুষ্যহৃদয়ে ধর্ম্মভয় বড়ই প্রবল ছিল। অধর্ম্মকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা ও ভয় করিতেন এবং সেই জন্যই সতত শান্তিতে বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়! এখন আমাদের অবস্থা কি হইয়াছে? আমরা আমাদের আর্য্যনারীগণের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ছাড়িয়া ভিন্নজাতীয় রীতি, নীতির অনুকরণ করিয়া কি অশান্তিতে বাস করিতেছি! আমাদের আর্য্যমহিলাগণ অপেক্ষা আমরা কত উন্নতি লাভ করিয়াছি, ইংরাজী সভ্যতায় সকল বিষয়ে, ধনে, মানে, অর্থে ও বিদ্যায় আমরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কত উচ্চতর অবস্থা লাভ করিয়াছি এবং যথেষ্ট স্বাধীনতাও পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহাদের মত আদর্শ সংসার করা দূরে থাকুক, কিরূপ রীতি নীতি অনুসারে চলিলে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে সুখে বাস করা যায় এবং সংসার সুখের আগার হয়, তাহা আমরা জানি না বা জানিতে ও শিখিতে চেষ্টাও করি না। আমাদের শিক্ষায় ও স্বাধীনতায় এখন এই ফল হইয়াছে। স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এবং স্বাধীনতা পাইয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়া আপন পরিবারবর্গকে চিরসুখী করিবে। তাহা না হইয়া এখন আমাদের সংসারের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এমন কি কোন কোন শিক্ষিতা মহিলার সংসারের দুরবস্থা, বিশৃঙ্খলতা ও উদ্ধত স্বভাব হেতু গুরুজনদিগের মনঃকষ্ট দেখিলে যথার্থই আক্ষেপ হয় এবং বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ঘৃণার উদয় হয়। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করিবার অথবা পুরুষ সাজিবার জন্য নহে। যে মহাত্মারা আমাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য আমাদিগের ধন্যবাদের পাত্র। স্ত্রীশিক্ষায় অনেক উপকার আছে সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া পুরুষ হইলে সংসার সুখের হয় না। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া গুরুজনদিগকে সুখী করা এবং যত্নে পুত্র কন্যা পালন করা ও তাহাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া। সংক্ষেপে বলিতে গেলে নিজ নিজ সংসার যাহাতে আদর্শ পরিবার হয়, তাহার চেষ্টা করা। আদর্শ হিন্দু-সংসার বড়ই সুখের ও শান্তির এবং প্রীতির আগার। অতএব আমরা যদি এখনও সাবধান হই এবং আমাদের ধর্ম্মপ্রাণা পিতামহী, মাতামহীদিগের পবিত্র রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার শিখিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকের সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। আদর্শ হিন্দু সংসারে যে কি সুখ শান্তি ও সচ্ছলতা পাওয়া যায়, তাহারই একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আজ আমি উপস্থিত হইতেছি।

২৪ পরগণার অন্তর্গত এক গ্রামে সামান্য অবস্থার এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার মাসিক আয় ৩০৲ মাত্র। ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোনও আয় অথবা পৈতৃক সম্পত্তিও

কিছু ছিল না। তাঁহার এই যৎসামান্য আয়ে অনেকগুলি প্রাণীর ভরণ পোষণ হইত। পরিবারমধ্যে তাঁহার ৫টি পুত্র ও ৩টি কন্যা, স্ত্রী ও একটি ভগিনী এবং নিজে, এই ১১টি প্রাণীর জীবনের সম্বল উক্ত ৩০ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী এমন মিতব্যয়ী ছিলেন যে, তাঁহাদের কোন কষ্ট না হইয়া স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। সংসার আপাততঃ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া উক্ত গৃহস্বামী কখনও নিশ্চিন্তভাবে আলস্যে কাল কাঁটান নাই। যাহাতে পরিণামে সংসারটির সকল বিষয়ে মঙ্গল হয়, সেই জন্য সতত চেষ্টা করিতেন ও সকল সময় সেই সর্ব্বদুঃখহারী হরিকে স্মরণ করিতে ভুলিতেন না। একান্তমনে হরিকে ডাকিতে পারিলে তাহার ফল যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণের সংসার তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। ভাগ্যফলে ব্রাহ্মণ একটি সর্ব্বগুণশালিনী রমণীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহার অপরিসীম গুণে আজ তাঁহার সংসার আদর্শ হইয়াছে। স্ত্রীজাতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ ধর্ম্মভয়, লজ্জা, নম্রতা, শ্রমশীলতা, গুরুভক্তি, দয়া, এ সকল গুণ উক্ত রমণীতে ছিল। ইনি একজন ধনী ব্যক্তির কন্যা ছিলেন। ধনীর কন্যা বলিয়া দরিদ্র স্বামীকে কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। স্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও অলৌকিক প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেন। স্ত্রীলোকের যে স্বামীই একমাত্র দেবতা ও গুরু, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এইজন্য ইহাঁদের স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। স্বামী যখন যে বিষয় বলিতেন, স্ত্রী সানন্দচিত্তে তাহা সম্পাদন করিতেন। দম্পতীর মনের ঐক্য না থাকিলে সংসার সুখের হয় না। স্বামীর স্বল্প আয় বলিয়া উক্ত গৃহিণী কখনও অণুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেন না, স্বামীকে বাক্যজ্বালায় জ্বালাইতেন না। উপযুক্তা স্ত্রী পাইয়াছিলেন বলিয়া স্বামী সংসারের সমস্ত ভার স্ত্রীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন এবং যাহাতে সংসারে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে সতত তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। গৃহিণী ঐ অল্প আয়ে সংসারটি এমন করিয়া চালাইতেন যে,পাড়াপ্রতিবেশী সকলের দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত। নিজের অথবা পুত্র কন্যাদের কাহারও বিলাসিতা এ সংসারে ছিল না। স্বামী বেতন পাইলেই তাহা গৃহিণীর হাতে সমস্ত দিতেন। গৃহিণী সানন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতেন। পরে সেই অল্প টাকা হইতে সর্ব্বাগ্রেই দান ধর্ম্মের নিমিত্ত ২ টাকা রাখিয়া বাকি টাকায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অল্প টাকা আয় বলিয়া নিজের সাহায্যের জন্য কোনও দাস দাসী রাখেন নাই। সমস্ত দিন নিজে পরিশ্রম করিতেন এবং যত্নে পুত্র কন্যাদের পালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন। যতদূর সাধ্য পরিশ্রম করিয়া আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নিজ

হস্তেই প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার শারীরিক কষ্টের কথা শুনিলে পাছে স্বামী মনে দুঃখ পান, এই জন্য কখনও তিনি স্বামীকে কষ্টের কথা বলিতেন না। স্বামী যদি কখনও কষ্টের কথা বলিতেন, স্ত্রী হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিতেন এবং স্বামীর মন ভুলাইয়া রাখিতেন। বলিতেন আমাদের ভগবান্ যা দিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট, আমাদের অপেক্ষা কত দরিদ্র আছে, আহা! তাহাদের না জানি কত ক্লেশ হয়! আমার কোনও কষ্ট নাই, বেশ সুখে দিন চলিতেছে,—তুমি বৃথা দুঃখ করিও না। এইরূপ ভাবে স্বামীকে সতত আনন্দে রাখিতেন ও নিজেও সতত প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন। তিনি একাকী সাংসারিক কার্য্য সকল এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করিতেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ও শত মুখে প্রশংসা করিত। গৃহিণী প্রত্যূষে ঈশ্বর ও স্বামীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। স্বহস্তে ঘর-গোবর, ছড়া, ঝাঁট, কাপড় কাচা প্রভৃতি গৃহকার্য্য সকল সম্পাদনপূর্ব্বক শেষে স্নান করিয়া রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতেন। স্নান করিয়া বাটীর একটি নির্জ্জন স্থানে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন ও স্বামী পুত্রের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বমঙ্গলার নিকট মাথা খুঁড়িতেন। পরে স্বামী ও পুত্রদিগকে আহার করাইয়া কিছুকাল পরে আনন্দিতচিত্তে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া নিজে সর্ব্বশেষে শাকান্ন ভোজন করিতেন। উক্ত গৃহিণীর দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও অতিথিতে অত্যন্ত ভক্তি ছিল। যে কোন সময়ে হউক, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন এবং যতক্ষণ অতিথিকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না দেখিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। এক দিন দেখিলাম, বেলা ৩টার সময় একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আসিয়া ইহাঁর বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া মা, মা, বলিয়া চিৎকার করিতেছে। গৃহিণী কোন কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু যেই তাঁহার কাণে উক্ত শব্দ গিয়াছে, তিনি অমনি সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সেই বৃদ্ধ লোকটির নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি কি চাও?" তখন বৃদ্ধ বলিল, "মা! আমি আজ দুই দিনের উপবাসী, আমার বাড়ী এখান হইতে ছয় ক্রোশ। এই গ্রামে এক জন বৈদ্য আছেন, তাঁহারই নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তাই তোমার বাড়ী আসিয়া পড়িলাম, আমাকে একটু আশ্রয় দাও ও একটু জল দাও।" গৃহিণী বৃদ্ধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন "বাবা! তুমি বসো, আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া গৃহমধ্যে গিয়া তাহার বসিবার জন্য একটি মাদুর ও তাহার পুত্রদের জন্য যে মিষ্টান্ন রাখিয়াছিলেন, তাহাই ও এক ঘটি জল আনিয়া উক্ত

রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে আহার করাইয়া সেই মাদুরে শয়ন করিতে বলিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ রন্ধনঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া তাহার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বৃদ্ধকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া নিজের শয়নঘরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে তাহাকে উত্তম শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন। পরে নিজ পতির নিকট উক্ত বৃদ্ধের অবস্থা জানাইয়া তাহার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামী স্ত্রীর এরূপ দয়ার ও অতিথিসেবার কথা শুনিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পর দিবস তাহার ভালরূপ শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণীর সেবা ও যত্নে বৃদ্ধটি সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী চলিয়া গেল। রোগগ্রস্ত দরিদ্র বৃদ্ধকে উক্ত গৃহিণী ও কর্ত্তা, পুত্রের মত সেবা যত্ন করিতেন। একদিনও তাহার প্রতি মনে মনে ঘৃণা বা বিরক্তি বোধ করেন নাই—এমন কি তাহার মল মূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়াছেন এবং সে সুস্থ হইলে তাহাকে কোন লোক সঙ্গে দিয়া তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। আহা! কি আশ্চর্য্য দয়া! ইহাঁরা এরূপ দয়া প্রকাশ না করিলে হয়ত বৃদ্ধের জীবন অকালে নষ্ট হইত ও শেষে সে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইত। উক্ত বৃদ্ধেরই আন্তরিক আশীর্ব্বাদে ক্রমে ক্রমে ইহাঁর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রত্যেক সংসারের গৃহিণীর হৃদয়ে এইরূপ দয়া থাকা উচিত। যদি সকল স্ত্রী এবং পুরুষের মনে এইরূপ দয়া ও মমতা থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর কত নিঃসহায় জীবের মঙ্গল হয় ও কতশত জীব অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়! (ক্রমশঃ)

ত্রয়োদশ জাতীয় মহাসমিতি।

এ বৎসর মধ্যভারতের অন্তর্গত অমরাবতী নগরে "কংগ্রেস" বা জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভারতের যেরূপ দুর্ব্বৎসর, তাহাতে এবার ভারতবাসিগণ নানা স্থান হইতে যে একত্র সম্মিলিত হইতে পারিবেন, তৎপক্ষে অনেক সন্দেহ ছিল। যাহা হউক, সভাস্থলে ছয় সাত শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্থানীয় লোকেরও মহা জনতা হইয়াছিল এবং বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী ও ইংরাজ প্রায় ২০০ মহিলা সভামণ্ডপকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় রমণীদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা না থাকাতে তাঁহারা অবাধে পুরুষ-দিগের সহিত প্রকাশ্যে আসন গ্রহণ

করিয়াছিলেন। মণ্ডপটী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত ও সুন্দর কারুকার্য্যে বিভূষিত হইয়াছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেদীর উপর স্বর্ণ ও স্ফটিকমণ্ডিত বিচিত্র আসন বিস্তারিত এবং ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপে মহারাণীর সহিত জাতীয় সমিতির সুন্দর চিত্রপট অঙ্কিত হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১॥টার সময় সভাপতির সহিত সদস্যগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি মহাত্মা খাপার্দ্দে এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মনোনীত সভাপতি শ্রীযুক্ত সঙ্কর নায়রের পরিচয় দিলেন। সভাপতি সভাকর্ত্তৃক বৃত হইয়া এক সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ ৩ সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৎপরে দুই দিবস সভার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হয়। প্রস্তাব সকলের সংক্ষেপ মর্ম্ম লিখিত হইল:—

(১) কংগ্রেসের মতে ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সীমান্ত-নীতি ইংরাজরাজ্যের, বিশেষতঃ এ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। কংগ্রেসের অনুরোধ, এ নীতি আর অবলম্বিত না হয়। বিলাতের স্বার্থরক্ষার্থ ইহা আবশ্যক হইলে ইহার অধিকাংশ ব্যয় ইংলণ্ডীয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রস্তাবক বোম্বাইয়ের বাচ্চা, পোষক হিন্দু সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

(২) দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ে ভারতের রাজস্বের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় এবং সীমান্ত-যুদ্ধের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থ জড়িত থাকায় পার্লামেণ্ট গত আফগান যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধেরও অধিকাংশ ব্যয় বিলাত হইতে দিবার অনুমতি করেন।

প্রস্তাবক বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পোষক লাহোরের শ্রীযুক্ত যশীরাম।

(৩) বিলাতের রয়াল কমিশন ভারতবাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কয়েকটী প্রার্থনা।

প্রস্তাবক এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীর, পোষক বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, সমর্থক মান্দ্রাজের পার্থ সারথি নাইডু ও নাগপুরের কেশবরাও যশী।

সভাপতি নিজেই প্রস্তাব করেন:—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রস্তাবিত আবকারী আইন, অস্ত্র আইন, সখের সৈন্য, বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ, শিক্ষা সার্ব্বিস পুনর্গঠন, জুরীপ্রথা ও ব্যবস্থাপক সভা প্রচার, কুলী আইন ইত্যাদি।

(৫) ভারতে ও বিলাতে উভয় স্থানে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রার্থনা।

(৬) দেশীয় রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের শাসন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে বিজ্ঞাপন আছে তাহা রহিত করা।

(৭) যে সকল প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, সেখানে তাহার প্রচলন।

প্রস্তাবক বারিষ্টার জন এভান্‌স্, পোষক বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গরুড়।

(৮) শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগ পৃথক্ করা।

প্রস্তাবক জে চৌধুরী, পোষক বোম্বাইয়ের শীতলবাদ।

(৯) প্রজার দরিদ্রতা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণার্থ দুর্ভিক্ষ কমিশন কে অনুরোধ করা।

শেষ দিবস পুনা বিভ্রাট ও সাময়িক আরও কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

জাতীয় সভার আগামী অধিবেশন মান্দ্রাজে হইবার সম্ভাবনা। মান্দ্রাজ কমিটি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাসময়ে সাধারণকে জ্ঞাপন করিবেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস।

জীবন আহুতি দিয়ে
মহাযজ্ঞ-দেশহিতে
দেখালে যে দেবভাব
দেখিব কি অবনীতে ?
হাসিতে হাসিতে সুখে
বীরেন্দ্র-কেশরী আজ
চলিলেন সুরপুরে
সাধিয়ে দেশের কাজ।
সংসার-সংগ্রাম ক্ষেত্রে
মহাবীর্য্য প্রকাশিয়া
নাশিলা কু-দেশাচার
বসুমতী কাঁপাইয়া।
শত শত অত্যাচার
লইলা মস্তক পাতি,
সহিলা তাড়না কত
অদম্য উৎসাহে মাতি।
অটল অচল সম
টলাইবে সাধ্য কার ?
পায়ে ঠেলি শত বাধা
আগুয়ান অনিবার।
অবলা-বান্ধবহীন
বঙ্গের অবলাকুল
তুলিয়াছে হাহাকার
মহাশোকে শোকাকুল।
অকাতরে অন্নদান
দুখিনী বিধবা তরে
কে করিবে বল আর ?
কার চক্ষে অশ্রু ঝরে ?
অতুলন ক্ষমাগুণে
চিরশত্রু নতশির,
কে দেখেছ ধরাতলে
এ হেন ধরমবীর ?
যে করিত নির্য্যাতন
তারে দিয়ে আলিঙ্গন
বাঁধিতেন স্নেহগুণে
এমনি উদার মন !
মধুর প্রকৃতি হেরি
অবাক্ মোহিত সবে,
সরল শিশুর মত
আর কি সেরূপ হবে ?
হারানিধি পেয়ে আজ
হারাইলে সে রতনে,
কে আছে মা তোর মত
কাঙ্গালিনী এ ভুবনে ?
কোল হতে কেড়ে নিল
অঞ্চলের নিধি কাল,
কাঁদিতে এসেছ ভবে
কাঁদ বসে চিরকাল।
যাও যাও যাও দেব
সেই দেবতার দেশে
অসার অনিত্য ভুলি
পরম যোগীর বেশে।
পশারিয়া প্রেম-বাহু
কোলে নিয়ে স্নেহময়ী
তুষিছেন কত মতে,
দিব্য চক্ষে দেখ তাই।
সযতনে সাজাইয়া
মণিময় আভরণে
বসায়ে দেবতা পাশে
দেবতার সিংহাসনে,
আশীষ করিছে কত
স্নেহময়ী স্নেহে গলি,
দেবতাসমাজে আজ
সকলেই গলাগলি।
সার্থক জনম তব
সাধিয়ে দেশের কাজ
অমর হইলে তুমি
অমর লোকেতে আজ।

শ্রীচ।

ঐতিহাসিক রহস্য।

১। দাসী রাজবংশের জননী।

ইংলণ্ডেশ্বর ১ম চার্লসের রাজত্বসময়ে একটী পল্লীগ্রামস্থ নিরুপায় দুঃখিনী বালিকা চাকরাণীর কাজের জন্য লণ্ডন সহরে আইসে। অন্য কোনও কার্য্য না পাওয়াতে বালিকা মুটিয়ার মত একটী মদের ভাঁটী হইতে মদ্য বহন কার্য্য করিতে লাগিল। ভাঁটীওয়ালা মেয়েটীর রূপ আছে দেখিয়া তাহাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করিল। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে বালিকা তাহার ধন সম্পত্তির অধিকারিণী হইল। হাইড সাহেব (পরে যিনি ক্লারেণ্ডনের আরল হন) তখন ওকালতীর কার্য্য করিতেন। এই রমণীর সম্পত্তির ব্যবস্থার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। চতুর উকীল ইহাঁকে রূপবতী ও ধনশালিনী দেখিয়া ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের ফল একমাত্র কন্যা। তিনি ইংলণ্ডেশ্বর ২য় জেম্‌সের সহধর্ম্মিণী। ইনি ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী মেরী ও আনের গর্ভধারিণী।

২। বোনাপার্টিদিগের পত্নীগণের দুর্দ্দশা।

চার্লস বোনাপার্টি ও লেটিসিয়া রামোলিনো মহাবীর নেপোলিয়নের জনক ও জননী। ইহাঁদের ৫টী পুত্র—যোজেফ, নেপোলিয়ন, লুসিয়েন, লুই ও জেরোম। নেপোলিয়ন যখন রাজ-রাজেশ্বর, তাঁহারই প্রভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোজেফ স্পেনের অধীশ্বর হন। তিনি রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাদিগের নিতান্ত অপ্রিয় ছিলেন। নেপোলিয়নের পতনে তাঁহারও পতন হইলে তিনি আপনার স্ত্রী জুলিয়া ক্লারাকে লইয়া ত্রিসংসার পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় স্থান পান নাই; অবশেষে ফ্লোরেন্স নগরে অস্থি রাখিয়া শান্তিলাভ করেন। ইহাঁর পত্নী মার্সেলের এক ধনাঢ্য বণিকের কন্যা ছিলেন। স্বামীর

মৃত্যুর পর বৃদ্ধাবস্থায় দীন দুঃখিনী বিধবা সকলের পরিত্যক্তা হইয়াও নিশ্চিন্তা হইতে পারেন নাই। তাঁহার উপর রাজদণ্ডাজ্ঞা—'যে কেহ তাঁহাকে দেখিবে, মারিয়া ফেলিবে।' তিনিও মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের দুই পত্নী—প্রথম সুপ্রসিদ্ধা পতিপরায়ণা যোজেফাইন। তিনি স্বামীর কষ্ট দুঃখ ও জীবনসংগ্রামের চিরসঙ্গিনী হইয়া যখন স্বামী সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহা কর্ত্তৃক নিরপরাধে পরিত্যক্তা হইলেন এবং মনের দুঃখে জীবন শেষ করিলেন। দ্বিতীয় পত্নী অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইসা—ঘোর গর্ব্বিতা ছিলেন। স্বামীর মহাসিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী হইয়া যেমন আকাশে উঠিলেন, তাঁহার পতনেই তেমনি নিম্নতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন এবং অবশেষে এক সামান্য কারাগারের বন্দিনী হইয়া শেষ জীবন অতিবাহন করিলেন।

লুসিয়েন বোনাপার্টি ক্রিষ্টাইন বয়ার নাম্নী এক সামান্য ঘরের মেয়ে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুইটী পুত্র হয়। কিন্তু তাঁহার অকালে মৃত্যু হওয়াতে ১৮০২ সালে লুসিয়েন আলেক্‌জাণ্ড্রাইন জুবার্থন নাম্নী এক দালালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এ সমময় নেপোলিয়ানের ভারী দপ্‌দপা, তিনি বিপত্নীক ভ্রাতার কোনও রাজারাজড়ার ঘরে বিবাহ দিবার পন্থা খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া মহা কোপান্বিত হন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার মুখ দর্শন করেন নাই। আলেকজাণ্ড্রাইন সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী নিরীহ ধাতুর লোক থাকাতে তাঁহার উচ্চ আশা আদৌ পূর্ণ হয় নাই। ইটালীর এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ১৮৫৫ সালে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

চতুর্থ পুত্র লুই সাম্রাজ্ঞী যোজেফাইনের প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হর্টেন্স বোহারণেকে স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ নেপোলিয়ান এই উদ্বাহযোগ সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; লুই তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য দুইবার বিদেশে পলায়ন করেন, কিন্তু অবশেষে ভ্রাতার আজ্ঞাধীন হন। এ বিবাহ দম্পতীর কাহারও সুখের কারণ হয় নাই। ১৮০৭ সালে লুই পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। বিপক্ষ সেনানীরা পারিস অধিকার করিয়া হতভাগিনীকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তিনি আরেনবর্গ নামক স্থানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কলেবর পরিত্যাগ করেন।

পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র জেরোম ১৮০৩ সালে বাল্‌টিমোরের এলিজেবেথ পাটার্সন নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহা নেপোলিয়নের মনোনীত না হওয়াতে তৃতীয় সহোদরের ন্যায় ইনিও তাঁহার ক্রোধ খর্পরে পতিত হন। লুসিয়েনের ন্যায় জেরোমের চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না,

এজন্য মহাতেজা ভ্রাতার আদেশে তিনি অচিরে ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়ার্টেনবর্গের কাথারিণকে পত্নীত্বে বরণ করিতে বাধ্য হন। ভ্রাতাও আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ জেরোমের জন্য ওয়েষ্ট-ফেলিয়া নামক এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি করেন এবং তাহার সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। যাহাহউক জেরোমের দুই পত্নীর জীবনই দুঃখের জীবন। পাটার্সন আলেকজান্দ্রাইনের ন্যায় সুন্দরী ও উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন এবং নেপোলিয়নের প্রভাবে রাজমুকুট ধারণের আশাতেও আশান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিনা মেঘে তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়া তাঁহার সকল আশা চূর্ণ করিল। তিনি অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ তাঁহার প্রতি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণে সান্ত্বনা লাভ হয় নাই। তিনি চিরদিন নিগূঢ় মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইয়া জীবন অবসান করিয়াছিলেন। তাঁহার সপত্নী কাথারিণ ১৮১৩ সালে সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি দুর্ভাগ্য স্বামীর সহিত একটু আশ্রয়-স্থান লাভের জন্য ভিখারিণীর ন্যায় অষ্ট্রিয়া, ইটালী ও সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, অবশেষে লসান নামক স্থানে মৃত্যুর ক্রোড় আশ্রয় করিয়া দুঃখময় জীবনের অবসান করেন।

নেপোলিয়ন বংশের উপর কি দারুণ অভিসম্পাত! এই বংশের দুইটী রাজ্ঞী দুর্ভাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছেন:—একটি লুই নেপোলিয়ানের পত্নী সাম্রাজ্ঞী ইউজিন, দ্বিতীয়া ইটালীর রাজকুমারী ক্লটিডা। ইউজিনের সম্পূর্ণ নাম ইউজিন মেরী ডি মণ্টিজো। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে ১ম নেপোলিয়নের মৃত্যু হইলে তাহার ৫ বৎসর পরে স্পেনের রাজ-বংশে ইহাঁর জন্ম হয়। লুই নেপোলিয়ন বুদ্ধিকৌশলে যখন ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিয়া ৩য় নেপোলিয়ন নাম গ্রহণ করেন, তখন কুমারী ইউজিন মাতার সহিত পারিস দর্শনে আসেন। নেপোলিয়ন তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। তাঁহার বন্ধুগণ এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। সাম্রাজ্ঞী ইউজিন ১৩ বৎসরকাল সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য লাভ করিয়া পৃথিবীতে মহোচ্চপদ ও পার্থিব সুখের পরাকাষ্ঠা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরাসী জর্ম্মণ সমরে ফ্রান্সের পরাজয় হওয়াতে তাঁহার শিরে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। তিনি রাজ্যসম্পদ ও পতি হারাইয়া ফ্রান্সে মাথা রাখিবার একটু স্থান পাইলেন না, ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে গ্রেট-ব্রিটেনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অনাথ সন্তানকে লইয়া স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। সে অবশেষে নেপোলিয়নবংশের শেষ আশার স্থল তাঁহার একমাত্র পুত্র ইংরাজ

পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়া অসভ্য আফ্রিকা-বাসীদের হস্তে নিহত হইয়াছেন। স্বামি-পুত্র-হীনা হৃতসর্ব্বস্বা বর্বীয়সী ইউজিনের মত দুর্ভাগিনী আজ আর কে?

রাজকুমারী ক্লটিডা ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা জেরোমের পুত্র প্রিন্স জেরোমের সহিত বিবাহিত হন। ১৮৫৯ সালে ইহাঁর বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন ইহাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহের একটী মহা শুভ ফল ইটালীরাজ্যের ঐক্যবন্ধন। কিন্তু ক্লটিডা চিরদুর্ভাগিনী। শৈশবে ও বাল্যে পিতা ও স্বদেশ কর্ত্তৃক বিক্রীত ও পরিত্যক্ত, যৌবনে স্বামী দ্বারা প্রতারিত, অত্যাচরিত ও অবশেষে বর্জ্জিত হইয়া ৫০ বৎসর বয়স হইতে না হইতে অকাল বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হন। তিনি সাম্রাজ্ঞী ইউজিনের সহচরী হইয়া অনেক দিন পারিসের রাজগৃহে ছিলেন, কিন্তু সেখানে জাঁকজমক ও বাহ্য চাকচিক্যের মধ্যে তাঁহার গুণ কেহ গ্রহণ করে নাই। তিনি স্বামীকর্ত্তৃক নিপীড়িত ও নানাপ্রকারে মর্ম্মাহত হইয়া টিউরিনের নিকট এক নিভৃত স্থানে প্রায় ৩০ বৎসর কাল কাটাইলেন। জীবনে আর যে কখনও সুখের মুখ দর্শন করিবেন, সে আশা নাই। কি আশ্চর্য্য! বোনাপার্টিবংশের সহিত যে রমণী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারই অদৃষ্টে ঘোর ক্লেশ ও দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। ইহার রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে?

নূতন সংবাদ।

১। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিসে যে বিশ্ব-প্রদর্শনী হইবে, রুষীয় সম্রাট তদ্দর্শনে গমন করিবেন।

২। প্রিন্স ভিক্টর দলীপ সিংহ কভেণ্ট্রীর আরল্-কন্যা আনের সহিত বিবাহিত হইয়াছেন।

৩। যে মহাবীর হাবেলক সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরাজপক্ষের জয়সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সীমান্ত যুদ্ধে হত হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার পত্নীকে শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

৪। আগামী বসন্তকালে মহারাণীর ইটালীভ্রমণে যাইবার সম্ভাবনা।

৫। গত ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে নূতন লেডী ডফারিন্ হাঁসপাতালের ভিত্তিস্থাপন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতাল হইয়াছে। ইহার জন্য ব্যয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা হইবে।

৬। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে শম্বুক রন্ধনের ১০০ প্রকার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার্লিনে ১৮১০ প্রকার ভিন্ন

ভিন্নপ্রণালীতে গোল আলু পাক করা হইয়া থাকে।

৭। কুচবিহারের রেলরাস্তা বিস্তারিত হইবে। এজন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২,০০,০০০ টাকা ঋণ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

৮। পুনাতে মড়ক পারদর্শক র‍্যাণ্ড ও আয়ারেষ্ট সাহেবের বিধবা পত্নীদিগের জন্য বাৎসরিক ১৮৭ ও ১৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহাদের সন্তানদের জন্যও অতিরিক্ত বৃত্তি দেওয়া হইবে।

৯। সার উইলিয়ম লকহার্ট বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বোম্বাইয়ের সেনাপতি সার চার্লস নেরল প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি হইবেন।

১০। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের পুত্র মানব মনের চিন্তার ফটোগ্রাফ লইবার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশকর্ম্মার পুত্র বিয়াল্লিসকর্ম্মা!

১১। বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক আয় ১,০০,০০০, কলিকাতার ৪,৮০,০০০ ও মান্দ্রাজের ২,০০,০০০ টাকা।

১২। ২৮৯৬-৯৭ সালের শিক্ষা রিপোর্টে প্রকাশ যে, বঙ্গদেশে কলেজের ছাত্রীসংখ্যা ৯৩, হাইস্কুলের ১৯১, মধ্যস্কুলের ১৬৮২, আপারপ্রাইমারী ২১৭০, নিম্নপ্রাইমারী ১৫৩৩২। বিদ্যালয়ে যাইবার যোগ্য বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ২জন মাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

বামারচনা।

তারা দুটি দেবকন্যা।

তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল পথ ভুলে
আলোক-আলয় হতে
আঁধারের এ মরতে,
দুই দিন এ আঁধারে মধুর জোছনা ঢেলে,
আঁধার আঁধারে রেখে কোথা গেল ফিরে চলে।

তারা দুটি দেবকন্যা এসেছিল খেলা ফেলে;
দুঃখময় এ হৃদয়ে
খেলার পুতুল হয়ে
হেসেছিল খেলেছিল সুখের লহর তুলে;
কেন কাঁদাইয়ে গেল দুই দিন হেসে খেলে!

সুধার সে শিশু দুটি স্নেহে ছিল সুধা মাখা;
হাসিত স্নেহের হাস,
কহিত স্নেহের ভাষ,
স্নেহের লতিকা দুটি দুলাত স্নেহের শাখা,
তারা দুটি ছিল ঘরে স্নেহ যেন পটে আঁকা।

আদরের মেয়ে দুটি আদর বিলা'ত তারা;
আদরে ধরিত গলা,
মোর আদরের দোলা
ছিল সেই মেয়ে দুটি, আদরের ডোরে বাঁধা,
খেলার সঙ্গিনী দুটি এক প্রাণ আধা আধা।

কোথা গেলি তোরা দুটি কৌতুক-জননী মোর ?

তোদের খেলার ছেলে
আজি সত্য আঁখিজলে
ভাসি ডাকে মা মা বলে ; তোরা কেন নিরুত্তর ?

আজি কি নূতন খেলা নিঠুর নিঠুরতর !
বারেক ডাকিলে তোরা ব্যাকুল জননী প্রায়

ছুটে কাছে আসিতিস্
কত কথা সুধাতিস্,
আমারি তাপিত প্রাণ কত স্নেহ মমতায়
জুড়াতিস, নিয়ে এসে স্নেহের মলয় বায়।
স্নেহের পরশ লাগি এখনও এ প্রাণ ধায় ;
তোরা শুধু স্মৃতিমাঝে
নিষ্ঠুর সুন্দর সাজে
বারেক সুদূর পথে দেখা দিয়ে কেন হায় !

আঁধার আঁধারতর করিস বিজলি প্রায় ?
কেন রে এত সুধায় সুধা এত বিষময় !
পুতুল ভাঙ্গিয়া যায়,
কুসুম শুকায় হায় !
কেন তবে ভালবাসা নারি ভুলিবারে তায় !
কেন চিরলুপ্ত ধনে হৃদয় ধরিতে চায় !
আজি ভালবাসা সুখ, কালি প্রাণ কাঁদে তায় !
বিশ্ব ভালবেসে সুখী,
ভালবেসে চির দুঃখী ;
তবু কেন ভালবাসি ? দেব ! একি মায়া হায়
শুনি তুমি ভালবাসা, তবে কেন দুখ তায় ?
দেবতার প্রাণ কিরে কাঁদে না মানবদুখে ?
এই কাল-যবনিকা,
অর্দ্ধ বিশ্ব তাহে ঢাকা;
আর অর্দ্ধ কাঁদিতেছে করাঘাত করি বুকে,
হে দেবতা ! এই দৃশ্য ব'সে কি দেখিছ সুখে ?

শ্রীব।

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

হায় ! বঙ্গবাসী আজি হলো মাতৃহীন ;
অনাথ করি সন্তানে,
শোক দুঃখ জ্বালি প্রাণে,
কোথা গেল আমাদের জননী রতন ;
সন্তানের প্রাণে দিয়ে দারুণ বেদন।
সহায় সম্বল হীন,
করিয়ে দরিদ্র দীন,
স্নেহের পুতুলি সবে হ'লে অন্তর্দ্ধান ;
দয়া ধর্ম্ম তেয়াগিয়া, হইয়ে পাষাণ।
কি উপায় হবে তবে,
কে ভালবাসিবে সবে,
বিতরিয়ে স্নেহ দয়া তোমার মতন,
সন্তানের দুঃখে দুঃখী জননী যেমন ?
আসিয়ে অবনীধামে,
সুযশ রাখিয়ে নামে,
ত্বরিত স্বরগধামে করিলে প্রয়াণ,
মোদের ভরসা আশা হইল নির্ব্বাণ।
ছিল অতুল ঐশ্বর্য্য,
পালিয়াছ ব্রহ্মচর্য্য,
দীনভাবে দিন তুমি করেছ যাপন,
কঠোর বৈধব্য ব্রত করিয়ে পালন।
লোকহিতকর ব্রত,

দয়া ধর্ম্ম অবিরত,
নিজের কর্ত্তব্য ভাবি করেছ পালন ;
করেছ সার্থক ভবে মানব জীবন।
কল্পতরু ছিলে দানে,
দেবী আর্ত্ত-পরিত্রাণে,
প্রেমমন্ত্র জপমালা ছিল জ্ঞান ধ্যান,
প্রাণপণে জগতের, সাধিলে কল্যাণ।
দানশীলা দয়াবতী,
প্রেমময়ী সাধ্বী সতী,
ভুবন ভরিয়ে তব সুযশ অশেষ,
ঘোষিতেছে কীর্ত্তি তব ইহ পর দেশ।
দেশের কল্যাণ তরে,
করি দান অকাতরে,
বিবিধ প্রকারে হিত করেছ সাধন ;
মুক্ত হস্তে স্বীয় ধন করিতে বর্ষণ।
স্কুল আর পাঠশালা,
কলেজ অতিথিশালা,
তোমার সাহায্যে সব হয়েছে নির্ম্মাণ ;
দুর্ভিক্ষেতে অন্নসত্র,
পেত দান দীন ছাত্র,
তোমার প্রেমের চক্ষে সকলে সমান,
পাপী সাধু জ্ঞানী মূর্খে নহে ভেদজ্ঞান।
কত যে চিকিৎসালয়ে,
কত যে অনাথাশ্রয়ে;
রোগাতুর ক্ষুধাতুর পেয়েছে পরাণ ;
বাঁচিয়াছে তাহারা যে পেয়ে তব দান।
কাঙ্গাল অতিথি যত,
নিত্য নিত্য শত শত,
ভুঞ্জিত তোমার অন্ন, করুণা অশেষ ;
হৃদয় গলিত তব, দেখি দীন বেশ।
সুশিক্ষা বিস্তার তরে,
দিয়ে ধন গ্রন্থকারে,
কত উপকারী গ্রন্থ করেছ প্রকাশ ;
করিতে অজ্ঞতা নাশ, জ্ঞানের বিকাশ।
"কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি,"
সত্য যদি এ ভারতী,
তবেত জননী তুমি, রয়েছ জীবিত ;
কার্য্যত না হেরি তোমা, আছি বিষাদিত।
প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিখানি,
স্বর্ণময়ী মহারাণী,
মানস-নয়নে তোমা, হেরি'ছি সতত ;
হৃদয়ের পটে তুমি, রয়েছ অঙ্কিত।
ছিলে আদর্শ রমণী,
নারীকুল-শিরোমণি,
"ভারত-মুকুট" সত্য, ছিলে যে গো তুমি,
সার্থক তোমায় পেয়ে এ ভারতভূমি।
নিজের সুকৃতি তরে,
গিয়াছ স্বরগপুরে,
শান্তিময় বিভুকোলে, লভহে বিশ্রাম ;
ভুল না সন্তানে বলি, অকৃতি অধম।
শোক তাপ সব ভুলে,
থাকিও সদা কুশলে,
সুখেতে রাখুন তোমা, প্রভু প্রাণারাম,
নাহি সেথা দুঃখ তাপ, সে যে শান্তিধাম।
লিখিতে গুণকাহিনী,
অক্ষম যে এ লেখনী,
মূর্খ আমি তব গুণ বর্ণিব কেমনে ?
ভক্তি ফুলে চিরদিন পূজিব জীবনে।

শ্রীভুবনমোহিনী দেবী।

স্বর্গ।

১

"কোথা রহে ধ্রুবলোক
গোলোক ও ব্রহ্মলোক,
কোথায় অমরাবতী, নন্দনকানন ?
'স্বরগ, এ ত্রি-অক্ষরে
আহা ! কি অমিয় ক্ষরে !
কোথা সে স্বরগ স্নিগ্ধ আলোকভূষণ ?
স্বর্গ কি গগনোপরে ? ,,
"না না তা কেমন করে ?
গগন যে শূন্য বই আর কিছু নয়,
স্বরগ সৌন্দর্য্য-সার,
গগনবৎ শূন্যাকার,
শূন্যে সে সৌন্দর্য্য ছটা সম্ভব কি হয় ?"

২

(তবে) কোথা সেই স্বর্গস্থল ?
হর্ষ বিনা অশ্রুজল
নাহি ঝরে যথা ? সদা সুখের হিল্লোলে
বিলাস মলয় বায়
খরতর বেগে ধায়,
প্রফুল্ল কুসুমরাজি সুষমার কোলে,
সৌরভ মাখিয়া গায়
অনন্ত যৌবনে ভায়,
দুঃখ চির অস্তমিত সুখের প্রভায়,
বসন্ত অমর হ'য়ে
শারদী পূর্ণিমা ল'য়ে
বার মাস অবস্থান করিছে যথায় ?
রোগ, শোক, বার্দ্ধক্যেরে
শাণিত ছুরিকা মেরে।
সন্তাপ-অনল যোগে করে ভস্ম ছাই ;
সুখ শান্তি বারি দিয়া
সে অনল নিভাইয়া
ধুইয়া ফেলেছে ছাই চিহ্নমাত্র নাই।
হীরকের হর্ম্ম্যরাজি
কাঞ্চন কুসুমে সাজি
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত মণির বোঁটায়,
মুকুতা স্তবক ধরি
মস্তক উন্নত করি
দাঁড়ায়ে সৌন্দর্য্য ছটা বিস্তারে যথায় !
যথায় সরসীমাঝে
বৈদুর্য্যের নালে রাজে
সুনীল হিল্লোলে স্বর্ণ কমলিনীচয়,
মাণিকেতে বিরচিত,
চারি তট সুশোভিত,
সুন্দর সোপানশ্রেণী মরকতময় !

৩

"যথায় কুসুমোদ্যানে
বিহগের কল গানে
মোহিত করিয়া মন প্রাণ হরি লয়,
পবন বাহনে উঠে
দিগ্ দিগন্তরে ছুটে,
সে গীত লহরী সুধু সুধাধারাময়।
কমলা কুসুম-আলি,
পবন আপনি মালী,
বাল-বেণু-প্রভমণি-লতিকার পাশে ;
সোণার মুকুলগুলি
কোমল পাপড়ী খুলি
মাণিক কেশরে সাজি হেলে দুলে হাসে !"

৪

"(না,) যথা পুণ্য বিভাময়
নিত্য প্রেম চন্দ্রোদয়
প্রেমের আলোক যথা চির বিভাসিত,
শারদ কৌমুদী রাশি
সন্তোষ প্রফুল্ল হাসি,
ছুটিতেছে সে আলোকে আনন্দের গান—
"সবে মোরা ভাই ভাই,
ভাই বোন, পর নাই
শ্বেত কৃষ্ণ, রাজা প্রজা সবাই সমান,
কেন কর ভেদজ্ঞান ?
হিন্দু, খ্রীষ্টী, মুসলমান
সকলে সন্তান সেই পরম পিতার।"
সে আলোকে পায় তাপ
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, পাপ ;
লেখা আছে সে আলোকে "সবাই সবার",
নাহি যথা প্রবঞ্চনা,
অহঙ্কার প্রতারণা,
বাসনা বিরক্তি সে আলোকে পুড়ে মরে।
মান অপমান জ্ঞান
যথায় পায় না স্থান,
যথা আত্মবলিদান জগতের তরে।
যথা অনাবৃত প্রাণ
করে প্রেম বারি দান
আপনাকে অর্ঘ্য দেয় জগতের পায়,
যথা প্রেম নদ-স্রোত,
বহিতেছে অবিরত,
চঞ্চলা আসক্তি কিন্তু ডুবে মরে তায়।
অনুরাগ অনুক্ষণ
করিতেছে সন্তরণ
প্রতি তরঙ্গের পর নাচিয়া নাচিয়া,
পরের দুঃখের তরে
যে অশ্রু নিয়ত ঝরে,
সেই অশ্রুবারি রহে এ নদে ভরিয়া।
আপনি আপনোচ্ছ্বাসে
কভু ডোবে কভু ভাসে
আপনাকে চূর্ণ করে বিশ্বের মাঝারে,
সহস্র আপনি হয়ে,
সহস্র আপনা ল'য়ে
মহানন্দে এই নদে বেড়ায় সাঁতারে।
সুন্দর সংযম-বেলা
ঢেউ ল'য়ে করে খেলা,
যথায় প্রেমের হর্ম্ম্য প্রেমের চত্বর,
প্রেমের কুসুম ফুটে
প্রেমের সৌরভ ছুটে
প্রেমের মলয়ানিল স্বনে সর্ সর।
প্রেমের কৌমুদীরাশি
প্রেমের উজল হাসি
তথায় স্বরগ রহে সৌন্দর্য্যের সার,
সে সৌন্দর্য্য নাহি ধারে পৃথিবীর ধার।"

কুমুদিনী রায়।

নিদ্রা।

প্রতি নিশি শুনি আমি তোর পদধ্বনি—
অতি মৃদু দূরাগত সঙ্গীতের মত।
কোথায় অদৃশ্য হয়ে বাজাস্ না জানি—
মোহন বীণায় তোর মোহমন্ত্র যত॥

পড়ে তোর মৃদু শ্বাস আননের পরে,
আঁখি পরে জাগে তোর নীরব চুম্বন।
অয়ি নিদ্রে! মোহময়ি! কি কথা লো ধীরে
বলিস অস্ফুট স্বরে—করিয়া শ্রবণ
আঁখি দুটি মুদে আসে, ধীরে থেমে যায়
জাগ্রত এ জীবনের অধীর কল্লোল।
ঢাকি তোর শান্তিময় অঞ্চল ছায়ায়
ললাটে ও স্নেহহস্ত বুলাস কেবল।
শিয়রে ছায়াটি তোর করিয়া বিস্তার
নিয়ে যাস্ কোন্ এক মায়াময় পুরে।
অসত্য যথায় ধরে সত্যের আকার,
বাস্তব জীবন- ছায়া মিলায়রে দূরে॥

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

স্বর্ণময়ীর প্রতি।

সোণার বরণী সোণামুখখানি
নাম স্বর্ণময়ী তার,
বিনোদ মাধুরী আহা মরি মরি
কোমল সৌন্দর্য্য সার
স্বরগের শোভা মরতে গঠিত
নেহারী ও বিধুমুখে,
আঁকা আছে ওতে প্রতি পাতে পাতে
শুভ্র পবিত্রতা সুখে।
নাহিক গরিমা প্রেমের প্রতিমা
বিমল প্রশান্ত মতি,
হেরে ও সুষমা লাজেতে চন্দ্রমা
লুকায় কনকভাতি।
ছুটেছে জীবনে হীরক কাঞ্চনে
কত মরকত ফুল,
জ্বলি স্তরে স্তরে সাহিত্য ভিতরে
হীরক তারকাকুল।
নবীনা ভারতী তুমি যে গো সতি!
আসীনা বিমল যশে,
বীণাটি ফেলিয়া এসেছ নামিয়া
না জানি কোন্ প্রয়াসে;
রমণীর মণি হও তুমি ধনী
বিধি-বর-দত্ত ফুল,
হও কি মানবী মনে মনে ভাবি,
হৃদে লেগে যায় ভুল।
অয়িগো সুভগে! তোমার গৌরবে
গৌরবিণী মোরা সবে,
প্রকাশ সুকৃতি হাসুক প্রকৃতি,
মাতুক আনন্দরবে।
দেখাও যতনে নারীর জীবনে
ধরে কি না গুণ জ্ঞান,
ভূতলে আবার আর্য্যপ্রেমাধার
লভুক রমণী মান।
ভারতের ঘরে আসুকগো ফিরে
খনা গার্গী লীলাবতী,
আর্য্য-সুতগণে পূজুক যতনে
নারী সতী গুণবতী।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,
সাহারাণপুর।

No. 397. February, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৭ সংখ্যা। | মাঘ ১৩০৪—ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮। | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—গত ১২ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের ৬৮ সাংবৎসরিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃসল অনেক স্থলে এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে। কলিকাতাস্থ তিন সমাজেই খুব জনতা হইয়াছিল।

দেশীয় সখের সেনা—অনরেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইসলামপুরের জমীদার বাবু প্রিয়কৃষ্ণ মজুমদার বলণ্টিয়র বা সখের সেনা দলভুক্ত হইয়াছেন।

সূর্য্যগ্রহণে মেলা—গত ১০ই মাঘের সূর্য্যগ্রহণে অনেক তীর্থস্থানে অনেক জনতা হইয়াছে। স্থানেশ্বরে ৬ লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। গ্রহণোপলক্ষে মাঘ মেলায় প্রয়াগে প্রায় ১১,০০,০০০ এগার লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়—১৯ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করিবেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তদশ (convocation) বার্ষিক অধিবেশনে পঞ্জাবের ছোট লাট ১৬ জন এম্ এ, ১০৪ জন বি, এ এবং ২৩ জন বি, এলকে উপাধি দিয়াছেন। প্রাচ্য বিদ্যায় এক

জন মাত্র বি, এ, এবং এক জন মাত্র এম, এ, হইয়াছেন।

মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি—ইহা কলিকাতায় আসিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য গোয়ালিয়ারের মহারাজা ৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

অশুভ লক্ষণ—১৮৯৮ সালে আবার ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, তাহা পশ্চিম ভারতবর্ষে হইবে। আগামী এপ্রেল, মে ও জুনে এবং সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসে এক একটী ধূমকেতুর উদয় হইবে। এক বর্ষে ৫টী ধূমকেতুর উদয় অসাধারণ ঘটনা। এ দিকে সীমান্ত যুদ্ধ পুনরারব্ধ।

সংস্কৃত কলেজ সম্মিলন—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের উদ্যোগে এ বৎসরও সরস্বতী পূজার সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের একটী শুভ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

প্রাদেশিক সমিতি—এ বৎসর ঢাকা সহরে বাঙ্গালার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবে।

দান—শিয়াড়সোলের রাণী ভবসুন্দরী দেবী একটী স্থানীয় ছাত্রনিবাস নির্ম্মাণার্থ ৬০০০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা—মড়ক কর্ত্তৃপক্ষদ্বয়ের হত্যাকারী দামোদর চাপকারের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। জুরীরা হত্যাকারী নয়, কিন্তু হত্যার সাহায্যকারী বলিয়া তাহাকে অপরাধী করিয়াছেন। সে হাইকোর্টে আপীল করিবে।

স্বভাবের প্রভাব।

জীবন বিকাশের উপায় অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রথমেই দেখিতে পাই—স্বভাবই মানব জীবন বিকাশের একমাত্র মহতী শক্তি। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতি জীবনেই কার্য্য করিতেছে। ইহারই প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে, কুসুম মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতেছে, ফল সুপক্ক হইতেছে,—প্রকৃতিতে সকল প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সংঘটিত হইতেছে, প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ইহার কার্য্য দেখিতে পাই। ঐ যে প্রান্তরে প্রকৃতির শোভন নয়নমনোরঞ্জন হরিৎ আস্তরণ বিস্তৃত রহিয়াছে;—উহা কে বিস্তৃত করিল? কে উহার শ্যামল শোভা রক্ষা করিতেছে? ঐ যে প্রসন্ন স্বচ্ছ সলিলে পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার মধুর হাস্যে ও লাবণ্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেছে—উহা কে রোপণ করিল, কে উহা বর্দ্ধিত করিতেছে—কে ঐ বিকশিত কুসুমকে হাসাইতেছে—কে

উহার লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য ফুটাইতেছে? উহাদের কাহারওত নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ফুল নিজের চেষ্টায় ফুটিতেছে না। তাহার জীবন ও সৌন্দর্য্যের জন্য সে কিছুই করিতেছে না, অথচ সে জীবিত, সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। এই সমস্ত কার্য্য স্বভাবের প্রভাবেই সংঘটিত হইতেছে। আবার এই স্বভাবের প্রভাবেই শিশুদেহ বর্দ্ধিত হইতেছে, বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে,—ইহার প্রভাবেই জীবদেহে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে—ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে—জীবন রক্ষিত হইতেছে। সংসারের নানা কার্য্যে সর্ব্বদাই আমাদের শরীর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছে, আমাদের মৃত্যু ঘটিতেছে। স্বভাবই সতত নবদেহ, নবশক্তি প্রদান করতঃ সে ক্ষতি পূরণ করিতেছে, জীবন রক্ষা করিতেছে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রতি সাত বৎসর মধ্যে জীবদেহের এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যে, পূর্ব্ব দেহের একটী পরমাণুও আর বর্ত্তমান থাকে না। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা বিকশিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা অজ্ঞাতসারে এবং কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতীত কত শিক্ষাই লাভ করিতেছি! প্রকৃতি যেন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে জ্ঞানী, প্রেমিক ও সাধু করিতেছে। আমরা নিজ যত্ন ও চেষ্টায় যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি, স্বভাবের প্রভাবে তদপেক্ষা কত সহস্র গুণ শিক্ষালাভ করিতেছি, তাহা কে বলিবে? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শিশু পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে শিক্ষা লাভ করে, সমস্ত জীবনের শিক্ষাও তাহার সমান হইতে পারে না। কিন্তু শিশুজীবন অতিক্রম করিলেই আমরা স্বভাবের প্রভাবের অতীত হইতে পারি না। পরবর্ত্তী জীবনেও ইহার প্রভাবেই আমরা জ্ঞানে, প্রেমে ও পবিত্রতায় উন্নত হই—ইহার প্রভাবেই সর্ব্বদা প্রাণে শুভ বুদ্ধি উদিত হয় ও হৃদয়ে সদ্ভাব কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, এবং আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়। আমরা দেখিতেছি স্বভাবের প্রভাবই জীবন বিকাশের একমাত্র মূল শক্তি। এই কার্য্যে আমাদের শক্তি ও অধিকার অতি অল্পই আছে।

আমরা বীজ বপন করিতে পারি, তাহাতে জল সেচন করিতে পারি, কিন্তু উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। আমাদের এরূপ শক্তি নাই যে, কুসুম বিকশিত করিতে পারি, ফল সুপক্ক করিতে পারি। আমাদের নিজ শরীর, মন, প্রাণ, বিকাশ করিবার শক্তিও আমাদের নাই। আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, শারীরিক নিয়ম পালন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাবলে আপন দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত করিতে পারি না। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা লাভের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছামাত্র তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিতে পারি

না। যেমন আমরা বৃক্ষে সার প্রদান করিতে পারি, কিন্তু সে সারকে বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, দেহে পরিণত করিবার শক্তি আমাদের নাই; যেমন আমরা আহার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সেই আহারকে রক্ত মাংসে পরিণত করিবার সাধ্য আমাদের নাই—সমস্ত কার্য্যই স্বভাবের প্রভাবে হইয়া থাকে—উহাতে আমাদের কোনও হাত থাকে না; এ স্থলেও সেইরূপ।

স্বভাবের প্রভাব যে হৃদয়ে যে পরিমাণে মুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে, সেই হৃদয় সেই পরিমাণে সুন্দর, মধুর ও জীবন্ত ভাব ধারণ করে। সকলের হৃদয়েই ইহা অল্লাধিক কার্য্য করিতেছে। যে হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, সেই হৃদয়ে স্বভাব যথোপযুক্তরূপে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিয়া তাহাকে বিকশিত ও লাবণ্যযুক্ত করে। স্বভাব প্রতি জীবনকেই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। স্বভাব সর্ব্বদাই জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল। বহির্জগতে স্বভাবের শক্তি সর্ব্বদাই মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে, বহির্জগৎ এত রমণীয়, এত মধুর! অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে, তরুলতার কিরণোন্মুখীন স্বভাব হইতে তাহাদিগকে কে কবে ভ্রষ্ট হইতে দেখিয়াছে? তাহারা সর্ব্বদাই বিকাশোন্মুখ অবস্থায় স্থিতি করিতেছে। সর্ব্বদাই তাহাদের উপর স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাব কার্য্য করিতেছে। তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাহারা বাধা প্রদান করিতে পারে না, তাই তাহাদের ভিতরে স্ব স্ব ধর্ম্মের এমন মধুর ভাব বর্ত্তমান, তাই তাহারা সর্ব্বদা জীবন্ত। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আছে, স্বভাবের কার্য্যে আমরা বাধা প্রদান করিতে পারি, তাই আমাদের সকল জীবনে স্বভাবের প্রভাব মুক্তভাবে কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং আমাদের জীবনও উপযুক্তরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে না। বহির্জগতে জীবন বিকাশের প্রধান শত্রু—জীবন বিনাশের প্রধান কারণ—কীটাদি। আমাদের জীবনের প্রধান শত্রু, পাপ-কীট। কুসুমকোরকে কীট প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়, এবং স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া উহাকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না, আমাদের জীবন-কুসুমেও সেইরূপ পাপ-কীট প্রবেশ করিয়া আমাদের কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও জীবন্ত ভাব সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়, এবং আমাদিগকে আর বিকশিত হইতে দেয় না। ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে ফুলের হাত নাই, কিন্তু আমাদের জীবন-ফুলে যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে আমাদের হাত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, ইচ্ছা করিয়াই যত কীটকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি। যাহাকে সুন্দর মনে করিয়া আদরের সহিত হৃদয়ফুলে বাস করিতে দিয়াছি, আজ দেখি সেই বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধু—সেই সুন্দর কীট—জীবন-ফুলটী

একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কীট ফুলের জীবন নাশ করিতে আসিলে, স্বভাবই সে বিনাশ নিবারণে চেষ্টিত হয় এবং অনেক সময়েই তাহাতে সফল হইয়া ফুলের পূর্ব্ব শ্রী ফিরাইয়া দেয়। আমাদের শরীরে কোনও বিষ প্রবেশ করিলে শরীরের সমস্ত শক্তি সেই বিষ বাহির করিবার জন্য সতত কার্য্য করিতে থাকে, যাবৎ সেই বিষ বহির্গত না হয়, তাবৎ সেই শক্তি নিরস্ত হয় না। ঔষধ,—এই প্রাকৃতিক শক্তি ক্ষীণ হইলে, তাহার বলের সাহায্য করে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে স্বভাবের প্রভাবেই ব্যাধির উপশম হয়—পূর্ব্বস্বাস্থ্য, পূর্ব্বলাবণ্য ফিরিয়া আইসে। স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের কীটদষ্ট জীবন হৃত শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়, রোগমুক্ত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়া বিকাশের বাধা জন্মাইতে পারি, যে ফুল শীঘ্র ফুটিত, আহার বিকাশের বিলম্ব ঘটাইতে পারি, কিন্তু স্বভাবের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিয়া জীবন বিনাশ করিতে পারি না। কীটদংশনে কুসুম বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দেহ বিনষ্ট হইতে পারে—তখন স্বভাবের প্রভাব আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না—কিন্তু শত পাপ-কীট দংশনেও আমাদের জীবন একবারে বিনষ্ট হয় না। সকল সময়েই স্বভাবের অপ্রতিহত শক্তি সমস্ত কীট ধ্বংস করিয়া আমাদের জীবন-কুসুম প্রস্ফুটিত করিতে পারে। তাহার প্রমাণ নিজে অপবিত্র ও শ্রীহীন হইয়াও পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ যে মুগ্ধ হয়, ইহাই জীবনের লক্ষণ। এই শক্তিই আমাদের জীবন বিকাশের প্রধান সহায়। যদি আমাদের এই স্বাভাবিক ভাব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ও তাহাতে মোহিত হইতে পারিতাম না। এই এক সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তির অভাবে অপরের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও সদ্ভাব আমাদিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়া জীবনের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারিত না। সাধুজীবনের সৌন্দর্য্য এবং সুন্দর প্রকৃতির পবিত্র দৃশ্য সকলই আমাদের নিকট বৃথা হইত। তাহাহইলে

মলয় বাতাস বইলে পরে ফুল ফোটেরে বনে,
সাধুর বাতাস লাগ্‌লে গায় প্রেম ফুটেরে মনে।"

এ কথা কেবল কবি-কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইত। স্বভাবের অপ্রতিহত প্রভাবেই মানবজীবন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়, পবিত্রতা ও প্রেমের সংস্পর্শে পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ হয়। যেমন বৃক্ষের স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সুরসাল ও সুশোভন ফল ফুলের মাধুরীতে প্রকাশিত হইয়া সকলের প্রাণ স্নিগ্ধ করে, তেমনই মানবাত্মার স্বাভাবিক বিকাশের অবস্থা তাহার সদ্ভাব ও সদ্‌গুণ-কুসুমের মধুর লাবণ্য ও সুসৌরভে প্রকাশিত হইয়া জগৎ মুগ্ধ, পবিত্র ও ধন্য করে। সকলের দৃষ্টি এই প্রভাব-সুন্দর জীবন্ত কুসুমের দিকে আকৃষ্ট

না হইয়া থাকিতে পারে না। কাহারও ইহা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যদি মানবমণ্ডলী স্বভাবের অপ্রতিহত কার্য্যে বাধা না জন্মাইত, তাহাহইলে সমস্ত জগৎ কি সুন্দর শোভায় শোভান্বিত হইত! বহির্জগতের দিকে চাহিয়া তাহাতে স্বভাবের সুন্দর বিকাশ দেখিয়া যেমন সর্ব্বদাই মুগ্ধ হই, তেমনই মানব জগতের দিকে চাহিয়াও মুগ্ধ হইতাম। তাহাহইলে জগতে কেবল অমৃত ও শান্তির মধুর স্রোত প্রবাহিত হইত, সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিত। সংসারের দুঃখ একবারে তিরোহিত হইত বলিতেছি না, কিন্তু স্বভাবের বিকাশে স্বভাবের প্রভাবে, সে দুঃখ অমৃতের প্রস্রবণ ও শান্তির সোপান স্বরূপ হইত। স্বভাব সকলই অমৃতে পরিণত করে। স্বভাবের প্রভাবেই পঙ্কিল ও মলিন, বিষাক্ত ও লবণাক্ত সলিলকণাসমূহ রবি-তাপে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া নির্ম্মল বারি-ধারায় ধরা সুশীতল করে, ধরাকে নব-জীবন প্রদান করে। স্বভাবের প্রভাবই সুখ দুঃখ, রোগ শোক, সম্পদ, বিপদ, সকল অবস্থা হইতে জীবন-উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে পরিপুষ্ট করে। তাই বলিতেছি স্বভাবের কি সুমহান্ প্রভাব! ইহা দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন করে, গরল হইতে অমৃত উৎপন্ন করে, অশান্তি হইতে শান্তি উৎপন্ন করে। এই স্বভাবই জীব ও প্রকৃতির ধর্ম্ম, ইহাই জগৎকৃপা, ইহাই জগৎশক্তি। পরমেশ্বরের করুণা ও শক্তি আমাদিগকে পাপ ও অপবিত্রতা হইতে পুণ্য ও পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে আকর্ষণ করিতেছে। নিতান্ত অসাড় ও মৃত না হইলে পরমাত্মার এই টান, এই আকর্ষণ কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা অসাড় ও মৃত হইয়া থাকিতে চাহিলেও, জীবনবৃক্ষের মূলে রসপ্রবেশের পথে বাধা জন্মাইলেও, পাপ পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নিতান্ত কুৎসিত হইয়া থাকিলেও করুণাময় ঈশ্বরের সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণে, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও অসীম স্নেহে সকল অবস্থা ধরা পড়িতেছে, আমাদের মৃত্যুপথ রুদ্ধ হইতেছে, জীবনবৃক্ষের মূলে আবার রস প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার অবিরাম কার্য্যশীলতা ও স্নেহগুণে মৃত, অসুন্দর ও কুৎসিত হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। সকলকেই জীবিত হইতে হইবে; সুন্দর হইতে হইবে, উঠিতে হইবে, চলিতে হইবে। তিনিই সমস্ত করিবেন। তাঁহার অসীম শক্তি, মহতী ইচ্ছা সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে।

পরমাত্মাই আমাদিগকে পবিত্রতা হইতে অধিকতর পবিত্রতাতে, জ্যোতি হইতে উজ্জ্বলতর জ্যোতিতে, উন্নত হইতে উন্নততর লোকে আকর্ষণ করিতেছেন। এই আকর্ষণের বিরাম নাই, ইহা অনন্ত কালের জন্য। এই আকর্ষণের জন্যই আমাদের অনন্তজীবন—অনন্ত উন্নতি—অবিরাম গতি। স্বভাবের প্রভাবেই আমরা ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতেছি, এক অবস্থায় এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিতেছি না, এইজন্যই অনন্ত গতি, অনন্ত উন্নতি। এই অনন্ত গতি, ও অনন্ত উন্নতির প্রবাহ কেবল আমাদের মধ্যেই রুদ্ধ নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও এই প্রভাবে অনন্ত গতিশীল, অনন্ত উন্নতি-পথে প্রধাবিত, কিছুই এক অবস্থায় স্থির থাকিতে পারিতেছে না। আমরাও এই অনন্ত উন্নতির স্রোতে, এই স্বভাবের সুমহান্ প্রবাহে জীবন ঢালিয়া ধন্য হই। আমরাও অনন্ত দেবের মহান্ ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিয়া, সতত বিকাশোন্মুখ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া অনন্ত গতিতে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হই। মানব জীবনে স্রষ্টার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক—সব জীবন্ত, মধুময় ও সুধাময় হউক।

কলালাপ।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হস্তলাঘব,—অলক্ষিত ভাবে নিজ বা পর হস্তের সঞ্চালন দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর প্রবর্ত্তন। এ দেশে "হস্তচালন", "করলিপি" প্রভৃতি ব্যাপার বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে এবং তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। মৈস্মরতত্ত্ব অর্থাৎ মেস্‌মেরিজম্ তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। একজনের অক্ষি-সমীপে নানা ভঙ্গীতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাহাকে অচেতন করা হয়। ইহা এক প্রকার মৈস্মরক্রিয়া। এই ক্রিয়ার অন্যবিধ প্রকরণও আছে। যাহাহউক, হস্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলি, এই কলার অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়। কোন ব্যক্তির দেহে কোনরূপ বিষজ চর্ম্মরোগের আবির্ভাব হইলে, তাহা কোন্ জাতীয় কীট, পতঙ্গ, বা গোধিকার বিষ; তাহা হস্তসঞ্চালন (হাতচালা) দ্বারা নির্ণয় করা হয়। কাহাকেও সর্পে দংশন করিলে, সেই সর্প নাগ, কি বাসুকী জাতীয়, ঐ হাতচালায় তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সকল সর্প বিষধর, তাহা বাসুকী-জাতীয় এবং যাহারা বিষধর নহে, তাহারা নাগজাতীয় সর্প। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, বা হারাইয়া গেলে, হাতচালার দ্বারা তাহারও সন্ধান হইয়া থাকে। যাঁহারা এই প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপন বাম হস্ত মৃত্তিকার উপর স্থাপন করেন। করতল কিয়ৎ কাল ভূমিস্পৃষ্ট হইয়া নিশ্চল থাকে। হস্ত-চালক অনুচ্চস্বরে নিরন্তর মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। সে সকল মন্ত্র প্রায় কাহাকেও সহজে শিক্ষা দেন না। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, সে সকল মন্ত্র শিক্ষা করিতে শিক্ষিতগণের রুচি ও বিশ্বাসও হয় না। যাহাই হউক, ঐ নিশ্চল হস্ত ক্রমশঃ চলিতে আরম্ভ করে। যে স্থানের যে ভূমিতে এই হস্তচালনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

হয়, সেই ভূমির একদেশে পূর্ব্বেই একটী মনুষ্য অবয়ব অঙ্কিত হইয়া থাকে। চালিত হস্ত সেই অঙ্কিত অবয়বের অঙ্গ-বিশেষ স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘন করে। সেই চিত্র স্পর্শ বা উল্লঙ্ঘনের প্রকারাদি পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই করচালনে অনেকেরই বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ বলেন, এই হস্তচালন চালকের ইচ্ছাকৃত প্রতারণামাত্র। অশিক্ষিত প্রতারকগণ ইহা দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। মন্ত্রে বিশ্বাস না হইলে নিজের হস্তসঞ্চালন বিষয়ে অপরের এরূপ মন্তব্য প্রকাশ অসঙ্গত নহে।

করলিপি বিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনা, বোধ হয়, অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় করলিপি দ্বারা অনেক লৌকিক ও অলৌকিক তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছিল, তাহাও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ইহা অনেক দিনের কথা, ইহার সত্যতার জনশ্রুতি ভিন্ন বিশেষ প্রমাণ নাই; সুতরাং ইহাতেও অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহাত কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। করলিপি ক্রিয়ার সহিত বোধ হয়, প্রেত-তত্ত্ব বা যোগ বিশেষের সম্বন্ধ আছে; নতুবা তাদৃশী অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্ভবে না। এই প্রক্রিয়াবিৎ ব্যক্তিগণ একটী নিরক্ষর কুমার, বা কুমারীর কর পরিচালিত করিয়া তদ্দ্বারা অদ্ভুত প্রশ্নাবলীর উত্তর লিপিবদ্ধ করাইয়া থাকেন। কখন বা নিরক্ষর যুবক বা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ-রূপে অচেতন করিয়া তাহার কর দ্বারা উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

১২৭৮ সালে রাণাঘাটের সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীগোপাল পালচৌধুরী বাত-ব্যাধি রোগে শয্যাগত হয়েন। ঐ পীড়ায় তিনি প্রায় নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া পরিশেষে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে নিরাময় করিবার উদ্দেশে বিবিধ লৌকিক ও দৈবানুষ্ঠান করা হইয়াছিল। করলিপি দ্বারা পীড়া বিষয়ক শুভাশুভ তত্ত্ব নির্ণয় করণ তন্মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। বীরনগরনিবাসী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন ব্রাহ্মণ ঐ অনুষ্ঠানের নেতা ছিলেন। একাদিক্রমে এক সপ্তাহ কাল ঐ অলৌকিক অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। প্রায় বিংশতিটি ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন। আমরাও সাত দিন ধরিয়া তাহা দেখিয়া তাহার দৈনিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

একটী বিলক্ষণ দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণযুবককে আসনে বসান হইল। এই যুবাটী নিতান্ত নিরক্ষর ছিল। তাহাকে গঙ্গাজলে আচমন করিতে বলায় সে তাহা করিল। তাহার সম্মুখে গঙ্গা-মৃত্তিকা চূর্ণের একটী ক্ষুদ্র স্তূপ রক্ষিত হইল। ব্রাহ্মণ-যুবক অনুষ্ঠাতার আদেশে

ঐ মৃত্তিকা স্তূপের উপর দক্ষিণ করতল স্থাপন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিল। অনুষ্ঠাতা পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যুবকের মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং নিজ মুখে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যোগাসনে উপবিষ্ট যুবকের মুখ দিয়া লালা ভাঙ্গিতে লাগিল এবং দন্তঘর্ষণের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। এই সময়ে অনুষ্ঠাতা এক একবার যুবকের চক্ষুদ্বয়ে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যুবকের দক্ষিণ কর সঞ্চালিত হইয়া মৃত্তিকা-স্তূপকে ভগ্ন করিল এবং চূর্ণ মৃত্তিকাকে সমধরাতলে বিস্তৃত করিল। অনন্তর বিস্তৃত করতল তদুপরি ঘুরাইতে লাগিল। "মা লেখ! মা লেখ!" কর্ম্মী নিরন্তর এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যুবকের তর্জ্জনী ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অঙ্গুলিচতুষ্টয় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল, কেবল তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মৃত্তিকাসংযুক্ত রহিল। এই সময়ে রোগীর পক্ষ হইতে বিবিধ প্রশ্ন হইতে লাগিল। প্রশ্নানুক্রমে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ধূলি-ক্ষেত্রে উত্তর সকল লিখিত হইতে লাগিল। সাত দিন প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা করিয়া বিবিধ উৎকট প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছিল। শেষে দেখা গেল, সেই বর্ণজ্ঞানবিহীন যুবক অচেতন অবস্থায় রোগের উৎপত্তি, স্থিতি-কাল, প্রতীকার জন্য স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম, বলি, ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল উত্তর লিখিয়াছিল, সকলই শাস্ত্র ও যুক্তি-সঙ্গত। তবে এইটুকু বুঝা গেল কর্ম্মীর জ্ঞানের সীমা যতদূর, যুবকের কোন উত্তরই তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহাতে বোধ হয় কর্ম্মী যেন যুবকের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। উপরি-উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন, তাহাও নহে। তিনি সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত গৃহস্থ ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, অথচ এই অদ্ভুত কাণ্ড অনায়াসে প্রদর্শন করিলেন। কাহারও মনে এমন সংশয় হইতে পারে যে, ঐ যুবক নিরক্ষর হইলেও, তাহাকে পূর্ব্বে সাধারণ প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখিতে শিখান হইত। এরূপ সংশয় করিবার স্থল আদৌ নাই। কেননা, প্রতিদিন যখন এই অনুষ্ঠান শেষ হইত, তখন ঐ যুবক সম্পূর্ণ অচেতন। তাহার চৈতন্য সম্পাদনার্থ বিশ ত্রিশ কলস জল মস্তকে ঢালিতে হইত এবং দন্ত ও হস্ত পদের সন্ধি শিথিল করিতে ২।৩ জন বলবান্ পুরুষকে বল প্রয়োগ করিতে হইত। তাহার তৎকালীন অবস্থা দর্শনে হয়ত আর চৈতন্য হইবে না বলিয়া আমরা সশঙ্কিত হইতাম। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ বুঝা যায়, এই বিস্ময়োৎপাদিনী বিদ্যা এককালে এ দেশে এত সহজবেদ্য হইয়াছিল যে, যে সে তাহা শিক্ষা করিতে পারিত। এমন

বিষ্ঠার এককালে লোপ হওয়া নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

কৌচুমার যোগ,—আপনাতে নানা রূপের অভিব্যক্তি। আমরা ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি যে, দ্রব্য-গুণে মনুষ্য আপনাকে নানা রূপে প্রদর্শন করিতে পারে। কিন্তু মহর্ষি কুচুমারের আবিষ্কৃত যোগ সেরূপ নহে। বোধ হয় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত এই কৌচুমার যোগ প্রভাবে মনুষ্য আপনাকে অণুবৎ ক্ষুদ্র দেখাইতে পারেন। আপনি এমন লঘুভার হইতে পারেন এবং অন্য পদার্থকে এমন লঘুভার করিতে পারেন যে, তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এমন জন-শ্রুতি আছে যে, কোন কোন সাধু সকলের সমক্ষে দিবালোকে জলের উপর পদব্রজে নদীপার হইয়াছেন। কেহ বা আপনার কাষ্ঠপাদুকা লতাতন্তুতে লম্বমান করিয়াছেন। রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কেশ্বর-পুত্র মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। মহাভারতপাঠে জানা যায়, দেবগণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরাজকে গগন-মার্গে পরিচালিত করিয়াছেন। এরূপ ঘটনার কথা কতই শুনা যায় এবং পুরাতন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। এ সকল ব্যাপার কি? বোধ হয়, কৌচুমার যোগ সিদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

১। পানকরস-রাগাসব যোজন,—পানক অর্থে শরবৎ। রস,—রাগ,—আসব অর্থে যথাক্রমে মধুর অম্লাদি রস, লোহিত পীতাদি বর্ণ এবং সুরাদি মাদক। জলমিশ্রিত সীতাশর্করাদির নাম শরবৎ,—অর্থাৎ মিশ্রি বা চিনির পানা (পানক)। ঐ পানায় বিবিধ আস্বাদ যোগ, নানাবিধ রঙ্গ করণ এবং সুরাদির মিশ্রণ পূর্ব্বক পানকের মাদকতা গুণ উৎপাদন। এখন চা, কাফি খাইয়া যে কার্য্য হয়, পূর্ব্ব-কালে উপরি-উক্ত প্রকার শরবৎ পান করিয়া বোধ হয় সেই কার্য্য হইত। এখন দেখা যাইতেছে, চা পান করা সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক ইংলণ্ডেই বৎসরে চৌদ্দ কোটি টাকার চা খরচ হইয়া থাকে। তদনুসারে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে কত টাকার চা খরচ হয়, তাহা অনুমান করাও কঠিন। ইংরাজের অনুকরণে, বোধ হয় বাঙ্গালীরও শতকরা পঁচিশ জন চা-খোর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন যিনি সকালে বিকালে চা পান না করেন, তাঁহাকে অসভ্য বলিলেও বলা যায়। যাহাহউক, এ হিসাবে ভারতবাসী বহু পূর্ব্বকালে সভ্য হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। কেননা যখন পৃথিবীতে চা ও কাফির গুণ প্রকাশ পায় নাই, তখনও তাঁহারা শরবতে চা ও কাফির গুণ যোজনা করিতে শিখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য একটী বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কোনরূপ মাদক সেবনে হঠাৎ দৈহিক ক্লম অপগত হইয়া মনে স্ফূর্ত্তি জন্মে। এই জন্যই শ্রমশীল মানবসমাজে মাদকের এত প্রাদুর্ভাব। কিন্তু উহার পরিণাম ফল বিষময়। কোনরূপ মাদক কিছু দিন সেবন করিলে, তাহা পরিত্যাগ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ যতক্ষণ উহার মত্ততাজনিকা শক্তি দেহে থাকে, ততক্ষণই শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি ও লঘুতা থাকে,—কিন্তু তাহার পর অর্থাৎ নেসা ছুটিয়া গেলে দেহ ও মনে দ্বিগুণ অবসাদ উপস্থিত হয়। এই অবসাদ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু চা, কাফি, অথবা এই কলায় বিবৃত পানকে অল্পপরিমাণে মাদকতা শক্তি থাকিলেও, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। চা ও কাফিতে ঐ শক্তি স্বভাবতঃই আছে এবং প্রাচীন পানকে যে মাদক মিশ্রিত করা হইত, তাহা সাধারণ গৌড়ী বা পৈষ্টী, উৎকট সুরা নহে;—তাহা আসব, অর্থাৎ পুষ্পমধু। এই জন্যই জনসমাজে চা ও কাফির এত আদর এবং প্রাচীন ভারতে আসবমিশ্রিত পানকের তাদৃশ গৌরব ছিল।

(ক্রমশঃ)

আত্মভাষিণী।*

১

কে জানে কেমন ক'রে
সে নিঠুর গেল ম'রে,
সুখদা বসুধা-পানে
দেখিল না চেয়ে,
আমাদের শশী রবি,
তারো ছিল ওরা সবি,
তারেও শুনা'তে, পাখী
বেড়াইত গেয়ে।

২

তারেও ঢালিতে প্রীতি,
কুসুম হাসিত নিতি,
তারেও মলয়ানিল,
দিত জুড়াইয়া,
আমাদের সাথী যারা
তারো ছিল সবি তা'রা,
প্রকৃতি স্নেহের কোল
দিত পসারিয়া।

৩

যদিও তাহার বুক
ভরা ছিল কত দুখ,
মরমে জ্বলিত সদা
লুকানো অনল,
তবুতো মা বসুন্ধরা,
অনন্ত শোভায় ভরা,
তবুতো মানব-গেহ
শত প্রীতিস্থল!

* সাহিত্য-সেবিকা বোধিনীর লেখিকা কুমুদিনী রায়ের শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।

৪

কত প্রাণ তার লাগি,
আনন্দে উঠিত জাগি,
কত আঁখি তার দুখে
ঝরিত নির্জনে,
কত স্নেহ কত প্রীতি,
কতজনে দেছে নিতি,
কত সাধ কত আশা
ছিল আরো মনে !——

৫

সকলি ভুলিয়া হায়,
জীবনে দলিয়া পায়,
অনা'সে সে চলে গেল,
উদাসীর প্রায়,
গভীর আঁধার রেতে
নীরব শয়ন পেতে,
ভাঙিল সাধের খেলা,
মরণ-ছায়ায় !

৬

কে জানে তখন তার
দু'টি তপ্ত অশ্রুধার,
উজল কপোলযুগে
বহেছিল কি না,
কে জানে প্রাণের টানে
চাহিয়া জগত-পানে,
ভাবিল কি "বাঁচি যদি,
মৃত্যু চাহিব না !"

৭

চির প্রিয় মুখগুলি
অলস লহর তুলি,
যবে সে মুমূর্ষু-প্রাণে
আসিল ভাসিয়া,
তখন অবশ করে
ধীরে ধীরে—সকাতরে,
শেষ আঁখিজল বুঝি
ফেলিল মুছিয়া !

৮

আবার রুচিরা ঊষা
পরিয়া কনক ভূষা,
ভাঙিল বিশ্বের ঘুম
অমিয় বাতাসে,
তারে ও সাধিল কত—
সে কুমুদ জন্ম মত,
ঢেকেছে যে মুখ, চির
অন্ধকার বাসে !

* * *

৯

আজো তার বাতায়নে,
হাসে শশী তারা সনে ;
পাপিয়া "প্রভাতী" গেয়ে,
জাগাইতে যায়,
না পেয়ে স্নেহের সাড়া
ভয়ে ফিরে আসে তা'রা,
শূন্য ঘরে বায়ু শুধু
করে "হায় ! হায় !"

১০

আর সে নিতান্ত নাই !
মিছা কাঁদে বন্ধু ভাই,
আর সে অভিমানিনী
দেখিবে না চেয়ে !...
গেছে যদি সুখে যাক্,
কুশলে—আরামে থাক্,
জুড়াক্ তপত হিয়া
মা'র কোল পেয়ে !

শ্রীকনকাঞ্জলি রচয়িত্রী।

সন ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা

গো-পরিচর্য্যা

(৩৯৬ সংখ্যা ৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)

গোরুর প্রসব সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে। একগাছা শক্ত দড়ী অগ্রে যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ দড়ী বৎসের আগপায়ে বাঁধ ও গাভী, যেমন প্রসবের নিমিত্ত কোঁথ দিতে থাকিবে, অমনি একটু একটু করিয়া টান। দড়ী না বাঁধিয়া কেহ কেহ হাতে ঘুঁটের ছাই মাখিয়া বৎস ধরিয়া অল্পে অল্পে টানিয়া থাকে। এই সময়ে সাবধানে থাকিবে যেন পড়িয়া গিয়া বৎসের মস্তকে আঘাত না লাগে।

প্রসব হইবার সময় যদি বৎস অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

যদি বৎসের লাঙ্গুল অগ্রে বাহির হয়, তাহা হইলে বাছুরকে ফিরাইবার আবশ্যক নাই, কারণ এ অবস্থায় বাছুরকে টানিয়া বাহির করা সুবিধাজনক। এই কাজে একটু তৎপর হওয়া আবশ্যক, তা না হইলে বাছুর হাঁপাইয়া মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। হস্তদ্বারা বাছুরের কটিদেশ একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পশ্চাদ্‌ভাগের একটী পায়ের জঙ্ঘা ধরিয়া টান, তাহা হইলে একটী পা নির্গত হইবে। পরে আর একটী পা নির্গত কর।

যদি আগে সামনের পা নির্গত হয়, কিন্তু মস্তক ভিতরে থাকে, তাহা হইলে বাছুরের মুখ হাত দিয়া পায়ের মধ্যে সরাইয়া দাও এবং গাভী যেমন কোঁথ দিতে থাকিবে, বাছুরকে অমনি একটু একটু করিয়া টানিয়া বাহির কর।

যদি বাছুরের উদরের পার্শ্বভাগ উপরে থাকে, মস্তক ও স্কন্ধ এক পার্শ্বে থাকে, এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে বৎসকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া পায়ের সঙ্গে মস্তকের সহিত নির্গত করিতে চেষ্টা কর।

সামনের পা যদি মাথার সহিত বক্ষঃস্থলের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে বাছুরকে একটু ভিতরে ঠেলিয়া দিলে মস্তক দেখিতে পাইবে, কিম্বা পা দুইটী বদ্ধ হইয়া উদরের নীচে আছে দেখিতে পাইবে। এক একটী সামনের পা ক্রমে ক্রমে বাহির কর। যদি মরিয়া গিয়া বাছুরের মস্তক অত্যন্ত ফুলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে একখানি সূক্ষ্মধারবিশিষ্ট অস্ত্র কৌশলপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা বাছুরের ঘাড়ের কাছ হইতে নাক পর্য্যন্ত কাটিয়া বাহির কর, এবং সামনের হাঁটু ধরিয়া মৃত বৎসকে ক্রমে ক্রমে বাহির কর।

যদি বাছুরের একটী পিছনের পা অগ্রে নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহা ভিতরে ঠেলিয়া দাও, কারণ পিছনের ও সামনের পা একত্র ধরিয়া বৎসকে নির্গত করা যাইতে পারে না।

এই সকল উপায় দ্বারা যদি বাছুরকে নির্গত করা দুঃসাধ্য হয়, তবে গাভীকে কপিকলে ঝুলাইয়া সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাৎ ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত কর, পরে প্রসবদ্বারে হাত প্রবেশ করাইয়া বাছুরকে জরায়ুর ভিতর ঠেলিয়া দাও এবং ফিরাও, পরে তাহার মস্তক ও সামনের পা ধরিয়া অনায়াসেই বাহির করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

আদর্শ হিন্দুপরিবার।

(৩৯৬ সংখ্যা—৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

এই গৃহিণী ও কর্ত্তা সামান্য অবস্থার মনুষ্য হইলেও ইহাঁদের মনের প্রবৃত্তি সকল অত্যন্ত উন্নত ছিল এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিক আস্থা ছিল। নিজের সংসারের শত কষ্ট সহ্য করিয়াও ইহাঁরা পরের উপকার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। গৃহিণী প্রত্যহ একটী দরিদ্রা বৃদ্ধাকে বাড়ীতে খাইতে দিতেন। এক দিন সে ভিক্ষা করিতে আসিয়া আপন নিঃসহায়তার ও দুর্দ্দশার কথা ঐ গৃহিণীকে জানায়। তিনি তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন, এবং আপনাদের সংসারের অল্প আয় ভুলিয়া গিয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে প্রত্যহ আসিয়া আহার করিতে বলিলেন। কত দিন তাহাকে নিজের মুখের গ্রাস দিয়া সানন্দচিত্তে সামান্য কিছু আহার করিয়া থাকিয়াছেন। এই কর্ত্তা ও গৃহিণীর এমন দয়ার শরীর ছিল যে, ইহাঁদের মুখ দেখিলেই তাহা লোকে বুঝিতে পারিত এবং আপন আপন কষ্টের কথা জানাইত। এই গ্রামে কত ধনী লোক বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীতে দরিদ্র লোকদের ভাগ্যে একমুষ্টি ভিক্ষা সকল দিন জুটিত না। অথচ এই সামান্য অবস্থার লোকের বাড়ীতে যে কোন রকমের অসহায় লোক আসুক না কেন, কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। ইহাঁরা পরের দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইতেন ও প্রাণপণে তাহার উপকারের চেষ্টা করিতেন। পরের ক্লেশের কথা শুনিলে যতক্ষণ তাহার কষ্টের লাঘব করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ স্থির হইতে পারিতেন না। হৃদয়ের এই উদারতাগুণের জন্যই ঈশ্বর তাঁহাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন। এই গৃহিণীর মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা এবং দয়া দেখিয়া সকলে শত মুখে প্রশংসা করিত। বাড়ীর গৃহিণী যেরূপ সদ্‌গুণশালিনী ছিলেন, কর্ত্তাও সেইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাঁদের অবস্থা অতি সামান্য হইলেও আচার ও রীতি নীতি বড় উন্নত ছিল। ইহাঁদের মনের মহত্ত্বগুণে ধনী ব্যক্তি সকল ইহাঁদের যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও সমাজের সকল কর্ম্মেই উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণীকে অগ্রগণ্য করিতেন। গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, উক্ত কর্ত্তা ও গৃহিণী যে কর্ম্মে থাকিবেন, সে কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে; কেননা ইহাঁরা বড় ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। গৃহিণীর গুণপণা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, যে তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিত, সেই বুঝিতে পারিত। তাঁহার বাড়ী ঘর, রন্ধনশালা, ও প্রাঙ্গণ এমন পরিষ্কার থাকিত যে, সকলে দেখিয়া পুলকিত হইত। গৃহিণী সাংসারিক পাট ঝাঁট রন্ধন প্রভৃতি কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন বলিয়া আপনি বা পুত্র কন্যাগণ যে অপরিষ্কার থাকিতেন, তাহা নহে। যেমন আপনি তেমনি পুত্র কন্যাগণ সর্ব্বদা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন যে, দেখিলেই বোধ হইত যেন বাড়ীতে সতত লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। পুত্র কন্যাদের শয্যা প্রত্যহ স্বহস্তে কাচিতেন, পাছে অপরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে সন্তানদের পীড়া হয়। আয় অল্প বলিয়া যা, তা, খারাপ সামগ্রী সন্তানদিগকে খাইতে দিতেন না। স্বহস্তে মুড়ি ভাজিয়া তাহাই সন্তানদের জলযোগ করিতে দিতেন। বাড়ীতে একটী প্রসূতিনী গাভী রাখিয়াছিলেন। এই গাভীর দুগ্ধ খাইয়া আমার সন্তানগণ জীবন ধারণ করিতেছে বলিয়া স্বহস্তে পরম যত্নে গাভীটীর পরিচর্য্যা করিতেন। স্বামীর আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া তিনি পুত্র কন্যাদের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। পাছে পীড়া হইলে স্বামীকে জ্বালাতন হইতে হয় বা বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়, এজন্য সতত সাবধান হইতেন। সামান্য অসুখে পারতপক্ষে চিকিৎসক ডাকিতেন না। দেশী গাছগাছড়ার ঔষধ এত জানিতেন যে, সামান্য পীড়ার আপনি চিকিৎসা করিতেন। ব্রাহ্মণও অনেকগুলি সন্তানের পিতা অথচ আয় অল্প বলিয়া বিপুল পরিশ্রমে ও চেষ্টায় বেশ ভাল রকম চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। এমন কি অনেক বড় বড় চিকিৎসক ইহাঁর নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতেন। এজন্যও ডাক্তারকে প্রায় অর্থ দিতে হইত না। নিজে না খাইয়া সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে একটী কপর্দ্দক ব্যয় করিতে বড় কাতর হইতেন। পরার্থে স্বার্থ পরিত্যাগই গৃহীর মূল মন্ত্র। এই মূল মন্ত্রের সাধনা করিতে তাঁহারা ক্ষণকালও ভুলিতেন না। মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া যদি পাঁচজনের উপকার না করিলাম, দীন দুঃখীকে আশ্রয় না দিলাম, অন্ধ আতুরকে একমুষ্টি ভিক্ষা না দিলাম, তবে জীবনই বৃথা ও উপার্জ্জিত অর্থও বৃথা, ইহাঁদের উভয়ের এই ধারণা ছিল। এই মহৎ গুণেই ক্রমে ইহাঁরা সর্ব্বাংশে মহৎ হইয়াছেন এবং গৃহিণীর অপরিসীম

গুণেই ইহাদের সংসার আদর্শ সংসার হইয়াছে। গৃহিণী যদি পিতার ধনে গর্ব্বিত হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ হইত না। সংসারে অনেক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া সন্তানদের উপর কখনও অন্যমনস্ক হন নাই। সতত তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিতেন। যে সকল কুসংসর্গে থাকিলে সন্তানদের পরিণাম অতি শোচনীয় হইবে, এরূপ সংসর্গে কদাচ থাকিতে দিতেন না। পরে যাহাতে পুত্রেরা মানুষ হয় ও কন্যাগণ প্রকৃত গৃহিণী-পদের যোগ্যা হয়, এজন্য সতত কায়মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন ও তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতেন। ইঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য প্রত্যহ দুইবেলা পিতা সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ইহাঁরা জানিতেন যে, বেতনভোগী শিক্ষক যেরূপ শিক্ষা দিবেন, ও তাহাতে সন্তানগণ যে শিক্ষা লাভ করিবে, তদপেক্ষা পিতার নিকট অধিক শিক্ষা হইবে। পিতামাতার শিক্ষায় যে ফল হয়, শিক্ষকের শিক্ষায় তাহা কখনই হয় না। এজন্য বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও ইনি পুত্রদিগকে নিজে শিক্ষা দিতেন এবং ফলও তদ্রূপ পাইয়াছেন। শিক্ষকের নিকট যাহা ছয় মাসে শিখিত, পিতার নিকট তাহারা তাহা ছয় দিনে শিখিতে লাগিল। সন্তানগণ ক্রমে বড় হওয়াতে ও শিক্ষালাভ করাতে সংসারের ব্যয় বাড়িতে লাগিল। আর পূর্ব্বের আয়ে চলা কষ্টকর হইতে লাগিল। এজন্য কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভাবনা বাড়িতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সংসারের একটু সচ্ছলতা হয় ও সন্তানদের শিক্ষা উত্তমরূপ হয়, এই ভাবনা তাঁহাদিগকে ব্যস্ত করিতে লাগিল। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। কর্ত্তার যে বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিল, ক্রমে সেটী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বিবাহের সময় হইল। বৈমাত্রেয় ভগিনী বলিয়া ব্রাহ্মণ কখনও তাহাকে অনাদর করেন নাই, নিজের কন্যার মত তাহাকে ভালবাসিতেন, গৃহিণীও সেই মাতৃহীনা ননদকে কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করিয়া অতি যত্নে লালনপালন করিতেন এবং সে যাহাতে পরিণামে কষ্ট না পায়, এই জন্য একটী সুপাত্র সন্ধান করিয়া তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটী সুপাত্র পাইলেন। কিন্তু সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে গেলে কিছু বেশী অর্থের প্রয়োজন, এজন্য ব্রাহ্মণ বড়ই চিন্তিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন কি করিব? প্রাণ থাকিতে এই মাতৃহীনাকে কোনও অপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিব না। আমরা সুখে থাকিব, আর আমার ভগিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, অথচ আমাদের কৌলীন্যপ্রথায় ভাল পাত্রে কন্যা দিতে গেলে অনেক

অর্থের প্রয়োজন, অতএব সে অর্থ আমি কোথায় পাই? আমার কেবল ভগবান্‌ই সম্বল। তখন স্ত্রী বলিলেন তুমি কেন ভাবিতেছ? আমরা যাঁহাকে সম্বল করিয়াছি, সেই চিরসম্বল ভগবান্ আমাদিগকে দয়া করিবেন। দেখ আমার পিতৃদত্ত যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা বিক্রয় কর এবং সেই অর্থে উক্ত পাত্রে তোমার ভগিনীর বিবাহ দাও। আমার অলঙ্কার থাকিতে তুমি কাহার নিকট ঋণ করিতে যাইবে? স্ত্রীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া স্বামী আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। যদিও অলঙ্কার বিক্রয় করিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল, তথাপি তিনি ভগিনীর জন্য সানন্দচিত্তে তাহা বিক্রয় করিলেন এবং বিক্রয় করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা পাইলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ইহাঁর বিমাতার কিছু স্ত্রীধন ছিল। কিন্তু পাছে উহাঁর সপত্নীপুত্র এই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে এই সন্দেহে সেই সম্পত্তির একখানি উইল করিয়া যাহাতে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উহা পায়, এজন্য তাহা মৃত্যুকালে কোনও আত্মীয় জনের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাহার নিকট তাহা রাখিয়াছিলেন, সে বলিল যে উহারই সম্পত্তি, অতএব উহারই বিবাহের জন্য তুমি এই সম্পত্তি হইতে কিছু লও, তাহা হইলে আর তোমাকে স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিতে হইবে না। কিন্তু ইহাঁরা এমনই ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না। বলিলেন যখন বিমাতা আমার উপর বিশ্বাস করিয়া এই সম্পত্তি আমার হস্তে দিয়া যাইতে পারেন নাই, তখন আমি উহা লইতে পারি না। শেষে ভগিনী এই সম্পত্তি ভোগ করিলেই আমি চিরসুখী হইব। আমার ভগবান্ আছেন। এই বলিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সমারোহে ভগিনীর বিবাহ দিলেন। বহুল অর্থ ব্যয় হইল বলিয়া কোন দুঃখ করিলেন না। তাঁহার দরিদ্রাবস্থায় তিনি যে আপন বৈমাত্রেয় ভগিনীর উত্তম পাত্রে বিবাহ দিতে পারিয়াছেন, ইহা জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও পরম সুখী হইয়া ভগিনীকে স্বামি-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিমাতা।

১

আমি হিন্দু পরিবারের মেয়ে হইলেও আমার বিবাহ হইতে বড় বিলম্ব হইতে লাগিল। বাবা অপিসে চাকরি করিতে করিতে হঠাৎ মারা গেলেন; ভাই দুটী আমার চেয়ে বয়সে ছোট; অন্য উপযুক্ত

অভিভাবকও নাই; সেই জন্য মা'র একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার বিবাহ শীঘ্র ঘটিল না। আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে দুইবেলা ঘটকী যাতায়াত করিতে লাগিল।

আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া ও সেলাইয়ের কাজ করি। বাবার একটী ছোট হারমোনিয়ম যন্ত্র ছিল, সেটীও বাজাইতে পারি। ইহা ভিন্ন কুটনা, বাটনা, রান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মও করিতে হয়; অবকাশসময়ে তিন ভাই বোনে মিলিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করি; মা আমাদিগকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিয়া থাকেন। এই সকল আমোদে বিবাহের প্রতি আমার মনের ঝোঁক নাই,সে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু চিন্তাও করি না।

যাহা হউক সহসা আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। একজন বড় ডাক্তার; বয়স ঊনত্রিশ বৎসর; সম্প্রতি দুইটী শিশু পুত্র রাখিয়া, তাঁহার পত্নী পরলোকে গমন করিয়াছেন; ঘরে তাঁহার এক বিধবা পিসিমা আছেন, অন্য কেহই নাই; সেইজন্য বিবাহার্থে তাঁহার বয়ঃস্থা পাত্রী আবশ্যক। অদৃষ্ট বশতঃ আমি নিতান্তই, বয়ঃস্থা হইয়া উঠিয়াছিলাম।—তোমরা শুনিলে কি বলিবে জানি না, আমার বয়স কিন্তু সত্য সত্যই সতর বৎসর ছাড়াইয়াছে। পল্লি-গ্রামের ভিতরে থাকিলে আমার মা'কে যে কতদূর অপদস্থা হইতে হইত, তাহা বিধাতাই জানিতেছেন! কলিকাতায় আছি বলিয়াই অনেক রক্ষা।

পাত্রের বন্ধুগণ "কনে" দেখিতে আসিয়া, আমার বয়স, চেহারা ইত্যাদি দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। একজন অপর জনকে জনান্তিকে বলিলেন "বেশ মেয়ে! নরেন বাবুর জন্য আমরা যে রকম মেয়ে চাই, ইটী সেই রকম সুপাত্রী বটে!" কথা "জনান্তিকে" হইলেও আমার কাণে গেল; আমি বড়ই লজ্জিতা হইলাম। তাঁহারা আমার এক-খানি ফটোগ্রাফ লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাকা দেখার পরে যথাসময়ে, যথা-নিয়মে আমাদিগের বিবাহ হইল। পিতৃ-হীনা কন্যার সহিত বিপত্নীকের বিবাহ, এজন্য ধুমধাম কিছুই হইল না। উভয় পক্ষের দুই চারি জন আত্মীয় বন্ধু আসিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিলেন মাত্র।

জামাতা দেখিয়া মা যারপর নাই সুখী হইলেন। বাবার কথা মনে করিয়া মা'র চোখের জল পড়িতেছিল; মা আমাকে বলিলেন "সরলা! ভগবানের কৃপায়, আর তোমার পিতৃদেবের পুণ্য-বলে তোমাকে এমন সোণার চাঁদের হাতে দিলাম!—আশীর্ব্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হইয়া, স্বামীর সঙ্গে একাত্মা হইয়া, মাতৃহীন বাছাদের মা হইয়া সুখে ঘরকন্না কর।" মায়ের কথা শুনিয়া আমারও চোখের জল উথলিয়া উঠিল; আমি মুখ ফিরাইয়া আঁচলের কোণ পাকাতেই লাগিলাম। মায়ের মুখ পানে চাহিতে পারিলাম না।

২

"শুভ দৃষ্টির সময়ে লোক জনের ভিতরে, আমি স্বামীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। লোকের উত্তেজনায় একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া-ছিলাম, কিন্তু উজ্জ্বল, বিস্তৃত নয়নযুগল দেখিয়া তখনই আমার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; আমি কি দেখিলাম, বলিতে পারি না। তারপরে বিবাহান্তে, সমাগতা, মহিলামণ্ডলীর মধ্যে, উজ্জ্বল দীপালোকে কার্পেটের আসনে বসিয়া, তিনি যখন জল খাবার খাইতেছিলেন, তখনই অন্যের অজ্ঞাতে, অন্তরাল হইতে, আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম।

তাঁহার পরণে চেলী বা গরদাদি নহে, একখানি লালপেড়ে ধুতী। গলায় এক গাছি বেলফুলের হার, হাতে একটী আংটী। সাজসজ্জা কেবল এই মাত্র। আমি কালিদাসের শকুন্তলাও নহি, শেক্সপিয়ারের মিরাণ্ডাও নহি; ইতিপূর্ব্বে কোনও মহাত্মাকে দেখি নাই এমন নহে; আমি শত সহস্র আত্মীয় বন্ধুদিগকে দেখিয়াছি, কলিকাতার রাস্তা পূর্ণ করিয়া যখন অসংখ্য লোক চলে, তখন সেই অগণ্য লোকশ্রেণী দেখিয়াছি, কিন্তু আজি যাহা দেখিলাম, তাহা এ জনমে দেখি নাই।—এমন স্নেহময়, পবিত্রতাপূর্ণ, স্নিগ্ধ, গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি আমি এ জনমে কখনই দেখি নাই! ইনি যখন আমাকে জীবনের অর্দ্ধভাগিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ কবিলেন, তখন আমার মত ভাগ্য-বতী আর কে? সুখের উচ্ছ্বাসে আমার শরীর অবশ হইয়া গেল!

কিন্তু এ সংসারে মানুষের সুখের গর্ব্ব কতক্ষণ থাকে? সেই অপরিসীম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে সহসা একটী কথা মনে হইয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল—আমার মনে হইল "কালের অদম্য প্রভাবে, এমন স্বামীকে ছাড়িয়া যে রমণী অসময়ে চলিয়া গিয়াছে, তাহার মত হতভাগিনী আর কে? যাইবার সময়ে তাহার প্রাণ না জানি কতই কাঁদিয়াছিল। হয়তো সে অবসন্ন চক্ষু দুইটী পুনঃ পুনঃ সবলে খুলিয়া ঐ ভুবনমোহন মুখখানি দেখিতে চাহিয়াছিল! নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে, আর পরস্বাপহারকের মত আমি তাহারই ধনে ধনী হইয়া আনন্দে দিশাহারা হইতেছি! আমার এই আনন্দের দিনে, সেই অনাবিষ্কৃত দেশ হইতে দুইটী সজল চক্ষু, ঐ মনোহর মুখ খানির প্রতি চাহিয়া আছে কি না, কে বলিবে? আর আমার উপরে মর্ম্মভেদী, অভিসম্পাতপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস বর্ষিত হইতেছে কি না, তাহাই বা কে বলিবে? সে যাঁহাকে জীবনের বন্ধু, সংসারের সহায়, জগতের অবলম্বন বলিয়া প্রাণের প্রাণে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল, হায়! হায়! পাপিষ্ঠা আমি, আজি তাহার সেই সর্ব্বস্ব ধনকে কাড়িয়া লইলাম!—এত দিনে তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইল—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে কি বলে, তাহা জানি না, আমার কিন্তু মনে হয়, মানবের প্রকৃত

মৃত্যু দেহের পতনে নহে, প্রিয়জনের স্মৃতিতে যে জাগিয়া থাকে, সে চিরদিনই অমর। মনুষ্যজাতির ইতিহাসেই এ কথার সত্যতা বুঝা যায়। আজি এ বিস্মৃতি তো আমার জন্যই ঘটনা হইল! —কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি অবলা; কাহারও হৃদয় হইতে প্রিয়জনের স্মৃতি, প্রণয়ের চিহ্ন মুছিয়া ফেলা আমার উদ্দেশ্য নহে; তবে আত্মরক্ষার্থে আমার শক্তিও নাই।—কিন্তু ছি, ছি, পুরুষেরা এত নির্ম্মম কেন? তাহারা কেন দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে? স্বর্গস্থ প্রিয়জনের উদ্দেশে প্রীতিবৃত্তি অনুশীলন করিলেও তো প্রণয়লিপ্সা চরিতার্থ হয়, তবে কেন নিষ্ঠুর পুরুষ স্বতন্ত্র পথ অনুসন্ধান করে?

বিবাহরাত্রে বাসরজাগার প্রথা অনেকের অনুমোদিত হইলেও আমার বাসর জাগিবার লোক মিলিল না। কেননা নিমন্ত্রিতা মহিলারা বিবাহের খানিকক্ষণ পরে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং তিনি ও আমি "নিরাপদে" বাসর-বাস করিতে গেলাম।

প্রথম দুই একটী সামান্য কথার পরে যখন তিনি আমার হাতের উপরে হাত রাখিয়া মধুর স্বরে বলিলেন "সরলা! আমি এ জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছি, অনেক দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছি; আজি জগদীশ্বরের চরণে নির্ভর করিয়া তোমায় লইয়া আবার সংসারী হইতেছি; তুমিই আমার নিরাশার আঁধারে আবার আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছ! সরলা! তোমার এ হতভাগ্য স্বামীকে লইয়া তুমি প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে তো? যথার্থ সহ-ধর্ম্মিণীর মত তোমার স্বামীকে গম্য পথ দেখাইয়া দিবে তো? তখন আমি কি উত্তর দিব? সে স্নেহমাখা সুমধুর বিষাদোক্তি শুনিয়া আমার প্রাণ দ্রব হইয়া গেল; এতক্ষণ মনে যে সব কথার ঢেউ উঠিতে-ছিল, সে সব কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু মুখে একটী কথাও সরিল না!—বলিতে পারিলাম না যে, তোমাকে লইয়া যদি সুখী হইতে না পারি, তবে এ নারী-জীবনে ধিক্! বলিতে পারিলাম না যে, আমার দেবতা তুমি, তোমাকে "গম্য পথ" আমি কিরূপে বুঝাইব? প্রভো! তোমার স্নেহের ছায়ায় এ দাসীকে রক্ষা করিও; তোমার চরণতলে স্থান পাইলেই এ দাসীর চতুর্ব্বর্গ মিলিবে!—তা ছাই, পোড়া মুখে একটী কথাও বলিতে পারিলাম না; কেবল দুইফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজলে সেই পদ্মফুলের মত হাতখানি ভিজিয়া গেল! কিন্তু তাহাতেও আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল; আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া উনি কি ভাবিতেছেন? —ছি, পোড়া চোখের জল পড়িয়া গেল কেন?

বিবাহের দুই দিন পরে আমি স্বামি-গৃহে চলিলাম। মা'কে এবং ভাই দুটীকে ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ যে কেমন আকুল হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীর সহিত গাড়ীতে বসিলাম। তাঁহার স্নেহের

সান্ত্বনা পাইয়া ক্রমশঃ চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলাম।

আমার পতিগৃহও কলিকাতায়। বাড়ীর কাছাকাছি হইলে স্বামী বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে তোমার নিজের বাড়ীতেই লইয়া যাইতেছি, সেখানে যাহা কিছু দেখিবে সে সব তোমারই; সরলা, সেই সব লইয়া তুমি সুখী হইতে পারিবে তো?" কথাগুলি উনি যেন বড়ই আকুল হইয়া বলিতেছেন—আমার বুকে যেন সূচ ফুটিল; আমার মুখ দিয়া হঠাৎ কথা বাহির হইল, আমি বলিলাম "আমার সুখের জন্য তুমি অত ব্যস্ত হইও না, আমি ভগবানের নামে তোমার চরণে বিক্রীত হইয়াছি, তোমার সুখেই আমার সুখ" এই কথা বলিতে বলিতে আমার আবার লজ্জা করিতে লাগিল। উনি কিন্তু বড়ই সুখী হইলেন।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিলে, ওঁর পিসীমা এবং দুই তিন জন সমাগতা মহিলা আমাকে লইয়া উপর তালায় গেলেন। আমার দিকে চাহিয়া পিসীমা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "মা! এস! জন্ম-এয়োতী হও; আমার সুরেন যতীনের মা নাই, তা'দের সু নজরে দেখ। বাছাকে আমার পোড়া যম টেনে নিয়ে গেল, তার সাধের সংসার প'ড়ে রইল!—কোনও সুখভোগ কত্তে পেলে না—"

পিসীমা মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। আর একজন মহিলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন "সুখের একপাল না হ'লে কি কেউ সুখ কত্তে পারে মা? অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় ছিল বলেই তো ডাক্তার বাবুর অমন সতী লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে মরে গেল!" তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই অন্য একজন রমণী কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তুলিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুর আর দুঃখ কিসের?—অমন সুন্দরী স্ত্রী পেলেন; দুদিনেই ডাক্তার বাবুকে ভুলিয়ে নেবে! সুরেন যতীনকে পর করে দেবে! —আমার কাছে বাবু, উচিত কথা—শাস্ত্রে বলে "সত্য কখনো মিথ্যা নয়, সৎমা কখনো আপন নয়" ইত্যাদি।

এই সব সমালোচনা ও মন্তব্য শুনিয়া আমার বুকের ভিতর যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। স্বর্গীয়া সপত্নীর অকাল-মৃত্যু যেন আমিই ঘটাইয়াছি! আমি নীরবে বসিয়া মনে মনে রবি ঠাকুরের একটী কবিতার ভগ্নাংশ ভাবিতে লাগিলাম। কবিতা টুকু এই—

"ফুলের মালাগাছি, বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ!"

সমাগতা মহিলারা বিদায় হইলে, একজন ঝি দুইটী শিশুকে আনিয়া আমার কাছে দিল। ঝি বলিল "এই নাও, মাঠাক্‌রুণ! তোমার ছেলেদের নাও; তোমার জিনিষ তোমায় দিলুম, আমরা খালাস পেলুম। যা, যা, সুরিন, যতীন, ঐ তোদের মা এসেছে; মা'র কোলে গিয়ে বোস্। মা' এত দিন লুকিয়ে-ছিল, আজ এল। যা! মা'র কোলে যা!"

শিশু দুটীর সুকুমার সৌন্দর্য্যে আমার মন মুগ্ধ হইল। মরি, মরি, স্বর্গবাসিনি! এ সোণার পুতুল দুটীকে তুমি ফেলিয়া গিয়াছ বলিয়াই এ অমরপ্রার্থিত রত্ন "হতভাগ্য" পাইয়াছে। মা আমাকে "মাতৃহীনের মা" হইতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনের সর্ব্বস্ব দিলেও কি ইহাদের মায়ের অভাব ঘুচিবে? আমি হয়তো ইহাদের উপযুক্ত মমতা দিতেই পারিব না; ইহারা যে মাতৃহীন, সেই মাতৃহীনই রহিবে।

দুই ভাই চারিটী সতৃষ্ণ চক্ষু আমার মুখের উপরে স্থাপিত করিল। বুঝি যাহা ভাবিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহা মিলিল না, যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহাকে পাইল না, তাহাদের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল!—তাহারা মুখের ভিতর আঙুল পূরিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল।

এতক্ষণ তবু সহিয়া ছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না—দুটী কচি প্রাণ আমার জন্য আঘাত পাইল, এ ব্যথা আমি আর সহিতে পারিলাম না। তখন চোখের জলে ভিজিতে ভিজিতে "বাপ, যাদু" বলিয়া, তাহাদের গলা জড়াইয়া কোলে বসাইলাম।

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে তাহারা আমার কোলে বসিল। যতীন ছোট, তাহার বয়স চারি বৎসর, সে তাহার দাদা সুরেনকে বলিল "এ মা তো সে মা নয় দাদা?" সুরেনের বয়স ছয় বৎসর; যতীনের কথায় সে খুব লজ্জিত হইয়া তাহার কাণে কাণে বলিল "সে মা নয়, উনি আমাদের মা"। যতীন ভগ্নস্বরে আস্তে আস্তে বলিল "এ মাও কি আবার সে মায়ের মত চলে যাবে, দাদা?"

হরি! হরি! বাপধন! তোরাই স্বর্গের কুসুম। কত লোকে আমাকে তোদের শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছে, আর তোরা আমাকে অমৃতময় ভালবাসা ঢালিয়া দিলি! আমি তোদের "সে মা নয়" সত্য, হয় তো তাঁর মত ভালবাসিতে পারিব না, ইহাও সত্য; কিন্তু এ ক্ষুদ্র বুকে যতদূর স্নেহ সম্ভব, তা' তোদেরি দিব। তোরা যাঁহার সেই অঞ্চলের নিধি, নয়নের তারা, বুকজুড়ান ধন, তিনি যে এ জগতে নাই, আর আমি যে বিধাতাকর্ত্তৃক তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, এ কথা আমি কখনই ভুলিব না। দশ জনে আমাকে যাহাই বলুক, তোদের আমি বুকের অতি নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিব; যদি তোদের মত সোণার পুতুল দুটীকে "আপনার" বলিয়া মমতা করিতে না পারিব, তবে এ জগতে রমণী হইয়া জন্মিলাম কেন? আর তুমি স্বর্গীয়া দেবি! আমি তোমারই দাসী—এই শিশুদের উপরে তোমার যে সমুদ্রতুল্য অতলস্পর্শ স্নেহরাশি ছিল, তাহারই এক কণা আমাকে দান কর, আমার জীবন সার্থক হউক।

আহা! স্বামীকে ও সন্তানকে তিনি না জানি কতই ভাল বাসিতেন; কতই আদর করিতেন; ইহাদের সুখের জন্য

আমি কি করিব? কি করিলে ইহাদের সুখ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে? হে ঠাকুর! লোকে যাহাই মনে করুক, আমার মনে হয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিশেষতঃ "বিমাতা" হওয়ার চেয়ে নারী-জীবনে গুরুতর দায়িত্ব আর নাই, আর নাই!

৪

আমার বিবাহের পরে অনেক বৎসর গিয়াছে। এখন আমার নিজের তিনটী সন্তান; দুটী মেয়ে ননী ও মণি; একটী ছেলে তাহার নাম ক্ষিতীন্দ্র। আমি সত্য কথা বলিব, ননী, মণি ও ক্ষিতীন্দ্র আমার বড় স্নেহের জিনিস হইলেও আমার সপত্নীপুত্র সুরেন ও যতীনের উপরে আমার প্রাণের টান বেশী। ইহা আমি স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য কপটতা করিতেছি না—আমার সুরেন, যতীন যে মাতৃহীন, পরের মা'র হাতে যে উহাদের লালন পালনের ভার, সে কথা সর্ব্বদাই আমার মনে জাগে। তাই ঐ দুটীর জন্য আমার মন যেমন করে, আমার গর্ভজাত তিনটীর জন্য সে রকম করে না।

সুরেন খুব শান্ত ও সুবোধ; যতীন ছোটবেলা হইতে কিছু আব্‌দারে ছেলে; কিন্তু সেই জন্যই যতীনের প্রতি আমার মন বেশী আসক্ত।

আমার সুরেন ওকালতী পাশ করিয়া হাইকোর্টে উকীল হইয়াছে। খুব সদ্বংশ-জাতা ও সুলক্ষণা একটী মেয়ে আমার বৌমা হইয়াছেন। বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী; সে দিন ও পাড়ার রাম বাবুর স্ত্রী বৌমাকে না কি বলিয়াছিল "ও গো! তোমার সৎশাশুড়ী তো তোমায় যত্ন মমতা করে?" বৌমা আমার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, তার পরে বলিল "মা! তুমি ও মাগীকে এ বাড়ী আসিতে দিও না। তোমাকে সৎশাশুড়ী বলে।" বাপের বাড়ীতেও বৌমা থাকিতে চাহে না। সেখানে গেলে আট দশ দিন পরে আমাকে লেখে আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন কবে?" এমন সোণার বউমা কি কাহারও হয়? —উনি তো তামাসা করেন, বলেন "আমাদের মত বৌমাকেও তুমি যাদুমন্ত্রে ভুলিয়ে ফেলেছ।"

এবার যতীন অনেকদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়াছিল, তাই উনি তাহাকে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে দেবঘরে পাঠাইয়াছেন। আজি যতীন আমাকে পত্র লিখিয়াছে; পত্র এই—

"মা! আমার শরীর অনেক সুস্থ ও সবল হইয়াছে। আমি হাঁটিয়া তপোগিরিতে ও নন্দন পাহাড়ে উঠিয়াছি। শিবগঙ্গায় সাঁতার দিয়াছি। কিন্তু মা! তুমি এখানে নাই বলিয়া আমার কিছুই ভাল লাগে না। বাবাকে বলিও আমি শীঘ্র বাড়ী যাইব, নচেৎ তুমি এখানে এস। আজি ২ মাস তোমাকে দেখি নাই; ইহাতে আমার মন বড়ই খারাপ হইয়াছে।"

পত্র শুনিয়া আমি চক্ষু মুছিলাম, উনি হাসিলেন। নির্জ্জনে দেখা হইলে

উনি আমাকে বলিলেন "সরলা! কত জন্মের পুণ্যবলে তোমাকে পাইয়াছি, জানি না; সত্য সত্যই তুমি মাতৃহীনের মা হইয়া এ সংসার সোণার সংসার করিয়াছ! আমাকে কৃতার্থ করিয়াছ!"

ছি! ছি! ও কি পোড়া কথা! তাড়াতাড়ি ওঁর পায়ের ধূলা একটু মাথায় দিলাম।

লেখিকা
শ্রীমা।

প্রবাসী পুত্রের মাতা।

১

আপন জীবন-ব্রত করিতে সাধন,
গিয়াছে প্রবাসে তাঁর নয়নের মণি;
না পেয়ে সংবাদ তার, চিন্তাকুল মন,
বিরলে নয়নধারা ত্যজেন জননী॥

২

যে পথে গিয়াছে পুত্র সেই পথ পানে
চাহিয়া জননী দিন করেন যাপন;
উন্মাদিনী সম, আহা! ছুটেন সেখানে
যেখানে পুত্রের নাম করে কোন জন॥

৩

পশি দেবালয়ে কভু, যোড় করি কর,
মাগেন সজল আঁখি সুতের কুশল;
কহিতে পুত্রের নাম রুদ্ধ হয় স্বর,
বিশুষ্ক কপোল বহি ঝরে নেত্রজল॥

৪

কতই নিশীথ মা'র কাটে জাগরণে,
স্বপ্নাবেশে কতদিন কাঁদেন জননী,
কতবার পদশব্দ শুনিয়া অঙ্গনে
জিজ্ঞাসেন দ্বার খুলি, "এলে যাদুমণি!"

৫

পাকিলে উদ্যানে ফল, আসিবে তনয়
ভাবিয়া জননী তুলি রাখেন যতনে,
কত অন্ন জননীর পর্য্যুষিত হয়;
কতবার রচি শয্যা কাঁদেন বিজনে॥

৬

কত দিন, কত মাস, কত সংবৎসর,
এইরূপে গেল চলি; পুত্রের সংবাদ
না আসিল, আঁখি মার ঝরে ঝর ঝর;
ভাবেন বিধাতা বুঝি ঘটা'ল প্রমাদ॥

৭

একদিন জননীর কোন আত্মজন,
কহিল তাঁহারে আসি, "তনয় তোমার
রহেছে যথায়, শুনি পান্থ একজন
আসিয়াছে সেথা হ'তে, পাবে সমাচার॥"

৮

আলু থালু কেশ বাস, ছুটিলা জননী
যথায় পথিক সেই, জিজ্ঞাসিলা তায়,
"হেরেছ কি তুমি মোর নয়নের মণি?
কি বলেছে বাছা তার অভাগিনী মায়?"

৯

উত্তরিলা পান্থবর, তব পুত্র সনে
নাহি ছিল ভদ্রে, মোর পূর্ব্ব পরিচয়,
সংবাদ তাঁহার তবে কহিব কেমনে?
বিশাল সে পুরী, ক্ষুদ্র গ্রামত সে নয়॥

১০

বড় সাধে বাদ বিধি করিল ঘটন,
নিরাশ জননী, তবু প্রবোধিয়া মনে
উথলিত অশ্রুধারা করি সম্বরণ
কহিলা পথিকে ধীর মধুর বচনে॥

১১

"পরিচয়ে, পান্থবর, নাহি প্রয়োজন,
নিজগুণে পরিচিত তনয় আমার.
যে দেশে যেখানে থাক্ সেথা সর্ব্বজন
চিনিবে তাহারে, জানি ব্যবহার তার॥

১২

বীরত্বে, ধীরত্বে, প্রেমে, আত্মবিসর্জ্জনে
থাকে যদি পরিচিত সেথা কোন জন,
বল শুনি, কার্য্য তার বিচারিয়া মনে,
বুঝিব সে বটে কি না আমার নন্দন॥"

১৩

কহিলা পথিক, মনে মানিয়া বিস্ময়,
"হেন বাণী কভু, দেবি, শুনি নাই আর
কোন জননীর মুখে;—বুঝিনু নিশ্চয়
নহে সে অযোগ্য পুত্র হেন মাতা যার॥

১৪

হেরিয়াছি সেথা, এবে কহিব তোমায়,
ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্রে, অশনি সমান
গর্জ্জিছে কামান যথা, বিদ্যুতের প্রায়,
ঘুরিছে ঝলসি আঁখি, উলঙ্গ কৃপাণ॥

১৫

রুধিরে বহিছে স্রোত, আহত মানব
তৃষায় আকুল কণ্ঠে করিছে চীৎকার,
ছিন্ন অঙ্গ, ছিন্ন দেহ লুটিতেছে শব,
রণমত্ত সেনাদল গর্জ্জে 'মার মার'॥

১৬

দাঁড়ায়ে সে রণক্ষেত্রে যুবা একজন,
ক্ষতদেহে রক্তস্রোত ছুটিতেছে হায়!
দৃঢ় করে ধরি বীর জাতীয় কেতন
যুঝিতেছে রণে যেন মত্তসিংহ প্রায়॥

১৭

অগণ্য অরাতিসৈন্য ঘেরি বীরবরে
কাড়িয়া লইতে কেতু করে প্রাণপণ,
কিন্তু হেন শক্তি কার? বাঁধা বজ্র করে;
ভঙ্গ দিয়া রণে শেষে ধায় শত্রুগণ॥

১৮

জয়োল্লাসে বীরবর প্রবেশে নগরে,
হর্ষে মগ্ন পুরবাসী করে যশোগান,
নিজে অগ্রসরি রাজা মহা সমাদরে
জয়মাল্য দিয়া বীরে করেন সম্মান॥

১৯

সেই কি তনয় তব কহগো জননি,"
জিজ্ঞাসিলা পান্থ; মাতা করিলা উত্তর,
"এ হেন তনয় যাঁর ধন্য সে রমণী,
কিন্তু, পান্থ, পুত্র মম আর(ও) গুণধর॥"

২০

বিস্মিত পথিক, কহে, "হেরেছি নয়নে
একদা বৈশাখশেষে নীল জলধর
ব্যাপিয়াছে ব্যোমদেশ, গরজি সঘনে
ছুটিছে অশনি বেগে বিদারি অম্বর॥

২১

ঝলসিয়া আঁখিযুগ চমকে দামিনী,—
হুহুঙ্কারি ঘোর রবে বহে প্রভঞ্জন,
সন্তাড়িত বায়ুবলে ধায় প্রবাহিণী
উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী করি প্রদর্শন॥

২২.

হেন কালে তরী এক তটিনীহৃদয়ে
করিতেছে টলমল ; পোতারোহিগণ
'সামাল, সামাল' বলি ডাকিছে সভয়ে
গেল বুঝি গেল তরী হ'ল নিমগন ॥

২৩

আসিছে তরঙ্গ ওই রক্ষা নাহি আর,
ডুবিল, ডুবিল তরী, ডুবিল অতলে ;
মাতৃক্রোড়ে ছিল এক শিশু সুকুমার
কোথা দোঁহে ? হের ওই ভাসিতেছে জলে!!

২৪

নিমগ্ন, অদৃশ্য তরী ; পোতারোহিগণ
আপন আপন প্রাণ রক্ষিবারে হায়!
রজ্জু, কাষ্ঠ যাহা হেরে করে আরোহণ,
অপরের পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥

২৫

কিন্তু, কে যুবক ওই, বদ্ধপরিকর,
বাম হস্তে জননীর বাঁধিয়া বসন,
দক্ষিণে শিশুরে তাঁর তুলি অংস'পর
চলিয়াছে তীরমুখে করি সন্তরণ ॥

২৬

ফেনিল তরঙ্গমালা বক্ষদেশে তাঁর
করিছে আঘাত বলে, তবু অবিরল
সন্তরি চলেছে যুবা, রোধে সাধ্য কার ?
ক্লান্ত বাহু, তবু তাহে ঐরাবত-বল ॥

২৭

কূলে উপনীত ক্রমে ;—শত কণ্ঠস্বরে
উঠে চারি দিক্ হ'তে জয় জয় ধ্বনি,
কেহ নমে পদে, কেহ আশীর্ব্বাদ করে,
সেই কি তনয় তব কহগো জননী ?"

২৮

চিন্তি ক্ষণকাল মাতা করিলা উত্তর
"না পারি বুঝিতে আমি কেবা এইজন,
সংশয়ে আকুল চিত্ত ; কিন্তু পান্থবর,
আর (ও) কিছু থাকে, বল, করিব শ্রবণ ॥

২৯

কহিলা পথিক ; "দেবি, হেরেছি নয়নে
প্রশান্ত, নিভৃত সেথা, আশ্রম শোভন,
ক্ষুদ্র প্রবাহিণী এক কুলু কুলু স্বনে
বহে সে আশ্রম-অঙ্গ করি প্রক্ষালন ॥

৩০

প্রভাতে মধুরভাষী বিহঙ্গনিকর
গায় সেথা বিভুগুণ হরষিতমনে,
আপনি চন্দ্রমা, নিজে দেব দিবাকর
সাজান সে পুণ্যাশ্রম কনক কিরণে ॥

৩১

মল্লিকা-সুবাসে সেথা দিক্ আমোদিত,
বিভূষিত তরুরাজি মরকতসাজে,
সুন্দর কুটীর কত পর্ণ আচ্ছাদিত,
শোভে শ্রেণীবদ্ধ সেই আশ্রমের মাঝে ॥

৩২

অনাথ আতুর মহাব্যাধিগ্রস্ত জন
সে আশ্রমে করে বাস ; প্রশান্ত-মূরতি
যুবা এক তা সবায় করেন পালন
বিসর্জ্জিয়া নিজসুখ পরহিতে মতি ॥

৩৩

পূতিগন্ধে লোক যার যায় পলাইয়া,
কৃমি কীটে ক্ষত যার দংশে অনুক্ষণ,
হেন জনে ক্রোড়ে যুবা যতনে তুলিয়া
স্বকরে ঔষধ নিত্য করেন লেপন ॥

৩৪

কত কাল গত, তবু অক্লান্ত যুবক
নীরবে জীবনব্রত করেন পালন ;
অনাথের পিতা, প্রভু, সুহৃদ, সেবক ;
না জানে, না চেনে তায় জগতের জন ॥

৩৫

দ্বাদশ বরষ হেন গত ধীরে ধীরে,
অচিন্ত্য বিধির লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
প্রবিষ্ট সে রোগ এবে যুবার শরীরে,
কে জানিবে দণ্ড ইহা কিম্বা পুরস্কার !

৩৬

নাহি তাঁর এবে সেই কান্তি নিরমল,
স্ফীত কর, পদ ; রোগে জীর্ণ কলেবর ;
কর্ত্তব্যসাধনে যুবা তবু অবিচল,
সে সহাস্য মুখচ্ছবি তেমন (ই) সুন্দর ॥

৩৭

সঙ্গে লয়ে স্নেহভরে ব্যাধিগ্রস্তগণে
করেন আনন্দে যুবা হরিগুণ গান ;
দিবানিশি এই মন্ত্র জপ মনে মনে
'হ'ক্ প্রভো, হ'ক্ এই বিশ্বের কল্যাণ ॥'

৩৮

দেবব্রত নাম তাঁর মানবসমাজে
না জানে, না চেনে কেহ ; কে করে
আদর ?
একাকী বিরলে যুবা রত নিজ কাজে,
সাক্ষী মাত্র সুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর ॥"

৩৯

নীরব পথিক ; মাতা ধ্যানমগ্ন প্রায়
আছিলেন এতক্ষণ, বিষাদ আঁধার
ক্ষণেক সে মুখচ্ছবি ঢেকেছিল হায়!
মেঘমুক্ত শশিসম শোভিল আবার ॥

৪০

সম্বোধি পথিকে ধীর মধুর বচনে
কহিলা জননী ; "পান্থ, না করি সংশয় ;
অপূর্ব্ব চরিত তার শুনিয়া শ্রবণে
বুঝিনু যুবক সেই আমার তনয় ॥

৪১

সুখে থাক্ বাছা মোর করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হ'ক্ বাঞ্ছা তার বিধাতার বরে ;
এত দিনে বিধি মোর পুরাইল সাধ,
ধন্যা হ'নু হেন পুত্রে ধরিয়া জঠরে ॥"

৪২

সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা হরি করিয়া স্মরণ,
নিশ্চিন্ত ফিরিলা মাতা আপন ভবনে ;
সেই দিন হতে আর কভু কোন জন
না হেরিলা অশ্রুবিন্দু মাতার নয়নে ॥

গার্হস্থ্য-প্রবন্ধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবার।

২য় প্রস্তাব।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কতকগুলি শুভ ফলের বিষয় যদ্রূপ বর্ণিত হইল, তদ্রূপ দুই চারিটী অশুভ ফলের বিষয়ও বলা কর্ত্তব্য।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা।

১। সম্যক্ স্বাধীনতার অভাব—যৌবন-

কালে অনেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে, যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী হয়; তখন অভিভাবকের অধীনে বাস করা মঙ্গলজনক। কিন্তু চরিত্র গঠিত হইলেও যদি সমস্ত স্বাধীনভাব পরিবর্জ্জন করিয়া, একমাত্র অভিভাবকের আজ্ঞানুসারেই চলিতে হয়, তবে কার্য্যকরী বৃত্তিসমূহ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

২। কৃতিত্ব ও উপার্জ্জনশীলতা লাভে ঔদাসীন্য।

একান্নভুক্ত পরিবারে প্রত্যেকেই কৃতী ও উপার্জ্জনশীল হইতে সচেষ্ট থাকে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কোনও অভাব বোধ করিতে পারে না। যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "অভাবই উন্নতির প্রসূতি।" মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, অভাবে পতিত হইলে তন্নিবারণার্থ সে অধিক ব্যাকুল হয়। নতুবা শুধু স্বীয় উন্নতিবর্দ্ধনের জন্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প লোকই ব্যগ্র হয়।

৩। পারিবারিক দরিদ্রতা। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারে দুই কি তিন জন মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি থাকেন। অপরাপর সকলেই পোষ্যবর্গ। একটী বৃহৎ পরিবারে যদি দুই কি তিন জনের উপর জীবিকার সম্পূর্ণ নির্ভর থাকে, তবে সে পরিবারে দরিদ্রতা অনিবার্য্য। পরিবারস্থ সুস্থকায় বক্তিমাত্রই যদি উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা না করে, তবে একে অপরের গলগ্রহস্বরূপ হয়। কাজে কাজেই সে পরিবারে ক্রমশঃ দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়।

একান্নভুক্ত পরিবারের শুভাশুভ ফলের বিষয় বর্ণিত হইল। যে পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তি এই অশুভ ফলগুলি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভে ও পরস্পরের উন্নতিকামনায় যত্নশীল হয়, সেখানে নিশ্চয়ই সুখশান্তি বিরাজ করে। যে পরিবারে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব, সেখানে সুখশান্তি তিষ্ঠিতে পারে না, এবং পরিবার অচিরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

রত্নমালা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন শ্যাম সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে জলের অব্যবহিত উপরের সোপানে উপবিষ্ট হইয়া একটী ফুলের মত সুন্দরী বালিকা কি চিন্তা করিতেছিল। পুষ্প-সুরভি-সমাকুল সায়াহ্নসমীর-সেবিত নদীতটে সে শান্ত চিন্তাশীলা বালিকাকে প্রকৃত সুরসুন্দরী বলিয়াই প্রতীত হয়।

সম্মুখে অনন্তকাল প্রবাহিণী নদী মৃদু নিনাদ করিতে করিতে অনন্তের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, সন্ধ্যাসমীরে উচ্ছ্বসিত লহরীমালা বালিকার পবিত্র পদপ্রান্তে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াই যেন আনন্দানুভব করিতেছে। সেইখানে একটী ছোট বকুল গাছে একটী ছোট পাখী "বৌ কথা কও" "বৌ কথা কও" বলিয়া সান্ধ্য জগৎকে কম্পিত করিতেছিল। কিন্তু কৈ সে গগনভেদী চীৎকারেও বালিকার সে গভীর চিন্তা ভগ্ন হইল না।

সেই সময়ে বালিকার পশ্চাৎ দেশে একজন লোক দণ্ডায়মান হইয়া বালিকার শ্বেত গোলাপের ন্যায় সুন্দর মুখখানি সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিল, বালিকা তাহা জানিতে পারে নাই।

বালিকা অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সেই বকুলবৃক্ষের নীচে গেল, কিন্তু সে দিন আর ফুল কুড়ান হইল না। যে তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল, বালিকা তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বকুলতলে একজন সুন্দর যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল, বালিকাকে এই অবস্থায় কাঁদিতে দেখিয়া তাহার মুখ আপনা আপনি খুলিয়া গেল। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল "বালিকে! তুমি কি কাঁদিতেছ? বল দেখি নদী-সোপানে বসিয়া বসিয়া প্রত্যহ তুমি কেন চিন্তা কর? তুমি কি আমাকে বলিতে পার এ চিন্তা তোমার কাহার জন্য?

যুবার সেই করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণে বালিকার সরম সম্ভ্রম কোথায় চলিয়া গেল, বালিকা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সেই মুখেই যেন সে পৃথিবীর সমস্ত শোভা সমাবেশ দেখিতে পাইল, সেই মুখের সম্মুখেই যেন তাহার সপ্তস্বর্গ খুলিয়া গেল, সে যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া গিয়া যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে বুঝিল না যে, সে এমনি ভাবে চাহিয়া আছে। যুবা পুনরায় কহিল "তুমি কাহার জন্য চিন্তা কর?"

বালিকা কহিল, "তেজকুমারের জন্য।" সে যে এ কথা কহিল তা যেন সে জানিল না।

তেজ। তোমার নাম কি?

বালিকা। সুভগা।

তেজ। তোমাদের গ্রামের নাম কি?

বালিকা। ছায়াপথ।

তেজ। তেজকুমার তোমার কে? আমি তাহাকে চিনি।

বালিকা কহিল "না না, তুমিই তেজকুমার, আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি।"

তেজকুমারের হৃদয় ফাটিয়া অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল। বালিকার চক্ষুও আবার অশ্রুপূর্ণ হইল, তৎকালে সন্ধ্যার আঁধারে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন, সন্ধ্যার শীতল বাতাস বকুলতল দিয়া হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, নবজল-ধৌত শ্যাম দূর্ব্বাদামের উপর ফুটন্ত বকুল ফুল পড়িয়া পড়িয়া বকুলতল ছাইয়া গেল। সেইখানে বসিয়া তেজকুমার ও সুভগা উভয়ে উভয়ের নিকট বহুদিনকার প্রাণের কথা কহিতে লাগিল।

তেজ। শুভে, তুমি কেমন আছ?

জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয়। সুভগা! তোমার কি—

সুভগা। (তেজকুমারকে কথা কহিতে না দিয়া কহিল) জিজ্ঞাসা আর কি করিবে? আমি শুনিয়াছি আমি বিধবা। তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে আমি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিলাম। পাত্রস্থ করিলে অন্যের অদৃষ্টে বাঁচিয়া উঠিব, এই আশায় আত্মীয়েরা আমার বিবাহ দিলেন। তখন আমি যথার্থই সুস্থ ও সুখী হইলাম। কিন্তু সে সুসময় আর ফিরিয়া পাইলাম না। শুনিলাম আমার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি বিধবা। তেজকুমার! তুমি বলিয়াছিলে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে, তবে কেন আর ফিরিয়া আসিলে না? তুমি চলিয়া গিয়েছ, সেত অনেক দিনের কথা। আমি সেই অবধি কেবল তোমাকেই ভাবি, তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার স্বামী। তবে আমি কাহার দোষে বিধবা হইলাম?

বালিকার সাশ্রুনয়ন দেখিয়া ও কাতরবাণী শুনিয়া উদারচেতা যুবকের হৃদয়ে ঘোর অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। তেজকুমার এই বালিকাকেই ভাল বাসিত—পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইলে এই বালিকাকেই বিবাহ করিবে বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল। এই বালিকার সঙ্গে সে পূর্ব্বে সরলভাবে বসিয়া কত কথা কহিত, খেলা করিত, কত সুখের আশা দিয়া ইহাকে স্বর্গে তুলিয়া দিত, এই বালিকার সঙ্গ-ছাড়া হইয়া সে কত না কষ্ট পাইয়াছে! আজ সেই দশম বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা পঞ্চদশ বৎসরের যুবতী নামে অভিহিত, কিন্তু এখনও তাহাকে ভুলে নাই। যখন নির্জ্জন কুসুমোদ্যানে বা নদীসৈকতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভ্রমরা-ভয়-স্পন্দিত শ্বেত পুষ্পের ন্যায় চঞ্চল অলকাবলোক-সজ্জিত এই বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি চিন্তা করিত, তখন কি ইহা জানিত যে এত অল্প দিনের মধ্যেই এই নিদারুণ বাধা আসিয়া উপস্থিত হইবে? এইরূপ অনেক ভাবিয়া অনেকক্ষণ পরে তেজকুমার কহিল "সুভগা, আমিই তোমার সমুদয় কষ্টের মূল।"

সুভগা। না না, আমার কর্ম্মানুযায়ী ফল আমাকে ভুগিতেই হইবে।

তেজ। সুভগা, তুমি হয়ত কত সময় আমাকে নির্দ্দয় পশু বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ। কিন্তু যদি জানিতে ইদানীং আমার সমস্ত সময় কত কষ্টে গিয়াছে, তাহা হইলে এ অভাগার জন্য তোমার চক্ষেও জল বহিত।

আগ্রহে সুভগা কহিল "তেজকুমার! তবে কি তুমি বড়ই কষ্টে ছিলে?"

তেজ। সেই সব পুরাণ কথা আজ তোমার নিকট কহিব, শ্রবণ কর।

আমাদের গ্রামে কৃষ্ণকুমার নামে একজন বিখ্যাত জমীদার বাস করেন। হরিবল নামে তাঁর একজন প্রধান দেওয়ান আছে। আমার পিতা হরিবলের কাছে একটী চাকরী চাহিয়াছিলেন। হরিবল সেই জমীদারের

সংসারে নিজের অধীনে পিতাকে একটী নায়েবি কাজে বহাল করিয়া দিল। কিছুদিন পরেই পিতার এমনি সুযশ সুখ্যাতি বাহির হইতে লাগিল যে, তাহাতে হরিবলের যত্ন-রক্ষিত পূর্ব্ব-উপার্জ্জিত যশোরাশি ম্লান হইয়া গেল। দিন দিন পিতা সেই জমিদারের প্রিয় হইতেছেন দেখিয়া দুরাশয় হরিবলের পাপহৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। সে তদ্বিরুদ্ধে নানারূপ অমোঘ অস্ত্র-কৌশল প্রয়োগ করিতে স্থিরসংকল্প হইল।

হরিবল সর্ব্বদাই জমীদারের নিকট পিতার মিথ্যা দোষ কীর্ত্তন করিত। তাহার পর যে কি হইল, তাহা আর আমরা কিছু বুঝিলাম না; কিন্তু পিতা ক্রমে ক্রমে জমাদারের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অবশেষে একদিন তিনি পিতাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দিলেন। পিতা তাঁহার নিকট হইতে আপনার মাহিয়ানার উপরে অনেক টাকা অগ্রিম লইয়াছিলেন। জমীদার এই সুযোগে সেই সব অর্থ পিতার নিকট চাহিয়া বসিলেন। কহিলেন "যদি তুমি তিন দিনে এই অর্থ দিতে না পার, তবে তোমাকে পুলিশের লোক দ্বারা ধরাইব।" আমরা তাঁহারই ভূমিতে বাস করিতাম। তিনি আমাদিগকে হয় টাকা দিতে, না হয় তাঁহার ভূমি হইতে তন্মুহূর্ত্তেই উঠিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা টাকা কোথায় পাইব? তাহার অর্থ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, সুতরাং সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য এক জনের ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইলাম। হরিবলের পরামর্শ মত ও তৎপ্রদর্শিত জঘন্য কার্য্যের অনুসরণ করিয়া যাহার ভূমিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেও আমাদিগকে আপন ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিল। এইরূপে হরিবলের তাড়নায় আমরা মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এক দিন রাত্রিকালে হরিবলের এক জন চাকরের অন্য মনুষ্য কর্ত্তৃক আহত রক্তাক্ত শবদেহ আমাদের শয়নগৃহের সম্মুখে পতিত ছিল। আমরা শত্রু কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত হইয়া মহা ভয়াকুল চিত্তে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া তৎসমুদয় ভয়াবহ কর্ম্ম দেখাইলাম। হরিবল আমার পিতাকে দোষী করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বার বার চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল "পিনাকী আমাকে ও আমার পুত্রকে হত্যা করিতে না পারিয়া অবশেষে আমার ভৃত্যকেই হত্যা করিয়াছে, অতএব আজই ইহাকে আদালতে যাইতে হইবে।"

যে দিন তাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যোগী ছিল, সেই দিন আমরা কোন একটী বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়া এই দিকে পলাইয়া আসিয়াছি ও একটী অরণ্যের ভিতর একটী ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছি। আমরা যাহাতে অন্য দেশে পলাইয়া যাইতে না পারি, এজন্য দুষ্টমতি হরিবল স্থানে স্থানে গুপ্তচর

প্রেরণ করিয়াছিল। পথিমধ্যে দৈব-দুর্য্যোগে যখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেই সময় কোন নৃশংস আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। বোধ হয় সে হরিবলের চর হইবে, কিন্তু তখনও আমরা দৈব অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিলাম। এই জমীদারের কাজেই পূর্ব্বে পিতা আমদিগকে লইয়া ছায়াপথ আসিয়াছিলেন। এইখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নানারূপে বিপদে পতিত হই। সুভগা, এই কষ্টই আমাদের চরম সীমা নহে। আবার সেফালি সেই হরিবলের পুত্র মুকুলকে ভালবাসে, এদিকে পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, এ বিবাহ কিছুতেই হইতে দিবেন না। ওদিকে সেফালির সেই পাণ্ডুমুখ ও অশ্রুপূর্ণ নয়ন এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য।

সুভগা। আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কি, সেফালি সেই হরিবলের পুত্রকে ভালবাসে?"

তেজ। হাঁ মুকুলকে পূর্ব্বে আমরা এক-জন সাধু লোক বলিয়াই জানিতাম। শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার যেন ধর্ম্মানুরাগ দেখিতে পাওয়া যাইত।

সুভগা। না না, সে বিষম ধর্ম্মান্ধ, না হইলে এমন অবস্থায় সে নিরপেক্ষ রহিবে কেন?

তেজ। সেফালি তাহাকে ভালবাসে, সেও সেফালিকে ভালবাসিত, কিন্তু এই সব ঘটনার পর হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আমাদের কুটীর হইতে ছায়াপথ এত কাছে। হঠাৎ এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এই দিকে আসিয়া পড়িলাম। প্রথমে একটী আম্রবৃক্ষের নীচে তোমার মাতার সহিত আমার দেখা হয়। সে দিন ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু তাহার পর দিনই আবার আসিলাম। এই বকুলতলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমায় দেখিতাম, যথাসময়ে আবার ফিরিয়া যাইতাম। সরলে, এত দিন তোমাকে পাইব আশা ছিল, আজ তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইল। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া সুভগা কহিল, "তেজকুমার! বিধির বিধান কি কেহ খণ্ডন করিতে পারে? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন তোমার জীবনের সুখের পথ দেখ।"

তেজ। সুখের কথা আর মুখে আনিও না, আমা হইতেই তোমার এ দুর্দ্দশা, তাহা কি এ জীবনে ভুলিব?

সুভগা। আমি বিধবা, বিধাতার অভিপ্রায় আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে পালন করিতেই হইবে। তুমিও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

তেজ। সুভগা, বিধবা বিবাহ—

তেজকুমারের কথায় বাধা দিয়া সুভগা কহিল, ছি ছি! স্ত্রী জাতির একটী মাত্র বিবাহ, বিধাতার কি ইহাই নিয়ম নহে?

তেজ। তোমার সমস্ত জীবন দুঃখময় হোক্ বিধাতার কি ইহাই ইচ্ছা?

সুভগা। হাঁ, তাঁহার তাহাই ইচ্ছা না হইলে এই বয়সে এরূপ হইবে কেন? অবলা জাতি দুর্ব্বলা হইলেও বৈধব্যের ব্রহ্মচর্য্য পালনে পরাঙ্মুখ বা ভীত নহে। সধবার স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠতম সুখ ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই সার স্বর্গ-সুখ। এই ধর্ম্মই বিধবাদের ধ্রুব সত্য ধর্ম্ম। অতএব তেজকুমার আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমি আর বিবাহ করিব না।

তেজ ভগ্নহৃদয়ে কহিল "তবে তুমি কি ভাবে কোথায় থাকিবে?"

সুভগা। বিবাহ ছাড়া নারীজীবনে অনেক কাজ করিবার আছে। তেজ-কুমার, আমি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি। আজ কি তুমি আমাকে সৎ উপদেশ দিবে না? রমণী বিধবা হইলে সমস্ত মানব-জগতের হেয় হয়, কিন্তু তখনও প্রাণের দেবতার নিকট মনের বল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি তেজকুমার,—

সুভগাকে কথা কহিতে না দিয়া তেজ-কুমার কহিল, সুভগা, সুভগা, আমি হিন্দুবিদ্বেষী নহি, বা নৃংশস নহি, তুমি স্বর্গের পরী। আমি জড়জগতের কীটাণু-কীট, তোমাকে স্বর্গচ্যুত করিবার আমার অধিকার কি? আশীর্ব্বাদ করি তুমি দেববলে তেজস্বিনী হও, ক্ষুদ্র মানবের প্রেম বিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেমে নিমগ্ন হও। তোমার সমস্ত জীবন

অদ্ভুত আনন্দরসে পরিপ্লুত হোক্। জানিও আমি কখনও তোমাকে ভুলিতে পারিব না। সুভগা, তুমি মহামহিমাময়ী, সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টা কুসুমময়ী দেবী; নিগূঢ়তম অন্তর প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া সদ্যপ্রসূত অশ্রুসলিলে ধৌত করিয়া আমি তোমাকেই পূজা করিব। বাহ্য জগতে উভয়ের সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইল—হোক্, তাহাতে ক্ষতি নাই।

সুভগা দৃঢ় স্বরে কহিল, তেজকুমার তবে তাহাই হোক্; তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আত্মরূপ উঠাইয়া লও। মন করায়ত্ত করা সহজ কাজ নহে, তুমি মানব, মানব চিরকালই আত্মবিরোধী, অস্থিরচেতা।

তেজ। তোমার কথায় আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সম্মতি জানিবে। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমি চলিলাম, চিরদিনের মত চলিলাম। তেজকুমার তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুভগা মর্ম্মভেদী তীব্র যাতনায় মুমূর্ষুবৎ সেই বকুলতলে বসিয়া রহিল, তাহার পরে অনেক রাত্রে "শুভ ইচ্ছার ও সাধু সঙ্কল্পের ঈশ্বর সহায় হইবেন" বলিয়া উঠিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল।

এই ঘটনার পর হইতেই সুভগা পরহিত-ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

যোদ্ধা পরিবার।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে স্পেনরাজ্য মুর বা আফ্রিকাদেশীয় যবনদিগের হস্তগত হইয়াছিল। সীড্ নামে প্রসিদ্ধ স্পেন-দেশীয় এক বীরপুরুষ ইহাদিগকে দেশ হইতে বারবার দূরীভূত করিয়া দেন, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া দেশের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। সীড্ অর্থে পরাক্রমশালী অসমসাহসী যোদ্ধা। মুরেরা আপনাদিগের বিপক্ষ সেনাপতির বীরত্বে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম রডেরিগো ডায়েস্। ১০৪০ এক হাজার চল্লিশ সালে বীডার্ দুর্গের নিকট বর্গোনামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়, এবং ১০৯৯ সালে ভালেন্সিয়া নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মুর-দিগের সহিত যুদ্ধে ইহাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়, এবং মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইনি তাহাদিগের হস্ত হইতে ভালেন্সিয়া নগর উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রতি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করাতে তাঁহার নাম মুরদিগের নিকট অত্যন্ত ভীতিজনক হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ সমর-সজ্জায় সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ মহোৎসাহে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পত্নীও বীরাঙ্গনা ছিলেন। জীবদ্দশায় স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অনেক যুদ্ধে তিনি তাঁহার সহকারিতা করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণী ভালেন্সিয়া নগর তিন বৎসর কাল স্বীয় অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন; অবশেষে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কাষ্টাইল নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন, এবং তথায় ১১০৪ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বীর দম্পতীর দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র ছিল। ইহাঁদের সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সন্তানেরাও অনুপ্রাণিত হইয়া মুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং দেশের উদ্ধার সাধনে আপনাদিগের প্রাণ আহুতি দিয়াছিল। ইহাঁদিগের উপাখ্যানে সত্যের সহিত অনেক কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। যাহাহউক সীড্ আদর্শ খৃষ্টীয় বীর বলিয়া দেশবাসীদিগের নিকট প্রসিদ্ধ। তিনি যেমন যুদ্ধে অজেয় ছিলেন, সেইরূপ চরিত্র অংশে নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন।

তাসের ঘর।

বালকেরা তাসের ঘর প্রস্তুত করিয়া খেলিয়া থাকে, তাহাতেই তাহাদের অপার আনন্দ—তাহাতেই তাহারা এককালে মগ্ন হইয়া যায়। সেই তাসের ঘরকে প্রকৃত ঘরের ন্যায় ভাবিয়া তাহারা সেই ঘর নির্ম্মাণ করে ও অতি যত্নে তাহার মধ্যে পুতুল শোয়াইয়া রাখে। যাহাতে সেই ঘরে বিন্দুমাত্র বাতাস না লাগে, যাহাতে সেই ঘর অতি সন্তর্পণে রক্ষিত হয়, তাহারা সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করে। একটু বাতাস বা ধাক্কা লাগিয়া যদি তাহাদের সেই সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ত্রস্তে ব্যস্তে তাহার সংস্কার করে ও আবার যাহাতে না পড়িয়া যায় তাহার চেষ্টা করে। যদি পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গে, তবে তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না—তাহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। আমাদের এই সংসার—এই ভবের খেলা—ইহাও কি ঠিক্ সেইরূপ নহে? বালকেরা যেমন তাসের ঘর ও পুত্তলিকা লইয়া মাতিয়া থাকে ও তাহাতে ডুবিয়া যায়, আমাদের অবস্থাও জ্ঞানের চক্ষে চাহিয়া দেখিলে ঠিক্ সেই-রূপ বোধ হইবে। আমরাও ভবের খেলায় মত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকি, স্বামী পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ি যে, কোন ক্রমেই তাহা হইতে মুক্ত হইবার আশা থাকে না। যদি সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আমাদের তাসের ঘর একটু নড়িয়া উঠে, তবে ভয়ের ও ভাবনার সীমা থাকে না—চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহার রক্ষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করি। যদি দৈবক্রমে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে দুঃখে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি,—জীবনের আর অবলম্বন থাকে না। বালক বালিকাদের তাসের ঘর ভাঙ্গিবার পর তাহাদিগকে রোদন করিতে দেখিলে তখন আমাদের হাসি পায়। তাহাদের অসার অকারণ রোদন প্রায় আমাদের বিরক্তিই উৎপাদন করেন কিন্তু ভুলিয়াও ভাবি না যে, আর এক মুহূর্ত্ত পরে আমাদের তাসের ঘরের জন্য হয়ত আমরা সেইরূপ বা ততোধিক ব্যাকুলান্তরে কাঁদিব। তখন একবারও নিজের হাস্যের কথা মনে হয় না। কেহ যদি আমাদের ক্রন্দন দেখিয়া তদ্রূপ হাস্য করে, তাহার অমানুষিক ব্যবহারে তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ ও ঘৃণাই জন্মে। একবার ভাবিয়াও দেখি না কেন এ ক্রন্দন, কেন এ ব্যাকুলতা? ইহাও কি শিশুর তাসের ঘর ভাঙায় ক্রন্দনের সমতুল্য নয়? যদি তাহাই হইল, তবে এ ব্যাকুলতাও ত হাস্যকর। কিন্তু এ মায়াই বা কেন? এ মোহই বা কেন? ইহার

কারণ কি, তাহা কে বলিবে? আর ভগবান্‌ই বা এ ক্রীড়া পুত্তলি ও তাসের ঘর দিয়া মানবকে মজাইলেন কেন, তাহাই বা কে বলিবে? তবে কি ইহা তাঁহার অভিপ্রেত? অভিপ্রেতই যদি হইবে, তবে ইহাতে এত দুঃখ কষ্ট হতাশার যন্ত্রণা কেন? এবং এই সুখকর মোহে যে ডোবে, সে তাঁকে পায় না কেন? যিনি মানবের সর্ব্বসুখদাতা ও সর্ব্বমঙ্গলের আকর, তাঁহাকে লাভ করাইত মানবের মোক্ষসুখ। যে ক্রীড়া তাঁহাকে লাভ করার পক্ষে অন্তরায়, সে ক্রীড়ায় প্রয়োজন কি? কেন এ তাসের ঘর—কেন এ ভবের খেলা? ইহাতে স্বতঃই মনে হইবে যে, এই ক্রীড়ায় অবশ্য তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় নিহিত আছে। তাহা কি? তাহা বুঝিবার জন্য ত কত জ্ঞানী, কত মনস্বী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বুঝিয়াছেন এই যে, এই তাসের ঘরে পুতুলক্রীড়ায় একবারে আত্মহারা না হইয়া, আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এই ভবের খেলা খেলিবে, এই মায়া মোহের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়াও যে ইহার বিষময় বায়ুতে বিষাক্ত না হইবে, সেই তাঁহাকে পাইবে। তবে এই তাসের ঘরও মানবের পক্ষে কর্ত্তব্যসাধনের প্রকৃষ্ট পথ। এই তাসের ঘরে থাকিয়া ও পুতুল খেলা খেলিয়া যাহাতে শুধু ইহাতে না ডুবিয়া যাই, দৈববশে তাসের ঘর ভাঙ্গিলে মুহ্যমান হইয়া না পড়ি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ইহা অন্তরে জাগরূক রাখিলে কালে আমরা কি মোক্ষসুখ লাভে সমর্থ হইব না?

শ্রীকুসুমকুমারী রায়।

গৃহ-কর্ম্ম।

বোঁদের পায়স।

দ্রব্য।		প্রস্তুত করিবার নিয়ম।
ছোলার ডালের বেশনের চিনিহীন বোঁদে	৵৷৷০ সের	যদি ঘরে বোঁদিয়া প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভালই, নতুবা ময়রার দোকান হইতে আল বোঁদে (অর্থাৎ চিনির রসে না ফেলা) টাটকা ভাজাইয়া আনাইয়া প্রস্তুত রাখ। দুধ জ্বালে ফুটিয়া ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে ঐ সকল বোঁদিয়া ঢালিয়া দেও। অল্প-ক্ষণ ফুটিলে তাহাতে চিনি দেও, তাহার পর সমস্ত উপকরণ দিয়া নাড়িতে থাক। যখন পায়সের ধরণে ঘন হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, তখন তাহাতে এলাচিচূর্ণ এবং কর্পূর নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া রাখ। ইহা অল্পোষ্ণ সেবন করিলে অনুপম আস্বাদন অনুভূত হয়। রসনা-পরিতৃপ্তিকর দ্রব্যের মধ্যে ইহা একটী প্রধান সামগ্রী।
খাঁটি দুগ্ধ	৵৩ সের	
চিনি দোবারা	৵৸০ পোয়া	
বাদাম	সম্ভব মত।	
পেস্তা		
কিসমিস		
ছোট এলাচচূর্ণ		
কর্পূর		

দেববালা সেন।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভা ১৯শে ফেব্রুয়ারি হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বড়লাট উপস্থিত থাকিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ডি এল উপাধি দিয়া সময়োচিত বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে অনেক-গুলি ইংরাজ ও বাঙ্গালী রমণী উপস্থিত ছিলেন। কুমারী হেমপ্রভা বসুর এম্ এ এবং আইডা ডিক্রুজের বি এ উপাধি লইবার সময় বিশেষ আনন্দ-ধ্বনি হয়। বাইস চ্যান্সেলার ট্রিবেলিয়ান সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

২। বেথুন কলেজের পারিতোষিক দান সভারও খুব সমারোহ হইয়াছিল। লেডী এলগিন স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

৩। মেঃ বি, এল গুপ্ত জেলা ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৪। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ মহী-মোহন ঘোষের সহিত স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমীলার শুভ বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

৫। সিন্ধু ও কট্‌রী নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণার্থ ষ্টেট সেক্রেটারী ২১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৬। রাজপ্রতিনিধি আগামী ২৯শে মার্চ কলিকাতা হইতে সিমলা যাত্রা করিবেন।

৭। বিলাতে ৬৪টী ছাত্র বারিষ্টার হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ১৫টী এ দেশীয়।

৮। গত ৮ই ফেব্রুয়ারি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। মহারাণীর বক্তৃতায় ভারতের অনেক কথা আছে। দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ, মড়ক বৃদ্ধির জন্য আক্ষেপ, সীমান্ত যুদ্ধের বীর-দিগের বীরত্বের ধন্যবাদ আছে।

৯। ডাক্তার এ ফরার নেপাল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন।

১০। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে আজি কালি সাহেব বিবী এবং বাঙ্গালী বাবুদের বাইসিকেল-ভ্রমণ দেখা যায়। কলিকাতায় নাকি ৪০০০ বাইসিকিলের আমদানী হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

ম্যাজিক কালী—পি এল মুখার্জ্জির প্রস্তুত কালী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নূতন পেনে জলের মত এই কালী লইয়া কাগজে লিখিলে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু তাহা শুকাইয়া আগুন তাতে ধরিলে দিব্য সবুজ রঙের লেখা বাহির হয়। ইহার মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ ছয় আনা।

সারস্বত পঞ্জিকা—ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৩০৫ সালের এই পঞ্জিকার একখণ্ড উপহার পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহাতে জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ আছে। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

বামারচনা।

আমার খুকু।

আয়রে আয়রে মোর হৃদয়-রতন।
শান্তিরূপা খুকুরাণী দেব-দরশন॥
হাসির লহরী ছুটে তোর মুখ দিয়ে।
আনন্দ ঢালিয়া দেয় হৃদয় ভরিয়ে॥
অমৃত-মাখান মুখ নাহিক তুলনা।
যত দেখি তত হয় দেখিতে বাসনা॥
ধরিয়া তোমারে বুকে স্বর্গসুখ পাই।
মর্ত্ত্যে কি ত্রিদিবে আছি ভুলিয়া তা যাই॥
ধরাতলে যত কিছু আছে মনোহর।
আমার খুকু রে! তুমি তা'হতে সুন্দর॥
লোকে না বলুক ভাল তাহে নাই ক্ষতি।
মোর চক্ষে খুকুরাণী ভুবনের জ্যোতি॥
ঈশ্বরের করুণার এক বিন্দু লয়ে।
গঠেছে বিধাতা তোরে একফোঁটা মেয়ে॥
নাহিক তুলনা তোর—জগতে অতুল।
দেবতার কৃপাকণা আশীর্ব্বাদি ফুল॥
পৃথিবীর পাপ তাপ দুঃখ ও যন্ত্রণা।
ছুঁইতে না পারে তোরে ইহাই কামনা॥
দেব-আশীর্ব্বাদ লয়ে চিরজীবী হও।
দুঃখময় হৃদে মোর শান্তি ঢেলে দাও॥

শ্রীমতী সৌদামিনী দাসী,
ঝিনাইদহ।

সরলা সুন্দরী।

মুছিয়া ফেলেছে তার সীমন্তে সিন্দূর,
কাড়িয়া লইয়া গেছে বাজু, বালা, হার,
মুড়াইয়া দিয়া চারু চাঁচর চিকুর,
যৌবনে যোগিনী-বেশ করিয়াছে তার।
একাহার, হবিষ্যান্ন, দিনান্তে বিধান,
একাদশী, ব্রহ্মচর্য্য সব তারি তরে;
নাহি সুখ, নাহি শান্তি, মরুময় প্রাণ,—
সরলা বিধবা আজ ভারত-ভিতরে!

পথের ভিখারী যেই, সেও আশা করে
ভবিষ্য জীবনে সুখী হ'তে একবার;
সংসার পুড়িয়া ছাই সরলার তরে,
তাহার সুখের দিন আসিবে না আর!
হা সরলা! হা বালিকা! দেখে ফাটে প্রাণ!
হা বিধি! করুণাময় কার এ বিধান?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

বাসি ফুল।

একদিন পড়িয়া ভূতলে।
বাসিফুল কেঁদে শুধু বলে
"বসিয়া কে মল বৃন্তকোলে
ভাসিতাম সোহাগ-হিল্লোলে,
ধীরে আসি মলয় পবন
করিত রে আদরে চুম্বন,
মধুকর গুণ গুণ স্বরে
কত গান শুনাইত মোরে।
এবে কেহ ফিরে নাহি চায়
বাসিফুল ব'লে চলে যায়।
ধন ছিল রূপ ছিল আগে,
চাহিত সকলে অনুরাগে।
এবে মোর ফুরায়েছে সব,
তাই কেহ করে না গৌরব!!

শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী।

শোক-অশ্রু।

(কোনও বিধবা বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

১

চোখের সম্মুখে এসে ভাসে বারে বারে
কাহার ভাবনা-ক্লিষ্ট কাতর বদন;
শ্রবণ-কুহরে এসে বাজে অবিরাম,
কাহার মরমস্পর্শী করুণ ক্রন্দন?

২

সহসা খুলিয়া গেল স্মৃতির অর্গল,
অতীতের কথা পুনঃ মনে উঠে জেগে;
অবশ হৃদয় পুনঃ জাগে গত শোকে—
অজস্র অশ্রুর ধারা বহে নব বেগে!

৩

হৃদয়ের তন্ত্রিচয় গিয়াছে ছিঁড়িয়া;
(ছিন্ন তন্ত্রী যোড়া দে (ও) য়া?—সেত বিড়ম্বনা!)
অতীত মধুর গীতি মনে জাগাইতে
বেসুরা গাহিছে শুধু ছিন্ন হৃদি-বীণা!

৪

বিগত দিনের কথা কখনো ভুলিনি,
(যে দিন হইতে মোর ভঙ্গ আশা খেলা)
তবে কেন পোড়া হৃদে স্মৃতি কুহকিনি!
খেল চাতুরীর খেলা—কেন হেন ছলা?

৫

যতই যতন স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে,
ততই উজ্জ্বলতর হেরি সে প্রতিমা,
ততই নেশায় যেন হই আত্মহারা—
মোহঘোরে হেরি আরো কত মধুরিমা!

৬

আমাকে ত্যজিয়া যেতে যদ্যপি গো তোর
হৃদয়ের প্রান্তদেশে লাগিল না ব্যথা,
তবে কেন তোর তরে—নিঠুরা পাষাণি—
বকে মরি বলে আমি এত শত কথা?

৭

কিন্তু যবে বাতায়নে দাঁড়াইয়া হেরি,
পশ্চিমে রক্তিম ভানু প্রায় অস্তমিত ;
বিষাদে অভুক্ত পাখী ধায় নীড় পানে,
অবসাদে ফুলদল হয় বৃন্তচ্যুত,—

৮

তখন মনের বাঁধ হয় গো শিথিল,
তখন মনেতে বহে ঝটিকা-উচ্ছ্বাস,
ভগ্ন, জীর্ণ ক্লান্ত হিয়া, আরো ভগ্ন করি—
ঝরে কয় বিন্দু অশ্রু—উঠে দীর্ঘশ্বাস !!

শ্রীশৈলজা সুন্দরী দেবী।

"সেই দেশ"।

কেন আজ মনে পড়ে কথা সে দেশের ?
রোগ, শোক নাই যথা,
পরাণে নাইকো ব্যথা,
যে দেশে গাহে না কেউ গান বিষাদের।
যে দেশে বসন্ত বায়,
সুরভি মাখিয়া গায়
বয়ে যায় দিবানিশি নাহিক বিরাম।
না জানি সে দেশে গেলে কতই আরাম।
ভাবি মনে একাকিনী বিরলে বসিয়া,
দুঃখে তাপে ম্রিয়মাণ,
অবসন্ন যেই প্রাণ,
তৃষিত যে তুচ্ছ হৃদি সে দেশ লাগিয়া,
সেথা গেলে পাবে শান্তি,
ঘুচিবে সংসার-শ্রান্তি,
পাইবে অনন্ত সুখ অমরে সেবিয়া,
গাইবে স্বরগ গীতি—প্রাণ মোহনিয়া।
সে দেশ কেমনতর বলিব কি করে ?
সেথা দেববালাগণ,
করে সদা বিচরণ,
কোকিল হরষে বসি গায় কুহুস্বরে।
সেথা কঠোরতা নাই,
নীরব, নিস্তব্ধ ঠাঁই,
যেথায় দুঃখেতে নাহি তপ্ত অশ্রু ঝরে।
সে দেশে বসন্ত রাণী সদাই বিহরে।
তুচ্ছ প্রাণ যেতে চায় যে দেশের পানে ;
তাপিত হৃদয় মোর,
ভেঙ্গে চুরে মোহ ঘোর,
ধায় সে দেশের লাগি, পরাণের টানে।
শত বাধা এড়াইয়া,
ক্ষুদ্র হৃদি বিকাইয়া,
চলে আজ দেবদেশে আশাপূর্ণ প্রাণে,
যথায় অমরবৃন্দ গায় একতানে।
কবে হবে শুভদিন জীবনে আমার,
ছাড়িব মরতধাম,
গাব সদা বিভুনাম,
দূরে যাবে ভয়, দুঃখ, নয়ন-আসার।
দেবতার আশীর্ব্বাদে,
থাকিব গো নির্ব্বিবাদে,
করিব সার্থক জন্ম তুচ্ছ রমণীর
হ'ক হেন শুভদিন বরে বিধাতার।

কুমারী সুকুমারী দাস।

No. 398. March, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৮ সংখ্যা। ফাল্গুন ১৩০৪—মার্চ্চ, ১৮৯৮। ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজপ্রতিনিধির রাজধানী ত্যাগ—আগামী মাসের শেষে লর্ড এলগিন সদলে সিমলা শৈলাবাসে গমন করিবেন। এই বৎসর ইহাঁর রাজত্বের শেষ বৎসর। আমরা প্রার্থনা করি, রাজপ্রতিনিধি পর্ব্বতের শীতল বায়ুতে বসিয়া ভারতের স্থায়ী কোনও মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাইবেন।

অকালে শীত—কবিবর মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী চণ্ডীতে গাইয়াছেন "ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা," এবার তাহাই ঘটিয়াছে। বসন্তের হাওয়া বহিয়া ও রৌদ্র প্রখর হইয়া ফাল্গুনে হঠাৎ দ্বিগুণ শীত পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝটিকা ও অতিরিক্ত বরফপাত ইহার কারণ।

হত্যাকারীর আপিল—দামোদর হরিচোপকার প্লেগ কমিসনরের হত্যাকারী বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, এখন তাহার আপীল শুনা হইতেছে। সে আপনার মুখে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, এখন বলে পুলিসের ভয়ে মিথ্যা এজাহার দিয়াছে, সে হত্যাকারী নয়।

মৃত্যু—(১) গত ৭ই ফাল্গুন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জগবন্ধু বসুর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি নব-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারি কলেজের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইহাঁর বিয়োগে উক্ত কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। (২) ১৮ই ফাল্গুন স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের গুণবতী পত্নী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। (৩) কুমারী ফ্লোরেন্স ইবা মর্গান বিলাত হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পুনা প্লেগ হাঁসপাতালে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন, হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

পারিতোষিক দান—(১) গত ১৫ই ফাল্গুন বেথুন কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ লেডী এলগিন দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে চিফ জষ্টিস ম্যাক্লিন সাহেব কলেজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু মনোমোহন ঘোষের একখানি ছবি বক্তৃতা সহকারে সাধারণ সমক্ষে মুক্তাবরণ করেন। (২) ১৬ই ফাল্গুন চিফ জষ্টিস পত্নী লেডী ম্যাক্লিন গড়ের মাঠে স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে ব্যায়াম পরীক্ষার পুরস্কার দান করেন।

মহারাণীর ভ্রমণ—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইউরোপের দক্ষিণাংশ ভ্রমণে আগামী গ্রীষ্মকাল অতিবাহন করিবেন।

সন্ধি—আবিসিনিয়ার রাজা মারিলকের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হইয়া গিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট হারিংটন ব্রিটিষ দূত স্বরূপ ঐ রাজ্যে থাকিবেন।

প্লেগ—বোম্বাইয়ের মহামারী আবার বাড়িয়া উঠিতেছে। পঞ্জাবেও দিন দিন ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

গ্লাডষ্টোনের সংবাদ—ইনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। ইহাঁর আশ্চর্য্য লিপিদক্ষতায় সকলে চমৎকৃত। ইনি এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিবর্ষে 'অসংখ্য' সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ৪।৫ হাজার চিঠি পত্র লেখেন। এ পর্য্যন্ত ২৯৯ খানি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। জগদীশ এরূপ মহাত্মাকে আরও দীর্ঘায়ু করুন।

গরিব লোকদের জন্য রাজপ্রাসাদ—গ্লাসগো নগরে লর্ড রোজবরী এই গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গরিবদিগকে ভাল ঘরে রাখিবার, ভাল খাদ্য খাওয়াইবার, রাজভোগ্য নানা উৎকৃষ্ট সুখে সুখী করিবার জন্য ইংলণ্ডের অনেক নর নারী ব্যস্ত। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়" ইহাঁরা এই বাক্যের সার্থকতা করিতেছেন।

প্রাচীন ভ্রম।

অনেকে কথায় কথায় বলিয়া থাকেন,—

"যাদৃশী ভাবনা যস্ত
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যিনি যেরূপ ভাবেন, তাঁহার সিদ্ধি সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলেনঃ—কাচ পোকায় তেলা পোকা (আশুলা) ধরে। তেলা পোকা প্রাণের ভয়ে কাচ পোকাকে নিরন্তর ভাবিতে থাকে। ঐ ভাবনা নিবন্ধন কিছু দিন পরে তেলা পোকা কাচ পোকা হইয়া যায়। পৌরাণিক দৃষ্টান্ত—ভরতের হরিণ-যোনি-প্রাপ্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

যাহা ভাবিতে ভাবিতে জীব দেহত্যাগ করে, দেহান্তে তৎপ্রাপ্তি হয়। ইহা শাস্ত্রের কথা। ইহা পরীক্ষা করিবার উপায় না থাকিলেও হিন্দুগণকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, কেননা শাস্ত্রে বিশ্বাসই হিন্দুত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া, "যাদৃশী ভাবনা যস্ত—" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় শ্লোকের পর যিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? ঐ শ্লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে তেলাপোকা কাচপোকার ইতিহাস অনেকেই বর্ণন করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ঐ ইতিহাস বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন যখন তখন অনেক অভিজ্ঞ বক্তার মুখেও ঐ কথা শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কথাটীর মধ্যে একটী প্রকাণ্ড ভ্রম আছে।

প্রাণিমাত্রেই ডিম্ব, বা শাবক প্রসব করে; কিন্তু কোন কোন প্রাণীর ডিম্বাদি পালন করিবার শক্তি নাই। অনেকেই জানেন, কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এবং কাকের ডিম্বগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। কাক আপনার ডিম মনে করিয়া কোকিলের ডিম পালন করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, কাচপোকার ডিম্ব রক্ষা করণোপযোগী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার ও ডিম পালিবার শক্তি নাই। কাচপোকার ডিম্ব প্রসবের সময় হইলে সে একটী তৈলপায়িকা ধরে এবং তাহার উদর ভেদ করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করে। ডিম্ব প্রসব এবং তৈলপায়িকার উদরমধ্যে ঐ ডিম্বের আধান, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে, কাচ পোকা তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকার একটু যন্ত্রণা হয় বটে, কিন্তু সে প্রাণে মরে না—কাতর ভাবেই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে উদরস্থ ডিম্ব সকল স্ফুটিত হইয়া কাচপোকার শাবকরূপে পরিণত হয়, এবং তৈলপায়িকার গর্ভস্থ মাংসাদি ভোজন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তৈলপায়িকা যাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া ২।১ দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। তখন কাচপোকার শাবকগণও তন্মধ্য হইতে বহির্গত হয়।

কোন কোন জাতীয় কাচপোকা, ডিম্ব প্রসবের পর তৈলপায়িকাকে পরিত্যাগ করে না, তাহাকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া, বা আর্দ্র মৃত্তিকাবরণে বদ্ধ করিয়া রাখে। তৈলপায়িকার উদর হইতে কাচপোকার সৃষ্টিপ্রকরণটী যেরূপ, তদ্দর্শনে কাচপোকাধৃত তৈলপায়িকা ভাবিয়া ভাবিয়া কাচপোকা হইয়া যায়, স্থূলদর্শী জনগণের এরূপ সংস্কার হওয়া বিচিত্র নহে।

এক পদার্থ অন্য পদার্থ সহ মিলিত হইয়া স্ব স্ব গুণ, বা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণান্তর বা ধর্ম্মান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহার নাম সম্বন্ধ বা রাসায়নিক ক্রিয়া। এই সম্বন্ধের বা রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণ

প্রদর্শনকালে অনেকেই চূর্ণ হরিদ্রার কথা উত্থাপন করেন। চূর্ণ শুভ্র ও হরিদ্রা পীত; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ ধারণ করে,—অতএব ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া। অনেক গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ উহা রাসায়নিক দৃষ্টান্ত নহে;—উহা পরমাণুগণের বিভিন্নপ্রকার নিবেশ মাত্র। রাসায়নিক ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ এই যে, পদার্থগণের মিলনকালে উত্তাপের সমাগম বা অপগম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চূর্ণ হরিদ্রার মিলনকালে উহার অন্যতর কিছুই হয় না।*

এইরূপ কত বিষয়ে কত ভ্রম কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আমাদের লক্ষ্য নাই। বোধ হয়, সকলের অভিনিবেশ থাকিলে মধ্যে মধ্যে এক একটী প্রাচীন ভ্রম আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে পারে এবং তাহার নিরাকরণও হইতে পারে।

প্রকৃত স্ত্রী।

(৩৯৬ সংখ্যা ৩২২ পৃষ্ঠার পর)

পতির প্রতি রমণীর যাহা কর্ত্তব্য গত সংখ্যায় তাহা দেখাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত স্ত্রীর আরও কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, এক্ষণে তাহাই বলিব।

পতি যেমন রমণীর পরমাত্মীয়, পতির আত্মীয়গণও তদ্রূপ রমণীর আত্মীয় বলিয়া পরিগণিত; সুতরাং পতির পিতা মাতাকে স্বীয় পিতা মাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা রমণীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক স্থলেই সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। কৌশল্যা সীতার ন্যায় আদর্শ শাশুড়ী বধূরও মনোমালিন্য বশতঃ অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবারকে ছারখার হইতে দেখা যাইতেছে। এ স্থলে একপক্ষ বিচারক শাশুড়ীদিগের ও আর একপক্ষ বধূদিগের স্কন্ধে দোষভার ন্যস্ত করেন। এমতে প্রকৃত দোষী কে, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আমরা নিজের মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী প্রবাদ বচন দ্বারাই ইহার আলোচনা করিব। আমাদেব দেশে যে সকল প্রবাদ বচনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক নহে।

"বৌ ভাঙলেন সরা, গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা॥"

অর্থাৎ বধূর ক্ষুদ্র দোষটুকুও প্রকাণ্ডাকার ধারণ করিয়া পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে এবং গিন্নির প্রকাণ্ড দোষটুকু ঘরের বাহিরও হয় না। এই প্রবাদ বচনটিতেই শাশুড়ীর স্বার্থপরতার ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

* চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রণে যে পাটলবর্ণ হয়,ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া কি না, এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। বা,বো,স।

হিন্দু সমাজে রমণীগণ বিবাহের পর হইতেই শ্বশুরালয়ে বাস করিতে আরম্ভ করে। অধিকাংশ স্থলেই তখন বালিকাদিগের বয়স চতুর্দ্দশ অতিক্রম করে না। তখন তাহারা কর্ত্তব্যের কি বুঝে? জীবনের শিক্ষা শেষ না হইতেই তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করে, এমতে শ্বশুরালয়ে সৎশিক্ষা লাভ না করিলে আর তাহাদের শিক্ষার স্থান কোথা? কিন্তু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, এই সময় হইতে শাশুড়ীগণ বধূদিগের কার্য্যকলাপ লইয়া খুঁটি নাটী আরম্ভ করিয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে একটী বধূর প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অন্যের হৃদয়ে ঈর্ষ্যার দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া সোণার সংসার ভস্মীভূত করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেন। অধিকাংশ স্থলে নাবিকের দোষে যেমন তরণী জলমগ্ন হইয়া আরোহীদিগকে বিপন্ন করে, গৃহিণীর দোষে তদ্রূপ সংসারে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া তৎসহযোগিগণ সেই অনলে ভস্মীভূত হয়। প্রবাদ-বচনেও আছে—

"গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট"

অতএব গৃহিণীর উদারচিত্ত হইয়া সকলকে সমান স্নেহ যত্ন প্রদান করাই কর্ত্তব্য। মৃদু ও মধুর বাক্যে বধূদিগকে উপদেশ প্রদান করা শাশুড়ীদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বনের পাখী ধরিয়া আনিলে আগে তাহাকে আদর যত্ন সহ লালন পালন করিতে হয়, পরে সে পোষ মানিয়া থাকে। একটী অপরিচিতা অবোধ অবগুণ্ঠ বালিকাকে গৃহে লইয়া আসিয়া, সমুচিত আদর যত্ন না করিলে সে বশীভূত হইবে কেন? এ সম্বন্ধে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ভূদেব বাবুর "পারিবারিক প্রবন্ধ" পাঠে বেশ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়।

অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। প্রাচীন কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, প্রাচীনকালে বিশেষরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রাচীনা রমণীগণ কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সমর-প্রাঙ্গণে, কি সংসার-ধর্ম্মে, সকল স্থলেই আবশ্যকমত নিজ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও রমণী-হৃদয়ের স্বর্গীয় ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা খোদিত রহিয়াছে। মধ্যে কিছুকাল স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, স্ত্রীজাতি মনুষ্যজাতি মধ্যে নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাহাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত জীবন গঠিত হয় না, অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারাই সমাজে মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমশিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। মধ্য সময়ের লোক ইহা বুঝিতেন না, সুতরাং ঐ সময় হইতে বধূদিগের প্রতি শাশুড়ীদিগের অযথা অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে এ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সংবাদ পাওয়া যায়। হা দুর্দ্দৈব! কৌশল্যা, কুন্তী প্রভৃতি দেবীগণ, তোমরা এখন কোথা!!

"গতস্য শোচনা নাস্তি" সুতরাং যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখনও স্ত্রীজাতি শিক্ষা লাভ করিলে সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা তিরোহিত হইয়া সংসারে শান্তির আলোক দেখা যাইতে পারে।

রমণী জননী জাতি, সুতরাং উদার-চিত্তে জগতে প্রেমার্পণ করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিগণই আত্মপর বাছাবাছি করিয়া থাকেন, উদারচিত্ত ব্যক্তিগণ বিশাল বিশ্বে আপনাকে মিশাইয়া সর্ব্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত হয়েন। যিনি বিশ্বসেবারূপ মহাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়খানিই প্রকৃত স্বর্গ। এইরূপ স্বর্গ লাভের চেষ্টা করা রমণীমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ক্ষমাশীলতা স্ত্রীজাতির একটী প্রধান ভূষণ। যিনি ক্ষমাশীল, নশ্বর জগতের জীবের কথা কি, তিনি দেবতাদিগেরও আদরণীয়। যথা—

অতিবাদং ন প্রবদেন্ন বাদয়েৎ,
যোনাহতঃ প্রতিহন্যান্ন ঘাতয়েৎ।
হন্তশ্চ যো নেচ্ছতি পাপকং বৈ
তস্মৈ দেবাঃ স্পৃহয়ন্ত্যাগতায়।"

উদ্যোগ ৩৫।১২৭০।

শাস্ত্র প্রকৃত স্ত্রীর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং করোতি হি।
বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।

অনুশাসন। ১৪৬।৬৭৮৫।

অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীর অনুগত থাকিয়া দেববৎ স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া সুখ-দর্শনা হয়েন, সেই প্রকৃত স্ত্রী। আবার,—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

আদিপর্ব্ব।

অর্থাৎ তিনিই ভার্য্যা, যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষ ও পুত্রবতী এবং যাঁহার হৃদয় বাক্য ও কার্য্য সকল পবিত্র ও যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

রমণীমাত্রেরই প্রকৃত স্ত্রী হইবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃত চেষ্টার পুরস্কার শ্রীভগবান্ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা আমাদের কর্ত্তব্য যথোচিত-রূপে পালন করিতে পারি না, সেই জন্যই আমাদের এত অধঃপতন ঘটিতেছে।

"যাতাধোধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্থ খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যচ কারকঃ"।

অর্থ—কূপখননকারী যেরূপ ক্রমে নিম্নগতি এবং প্রাচীরগাথক ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়, মানব সেইরূপ নিজ কর্ম্মানুসারে উচ্চতা ও নীচতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নিজ উচ্চতা লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে আমরাও সফলকাম হইতে পারিব।

নশ্বর জীবন কয় দিনের জন্য? সৎ-কীর্ত্তিই প্রকৃত জীবন। ভগিনীগণ! আইস আমরা সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃত জীবন লাভের চেষ্টা করি। ভারত আবার সীতা সাবিত্রীর পবিত্র ছবি লইয়া ধন্য হউক্।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

রত্নমালা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেফালি একদিন ফুল তুলিতে তুলিতে গুণ গুণ করিয়া গাইতে গাইতে কুটীরের নিকটবর্ত্তী একটী গিরিবর্ত্ম ধরিয়া যাইতে-ছিল। যাইতে যাইতে যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল না। সেই সময় তাহার উপর দিয়া একটী বসন্তের কাল কোকিল দিগন্তব্যাপী ঝঙ্কার করিয়া চলিয়া গেল। সেফালি চমকিত ভাবে আকাশের দিকে চাহিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিপাশে বৃহৎ শ্বাপদ-সমাকুল ঘোর অরণ্যানী। সেফালি মহা ব্যস্ত হইয়া কুটীরে ফিরিতে চাহিল, কিন্তু পথ নাই। সে অনেকবার পথের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে পথ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার সেই নির্জ্জন কুটীরের শ্যাম সৌন্দর্য্যের কথা মনে হইল। ধীরে ধীরে পিতার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি মনে হইল, তেজকুমারের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একখানি মুখ তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইল। বালিকার কুসুম-কোরকোপম নয়নে অশ্রুজল বহিয়া গণ্ড ভিজিয়া গেল।

কিন্তু বালিকা তাহাতেও অধীর হইল না, হৃদয়ের বল হারাইল না, কারণ সে জানিত ভগবান্ বিপদভঞ্জন। সম্মুখেই একখানি শ্বেত শিলাখণ্ড, বালিকা তাহার উপর বসিয়া ভগবানের ধ্যানে মনো-নিবেশ করিল। সেই ধ্যানমগ্না বালিকার শিথিল অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছিল, মুদ্রিত নেত্রে প্রেমাশ্রু পড়িতেছিল, যুক্ত-কর-পল্লব ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। সেই অরণ্যে সনাতন ধর্ম্ম-দ্বেষী কয়েকজন দৈত্যপ্রকৃতি মানব বাস করিত; অচিরাৎ সেই ধ্যানমগ্না বালিকা তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহারা গভীর গর্জ্জন করিয়া সেফালির কেশাকর্ষণ করিতে করিতে শূন্যে উঠাইয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য লইয়া গেল। সেফালি কি তদবস্থায় অচেতন? না না, সেফালি প্রাণের কাতরতায় মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়া কহিল "তাহাই হউক, যাঁহার ইচ্ছায় এই অনন্ত বিশ্বজগৎ শাসিত হইতেছে আজ, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" "ভগবান সহায় হও, ভগবান সহায় হও"—অসুরদিগের বিকট চিৎকার ধ্বনির মধ্যেও সেফালির কর্ণে এই গম্ভীর মনুষ্য-কণ্ঠ ধ্বনিত হইল। "ভগবান্ সহায় হও! ভগবান্ সহায় হও" কি মধুর কণ্ঠ, কি পবিত্র স্বর! মুহূর্ত্তমধ্যে অসুরদল লণ্ড ভণ্ড হইয়া কে কোথায় পলাইয়া গেল। সেফালি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে

দীর্ঘাকৃতি এক মনুষ্যমূর্ত্তি, তাঁহার বাম হস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি। সেফালি অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহাকে চিনিল, তিনি সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তখন উৎপীড়িত ধূল্যবলুণ্ঠিত কল্পলতিকা তুল্য সেফালিকে অতি যত্নে কোলে তুলিয়া লইয়া কুটীরে রাখিয়া আসিলেন। এই স্পর্শে সেফালির মনোমধ্যে নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় একরূপ অনল জ্বলিল, সেফালি সন্ন্যাসীর হস্ত ধরিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিল "দেবতা, আবার যেন দেখা পাই।"

একদিন সন্ধ্যাকালে তেজকুমার ও সেফালি বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে মালতী বৃক্ষের উপরে সোণার চাঁদ হাসিতেছিল, শিশিরসিক্ত নৈশসমীর গাছ পাতা দুলাইয়া দুলাইয়া যেন ঘুম পাড়াইতেছিল, চারি পাশে ফুলে ফুলে স্তব্ধ জ্যোৎস্নার ঢেউ বহিতেছিল। তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই মুকুলকে ভুলিয়া যা।" অনাহূত চক্ষের জলে সেফালির মুখখানি প্লাবিত হইয়া গেল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি বালিকা তৎক্ষণাৎ অশ্রুজল মুছিয়া হাসিয়া উঠিল।

তেজ। ভুল্‌বি না? এমনি করিয়া অনর্থক কষ্ট পাবি?

সেফালি। আচ্ছা, যদি কোন দিন কষ্ট বোধ করি, তবে তাহাকে ভুলিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব।

তেজ। তোর চির কালই ঐ এক কথা।

সেফালি হাসিয়া কহিল "তবে কি দুই কথা বলিতে বল? এক মুখে দুই কথা বলা কি ভাল?"

তেজকুমার কিছুতেই সেফালিকে দুঃখের পথ হইতে সরাইতে না পারিয়া কাতর হইয়া কহিল "সেফালি, যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিল, তুই তাহাকে ভাল বাসিবি?"

এবার সেফালির মুখ গম্ভীর হইল। সেফালি গম্ভীরস্বরে কহিল "তিনি কাহাকেও কষ্ট দেন নাই।"

তেজ। তাহার ধূর্ত্তামি তুই কি বুঝিবি? এই ভাষণ দোষ তাহার উপর অর্পিত হইবে বলিয়াই সে নিরুদ্দেশ হইয়া আছে। তুই জানিস্ সে তোকে ভাল বাসে না?

গম্ভীর স্বরে সেফালি কহিল "তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। তাঁহার ভালবাসা সেফালির ভালবাসা হইতেও উচ্চ, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া তেজকুমার কহিল "সেফালি, তুই কি তাহাকে ইতিমধ্যে দেখিয়াছিলি?"

কম্পিতকণ্ঠে সেফালি কহিল, "হাঁ আমার এমনি বিশ্বাস"। তেজকুমারের পিতা হইলে কহিতেন এত প্রেম নয়, এ হরিবোলের রোষবহ্নি আমাকে বিদগ্ধ করিবার জন্য এ সুন্দর বনপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। তেজকুমার তাহা কহিল না। সে নিজে প্রেমিক, প্রেমের

অপরিহার্য্য সম্বন্ধ তাহার অবিদিত ছিল না, অতএব সে ছোট রকমের একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সেফালি তোকে আর কত বুঝাইব? যদি মুকুলকে ভুলিতে না পারিস, তবে চিরকালের মত জীবনের সুখের আশা পরিত্যাগ কর্। বোধ হয় পিতার জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞার কথা চিরকালই তোর মনে জ্বলিবে।

সেফালি সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, তাহার অনাহূত চোখের জলই সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছিল।

সহসা পিনাকীর রুদ্ধ কণ্ঠের একটী বিকট চিৎকার তাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা দ্রুতপদবিক্ষেপে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সংন্যাস রোগে পিতার মুমূর্ষু অবস্থা।

নিরতিশয় ব্যাকুলতার সহিত ভ্রাতা-ভগ্নী পিতার শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল, এবং চিকিৎসায় কিছু হইল না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ঘন ঘন বজ্রপাতের সঙ্গে ঘোর শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সমস্ত অরণ্য সহ ক্ষুদ্র কুটীর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। বিপদের উপর বিপৎপাত! তেজকুমার ভয়বিহ্বলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া ডাকিল—ভগবান্! ভগবান্!! "আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য আসিতেছি; ভয় নাই, ভয় নাই!" তেজকুমার দেখিল—সেফালি দেখিল, সেই বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া এইরূপ বজ্রগম্ভীর ধ্বনি করিতে করিতে পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী তাহাদের কুটীরে উপস্থিত হইল। সে যাত্রা তেজকুমারের পিতা আর রক্ষা পাইলেন না, তেজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেফালিকে কহিলেন "সেফালি! আজ মুমূর্ষু পিতার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর্ কখনও হরিবোলের পুত্রকে বিবাহ করিবি না।" পিতার এই কঠোর আদেশ সেফালির ক্ষুদ্র হৃদয়ে বজ্রের ন্যায় বাজিল। সেফালি কম্পিত অধর খুলিতে না খুলিতেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই দুঃখের সময়ে সন্ন্যাসী এই বিপন্ন পরিবারের যে মহোপকার করিয়াছিল, তাহা তাহারা সমস্ত জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

(ক্রমশঃ)

ইলিয়ড।

(গত প্রকাশিতের পর)

এতেক বলিয়া যবে নীরবিলা বীর,
এইরূপে নরপতি উত্তরিলা তারে—
"ভেবেছ কি মনে তুমি, শান্ত মনে আমি
ত্যজিব ও বন্দিনীরে মম, আর তুমি
রবে অধিকার করি সুখে নারী তব?
হও না হে বলী, সমরে অমর সম,

বীরত্বে প্রধান ; কিন্তু ভাবিও না কভু—
সৈনিকের অধিকার অবাধে দুর্বৃত্ত
তুমি করিবে হরণ। তব প্রার্থনায়
অর্পিব যাজকে আমি কৃসিসা বালারে,
কিন্তু অগ্রে উপযুক্ত মূল্য তার সবে
করহ প্রদান, হেন মূল্য নরপতি
পারেন যাচিতে যাহা, আর যোগ্য তাঁর।
নতুবা এ মম রাজ-অধিকার বলে,
এই হস্ত মোর অন্য কোন বন্দিনীরে
করিবে গ্রহণ। অতুল প্রতাপশালী
বীরেন্দ্র এজাক্ষ, ত্যজিতে হইবে তাঁরে
বন্দিনীরে তাঁর, কিম্বা ইউলিসিসের,
কিম্বা বীর তোমার সে হইবে আমার।
যার ইথে হবে ক্ষতি-বোধ কিম্বা ক্লেশ,
পারে সে করিতে অভিযোগ, কিম্বা পারে
হইতে কুপিত, কিন্তু সেই রোষ তার
তুচ্ছ বলি গণি। থাক্ এ সকল কথা,
যথাকালে ইহা মোরা করিব সাধন,
সাধিতে হইবে শীঘ্র মোদের এখন
দেবকার্য্য শুভ—ক্রাইসিস উপকূলে
উজানি জলধি, দ্রুত সঞ্চালি ক্ষেপণি
মনোনীত কয়জন নাবিক সহিত,
প্রেরিত হইবে চারু তরণী মোদের,
সহ যত বলি আর নৈবেদ্য-সম্ভার।
করুক্ সে তরীপরে কৃসিসা সুন্দরী
ত্বরা আরোহণ, আর তাহার সহিত
প্রতিনিধি নৃপ কেহ করুন গমন।
ক্রিটাসের অধিপতি, কিম্বা উলিসিস
কিম্বা বীরেন্দ্র এজাক্ষ, মোদের এ ইচ্ছা
করুন্ পূরণ। কিম্বা যদি রাজ-ইচ্ছা
হয় অর্পিবারে আকিলিস বীরবরে
এই কার্য্য-ভার, প্রচণ্ড কুপিতচিত্ত,
সে বীর প্রধান, রাজাদেশ শিরে ধরি
স্বয়ং এ কার্য্য সাধি করুন্ প্রসন্ন
দেব আপোলোরে, আর নিবারুন্ ত্বরা
কালমৃত্যুরূপী এই ভীষণ মড়ক।”

কঠোর ভ্রূকুটি করি গর্জিয়া গভীরে
এইরূপে পিলিডাস* করিলা উত্তর—
“হে যথেচ্ছাচারী ! গর্ব্ব ঔদ্ধত্যের বলে
বলী তুমি শুধু, আর, নীচ স্বার্থ-দাস,
চাতুরী ও ছলনায় নিরত নিয়ত,
নহ যোগ্য তুমি উচ্চ রাজ-হৃদয়ের।
উদারহৃদয় কোন্ গ্রীক বীর, আজ্ঞা
তব নৃপাধম ! করিবে পালন আর
গুপ্ত রণব্যূহ হায় ! করিবে রচিত,
কিম্বা তরবারি তীক্ষ্ণ উঠাইবে আর
হানিতে অরিরে ? কি কারণে বল আজি
প্রবৃত্ত দুর্বৃত্ত মোরা করিতে সমর
তবাদেশে হেথা ? দূরদেশবাসী এই
ট্রয়বাসিগণ কভু মোর কোন ক্ষতি
করেনি সাধন, কিম্বা দূর থিয়টিসে
বিপুল বাহিনী সহ কভু শত্রুভাবে
করেনি গমন। চরিত নির্ভয়ে তার
উপত্যকামাঝে, সমরকুশলী মম
অশ্বগণ যত, রক্ষিতেছে নিরাপদে
যে দেশ সতত গভীর কল্লোলময়
অকূল জলধি আর শৈলের প্রাচীর ;
যাহার উর্ব্বরা ভূমি আছয়ে পূর্ণিত
ফল শস্যে আর মহাযোদ্ধৃবীরদলে।
হেথা মোরা আসি নাই সাজি দলবলে
শত্রুতা সাধিতে, সর্ব্ব গ্রীকগণ পরে

*একিলিস।

ট্রোজানগণের কোন অন্যায়াচরণে,
কিন্তু হে একের পরে, আচরিত ঘোর
অন্যায়ের যথোচিত প্রতিবিধানিতে,
স্ব-ইচ্ছায় হেথা মোরা আসিয়াছি সবে।
হে কৃতঘ্ন ! তব আর তব ভ্রাতৃতরে
আসিয়াছি মোরা হেথা সসৈন্য সদলে,
নতুবা কি অন্য হেতু, এ ট্রয় নগরে
সমবেত গ্রীকগণ ছাড়ি রাজ্যবাস ?
মোসবার রণশ্রম শোণিতপাতের
এই কিহে উপযুক্ত প্রতিফল দান ?
কি দুঃখ ! যাঁহার কার্য্যে ব্রতী মোরা সবে,
সেই জন হতে অপদস্থ ক্ষতিগ্রস্ত
হইব এরূপে ? কাড়ি নিতে বন্দিনীরে
মম, হে দুর্বৃত্ত ধরিছ সাহস,
দেখাইছ ভয় ? বহু ঘোর মহাহবে
প্রাণপণে যুঝি লভি জয় পুরস্কার
কদাচও যাহা, জেন হে গর্ব্বিত, তাহা
অধিক সামান্য তব পুরস্কার হতে,
মোর বীরকীর্ত্তি যেইরূপ সর্ব্ব অংশে
তব হতে শ্রেষ্ঠতর, দেখ তুলনীয়া।
প্রতি রণজয়ে হও পুরস্কৃত তুমি
বিনা শ্রমে হে দুর্বৃত্ত ! শ্রেষ্ঠ উপহারে ;
আর মোর ভাগ্যে শুধু পরিশ্রম সার।
শুধু হে সামান্য কোন উপহার আমি
লভি ঘোরতর রণশ্রম বিনিময়ে,
কিম্বা লভি শূন্যগর্ভ অসার সুখ্যাতি।
কিন্তু জেনো, হে গর্ব্বিত, তব দাস আমি
নহি আর এবে। ত্যজি ট্রয় উপকূল
উজানি জলধিজল যাইব চলিয়া।
ইলিয়ন্ ভূমে লব্ধ রণজয়ে যত
বিলুণ্ঠিত ধন, পূরাউক সব এবে
আট্রিডিস নৃপতির ভোগ-অভিলাষ।”

(ক্রমশঃ)

দেবী না মানবী।

(১)

“মরণ মঙ্গল গণি তবু কদাচন
নারিব পরকে দিতে স্বামী হেন ধন।”

এইত বঙ্গবামাগণের প্রাণের কথা। বঙ্গীয়া সাধ্বীগণ মরণকে মঙ্গল গণিতে পারেন,—অনায়াসে মরিতে পারেন,—তবু স্বামী সদৃশ অমূল্য ধনকে পরের ভোগ্য করিতে পারেন না। কথাটা শুনিবামাত্র প্রাণ চমকিয়া উঠে,—বড়ই মিষ্ট বোধ হয়, তথাপি উহা কামগন্ধ-বর্জ্জিত নহে। কেননা—

“আত্মেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা তার নাম কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।”

চৈঃ চঃ।

যতক্ষণ আত্মসুখে বাঞ্ছার তৎপরতা থাকিবে, ততক্ষণ তাহার নাম কাম। আর সেই বাঞ্ছা কৃষ্ণসুখপরা হইলে প্রেমাখ্যা ধারণ করে। এখানে কৃষ্ণশব্দে আত্মেতর জীব মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। কেননা—

“সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্
সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।”

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে জানা যায়, পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে বিরাজমান। পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে বিরাজমান হইলেও আপনাকে ব্রহ্মভূত মনে করা নিষিদ্ধ ;—কেননা সেরূপ মনে করিলে সেব্য সেবক তত্ত্বে বাধা উপস্থিত হয়। এই-রূপ বাধা দ্বারা ভক্তিহানি হয়। এইজন্য উপরিভাগে "আত্মেতর" কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ আত্মসুখ কামনা বর্জ্জিত হইয়া পরের সুখান্বেষণ করাই প্রেমধর্ম্ম। ধর্ম্মরাজ্যে এই প্রেমধর্ম্মেরই উচ্চাসন। কিন্তু আধুনিক ধার্ম্মিকমণ্ডলে, বিশেষতঃ রমণীসমাজে এই ধর্ম্মের বড়ই বিরল প্রচার। এই জন্য রমণীচরিত্রে প্রেমধর্ম্ম সন্দর্শন করিলে আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। এইজন্য প্রেম-ময়ী রমণীকে দেবী কি মানবী বলিব, ঠিক্ করিতে পারি না।

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণজাতীয়া একটী প্রাচীনা রমণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পূর্ণ যৌবনকালের সত্য বিবরণ বিবৃত করিব বলিয়াই উপরে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করিতে হইল। তিনি নিজে পরমা সুন্দরী এবং ঐশ্বর্য্যশালী ও মহা-কুলীন কোন সাধুচরিত্র সুন্দর পুরুষের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। স্ত্রী পুরুষে সুদৃঢ় প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অপার দাম্পত্য-সুখ অনুভব করিতেন। সংসারে কোন অভাব, বা বিশৃঙ্খলা ছিল না। অসুখের মধ্যে যথাসময়ে পুত্র কন্যার মুখদর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। যদিও হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্র ব্যতিরেকে পুন্নাম-নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়ান্তর নাই, তথাপি এই পুরুষটীর তজ্জন্য কোন ক্ষোভ ছিল না। যথাকালে পুত্র সন্তান না জন্মিলে সঙ্গতিমান্ হিন্দু প্রায়ই দারান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের এই পুরুষটী যদিও সঙ্গতিমান্ ও মহাকুলীন ছিলেন,—অনায়াসে আর একটী বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী ধর্ম্মপত্নীকে সাপত্ন্যদুঃখ প্রদানপূর্ব্বক দারান্তর পরিগ্রহের সঙ্কল্প স্বপ্নেও করিতেন না। পত্নী মধ্যে মধ্যে পতিকে বলিতে লাগিলেন, "আমার পুত্র হইবার বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, শরীরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, আমার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনাও নাই ;—অতএব আপনি পিতৃবংশ রক্ষা হেতু আর একটী বিবাহ করুন।" পতি, এ বাক্য, পত্নীর মৌখিক মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। পত্নী কখন বলিতেন,—"আমার মনে দুঃখ হইবে বলিয়া আপনি বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছেন না, কিন্তু আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, আপনি আর একটী বিবাহ করিলে, সেই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া আপনার যত সুখ হইবে,—আপনার সুখে আমিও ততই সুখিনী হইব,—সে পুত্রকে আমি আপনার গর্ভজাত মনে করিব। নববিবাহিতা পত্নীকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় লালন পালন করিব। আমার

সংসার অধিকতর সুখের হইবে। অতএব আপনার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, আপনি আর একটী বিবাহ করুন।" পতি মহাশয়, পত্নীর এই কথা শ্রবণে কেবল হাস্য করিতেন। কখন বা বলিতেন,—

"সতীনের জ্বালা জান না বলিয়াই এখন এত সতীত্ব প্রকাশ করিতেছ। আমাদের বংশলোপ পাউক,—পুন্নাম-নরকে আমার বাসস্থান হউক, তথাপি প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে সতীনের জ্বালা দিতে পারিব না। অতএব তুমি এরূপ বৃথা কথা আর আমাকে বলিও না। দুই জনে পরম সুখে সংসার করিতেছি, এমন সুখের সংসারে কেন অশান্তি উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছ ?"

পতির এইরূপ কথার পর হইতে পত্নী বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলেন নাই।

(২)

আমরা যে সামাজিক ইতিহাসের কিয়দংশ প্রথম পরিচ্ছেদে বিবৃত করিলাম, তন্মধ্যে একটী পুরুষ ও একটী রমণীর উল্লেখ আছে। পুরুষটীর নাম রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্ত্রীটীর নাম যোগেশ্বরী দেবী। অতঃপর স্ত্রী পুরুষের নামোল্লেখে গল্প বলিব।

রসময় বাবু কৃষ্ণনগরের জজ আদালতে ওকালতি করিতেন। কৃষ্ণ-নগরের জজ আদালত গোয়াড়িতে। গোয়াড়ী হইতে নবদ্বীপ তিন ক্রোশেরও কিঞ্চিৎ দূর। সুতরাং রসময় বাবু প্রায়ই বাটী হইতে আদালতে যাতায়াত করি-তেন। নিজের গাড়ী ঘোড়া ছিল,—গোয়াড়ীতে একটা নামমাত্র বাসাবাড়ীও ছিল। কালে ভদ্রে ঐ বাসায় অবস্থান করিতেন।

একদা যোগেশ্বরী স্বামীকে প্রাতে ৮টার সময় ভোজন করাইবেন, পূর্ব্বদিন রাত্রে সেই কথা তাঁহাকে বলিলেন। রসময় কহিলেন,—"রোজ ৯টায় আহার দাও, কল্য ৮টায় কেন ?"

যোগেশ্বরী কহিলেন,—"কল্য মধ্যাহ্ন-কালে আমার একটু কাজ আছে,—তুমি যতক্ষণ কাছারী না যাইবে, আমি ততক্ষণ সে কাজ পাইব না।"

"উত্তম" বলিয়া রসময় নিদ্রা গেলেন। পরদিন রসময় বাবু ভোজন করিয়া গোয়াড়ি যাত্রা করিবামাত্র যোগেশ্বরী সত্বর আহার সারিয়া লইলেন। পরে যেন বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, এইরূপ আয়োজন করিতে লাগিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইল। দাস দাসীকে আবশ্যক মত উপদেশ দানপূর্ব্বক যেন কাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে সংবাদ পাইলেন, বহি-র্দ্বারে একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে সাদরে আসন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—

"ঘটক মহাশয়, মেয়েটী আমার পছন্দ মত হইবে ত ?"

ঘটক মহাশয় কহিলেন,—"এ মেয়ে যদি পছন্দ না হয়, তবে পছন্দ হইবার মেয়ে জগতে নাই।"

"বাবু বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমরা ফিরিতে পারিব?"

"যে অসুরের ন্যায় ষোল জন বেহারা ও দুইখান পালকী দরজায় উপস্থিত হইল, আমাদের যাতায়াত ও সেখানকার কার্য্য সারিতে বোধ হয় চারি ঘণ্টার অধিক লাগিবে না।"

"তবে কোন্ চিন্তা নাই,—যাত্রা করুন,—আমি প্রস্তুত" বলিয়া যোগেশ্বরী আপনি এক পাল্‌কীতে আরোহণ করিলেন, এবং ঘটক মহাশয় অন্য পাল্‌কীতে চড়িয়া বসিলেন। যোজন-কর্ত্তা ঘটকগণের পাত্র-কন্যার যোজনা করিবার জন্য হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের বন্ধন ছিন্ন ও পদতল ফাঁকুড়ফাটা হইয়া যায়। আজ সেই ঘটক মহাশয় পাল্‌কীতে চড়িয়া অপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলেন। বাহকগণ "হুঁ হুঁ" শব্দে তীরবেগে ছুটিল।

যোগেশ্বরী পুনঃ পুনঃ স্বামীকে বিবাহের অনুরোধ করিয়া যখন কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন অন্য উপায় চিন্তনে ব্যাপৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই চিন্তার ফলে মধ্যে মধ্যে রসময়ের আত্মীয়, স্বজনগণ বংশলোপের ও পুন্নাম-নরকবাসের ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দার-পরিগ্রহে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ২।৪টী ঘটক রসময় বাবুর সম্মুখে মধ্যে মধ্যে পরমা সুন্দরী অনূঢ়া কন্যাগণের রূপ যৌবন বর্ণন করিতে লাগিলেন। রসময় স্বকৃতভঙ্গ কুলীনের পুত্র; সুতরাং অনূঢ়া কুলীন কন্যাগণের রূপ যৌবনের প্রলোভন, ভূরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য রজত মুদ্রার ভারে ভারায়মান হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট কামিনী কাঞ্চন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। "বিবাহ করিলে যোগেশ্বরীর মনে দুঃখ হইবে" এই যুক্তির স্রোতে সকলই ভাসিয়া গেল। রসময় দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে কোনরূপেই সম্মত হইলেন না। তখন যোগেশ্বরী বলপূর্ব্বক স্বামীর বিবাহ দিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আজ ঘটকের সহিত স্বামীর জন্য নিজে মেয়ে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া পাত্রী দেখিলেন। আপনি পরম রূপবতী হইয়াও পাত্রীর রূপে মুগ্ধা হইলেন। ভাবিলেন,—

"এই স্ত্রীরত্ন পাইলে আমার প্রাণেশ্বর পরম সুখী হইবেন।" স্বীয় গাত্র হইতে একখানি বহুমূল্য আভরণ উন্মোচন করিয়া তদ্দ্বারা পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর কন্যাকর্ত্তার দ্বারা একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত ডাকাইয়া বিবাহের দিন স্থির করাইলেন। বিবাহের দিন মধ্যাহ্নকালে কন্যাকর্ত্তা পাত্রীকে লইয়া অতি গোপনে যোগেশ্বরীর ভবনে উপস্থিত হইবেন, সেই দিন ইহাও স্থির

হইল। যোগেশ্বরী ঘটক সমভিব্যাহারে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

যোগেশ্বরীর যোগচক্রে পতিত হইয়া রসময় বাবু নির্দ্দিষ্ট দিনের রজনীযোগে স্বভবনস্থ শয়নগৃহে দ্বিতীয় দারের পাণি-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইবামাত্র যোগেশ্বরী সেই সম্প্রদান আসনে উপবেশন ও গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্ব্বক নবোঢ়া সপত্নীর দুই পাণিতল আপন বাম হস্তে ধরিলেন এবং স্বামীর দুই পাণিতল দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া "প্রিয় ভগ্নি, আমি চির-জীবনের জন্য আমার এই রাজা স্বামী তোমাকে সমর্পণ করিলাম। আজ হইতে তুমি ইহাঁর ভোগ্যা ধর্ম্মপত্নী হইলে এবং আমি তোমাদের উভয়েরই সেবাদাসী রহিলাম।" এই বাক্য বলিয়া স্বামীর দুই হস্ত সপত্নীর যুগল করে অর্পণ করিলেন।

রসময় বাবুর পদ্মপলাশ নয়নযুগল হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল;—কিন্তু যোগেশ্বরীর সহাস্য বদন,—অতি মহান্ ধর্ম্ম কার্য্যসম্পাদনের পর মানবমনে যেরূপ আত্মপ্রসাদ হইয়া থাকে,—যোগেশ্বরীর বদনকমল সেইরূপ আত্মপ্রসাদে সুপ্রসন্ন!

রমণীগণ আপন গর্ভজাত কন্যা, বা কনিষ্ঠা সহোদরাগণকে যেরূপ স্নেহ ও মমতার সহিত লালন পালন ও তাহাদের বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, যোগেশ্বরী নবীনা সপত্নীকে সেইরূপ লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সপত্নী একটী পুত্র প্রসব করিলেন। যোগেশ্বরী যেন পূর্ণিমার চাঁদ হাতে পাইলেন। এতদিনে যোগেশ্বীরর যোগ সিদ্ধ হইল।

গর্ভধারিণীর সহিত এই বালকের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যোগেশ্বরী সূতিকাগারেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে গর্ভধারিণীর স্তনপান করাইয়া লইতেন। এই শিশুর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদিন গর্ভধারিণী শিশুর গায় হাত তুলিয়াছিলেন। যোগেশ্বরী দাস দাসী সত্ত্বেও স্বহস্তে গো-শালা পরিষ্কার করিতেন। তখন ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালকের রোদনধ্বনি শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। রোদনের কারণ অবগত হইবামাত্র সেই গোবর-হস্তে সপত্নীর কপোলে একটী চপেটাঘাত করিলেন এবং কহিলেন,—

"তুই আমার ছেলে মারিবার কে? তুই জানিস্ না যে, এই ধন পাবার জন্য চিরজীবন স্বামিধনে বঞ্চিত হইয়াছি? এই শিশু আমার স্বামিকুলের বংশধর,—ইহার জন্যই আমার প্রাণের অধিক প্রিয়-বস্তু তোকে বিলাইয়া দিয়া তোর দাসীত্ব করিতেছি?" এই কথা বলিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শিশুকে শান্ত করিলেন এবং সত্বর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন।

এই সকল ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের মুখে শ্রবণ

করিয়াই এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। অতএব ইহা দুর্গেশনন্দিনীর হস্তে আয়েসার জগৎ সিংহ সমর্পণের ন্যায় কল্পিত কথা নহে এবং এতাদৃশ উৎকট অসাধ্য সাধনের পর অনুতাপানলে, অথবা সপত্নী-বিদ্বেষের মুর্ম্মর দাহে দগ্ধ হইয়া যেগেশ্বরী স্বকীয় জীবনের মধ্যে কখনই হীরকাঙ্গুরীয় ভক্ষণ করিতে যান নাই;—চিরকাল সমান সুখে ও পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রাণেশ্বরের সহিত চিরকাল এক গৃহে বাস করিয়াছেন,—অথচ সপত্নীহস্তে স্বামী সমর্পণের সময় হইতে একদিন ভ্রমেও স্বামীর শয়নগৃহে গমন, কি স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। সপত্নীর দ্বারা সযত্নে স্বামিসেবা সাধন করিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—"দেবী, না মানবী?"

আদর্শ হিন্দু পরিবার।

(গত প্রকাশিতের পর)

ভগিনীর বিবাহে ব্রাহ্মণ স্ত্রীর অলঙ্কার উৎসর্গ করিয়াও কিছু ঋণগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু স্ত্রীর গুণে ও ভগবানের কৃপায় সে দায় হইতে শীঘ্র মুক্ত হইলেন। গৃহিণী স্বামীর ঋণ পরিশোধ জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। পূর্ব্বে যে ভাবে পরিশ্রম করিতেন, এখন তাহার দ্বিগুণ করিতে লাগিলেন। যতদূর সাধ্য অল্প ব্যয়ে সংসার চালাইতে লাগিলেন। বাজারের শাক সবজি ক্রয় করিতে বেশী পয়সা ব্যয় হয় বলিয়া চারি টাকা বেতনে একজন মালী রাখিলেন, ইহাতে বাড়ীতেই সকল শাক সবজি ও আলু বেগুণ হইত। এবং ধান কিনিয়া তাহাতে চাউল প্রস্তুত করাইলেন। এইরূপে সংসারের সকল ব্যয় কমিয়া গেল। প্রথমতঃ বাগান প্রস্তুত করিতে যদিও কিছু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সেই ক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইল। পরিবারের আহারের উপযোগী ফল মূল রাখিয়া মাসে প্রায় ৫।৬ টাকার ফল মূল বিক্রয় হইত ও গৃহিণী অল্পব্যয়ে সংসার চালাইয়া কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ঋণের দায়ে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি কায়মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেন। এইরূপে তাঁহাদের ঋণের সামান্য কিছু পরিশোধ হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে, কোন সাংঘাতিক রোগে ব্রাহ্মণের ভগ্নীটি মারা গিয়াছে, এবং সে নিঃসন্তান থাকায় তাহার সেই মাতৃদত্ত সম্পত্তি সমস্ত ভ্রাতাকে দানপত্র করিয়া দিয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এমন কি প্রায় মাসাবধি তাঁহারা ইচ্ছা-পূর্ব্বক অন্নজল গ্রহণ করেন নাই এবং শোকে সর্ব্ববিধ সুখ ও আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যে এই

দুরবস্থার সময় এত সম্পত্তি পাইলেন, সেজন্য কিছু মাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না বা তাহা আপনাদের সচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিলেন না। উক্ত সম্পত্তি দ্বারা একটী ছোট অতিথিশালা ভগিনীর স্মরণার্থ প্রস্তুত করাইলেন। সেই অতিথিশালাতে প্রত্যহ ১০টি দীন দরিদ্র অন্ন পাইত।

ভগ্নীর পরকালের হিতার্থ এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিয়া গ্রামবাসী সকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা ও তাঁহার ভক্তের প্রতি করুণা! যে তাঁহাকে একবার কায়মনে ডাকে, তিনি তাহার প্রতি সদয় না হইয়া থাকিতে পারেন না এবং সত্বর তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। এই জন্য ভগবানের নাম বিপদভঞ্জন। এই ব্রাহ্মণ কায়মনে ভগবানে ভক্তি করিতেন, অধর্ম্মাচরণে কখনও অগ্রসর হইতেন না, সেইজন্য ঈশ্বর ইহাঁর উপর এত দয়া করিয়াছিলেন। এই অতিথিশালা প্রস্তুত হইবার দুই মাস পরেই ইহাঁর বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা চারি গুণ বাড়িল। ইহাঁর বিশ্বস্ততা ও ধর্ম্মভীরুতা এবং পরোপ-কারিতার কথা অনেকেই জানিতেন এবং অনেকগুলি সন্তান অল্প আয়ে প্রতিপালন করিতে হয় ও তাহাতে ইহাঁদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, ইহা সকলেই জানিতেন; এবং যাহাতে ইহাঁর কিছু বেশী আয় হইয়া একটু সচ্ছলতা হয় এজন্য সকলেই চেষ্টা করিতেন। ভাগ্যক্রমে যে স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্ম করিতেন, সেই স্থানে একটী উচ্চ বেতনের কর্ম্ম খালি হওয়াতে অনেকেই ইহাঁর পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রাহ্মণের চেষ্টা ও পরিশ্রমে এবং ঈশ্বরের কৃপায় এক কালে ১৫০ টাকা বেতনের কর্ম্ম তাঁহার হইল। তাঁহাকে এই কর্ম্ম দিতে ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন আপত্তি করিলেন না, বরং উপযুক্ত লোককে এই কর্ম্ম দেওয়া হইল বলিয়া সকলেই অত্যন্ত সুখী হইলেন।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এত দিনে ইহাঁদের কষ্টের কিছু লাঘব হইল। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আয় চতুর্গুণ হইল বলিয়া ইহাঁরা গর্ব্বিত হইলেন না। পূর্ব্বে গৃহিণী যেরূপ শ্রমশীলা, নম্র ও পরদুঃখ-কাতরা ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিলেন। উচ্চ বেতনভোগী স্বামীর স্ত্রী বলিয়া গর্ব্বিতা অথবা বিলাসপ্রিয়া হইলেন না। পূর্ব্বে যেরূপ শত কষ্ট হইলেও স্বামীকে জানাইতেন না, এখনও সেইরূপ নিজ সুখের জন্য অথবা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য একটী কথাও স্বামীকে বলিতেন না। যদিও স্ত্রী স্বামীকে কখনও নিজের বিষয়ে কিছু বলিতেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামী সকলই জানিতে পারিতেন। আয়ের অল্পতা হেতু স্ত্রীকে যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিতে হইত, এমন কি তাঁহার দুই সন্ধ্যা ভাল করিয়া আহার পর্য্যন্তও হইত না, ইহা স্বামী জানিতেন। সেইজন্য মনে মনে বড় কষ্ট ছিল। এমন পতিব্রতা ও সর্ব্বগুণ-

শালিনী স্ত্রীকে যে তিনি সুখে রাখিতে পারিতেছেন না, সেজন্য বড়ই দুঃখিত ছিলেন ও সেই দুঃখ কেবল ভগবান্‌কে জানাইতেন। এখন বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে স্ত্রীর কষ্টের লাঘব জন্য ২।৩ জন দাস দাসী রাখিয়া দিলেন এবং অল্প দিন মধ্যে পূর্ব্বের ঋণ সকল পরিশোধ করিলেন। দাস দাসী দ্বারা সাংসারিক অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে লাগিল, ইহাতে গৃহিণী অবসর লাভ করিলেন। কিন্তু সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া আলস্যে তিলমাত্র কাল কাটান নাই। তাস পাশা খেলিয়া এবং পাড়া বেড়াইয়াও বেড়ান নাই, অথবা সকল কর্ম্ম ভৃত্যদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহার কার্য্যের নূতন প্রণালীর বিষয় পরে বলিতেছি।

(ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রকার মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বিধবাদিগের বিবাহ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ইচ্ছুক; কেহ কেহ তাহাদিগকে স্বাবলম্বন-পরায়ণা করিয়া জীবিকার উপায় বিধানে অভিলাষী। আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহাদিগের জীবিকালাভের যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহারই আলোচনা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বিধবাগণ উপবীত কাটিয়া, এবং অন্যান্য বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ ধান ভানিয়া, চরকা দ্বারা সূতা কাটিয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা ও অন্য প্রকারে শরীর খাটাইয়া, কষ্টে সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আজ কাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রুচি ও সামাজিক নিয়মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান রুচি ও সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাজসম্মত হইতে পারে, এমন ভাবেই উপায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষায় যেমন জীবিকালাভের পথ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দেয়, এমন আর কিছুতেই নয়। শিক্ষা যে কেবল জীবিকা বিধান করিয়াই নিরস্ত হয়, এমন নহে; ইহাতে চরিত্র গঠিত এবং শারীরিক মানসিক, ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ব প্রকার সুখ সাধিত হইতে পারে। যাহা হইতে উপজীবিকা ও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে, এমন সুখের বাণিজ্য কে

পরিত্যাগ করিয়া থাকে? দুঃখের কথা কি বলিব? সুপ্ত ভারতে দুঃখ-দুন্দুভি বাজাইয়া আর কি করিব? যে ভারতবাসীর হৃদয় থাকিয়াও নাই, স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ বিধবা নারীর সুখ দুঃখ "সুখ দুঃখ" বলিয়া যাঁহাদের ধারণা নাই, তাঁহাদের নিকট স্ত্রী-শিক্ষার আলোচনা করিলে কি হইবে? যাহাহউক ভারতে আজ কাল স্ত্রী-শিক্ষা কথঞ্চিৎ প্রচলিত হওয়াতে আমরা আশ্বস্ত হইতেছি এবং যে ভাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথ স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের উপায় সংগৃহীত করিব, তাহাতে আশা করি সমাজ আমাদের প্রতি কোনরূপই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধেও নানা জনের নানা মত। ইহার মধ্যে সমাজের যে মত, অনেকটা তন্মতেই চলিতে হইবে। আমরাও বলি না যে, স্ত্রীলোকে কেরাণীগিরি করিবে। তাহারা শিক্ষিতা হইয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, পত্রিকা-সম্পাদিকা, গ্রন্থকর্ত্রী, প্রসবাদি-কার্য্যের ধাত্রী ও স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসিকা হইলে, তাহাদের জীবিকা-লাভের উপায় অতি সহজেই হইতে পারে এবং ইহাতে সমাজেরও কোন অনিষ্ট বা দোষের কারণ দেখা যায় না।

ইহার পরেই শিল্পবিভাগ। শিল্প-ক্ষেত্রে উক্তবিধ স্ত্রীলোকের জীবিকা-লাভের যতগুলি উপায় আশা করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতেই না। শিল্পজাত দ্রব্যে যেরূপ আয় হইয়া থাকে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আসামে এরেণ্ডীনামক এক প্রকার বিখ্যাত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহা আসামীয়া স্ত্রীলোকদের নির্ম্মিত। এক এক খানা এরেণ্ডীর দাম ১০৲, ১৫৲, ২০৲ টাকা, কি তদধিক হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মুগার কাপড়, সূতার বড় কাপড়া নামক গাত্রবস্ত্র তাহাদের হস্তে নির্ম্মিত হইয়া যথেষ্ট লাভ হয়। ব্যাধ বা ডোম এক প্রকার অসভ্য জাতি আছে। তাহারা সস্ত্রীক নানা স্থানে যাইয়া বাঁশের কার্য্য করে। এরূপ প্রবাদ আছে যে, একটী বাঁশে ৫৲ টাকা আয় না হইলে, তাহারা আর সে স্থানে থাকে না। ফলতঃ বাঁশনির্ম্মিত সামান্য ডালা, চুপড়ী, সাজি ইত্যাদিতে তাহাদের যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে ঐ প্রবাদ কখনও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রীগণ সকলেই এইরূপ আসামীয়া স্ত্রীলোক ও ব্যাধ-রমণীর অনুকরণ করিলে, জীবিকা-লাভের জন্য কখনই তাহাদিগকে হাহাকার করিতে হয় না। নিম্নলিখিত শিল্প সকল হইতে ভারতের বিধবা ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের উপজীবিকা লাভ হইতে পারে; যথা,—বস্ত্রবুনন, কাপড়ে বুটা উঠান, পিরাণ চাপকান ইত্যাদি সূচীকর্ম্ম; মোজা, টুপি, কম্ফোর্টার নির্ম্মাণাদি উলের কাজ; কাগজে নানা প্রকার ছবি অঙ্কনাদি চিত্রবিদ্যা ও ঝাড় লতা পাতা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে কাগজ কাটা; মাটী দ্বারা

নানা প্রকার খেলনা ও বাসন তৈয়ার; পাটি নির্ম্মাণ, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, সাজি, ধূচনী, ইত্যাদি বাঁশের জিনিশ প্রস্তুত করা। কা, চ, ভ।

জীবনবিকাশ।

স্বভাবের প্রভাবেই আমাদের জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জীবনবিকাশ সম্বন্ধে অনেক বিষয়েই আমাদের অধিকার নাই সত্য; কিন্তু একবারেই যে কোন অধিকার নাই, কিছু করিবার নাই, কোন যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। জীবনবিকাশেও আমাদের যত্ন চেষ্টা, চিন্তা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। নিজ যত্ন চেষ্টা ভিন্ন জীবনের আশানুরূপ বিকাশ অসম্ভব। আমি যদি যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম পূর্ব্বক আহার সংগ্রহ না করি এবং সেই আহার গ্রহণে যদি বিরত থাকি, তবে কি স্বভাবের প্রভাবে শরীরের বিকাশ হইতে পারে? তাহা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি নিজ জীবনের জন্য নিজে পরিশ্রম না করিলে, নিজের উন্নতির জন্য নিজের যত্ন চেষ্টা না থাকিলে, কেবল স্বভাবের প্রভাবেই জীবনের উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নতি হইতে পারে না। স্বভাবের প্রভাব ভিন্ন যেমন আমার দেহ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও বর্দ্ধিত হয় না, তেমনি নিজ যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম ভিন্নও দেহমন প্রাণের উন্নতি সম্ভবপর নহে। পার্থক্য এই যে, আপন যত্ন চেষ্টার অভাবে দেহের মৃত্যু সংঘটিত হয়, কিন্তু তদভাবে আত্মার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না। তাহাও এইজন্য যে আত্মা অমর। আমাদের চেষ্টা যত্নের অভাবে আত্মা জীবিত থাকে, কিন্তু তাহার বিকাশক্রিয়া ভালরূপে চলিতে পারে না।

শরীর বিকাশের জন্য প্রধানতঃ তিনটী কার্য্যের প্রয়োজন—(১) আহার গ্রহণ, (২) তাহা জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করণ অর্থাৎ দেহ-পোষণোপযোগী রক্ত মাংসে পরিণত করণ, (৩) আপন শক্তি বিকিরণ অর্থাৎ বিবিধ কার্য্যে শক্তি চালনা। ইহার কোনও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই দেহের বিকাশ হয় না। মানবজীবন সম্বন্ধেও ঠিক্ সেইরূপ। গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ এই তিন ক্রিয়া সুন্দররূপে না চলিলে আত্মার বিকাশ সাধিত হইতে পারে না।

তাই দেখিতেছি জীবনের বিকাশে আমাদের প্রথম কার্য্য আহার গ্রহণ। আমরা জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা দ্বারা গঠিত, সুতরাং আমাদের আহার জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা। যে সত্য—যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। যদি একবার চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব জীবনোপযোগী কত সত্য—কত

শিক্ষা, কত সময় কত ভাবে পাইয়াছি, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা অতি অনুন্নত অসম্পূর্ণ; তবুও যে সকল শিক্ষা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও যদি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে জীবন আজ এত বিকৃত ও অগঠিত থাকিত না। চারি দিকে আত্মার যে সকল আহারীয় বস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যত আমরা কোন চেষ্টাই করি না। আমাদের কোনওরূপ চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়াও যে সকল জ্ঞান আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, আলস্য ও উদাসীনতা বশতঃ তাহাও গ্রহণ করি না। এই অবস্থায় জীবনের বিকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল অল্পাহারজনিত ক্ষীণতা ও অসম্পূর্ণতা। এই শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী ফল আমাদের হীন মলিন অবিকশিত জীবন।

জীবনবিকাশের প্রথম উপায় "গ্রহণ" সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা পোষণোপযোগী হওয়া চাই। গ্রহণের অভাবে যেরূপ মৃত্যু, মন্দ বস্তু গ্রহণেও সেইরূপ মৃত্যু। অনিষ্টকর জল বাতাস ও খাদ্য যদি গ্রহণ করি, তবে আমার শরীর পুষ্ট হইবে না, বরং বিনষ্ট হইবে। মন্দ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া মানবাত্মা বিকাশের পথে না যাইয়া বিনাশের পথেই যায়। আত্মার স্বভাবই গ্রহণ করা—ভাল হউক মন্দ হউক, সে কিছু গ্রহণ করিবেই। এই দুইয়ের ফল অবশ্য দুই বিভিন্ন প্রকার। অতএব সর্ব্বদা আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে ভাল মন্দ বিচারশক্তি পাইয়া, কিসে ইষ্ট আর কিসে অনিষ্ট হয় তাহা জানিয়া কে মন্দ বিষয়—অনিষ্টকারী বস্তু গ্রহণ করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাত-মধুর সুখে ভুলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়েই অহিতকর বস্তু আস্বাদন করি, কুশিক্ষা গ্রহণ করি। অসার অনিষ্টকর বস্তু গ্রহণ করিতে করিতে সে সকল বস্তুই আমাদের প্রিয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে, সারগ্রাহিতা শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা জানিয়া শুনিয়াও মন্দ বস্তুই অধিক গ্রহণ করিতেছি এবং এই কুশিক্ষার ফলে জীবন বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সর্ব্বস্থান হইতে যাহা কল্যাণকর তাহাই গ্রহণীয়। সূর্য্য যেমন পঙ্কিল দূষিত স্থান হইতেও কল্যাণপ্রদ নির্ম্মল সলিল-কণা গ্রহণ করে, আমরা যদি সেইরূপ সকল অবস্থা হইতে, সকল মানবজীবন, সকল গ্রন্থ এবং জগতের সমস্ত পদার্থ হইতে নির্ম্মল সার বস্তু গ্রহণ করিতে পারি, সৎশিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, তবে কতই না উপকৃত হইতে পারি, তাহাতে জীবন কতই না উন্নত ও বিকশিত হইতে পারে!

কেবল পোষণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিলেই হইবে না, তাহা আপনার উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, নতুবা

পোষণ অসম্ভব। যদি খাদ্য শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা শরীরের প্রধান উপাদান রক্ত মাংসে পরিণত না হয়, তবে শুধু পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে শরীর কখনও পুষ্ট হয় না। জীবন-বিকাশ সম্বন্ধেও সেই কথা। সাধু সাধ্বী নর নারী দর্শন, তাঁহাদের জীবনী অধ্যয়ন, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুভব, জগৎ হইতে অপরাপর প্রকারে বিবিধ শিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে কি ফল হইবে, যদি তাহা আমার আয়ত্ত করিতে না পারি, জীবনের রক্তে—আপনার বস্তুতে পরিণত করিতে না পারি? কত জ্ঞান আমরা উপর উপর শিক্ষা করি, কত তত্ত্ব কথা ভাসা ভাসা মুখে বলিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা আমাদের জীবনের মূলে প্রবেশ করে না। সুতরাং ইহাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না, বিকশিত হয় না। পল্লবগ্রাহিতা আমাদের জীবন-বিকাশের প্রধান অন্তরায়।

আবার কেবল গ্রহণ ও ধারণ ক্রিয়া সুন্দররূপে চলিলেই উপযুক্ত বিকাশ হইতে পারে না, বিতরণ আবশ্যক। শরীর-চালনা না করিলে—শক্তি ব্যয় না করিলে শরীরের বিকাশ হয় না—শরীর পুষ্ট ও সবল হয় না। আত্মার পক্ষেও বিতরণ প্রয়োজনীয় এবং তাহাই আত্মার স্বভাব। আমি জগৎ হইতে কেবল গ্রহণ করিব, কিন্তু কিছু দিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না—এরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেও পারি না। তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, কারণ এই স্বাভাবিক কার্য্যে বাধা দিবার শক্তি ও অধিকার আমার নাই। বিতরণ আমার স্বভাব, তাই যাহা গ্রহণ করিব, তাহাইত দিতে সক্ষম হইব। যাহা গ্রহণ করি নাই, তাহা কিরূপে দিব? এই স্থানেই সমস্ত জগতের সহিত,—সমস্ত মানবমণ্ডলীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ এবং এই স্থানেই নিজের উন্নতির সহিত অপরের উন্নতি গ্রথিত। আমি যদি কল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, আমা দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ বই অকল্যাণ হইবে না। আর যদি নিজে অকল্যাণকর পদার্থ গ্রহণ করি, নিশ্চয় অপরের অমঙ্গল সাধন করিব। নিজের পাপে কেবল নিজেই বিনষ্ট হইব না, অপর সকলকেও বিনষ্ট করিব। সূর্য্য নির্ম্মল সলিল গ্রহণ করে বলিয়া পৃথিবীর এবং প্রাণিগণের এত মঙ্গল সাধন করিতে পারে। যদি উহা দূষিত বিষাক্ত জল গ্রহণ করিত, তবে এই কল্যাণের পরিবর্ত্তে ঘোরতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইত। যেখানে দূষিত পদার্থ নাই, সেখানেও দূষিত বারি বর্ষণ করিয়া জগৎকে মরু তুল্য করিত। তখন পৃথিবী আর "সুজলা সুফলা" থাকিত না। তবেই দেখিতে পাই আমার জীবনের অবনতিতে কেবল যে আমার নিজেরই অবনতি তাহা নহে, সমস্ত জগতের অবনতি। যে হৃদয়ে হয় ত কত সুন্দর সদ্‌গুণ ফুটিতে পারিত, আমার সংস্পর্শে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কি ভয়ানক কথা! নিজে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে পারি, কিন্তু সে কুঠার যে কত প্রিয় বৃক্ষকে ছেদন করিবে তাহা কি একবার ভাবি?

তাহাদিগকে ছেদন করিবার আমার কি অধিকার আছে? যাহাদের কোনরূপ কষ্ট হইলে প্রাণে বিষম আঘাত পাই, তাহাদের জীবনের মূল আমাদের দ্বারা এরূপ আহত হইতেছে এবং হইবে ইহা জানিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তবে প্রেম কিসের? মায়া মমতা কিসের? কেবল কি নশ্বর শরীরের জন্যই মায়া? ইহারই কি এত মূল্য? অনন্ত জীবনের —অক্ষয় নিত্য জীবনের কি কোন মূল্য নাই? পৃথিবীর কোন মূল্যবান্ পদার্থের সহিত যে জীবনের মূল্যের তুলনা হয় না, এমন অমূল্য জীবন কি আমাদের নিকট এতই তুচ্ছ? তাহা হইলে কেন না জগৎ আমাদিগকে অসার বলিয়া তুচ্ছ করিবে?

শক্তি চালনা দ্বারাই শক্তির বিকাশ হয়। কোন এক অঙ্গ চালনা করিলে কেবল তাহারই উন্নতি ও বিকাশ হয়। যে অঙ্গের বিতরণ ক্রিয়া বন্ধ করি, ক্রমে তাহার পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া আইসে এবং তাহা একেবারে অকর্ম্মণ্য ও বিকল হইয়া যায়। যাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু হন, তাঁহাদের শুষ্ক হস্ত দেখিয়া আমরা ইহার ফল প্রত্যক্ষ করি। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, দীর্ঘকাল অন্ধকারপূর্ণ কুঠরীতে থাকিয়া অনেকে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যে শক্তি অপরের জন্য ব্যয় করিব, তাহাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহারই বিকাশ হইবে; আর যাহার চালনা করিব না, পোষণ প্রভৃতি সকল ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া তাহা কার্য্যের অযোগ্য ও বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত শক্তি অপরের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যত আমরা অপরের জন্য খাটিব, ততই বিকাশ প্রাপ্ত হইব—উন্নত হইব। পরের সেবাতে আপনারই সেবা, পরের স্বার্থ সাধন করিতে যাইয়া আপনার স্বার্থ সাধনই করি। বিশ্ববিধাতার কি আশ্চর্য্য নিয়ম! যে ব্যক্তি শরীরক্ষয় হইবে ভয় করিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকিবে, তাহার শরীর অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর যে আপন শরীরক্ষয়ের ভয় না করিয়া পর-সেবাতে শরীরপাত করিতে অগ্রসর হইবে, তাহারই শরীর রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবে। যে আপন সুখ—আপন সুবিধা অন্বেষণ করিয়া চলিবে, তাহার সব সুখ বিনষ্ট হইবে। আর যে আপনাকে ভুলিয়া অপরের জন্য জীবন বিসর্জন করিবে, তাহার জীবনই রক্ষিত ও বিকশিত হইবে—তাহার আনন্দ শান্তিই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত হইবে। এইজন্য মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন "যে জীবন চাহিবে, সে জীবন হারাইবে, আর যে জীবন হারাইবে, সে জীবন পাইবে।" মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার এইরূপই বিধি।

গ্রহণ, ধারণ ও বিতরণ ইহার একটী ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে সকল ক্রিয়া বন্ধ হয়। ইহাদের পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং আমাদিগকে তিনটি উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। কোনটী পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

বিকাশ কি, সে সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞানের কোনও অভাব নাই। নিজে অসম্পূর্ণ ও জীবনের বিকাশ বিষয়ে উদাসীন হইলেও কোন্ জীবন উন্নত, কোন্ জীবন কিরূপ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বেশ বুঝি। বিকাশের উপায়ও আমরা জানি। জ্ঞান প্রেম পবিত্রতায় উন্নত—ধৈর্য্য, ক্ষমা, সরলতা, সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, স্বাধীনতা, কোমলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত জীবনকে কে না সম্মান করে? ইহা লাভ করিতে যে সকল সাধন প্রয়োজন, তাহাই বা আমরা কে না জানি? কিন্তু শুধু বুঝিলে বা জানিলে কি হয়? কেবল কি কোন্ খাদ্য দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, কাহার শরীর সুস্থ ও সবল ইহা জানিলেই আমার দেহ পুষ্ট, সুস্থ ও সবল হইবে? তাহা নহে। আমি যাহাতে সে সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাহার ক্ষুধা নাই—অভাব বোধ নাই—অসুস্থ বিকল দেহ বহন করিয়া কোন কষ্ট নাই, সে আহার গ্রহণ করিতে যাইবে কেন? স্বাস্থ্যলাভ করিতে যত্ন করিবে কেন? রুগ্ন বিকল দেহ লইয়া যদি কেহ আপনাকে সুখী ও সচ্ছন্দ মনে করে, তবে তাহাকে কি আমরা প্রকৃতিস্থ মনে করি? কখনই না। কিন্তু আমরাত সর্ব্বদাই রুগ্ন বিকল জীবন লইয়া সুখী আছি। তবে আমরাও কি অপ্রকৃতিস্থ নহি? আমাদের জীবনের উন্নতির জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষুধা নাই, অভাব ও কষ্ট বোধ নাই, ইহা অসম্পূর্ণ বিকল জীবনের লক্ষণই প্রকাশ করিতেছে। জীবনের উপযুক্ত বিকাশ যেরূপ সুস্থ অবস্থার লক্ষণ, ক্ষুধা ও অভাব বোধও সেইরূপ সুস্থাবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ। ক্ষুধাতেই দেহ সুস্থ ও সবল হয় এবং সুস্থ ও সবল ব্যক্তিরই ক্ষুধা প্রবল। অভাববোধজনিত ব্যাকুলতাতেই আত্মার বিকাশ হয় এবং আত্মার বিকাশে আবার অভাব বোধ বৃদ্ধি হয়। এই ব্যাকুলতা হইতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজীবনই প্রকৃত বিকশিত জীবন। সুতরাং এই অভাবজনিত ব্যাকুলতা বা ক্ষুধা আমাদিগের জীবনবিকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

আমরা জীবনের জন্য না ভাবিলেও এমন একজন আছেন, যিনি জীবনের জন্য সর্ব্বদা ভাবিতেছেন ও কার্য্য করিতেছেন। জীবনের দিকে দৃষ্টি গেলেই যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের জন্য কার্য্য করিতেছেন, জীবনের মূলে 'জীবনের জীবন' হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কাছে না যাইয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন জীবনের গঠন, জীবনের উন্নতি ও বিকাশ সাধন অসম্ভব। নিজের দুর্ব্বলতা ও উদাসীনতার জন্য নিরাশ হইবার বিষয় নাই, তিনি সর্ব্বদা সহায় আছেন। সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া সকল শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবার জন্য সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার করুণাতেই জীবন বিকাশ প্রাপ্ত হয়—সুস্থ সবল ও সুন্দর হয়। যাঁহার করুণার ছায়ায় প্রতি মুহূর্ত্তে কত যত্নে রহিয়াছি, তিনিই জীবন পরিবর্দ্ধন ও তাহার উন্নতি সাধন করিবেন। তিনিই সকল বাধা দূর করিবেন। যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিবেন। আমরা তাঁহাতে আশা ও নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক আমাদের কাজ করিয়া যাই, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা পালন করিয়া যাই, ফলদাতা তিনি সময়ে ফল প্রদান করিবেন। তিনি আমাদের সহায় হউন। আমরা সকল ভগিনী তাঁহার করুণায় জীবন প্রাপ্ত হই, সুখী হই। তাঁহার করুণাচ্ছায়ায় ও স্নেহ-সলিলসেকে আমাদের জীবনতরু দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তিনিই জয়যুক্ত হউন।

দেবী জগন্মোহিনী।

ভারত-গৌরব স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী পতিবিয়োগের পর প্রায় ১৪ বৎসর কাল বৈধব্য ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক গত ১৮ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার সময় মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে স্বামীদেবের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর তিনি স্বামীদেবের ন্যায় বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছিলেন। পরিশেষে পৃষ্ঠদেশে এক সাংঘাতিক বিস্ফোটক হইয়া ইহাঁর প্রাণাত্যয় সংঘটন করিল। ইনি ৫টী পুত্র ও ৫টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র সেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি। মাতৃবিয়োগে সন্তানগণ এককালে পিতৃমাতৃবিয়োগ-শোকের উচ্ছ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন। আমরা এই ঘটনায় তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া অন্তরের শোক প্রকাশ করিতেছি।

জগন্মোহিনী দেবী বালীনিবাসী ৺চন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয়ের জেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইনি যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ সরলা, সহৃদয়া ও সদ্‌গুণবতীও ছিলেন। ইহাঁর বয়স যখন নয় বৎসর, আঠার বৎসর বয়স্ক যুবক কেশব চন্দ্রের সহিত ইহাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইনি নিজের রচিত পদ্যে আপনার যে বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"বাল্যকালে হয় মনে আনন্দ কতই,—
পাতায়েছিলাম গঙ্গাজল আর সই
আতর গোলাপ আর বেগুনের ফুল।

* * * *

কুড়াতে যেতাম প্রাতে কুল আর ফুল,
দাঁড়াইয়ে হাসিতাম যথা বৃক্ষমূল।
মনসাধে খেলিতাম খেলাঘর করি,
দিতাম পুতুল-বিয়ে কত ঘটা করি।
জামাতা বধূরে লয়ে বড়ই পছন্দ,

ধূলা কাদা লয়ে খেলা এতই আনন্দ।
গুরুজনে বলিতেন কি তোদের খেলা,
নাহিক বুঝিস্ তোরা প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলা।
বাড়ীতে পূজার ঘটা অতি ধুমধাম,
কি পরিব কি খাইব এই মনস্কাম।
নব বস্ত্র অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত,
বালিকা বয়সে আমি নব-বিবাহিত।
ছাগবলি হেরি প্রাণ হত কম্পমান,
ভাবিতাম ইহাদের নিষ্ঠুর পরাণ!
অঞ্জলি দিবার সাধ বড় ছিল মনে,
ছোট বলি কেহ নাহি লইতেন সনে।
যাইত যখন সবে পুকুরের ধারে,
বলিতাম লয়ে যাও মোরে পর পারে।
আত্মীয় স্বজনে লয়ে যেত পিঠে করে,
পিসী মাসী সবে মিলে আমারে আদরে।
কুমারী ছিলাম যবে বালিকা হইয়া,
মনসুখে বেড়াতাম সঙ্গিনী লইয়া।
ফুলমধুপান করি মিলি সখীদলে,
ছিটেমাত্র পানে তৃপ্তি হেসে মরি গ'লে।
করিতাম ভক্তি পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে,
তাঁহাদের পদধূলি লইতাম শিরে।
আশীর্ব্বাদ করিতেন তাঁহারা সকলে,
'মহাদেব স্বামী তব হবে মহীতলে।
চিরসুখী হবে তুমি ভাগ্যবতী নারী,
সুলক্ষণা মূর্ত্তি দেখে চিনিতে যে পারি।'
একমনে বাল্য ব্রত করিতাম যবে,
মহাদেব স্বামী আমি পাই যেন ভবে।
পুকুরে মাছের গাঁদি লাগিয়া কিনারে,
লোক সব জড় হত তার চারি ধারে।
সরোবরতীরে গিয়া ধরি ছোট মাছ,
যাই নাক বেশী জলে থাকি তীর কাছ।
হাত চাপি ধরিবারে যাই আশা করে,
পিছলিয়া যায় মাছ জলের ভিতরে।
কভু করিতাম যাত্রা সকলে সাজিয়া,
মাতিতাম নৃত্যগীতে দ্বারে খিল দিয়া।
প্রাতে উঠি বেড়াতাম মিলে সখীদলে,
বেড়াতাম বাগানে তুলিতে ফুল ফলে।
লুকোচুরি খেলা করি মিলিয়া সকলে,
ছুটাছুটি করিতাম বুড়ী ছোঁব বলে।
আঁধি হলে হার হোত বড় দুঃখ মনে,
বুড়ি ছুঁলে জিত হত আনন্দ বদনে।
চড়িভাত করিতাম রাঁধিতে জানি না,
মনেতে হইত কত রাঁধিতে বাসনা।"

এই পদ্যগুলি জগন্মোহিনীর অন্তরের অকপট সরলভাব, আমোদপ্রিয়তা এবং হিন্দুবালিকোচিত ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক। জগন্মোহিনী দেবী বাল্যকালে সামান্যরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগ পান নাই। তাঁহার স্বামী প্রথম বয়স হইতেই যেমন ধর্ম্মানুরাগী, সেইরূপ স্ত্রী-শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। দেশহিতকর সহস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পত্নীর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নিয়ত সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিজে যে ভারত-মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে পত্নীকে ছাত্রীরূপে প্রবিষ্ট করিয়া দেন এবং স্বতঃপরতঃ তাঁহার বিদ্যোন্নতির সহায়তা করেন। পত্নী অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তানের জননী এবং গৃহকার্য্যভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পতির বা আপনার বাঞ্ছানুরূপ শিক্ষালাভ করিতে

পারেন নাই, এজন্য তিনি সততই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তথাপি তিনি সুন্দর চিঠী পত্র লিখিতে এবং গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরিচারিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "প্রেম কুসুম" নামে তাঁহার রচিত একখানি কবিতা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। পতিও তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহা লইয়া "স্ত্রীর প্রতি পতির উপদেশ" নামক একখানি সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ১২৭৭ সালে যখন ইংলণ্ডে অবস্থিতি করেন, তখন অনেকগুলি ইংরাজ রমণীর সহিত তাঁহার পত্নীর পত্রালাপ চলিয়াছিল। কুমারী সার্প, কুমারী কলেট, বিবী হিক্‌সন ও স্পিয়ার্স প্রভৃতি তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখেন, তৎকালে বামাবোধিনীতে তাহা প্রকাশিত হয়। পাঠিকাগণের কৌতূহল বিনোদনার্থ তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

জগন্মোহিনী কুমারী সার্পকে যে পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে উক্ত ইংরেজ মহিলা লেখেন :—

"ফলতঃ আপনার পত্র যে আমাকে কি পরিমাণে আহ্লাদিত করিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। পৃথিবীস্থ সকল জাতির নরনারী যে নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার সহিত যে সকলেরই এক সাধারণ সম্বন্ধ আছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই যে সেই একই প্রকার হৃদয় আছে ও বাহ্য বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও সেই একই প্রকার আত্মা যে সকলের রহিয়াছে, আপনার পত্র পাঠ করিয়া এই সত্যগুলি আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এমন আর কখনও হয় নাই। উহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে আমার হৃদয় এত প্রশস্ত ও গাঢ়ভাবযুক্ত হইল। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে এক বার আমার বড় ইচ্ছা হয়, কিন্তু উহা বহু দূরে স্থিত এবং ইংলণ্ডে আমি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত, তজ্জন্য কখন যে আমি যাইতে পারিব এমন বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের নিমিত্ত এক এক সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাঁহাদের জন্য কোন কার্য্য করিতে বড় ইচ্ছা হয়। আপনার পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আপনি বিদ্যার অভাব জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার কন্যাদিগের যাহাতে উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, আপনি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি! আমি অনুরোধ করি আপনি এরূপ নিরাশ হইবেন না। কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার এরূপ বোধ হইল না যে, যাহাকে আমরা অশিক্ষিত বলি উহা এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য অনুভব ও দোষ গুণ আলোচনা করিবার আপনার শক্তি আছে এবং আপনার অনেক সৎ ও গভীর চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ইংলণ্ডে যখন কোন রমণী বিবাহিত হইয়া সন্তানের মাতা হয়েন, তখন তাঁহার পক্ষে যাহাতে সেই সন্তানগণের নম্রতা, বাধ্যতা ও ভালবাসা শিক্ষা হয় এবং সৎ বিষয় সকল শিখিবার জন্য তাহাদের প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে, সেইরূপে তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য। কারণ স্নেহময়ী জননীরাই সন্তান পালন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। প্রকৃত

নম্রতা, সাবধানতা এবং প্রীতি যে কিরূপ তাহা তাঁহারাই উপদেশ, এবং বিশেষতঃ আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অতএব আপনি যখন সেই মহাব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন, তখন এই অবনীমধ্যে কে বলিতে পারে যে, আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতেছেন না? সন্তান প্রতিপালনের গুরু কার্য্যভার যখন আপনি বহন করিতেছেন, তখন অপর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আপনার আর অল্পই অবকাশ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্তান প্রতিপালন করা যে কিরূপ মহৎকার্য্য তাহা এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। জননীর জীবনের দৃষ্টান্ত সন্তানের মনে এমন প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয় যে, আমরা ইংলণ্ডে এরূপ বলিয়া থাকি, যে ব্যক্তি মহৎ ও সদ্‌গুণবিশিষ্ট, তাহার মাতা নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন অসামান্য গুণবতী হইবেন। আপনার সন্তানেরা এখন শিশু রহিয়াছে, তাহারাই আবার ভবিষ্যৎ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ হইবে এবং উহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত আবার অন্যের জীবনের উপর প্রভাব প্রকাশ করিতে থাকিবে।"

ভারতহিতৈষিণী বিদুষী মিস কলেট লেখেন:—

"তুমি যদি এতদূরে না থাকিতে, আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। তাহা হইলে কত আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ, ও কথোপকথন করিতাম। তোমার অন্তঃপুরস্থ জীবন কিরূপ জানিতাম এবং তোমার সন্তানদিগের আকৃতি প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিতাম, কিন্তু আমি গতিশক্তি-হীন, দুর্ব্বল ও দুঃখিনী এবং লেখনী চালনা ব্যতীত আর কোনও কার্য্য করিতে পারি না। অতএব আমি গৃহে বসিয়া ও লিখিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব। ভারতের, বিশেষতঃ তত্রত্য অবলাকুলের কোন প্রকারে উপকার করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র। আমি যদি তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়ে কোন সাহায্য করিতে পারি, অত্যন্ত সুখী হইব। ভারতীয় নারীগণকে প্রতিদিন অনেক প্রকার আত্মবঞ্চনা ও নিরুৎসাহজনিত কষ্ট পাইতে হয় আমি জানি, কিন্তু হে ভগিনি, ঈশ্বর তোমাকে এ প্রকার স্বামী দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে চিরকাল পরম পিতার সাহায্য ও স্নেহলাভে নিশ্চয় আশান্বিত হইবে। * * কুমারী সার্পকে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাকে পড়িতে দিয়াছেন। তাহা পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। আমি ত্বরায় বাঙ্গালা শিখিতে পারিব, আশা করিতেছি, তাহা হইলে তোমাকে তোমাদের ভাষাতেই পত্র লিখিতে পারিব। কুমারী এস, ডি, কলেট।"

"আমার প্রিয় ভগ্নি,

আপনার স্বামীর ন্যায় উদারচেতা, সহৃদয় এবং সাধু লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি যে কত আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি এবং তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না বলিয়া আমি যে কিরূপ দুঃখিত হইতেছি তাহা বলিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিতেছি। তাঁহাকে পুনরায় আপনি দেখিতে পাইবেন এই চিন্তাটী আপনার কত আনন্দজনক হইবে এবং তিনি ইংরাজদিগের হৃদয়ের যেরূপ প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া আপনি কেমন উল্লসিত হইবেন! আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, তিনি আমার যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রতিক্রিয়া আমি কখনও করিতে পারিব না। * * আমি আশা করি, আপনি এই পাশ্চাত্য ও অনুরক্ত ভগ্নীকে সময় সময় মনে করিবেন। আপনারাই

মে, হিক্‌সন্।"

"আমরা কেশব বাবুর গমনে সম্পূর্ণ বিষণ্ণ হইয়াছি। কারণ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। আমার ভগ্নী এবং বন্ধুরা

তাঁহার কথা বলিবার সময় চক্ষুর জল ফেলিতে লাগিলেন এবং আমার স্বামী যখন তাঁহাকে বিদায় দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু সম্পূর্ণ সজল দেখিলাম। * * * আমরা ভরসা করি এক্ষণে সর্ব্বদা তাঁহাকে এবং আপনাকে স্মরণপথে রাখিব, নিয়ত পত্র লিখিব এবং পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি এখানে যেরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিলে আপনি মহা আনন্দিত হইবেন। রবিবার দিবস মিষ্টার স্পিয়ার্স তাঁহার জন্য উপাসনালয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আপনারই

ই. স্পিয়ার্স।"

জগন্মোহিনী অতি স্বাধীনপ্রকৃতি ও অভিমানিনী ছিলেন। তাঁহার মত স্বামি-ভাগ্য কয়জন রমণীর হয়? কিন্তু স্বামী যেমন এক দিকে তেজস্বী, সম্পূর্ণ আপনার মতে স্ত্রীকে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; স্ত্রীও সেইরূপ তেজস্বিনী, আপনার সংস্কার ও রুচি অনুসারে চলিতে দৃঢ়ব্রতা। এই জন্য প্রথম অবস্থায় সময় সময় স্বামী ও স্ত্রীর মত ও রুচির সংঘর্ষণ উপস্থিত হইত। স্বামী সাধারণ হিতকার্য্যে রত হইয়া বাড়ীর অন্যান্য ভর্ত্তার ন্যায় স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও সাংসারিক সুখ সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেন না, ইহাতে ভার্য্যার সময় সময় দুঃখ ও অভিমানও হইত। তিনি মনে করিতেন, স্বামী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির প্রতি ঔদাস্য করেন। কিন্তু তিনি প্রেমিকা ও ভাবময়ী বলিয়া তাঁহার অভিমান স্থায়ী হইত না এবং স্বামী তাঁহার আন্তরিক ভাব ও সদ্‌গুণ সকলে বশীভূত হইয়া স্ত্রীপ্রকৃতির মধুরতাই অনুভব করিতেন এবং তাঁহার প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধনে অধিক মনোযোগী হইতেন। আপনার স্ত্রী হইতেই স্ত্রীজাতির প্রতি কেশব বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং তিনি আজীবন স্ত্রীপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের মাতৃ-প্রকৃতি বলিয়া তাহার স্বাধীনতার সম্মান করিয়া গিয়াছেন।

জগন্মোহিনী প্রাচীন সংস্কারে দীক্ষিত ও স্বাধীনপ্রকৃতি হইলেও স্বামীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সাধনের বিরোধিনী ছিলেন না, তাই তাঁহার গুণবান্ স্বামী আপনার ইচ্ছামতে জীবনপথে চলিতে পারিয়াছেন এবং উৎসাহ সহকারে দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য যাহা সৎ বলিয়া বুঝিতেন, তাহাতে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যখন অল্পবয়স্কা বালিকা, তখন স্বামী মাঘোৎসবে সস্ত্রীক ব্রাহ্ম-সমাজে যাইবেন বলিয়া বাটীর কর্ত্তৃপক্ষের অমতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন, স্ত্রী গৃহ ধন জন পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মীয়দিগের তাড়না গঞ্জনা সকল অগ্রাহ্য করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। সে গৃহের দ্বার তাঁহাদিগের প্রতি রুদ্ধ হইল, রমণী স্বামীর সহিত পরগৃহকে আপনার গৃহের মত করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। বিধবা-বিবাহে

অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কার প্রথম প্রথম স্ত্রীর অভিমত ছিল না, কিন্তু স্বামীর উদার ভাব তিনি ক্রমে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে নানা শ্রেণীর নানা বর্ণের ও নানা প্রকৃতির পরিবার সকল এক পরিবার হইয়া বাস করিতে লাগিল, তিনিও সেই পরিবারভুক্ত হইয়া স্বামীর মহোদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা ও সদ্ভাবে অপর রমণীগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি যদিও কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের কুলবধূ এবং চিরকাল অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন, তথাপি সময় সময় অবরোধপ্রথা অগ্রাহ্য করিতেও সাহসী হইয়াছিলেন।

জগন্মোহিনী অতি ধৈর্য্যশীলা ও স্থির-প্রকৃতি ছিলেন। "সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ"—সুখ উপস্থিত হইলে তাহার সেবা করিবেক, দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক, তাঁহার জীবনে এ কথার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাণীর জননী হইয়া কোন্ সুখ সম্পদ্ তিনি ভোগ করেন নাই? মাতৃভক্তা কন্যা আপনি যেরূপ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া যেরূপ অবস্থায় থাকিতেন, মাতাকেও সেইরূপ অবস্থায় রাখিতে ত্রুটি করিতেন না। পতি বিদ্যমানে জগন্মোহিনী যথার্থ রাজপত্নীর ন্যায় সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু যে দিন হইতে পতিধন হারাইলেন, সেই দিন হইতে বৈরাগিণীর জীবন সচ্ছন্দচিত্তে অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে মহিলা পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"আচার্য্যদেবের সঙ্গে আচার্য্যপত্নী ক্রমে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রাত্যহিক উপাসনায় তিনি নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন। শেষ জীবনে আচার্য্যদেব তাঁহাকে বিশেষরূপে ধর্ম্ম-পথের সঙ্গিনী করিয়া লন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া আচার্য্য কয়েক দিন যুগল ব্রত সাধন—যোগসাধন করিয়াছিলেন, অনেক সময়ে বিশেষ ব্রত বিধি সাধনে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। তিনি নিস্তব্ধ রজনীতে ছাদের উপর নির্জ্জনে বসিয়া একতন্ত্রিযোগে সঙ্গীত ও যোগ-ধ্যানে রত থাকিতেন। সেই সময় তিনি বিশেষ বিশেষ প্রচারক বন্ধুকে নিকটে ডাকিয়া সদ্গ্রন্থ শ্রবণ ও সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। সাংসারিক আমোদ আহ্লাদে তাঁহার স্পৃহামাত্র ছিল না, তখন সৎপ্রসঙ্গে ও উপাসনাদি যোগে ব্রাহ্মিকাদিগের সেবা করার স্পৃহা তাঁহার মনে বলবতী হইয়াছিল। * * আর্য্যনারী সমাজের উপা-সনাদি কার্য্য আচার্য্যপত্নীই চালাইতেন। মাঘোৎসবের সময় আর্য্যনারী সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য তিনিই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। দেবালয়ে প্রাত্যহিক উপাসনায় আচার্য্যের প্রার্থনা

পাঠের পর প্রায়ই তিনি প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা অতিশয় প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইত। সেই প্রার্থনা শুনিয়া প্রায় সকলে মনে বিশেষ তৃপ্তিবোধ করিতেন। মহিলাদের মন তাঁহার মধুর উপাসনা প্রার্থনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িত। আচার্য্যের অনেকগুলি প্রার্থনা তাঁহা কর্ত্তৃক পদ্যে পরিণত হইয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।"

জগন্মোহিনীর মন অতি উচ্চ এবং হৃদয় অতি উদার ছিল। তিনি কোনও ধর্ম্মের লোককে ঘৃণা করিতেন না—এমন কি নববিধানবাদীদিগের অনেকে যে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন। সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মগণের মুখে ভগবৎ-নাম কীর্ত্তন তিনি অনেক সময় আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন এবং ইহাঁদের নগর-সংকীর্ত্তনের দল তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া যায় এজন্য বার বার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার এরূপ উদার প্রেম ও সৌজন্যে ঘোর বিপক্ষেরাও মুগ্ধ হইয়াছেন।

দেবী জগন্মোহিনী যে দিন পতিধনকে হারাইয়াছিলেন, "হায়! এমন গুণের স্বামীকে হারাইলাম" তাঁহার সেই দিনকার এই কাতর আর্ত্তনাদ আজিও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। আজি তিনি নিত্যধামে সেই হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তুকে পাইয়া কতই না আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেছেন। জগৎ-চিন্তামণি নাম করিতে করিতে তিনি ইহজীবন পরিহার করিয়াছেন, এখন সেই চিন্তামণিকে লইয়া তাঁহার জীবন অনন্তকাল সুখ শান্তি কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করিতে থাকুক, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

আর্কিমিডিস ও তাঁহার মৃত্যু।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধকালে সিসিলি দ্বীপে যখন রোমক ও কার্থেজীয়দিগের মধ্যে ঘোরতর সমর চলিতেছিল, তখন সিসিলির গ্রীকগণ কার্থেজীয়দিগের পক্ষ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ আর্কিমিডস ইহাদের মধ্যে একজন এবং তিনি বৈজ্ঞানিক কৌশলে রোমীয়দিগের জয়-চেষ্টা অনেকবার ব্যর্থ করিয়া দেন। এক সময় তিনি আতসী পাথরের আগুনে দূরস্থ রোমীয় জাহাজ সকল ভস্মসাৎ করেন। রোমক সৈন্যগণ সিরাকুজ নগর অধিকার করিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এই সময় আর্কি-মিডিস ঐ নগরে আপনার গৃহে বসিয়া গণিত অনুশীলনে এত গভীররূপে নিমগ্ন ছিলেন যে, নগরময় যে বিপ্লব, চিৎকার ও ভয়ঙ্কর কোলাহল হইতেছিল, তাহার কিছুই তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই এবং

তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এক ভীষণমূর্ত্তি সৈনিক পুরুষ যে গৃহে তিনি অঙ্ক কসিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং এক শাণিত তরবারি তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ধারণ করিল। কথিত আছে, তিনি তখন জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞাপূরণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন; সৈনিককে বলিলেন "বন্ধো! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমার প্রমাণ শেষ হইয়া আসিয়াছে।" কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মূর্খ সৈনিক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখনই তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া ফেলিল, তাঁহার সে গণনা ইহ জীবনে আর পূর্ণ হইল না। রোমক সেনাপতি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিলেন এবং সেই গুণবান্ ব্যক্তির দেহ যত্ন সহকারে সমাধিস্থ করিলেন। উত্তরকালে সমাধির উপর একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। বাগ্মী সিসিরো তীর্থস্থান বলিয়া এই স্থান দর্শন করিতে যান, কিন্তু তাহা আগাছা ও কণ্টকে আবৃত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

আর্কিমিডিস সিসিলির অন্তর্গত সিরাকুজ নগরে খ্রীষ্টের জন্মের ২৮৭ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১২ খৃষ্টাব্দে হত হন। সিরাকুজের রাজা হায়ারো তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও সহায় ছিলেন। এক সময় রাজা এক স্বর্ণকারকে অনেক টাকা দিয়া আপনার জন্য এক স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করিতে দেন। স্বর্ণকার তাহা প্রস্তুত করিয়া রাজার নিকট আনিয়াছিল, কিন্তু তাহা পরীক্ষা করিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, ইহার মধ্যে রৌপ্য মিশাল আছে। তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আর্কিমিডিসকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তথ্য নিরূপণ করিতে বলিলেন। পণ্ডিতবর দিবানিশি এই বিষয় চিন্তা করেন, কিন্তু সমস্যা পূরণের কোনও উপায় স্থির করিতে পারেন না। একদিন প্রকাশ্য স্নানাগারে স্নান করিতে গিয়াছেন। টব জলে পরিপূর্ণ আছে। যেমন তিনি তাহাতে নামিয়াছেন, টব উছলাইয়া জল পড়িয়া গেল। তাঁহার দিব্যজ্ঞানে তখনই এক আশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কৃত হইল—তাঁহার দেহ-পরিমিত জল টব হইতে বাহিরে পড়িয়াছে, এই জল পরিমাণ করিতে পারিলে দেহের ভার পরিমাণ করিতে পারা যাইবে,—এইরূপে প্রত্যেক বস্তু জলে ডুবাইয়া পরিমাণ করিলে তাহার প্রকৃত ওজন এবং জলমগ্ন অবস্থার ওজনের প্রভেদ বুঝা যাইবে। তবেই ত সমস্যা পূরণ হইয়াছে, সোণার প্রকৃত ওজন ও জলমগ্ন অবস্থার ওজন কখনও সমান হইবে না। সোণার মুকুট আর মিশ্র ধাতুর মুকুট এইরূপে ধরা পড়িবে। এই সকল চিন্তা বিদ্যুতের মত তাঁহার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে মহানন্দে উন্মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি যেমন উলঙ্গপ্রায় হইয়া স্নান করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় টব হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাজপথে গেলেন এবং

মনের উচ্ছ্বাসে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইউরিকা, ইউরিকা"—আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি। লোকে এই মহাপণ্ডিতের স্বভাব জানিত, এইজন্য পাগল বলিয়া তাঁহাকে ধরিল না। তিনি উন্মত্ত অবস্থায় গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃহে গিয়া ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, রাজার সন্দেহ অমূলক নহে। পরে রাজা যে পরিমাণ সোণা দিয়াছিলেন, জলমধ্যে তাহার ওজন এবং এই ভাঁজাল স্বর্ণমুকুটের ওজন করিয়া যে অনেক পার্থক্য হয়, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। রাজা স্বর্ণকারকে ডাকাইলে সে আপনার অপরাধ স্বীকার করিল এবং দয়া প্রার্থনা করিয়া রাজার পদতলে পড়িল।

আর্কিমিডিসের এই পরীক্ষা হইতে বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহাতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা এই যে "কোন বস্তু দ্রব পদার্থের মধ্যে মগ্ন করিলে তাহার কতক ভার কমিয়া যায়, আর ঐ বস্তু যত স্থান অধিকার করিয়া থাকে, সেই স্থান-পরিমিত ঐ দ্রব বস্তুর ওজন এই হৃত (কমতি) ভারের সমান।"*

* That a body plunged in a fluid loses as much of its weight as is equal to the weight of an equal volume of the fluid.

জীবনের দশ নিয়ম।*

১। আজি যাহা করিতে পার, কল্যকার জন্য তাহা ফেলিয়া রাখিও না।

২। যাহা নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অন্যকে খাটাইয়া ক্লেশ দিও না।

৩। টাকা হাতে না আসিতে তাহা ব্যয় করিও না।

৪। যে বস্তুর প্রয়োজন নাই, সস্তা বলিয়া তাহা কিনিও না, কিনিলে তোমার পক্ষে ইহা মহার্ঘ হইবে।

৫। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতে আমাদিগকে যত ক্লেশ দেয়, অহঙ্কার তদপেক্ষা অধিক।

৬। কম আহার করিলাম বলিয়া কখনও অনুতাপ করিতে হয় না।

৭। যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করি, তাহা কখনও কষ্টকর হয় না।

৮। যে সকল বিপদ ঘটে নাই, তাহার ভাবনায় আমরা কত ক্লেশ পাইয়াছি!

৯। কোনও বস্তু ধরিবার সময় তাহার যে দিক্ মসৃণ, তাহা ধর।

১০। রাগ হইলে পুনরায় কথা কহিবার পূর্ব্বে দশ গণনা কর; যদি বেশী রাগ হইয়া থাকে, ১০০ গণনা কর।

* আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বহুদর্শী জাফার্সনের এই উপদেশগুলি "জাফার্সনের দশ নিয়ম" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হেঁয়ালী।

আমরা অনেক দিন আর হেঁয়ালীর উত্তর পাই নাই বলিয়া নূতন হেঁয়ালী প্রকটনে ক্ষান্ত ছিলাম। বৎসরের শেষে আর কয়েকটী প্রকটন করিয়া এ বৎসরের মত আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিব।

আশ্বিনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বাদাম। (২) নাসিকা। (৩) ভ(অক্ষর)। (৪) কেরাণী। (৫) পাতাল।

ফাল্গুনের হেঁয়ালী।

বিবাহ হাতীর সঙ্গে একি বিড়ম্বনা,
না পারি বহিতে ভার আপনি আপনা। ১
আদি দুই বর্ণে যন্ত্র পাক করিবার,
মধ্য বর্ণ ছেড়ে দিলে বাসনা অপার,
ছাড়িলে প্রথম বর্ণ পীড়া গুরুতর,
কে আমি ভূতের মধ্যে বসি নিরন্তর ? ২
চিনদেশ হতে আসি পড়িলাম বাঁধা
লতাপাশে; চাল উড়ে গেল একি ধাঁধা—
ডিম ফুটাইতে পাখী আসি দেখা দিল,
অম্লরস-ভরা মোরে দেখে পলাইল। ৩
গলায় পা দিয়া মোরে বানাল বাতুল,
বুদ্ধিশুদ্ধি যাহা ছিল সব হলো ভুল। ৪
প্রথম দ্বিবর্ণে আমি সন্ন্যাসীর জায়া,
দ্বিতীয় দ্বিবর্ণে একেশ্বর শতকায়া,
এক বর্ণে মাতৃসম পালি জীবগণ,
তিন বর্ণে মাতৃক্রোড়ে যাদু বাছাধন। ৫

নূতন সংবাদ।

১। ছোটলাট সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জী পীড়াবশতঃ পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন।

২। কলিকাতায় গ্যাসের পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক আলোক দিবার ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমোদিত হইয়াছে। শীঘ্রই ইহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

৩। মড়ক উপলক্ষে বোম্বাই নগরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া কয়েকটী ইউরোপীয় ও অনেকগুলি দেশীয় হতাহত হইয়াছে।

৪। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার রাজত্ব-কালে ২৮৫ জনকে লর্ড করিয়াছেন।

৫। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চক্ষুর পীড়া বশতঃ হাইকোর্টের প্রধান গবর্ণমেণ্ট উকিলের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৬। বিশ্বহিতৈষী জর্জ মুলারের বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছে। তাঁহার অনাথাশ্রম

সকলের অধিবাসিসংখ্যা ১৭০০। তাঁহার কার্য্যের সাহায্যকারীর সংখ্যা ২০০।

৭। আমাদের বড় লাট লর্ড এল্‌গিনের জননীর ৮০ বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁর শোকের সান্ত্বনা করুন্।

৮। গত ১৪ই ফাল্গুন যোধপুরের যুবরাজ পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

৯। পারিসে নূতন দুইখানি দৈনিক পত্র স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

১০। দিল্লীতে উর্দ্দু ভাষায় একখানি পত্রিকা বাহির হইবে, একজন উচ্চবংশীয় মহিলা ইহার সম্পাদনের ভার লইয়াছেন।

১১। রুষীয় রাজকোষের আয় ১৪ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। আর কোন রাজ্যের রাজস্ব ইহার সমতুল্য নহে।

১২। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের নৈহাটী হইতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত ডবল লাইন হইবে।

১৩। সেলোরা কেসিনা নাম্নী এক মার্কিন স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনাঢ্যা। চিলি ও পেরু প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ তামার খনি তাঁহারই। তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন কোটী টাকা। সমুদয় সম্পত্তির মূল্য কত, বিবেচনা কর!

১৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিবি পি, হার্ষ্ট বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটী টাকার অধিক দান করিয়াছেন।

১৫। রুষীয় সম্রাট সৈন্যগণকে হিন্দুস্থানী শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৬। আফ্রিকাতে প্রতিবৎসর হস্তিদন্তের জন্য প্রায় ৬০ হাজার হস্তী নিহত হয়।

১৭। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, কিন্তু মিশর রাজ্যে ইহার বিপরীত। তথায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক।

১৮। এ বৎসর মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী স্ত্রীলোক বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম কুমারী কমলা রত্যং কৃষ্ণগমা। তিনি এক হিন্দু সব-জজের কন্যা।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

কবিরাজি-শিক্ষা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত। এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি প্রধান প্রধান আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত এবং অধুনাতন হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক সকলের রচনা ও বিষয়-সন্নিবেশ প্রণালীর অনুরূপ অভিনব প্রণালীতে লিখিত। ইহা আট খণ্ডে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা, পথ্যাপথ্য অতি বিশদ ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় দক্ষতার সহিত লিখিত। ইহাতে প্রত্যেক রোগাধিকারে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিখ্যাত বিখ্যাত পরীক্ষিত

ঔষধসমূহ, উহাদের সেবন, প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী সন্নিবেশিত হইয়াছে। জীবদেহতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান ও ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির ডাক্তারী ও কবিরাজী মত স্থানে স্থানে চিত্র দ্বারা বিশদ করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে পূর্ণাবয়ব করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাবলীর উপাদানসমূহের শাস্ত্রীয় নাম, দেশী চলিত নাম, লাটিন ভাষায় নাম ও গুণাদির তালিকা দিয়া গ্রন্থের উপকারিতা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাপ্রণালী-শিক্ষার্থীদিগের এবং সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপযোগী ও আদরের বস্তু হইবে। পুস্তকখানির আয়তন হিসাবে ইহার মূল্য সুলভ করা হইয়াছে বলিতে হইবে এবং নগেন্দ্র বাবু বিস্তর গবেষণা ও বহু পরিশ্রম করিয়া অভিনব প্রণালীতে রচিত এই সুবৃহৎ চিকিৎসাগ্রন্থখানি অতি সুলভ মূল্যে প্রচার করিয়া সহজে কবিরাজি-শিক্ষার পথ প্রসারিত করিয়াছেন। এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইতিমধ্যে গ্রন্থখানির পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে, ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। আশা করি উৎসাহী গ্রন্থকার মহাশয় ইহার ষষ্ঠ সংস্করণে মুষ্টিযোগ অধ্যায় বিস্তৃত করিয়া এবং দ্রব্যগুণাদির এক নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে ত্রুটি করিবেন না। এই স্বাস্থ্যহীন দেশে এইরূপ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপাদেয় গ্রন্থ গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় সকল গৃহে রক্ষা করা এবং স্ত্রী পুরুষ সকলেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।

বামারচনা।

অনন্ত বিষাদ।

(দেবী জগন্মোহিনীর বিয়োগে)

একি শুনি অকস্মাৎ, কঠিন কুলিশপাত
আমাদের ভগ্নপ্রাণ দুঃখী পরিবারে,
কমল-কুটীর হতে, শত যোজনের পথে
বিষাদে ব্যথিত সবে শোক-সমাচারে।
ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ, সবে বিষাদিত মন,
সকলের মুখে আজি বিষাদের রেখা;
জননীর সম যিনি, আমাদের শিরোমণি,
আর তাঁরে এ সংসারে নাহি যাবে দেখা।
সে দিন কেশব তরে, সবে মোরা ঘরে ঘরে
কেঁদেছি কাতর প্রাণে বিষাদে বিরলে,
কোন্ অপরাধে আজ, বজ্রের উপরে বাজ
পড়িল, কাঁদাতে সবে তীব্র অশ্রুজলে?

মিলে ভাই ভগ্নী সবে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে ক্ষুণ্ণভাবে
চল যাই দেখি আজ জননী-শ্মশান,
শোকপূর্ণ অশ্রুজলে, জননী সমাধিস্থলে
চল সবে, অশ্রুজলে ভাসাই সে স্থান।
প্রাণভরে ডাকি তাঁরে, স্মরিলে অন্তরে যাঁরে
হৃদয়ের দুঃখরাশি হয় নিবারণ,
যাঁহার আদেশক্রমে, পবিত্র স্বরগভূমে
গেছেন জননী ত্যজি সংসার-গহন।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।

বিদায়।

১

বিষাদের দিন, হায়! সদাই যে পড়ে মনে,
মনোব্যথা, অশ্রুজল প্রবাহে তাহার সনে,
নিশিদিন সেই ছবি, জাগিছে হৃদয়-মাঝে,
মরণের নাহি সাধ্য মুছাতে হৃদয়রাজে
নবীন এ প্রেম-স্মৃতি হ'তে।

২

নিকটে প্রেমের ছায়া, নেহারি নিকটতর,
দীর্ঘ অদর্শনে, প্রেম, ধরে রূপ মনোহর,
ভাষা মরে, স্মৃতি জাগে, মরণ-ভীষণ-শরে
ঊর্দ্ধশির, পড়ে লুটাইয়া, যাতনার ভরে
সুশীতল বিভু-পদ-প্রান্তে।

৩

হে মাতঃ বসুধে! তব অভাগিনী তনয়ার
কেহ নাহি এ জগতে আপনার বলিবার;
সুকোমল ক্রোড়ে তব, লভিব বিরাম সুখে;
ব্যথা পেলে, শ্রান্ত হলে, লুকাব মা তোরি বুকে—
তুই মোর জীবন-আধার!

৪

শূন্য গৃহ, শূন্য হৃদি, জগত এ মরুময়,
একের অভাবে সব 'শূন্য শূন্য' নিরথয়,
দয়াময়! বিধান তোমার, বুঝে সাধ্য কার,
তুমি বিনা কেবা পারে, লাঘবিতে হৃদিভার,
তুমি মাত্র ভরসা আমার।

৫

নীরব বসুধা যবে, রজনীর স্তব্ধ বুকে,
নিরমল শিশুপ্রায়, ঘুমায় মনের সুখে,
স্বপনেরা, ক্ষণেকের তরে, শ্রান্ত আঁখিতলে
কি মধুর ছবি আঁকে, ভুলায় কতই ছলে,
তৃষিত এ তাপিত পরাণ।

৬

আধেক ঘুমের ঘোরে, আধেক স্বপনে ভুলি,
ফিরে পাই আগেকার সুখের সে দিনগুলি।
পিপাসু প্রেমের দৃষ্টি শুনিবারে সে মধুর ভাষা,
আকুলিত প্রাণে মোর, জাগায় নূতন আশা,
অতীতেরে ভাবি বর্ত্তমান।

৭

প্রেম-ডোরে বাঁধা, সে যে দূরে যাইবার নয়,
অন্তরের নিধি মোর, অন্তরে লুকান রয়;
আমি যদি দূর ভাবি, তবেই সে দূরে যায়,
নয়নে অদৃশ্য,—কিন্তু, অন্তর দর্শন পায়,
প্রেম-বক্ষে অমর আত্মার।

৮

বর্ষ দুই হ'ল, সেই তনু লয়েছে বিদায়,
প্রেমের কলিকা তিন, রেখে গেছে এ ধরায়.
কালেতে তাহারা যেন, গোলাপ কুসুম সম,
বিতরে সৌরভ, বিকাশি লাবণ্য অনুপম,
ঘুচায় সকল হৃদি-ভার।

৯

শূন্য হৃদি?—না, না, সে যে পূর্ণ এবে পরব্রহ্ম জ্ঞানে,
ভবের অসার সুখে মন শান্তি নাহি মানে।
তরুবর গেছে দেব-লোকে, দিব্য রূপ ধরি,
ফেলে গেছে ছিন্ন লতিকারে, ধূলায় ধূসরি
জড়াইতে ব্রহ্মতরু-শাখে।

১০

ভুলিয়া অসার কথা, সাধু-অমরাত্মা সনে
থাকি যেন মগ্ন সদা পরব্রহ্ম-যোগ ধ্যানে;
পথ বলে দিয়ে গেছ, কিসের ভাবনা তবে?
ঠিক্ পথে চলি যদি, মিলন হবেই হবে—
সাধ্য কার, মোরে দূরে রাখে?

শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, চুঁচড়া।

সরোজিনীর খুকী।

(জন্ম ৭ই মাঘ—মৃত্যু, ৩০এ মাঘ, ১৩০২)

১

কেন বিধি এমন পাষাণ?
মানব মানবীগণে কেন দহে হুতাশনে
করুণা-মমতা-হীন দেবতার প্রাণ!
আশায় নিরাশা-মাখা স্নেহ হতাশ্বাসে ঢাকা,
আনন্দে বিষাদ মেলা,—বিচিত্র বিধান!
এমন কঠিন কেন দেবতার প্রাণ?

২

অস্ফুটন্ত সে কলিকা, (শরতের সেফালিকা)
ভাল করে সোণামুখে না ফুটিতে হাসি,
কেন রে পড়িল ঝরি? কেরে রাহু বেশ ধরি
প্রতিপদে এ চন্দ্রমা ফেলিল গরাসি?

৩

কত সাধ, কত আশা ছিল মোর মনে;
একটী পলকে হায়! শেষ হ'ল সমুদায়,
একটী নিঃশ্বাস ভেদ জীবনে মরণে!
এই ছিল ইহলোকে, এই কাঁদাইয়া শোকে
চলে গেল পরলোকে বুঝি না কেমনে!
জীবনে মরণে খেলা প্রভাত সায়াহ্ন বেলা
সময়াসময় নাই,—দয়া নাই মনে।

৪

যখন প্রথম মেয়ে দেখিল ভূতল,
নিরানন্দ সমুদয়, কত ভবিষ্যৎ ভয়,
কত যেন হতাশ্বাস, কত অশ্রুজল,
কত ঘৃণা, কত ছি ছি করে সবে মিছামিছি
একটু আহ্লাদ নাই,—বিষাদ কেবল!
দেখিয়া সোণার খুকী কেহই হলনা সুখী,
সবাই ভাবিল মেয়ে মহা অমঙ্গল!
তাতেই চরণে ঠেলি গেল সে সকলে ফেলি,
দারুণ মানিনী মেয়ে,—জ্বলন্ত অনল!

সবারি ঘুচিল ভার, চিন্তা দূর সবাকার,
মায়ের পরাণভরা শ্মশান কেবল!
তারি শুধু সর্ব্বনাশ, তারি শুধু হতাশ্বাস,
আমরণ তারি শুধু নয়নের জল!

৫

কোথা সুরপুর?—
কই সে নন্দনবন, সুশীতল সমীরণ,
কোথা শান্তি-নিকেতন অনন্ত মধুর?
কোথায় অমরাবতী মন্দাকিনী স্রোতস্বতী,
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুধামাখা সুর?
হায় সে একাকী মেয়ে কোন্ পথে গেল ধেয়ে?
আহা! সে অজানা দেশ কোথা?—কত দূর?

৬

আর কি হবে না দেখা আহা! তার সনে?
জ্বলন্ত উল্কার মত বেড়াইব অবিরত
খুঁজিয়া সে বালিকায় ভূতলে গগনে!
দীনা কাঙ্গালিনী বেশে বেড়াইব দেশে দেশে,
দেখিব আমার খুকী গেল কোন্ খানে!
তুলিয়া করুণ তান গাইয়া খেদের গান
করিব করুণা ভিক্ষা সবার চরণে,
আমার সোণার মেয়ে দেয় কিনা দেখাইয়ে
কোন্ পথে গিয়াছে সে,—রয়েছে কেমনে।
কার বুকে শুয়ে থাকে, "মা" বলে কাহারে ডাকে,
ঘুচায় পিপাসা তার কার স্তন পানে?

৭

ডাকিয়া নিয়াছে বিধি বালিকা আমার,
সবারি মনের ভয়— দূর হ'ল সমুদয়
তাহার কারণে কারো খেদ নাই আর।
যার মেয়ে সে নিয়াছে সকলেই বাঁচিয়াছে,
খুঁজিতে হবে না "বর" এ জগতে তার।
স্বরগে বিবাহ হবে, দেবদেশে সুখে রবে,
পাইবে স্বর্গের শিক্ষা সুর-অঙ্গনার!
'অনূঢ়া কুমারী মেয়ে কাঁদিবে না বর চেয়ে'
ভাবিয়া হবে না কারো হৃদয় অঙ্গার!
সবারি ভাবনা ভয় দূর হ'ল সমুদয়,
স্বরগের খুকী গেছে স্বরগে আবার!
একটী মাসের তরে এসেছিল এ সংসারে
কেবল বুঝিতে স্নেহ মমতা সবার!
যাক্ মেয়ে দেবদেশে দেব-বালিকার বেশে,
আমিও যাইব ত্বরা নিকটে তাহার—
না হয় না হ'ল ভবে, সেইখানে দেখা হবে,
অবসান হবে সব জ্বালা যন্ত্রণার,
ঘুচিবে জন্মের মত এই হাহাকার।

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ,
ময়মনসিংহ।

শেষ নিবেদন।

এই নিবেদন বিভো! শেষ-নিবেদন,
নেবে যদি ভগবান্,
মম এ অধম প্রাণ,
নেও তারে প্রেম বাহু করি প্রসারণ,
দেখাইয়ে তারে তব মূরতি মোহন।
মরিব তোমারি নামে ওহে মৃত্যুঞ্জয়,
ছাড়িয়া তোমারি ধরা
যাব সে অমৃত-ভরা,

সেই তব দেব-দেশ—যথা শোকভয়
না করেহে বিচরণ—সদা সুখময়।
এই নিবেদন বিভো শেষ নিবেদন,
যেন হে আমার তরে
কেহ শোক নাহি করে,
ঐহিকের সুখ আর জীবন চাহে না,
লভি মৃত্যু আলিঙ্গন,
সুখে করিব গমন,—
অমৃতে—অমৃতে পূর্ণ সে দেব-সদন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।
এ সংসারে সুখ দুঃখে,
যাঁহারে ধরি এ বক্ষে,
কৃতার্থ মেনেছি, আজ সেই প্রিয়ধন
রাখিবে হে সযতনে,
সে মুখ হেরি নয়নে,
সুখেতে লভিব মম অন্তিম শয়ন।
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন,
তব নাম স্মরি হরি!
ভব ধাম পরিহরি,
সুখেতে লভিব চির-শান্তি-নিকেতন।
তোমারি অমৃত-বুকে
ক্ষুদ্র প্রাণ ঢালি সুখে
ঘুমাব অনন্ত কাল অনন্ত জীবন,
এই মাত্র বিভো মম শেষ নিবেদন।

শ্রীমতী রেবা রায়, কটক।

লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—(১) শোভাবাজার শাখা, ২০৫নং অপার চিৎপুর রোড; (২) বড়বাজার শাখা, ২২৬ নং হারিসন রোড; (৩) বাঁকীপুর শাখা; (৪) পাটনা শাখা; (৫) ডালহাউসি স্কোয়ার শাখা, ১নং ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার; (৬) মথুরা শাখা। ঔষধপূর্ণ বাক্স সকল—

১। ওলাওঠা চিকিৎসার ছোট বাক্স—অত্যাবশ্যকীয় ১২ শিশি ঔষধ, চিকিৎসোপযোগী অত্যুৎকৃষ্ট একখানি পুস্তক, এক শিশি ওলাউঠার অব্যর্থ মহৌষধ রুবিনির, বাক্সের সর্ব্বসমেত মূল্য ৫ টাকা।

২। ওলাউঠা চিকিৎসার বড় বাক্স—২৪ শিশি ঔষধ, পুস্তক, ক্যাম্ফর ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র; সর্ব্বসমেত মূল্য ৮।০ টাকা।

৩। গার্হস্থ্য চিকিৎসার ছোট বাক্স—২৪ শিশি ঔষধ "গৃহ-চিকিৎসা পুস্তক" এবং ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ, মূল্য ৮৵০ টাকা।

৪। গার্হস্থ্য চিকিৎসার বড় বাক্স—৬০ শিশি ঔষধ, পুস্তক ও ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র সহ, মূল্য ২৫৲০ টাকা।

April, 1898.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫ বর্ষ। ৩৯৯ সংখ্যা। | চৈত্র ১৩০৪—এপ্রেল, ১৮৯৮ | ৬ষ্ঠ-কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-পরীক্ষক—লক্ষ্ণৌ অ্যাড্‌ভোকেট বলেন, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায় (এফ এর তুল্য) বিবী জেনিংস পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে ইহা এক নূতন দৃষ্টান্ত, ইহা দ্বারা শুভ-ফলের আশা করা যায়।

জেনানা হাঁসপাতাল—লেডি ডফরিণ জেনানা হাঁসপাতালের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কাসিমবাজারের বাবু আশুতোষ নাথ রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ টাকা, মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (২য় বার) ৮০০০ টাকা, গিধৌড়ের মহারাজা ২০০০ টাকা এবং কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ২০০০ টাকা দিয়াছেন।

কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ড—গত ২২শে মার্চ টাউনহলে ইহার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গণ্য মান্য লোক সভাস্থ হন এবং স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি সভাপতির কার্য্য করেন। বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত যে এই ফণ্ডের অধীনস্থ হাঁসপাতাল সকলে অধিবাসী রোগীর সংখ্যা ১৮৯৬ সালে প্রায় ৩০ হাজার ছিল, ১৮৯৭ সালে ৩৩ হাজার হইয়াছে এবং বহিরাগত রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ স্থানে ১৩॥ লক্ষ হইয়াছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ অপেক্ষা দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে রোগীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে, ইহার কারণ অনুসন্ধেয়। এই ফণ্ডের অধীনে এখন ৩৩টী ১ম শ্রেণীর লেডী ডাক্তার, ৭০ জন আসিটাণ্ট সার্জন এবং ১১৭জন হাঁসপাতাল আসিষ্টাণ্ট আছেন। লেডী ডফরিণের পর লেডী লান্সডাউন ও তৎপরে লেডী এলগিন লেডী-প্রেসিডেণ্ট হইয়া ফণ্ডের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ভারত বিজ্ঞান-সভা—গত ২১শে মার্চ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের স্থাপিত বিজ্ঞানসভার বার্ষিক অধিবেশনে ছোট লাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী সভাপতিত্ব করেন। তিনি দেশীয়দিগের বিজ্ঞান চর্চ্চার বন্ধু বলিয়া আপনার পরিচয় দেন এবং সভার ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করেন।

স্ত্রী-সৈন্য—আমেরিকার আট্‌লাণ্টা, জর্জিয়া, ডুবার এবং কলরেডো প্রদেশে কেবল রমণীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র সৈন্যদল প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের অধ্যক্ষ ইহাদের শিক্ষায় উৎসাহিত হইয়া বলিয়াছেন "যে সকল অস্ত্র ইহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার ইহারা করিবে এবং ইহাদের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইতেছে, তাহার সুফল জগৎকে দেখাইবে। প্রাচীনকাল হইতে বীরাঙ্গনার কীর্ত্তি জগতে বিদিত, সমরকৌশল-শিক্ষিতা নারীদিগের অভাব বর্ত্তমান কালেই বা কেন হইবে? তবে ইহাঁরা জগতের কি মঙ্গল সাধন করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য।

ফুলে রঙ্গ করা—জলের সহিত এনিলাইন রঙ মিশাইয়া তাহাতে ফুলের বোঁটা ডুবাইলে ফুলে নানা বর্ণ উৎপন্ন হয়। দুই প্রকার রঙ একত্র মিশ্রিত করিলে ফুলে চিত্র বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হয়।

বিলাতে দেশী রন্ধনশালা—পুনার প্রসিদ্ধ সোরাবজীর ভগিনী লঙ্গরাথা লণ্ডন নগরে এক বাবুর্চ্চিখানা খুলিয়া দেশীয় সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জনে ইংরাজ-রসনা বেশ তৃপ্ত করিতেছেন এবং অর্থোপার্জ্জনেরও এক পথ পাইয়াছেন।

মুসলমান বালিকাবিদ্যালয়—গত ২৩শে মার্চ রবিন্‌সন ষ্ট্রীট ১নং ভবনে এই বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। চিফ-জষ্টিস-পত্নী লেডী ম্যাক্লিন স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সার জন উডবরন্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করেন। এক বৎসরে ৪৬টী বালিকা ভরতি হইয়াছে এবং মুরসিদাবাদের নবাব বেগমের বদান্যতায় ইহার অর্থাভাব নাই। মুসলমান বালিকাদের জন্য কলিকাতায় এই একমাত্র বিদ্যালয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি প্রার্থনা করি।

দোষের পরীক্ষা।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যেরূপ দৈব উপায়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হইত, ইউরোপের অন্ধকার-যুগে অনেকটা সেইরূপ হইত। এ বিচার যদিও মনুষ্যদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত, কিন্তু ধর্ম্মের নামে যাজকগণ নানা প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ ও ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেন, সেইজন্য ইহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিচার বলিয়া অভিহিত হইত এবং লোকেও তাহাই বিশ্বাস করিত। দোষী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, বস্ত্রে চক্ষু বন্ধনপূর্ব্বক লাঙ্গলের তপ্ত ফালের উপর তাহাকে দাঁড়াইতে হইত। কখনও আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চলিয়া যাইতে হইত। কখনও জ্বলন্ত লৌহদণ্ড হস্তে ধারণ করিতে হইত, কখনও তপ্ত জলের মধ্যে সমুদয় হস্ত ডুবাইয়া ধরিতে হইত। এই সকল অগ্নি-পরীক্ষা। এ দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অগ্নি স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী দেবতা, দোষী তাহার স্পর্শে দগ্ধ হয়, কিন্তু নির্দ্দোষী নিরাপদে অব্যাহতি পায়। ইউরোপের লোকে অগ্নিকে সেরূপ চক্ষুতে না দেখিলেও মন্ত্রপূত অগ্নি দ্বারা দোষ ধরা পড়ে বিশ্বাস করিত। অগ্নি দ্বারা যাহার দেহ ক্ষত হইত সে দোষী, যাহার দেহ অক্ষত থাকিত, সেই নির্দ্দোষী। অগ্নির প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য নানা প্রকার যাদুবিদ্যা এবং মন্ত্র তন্ত্র ও কল কৌশলও অবলম্বিত হইত, তাহা দ্বারা কত দোষীও নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইয়া যাইত।

অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার পরীক্ষা ছিল। অভিযোগকারী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিত। বলবান্ লোক দুই পক্ষেরই প্রতিনিধি হইতে পারিত; যুদ্ধে যে পক্ষের জয় হইত, সেই নির্দ্দোষী এবং যে পক্ষের পরাজয় হইত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। মধ্য যুগের ইউরোপীয়েরা ডাইনে বিশ্বাস করিতেন। যে স্ত্রীলোককে ডাইন বলিয়া সন্দেহ হইত তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলে যদি সে ডুবিয়া মরিত, তবে নির্দ্দোষী; যদি সাঁতার দিতে পারিত, তাহা হইলে প্রকৃত ডাইন বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত। উভয় স্থলেই মৃত্যু ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। ডাইনকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিবার পদ্ধতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

কোনও বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে তাহারও দৈব বিচার হইত। একটী ক্রুসকাষ্ঠ পুতিয়া তাহার সম্মুখে বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় বা তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে যীশুখ্রীষ্টের মূর্ত্তির ন্যায় বাহু প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইতে হইত। যাহার বাহু অগ্রে ভারাক্রান্ত হইয়া অবনত হইত, সেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত এবং মোকর্দ্দমা হারিত। এক সময়ে এক মঠের স্বত্ব লইয়া পারিসের ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং সেণ্ট ডেনিসের সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিবাদ হয়। বিচারক কোন প্রকারে তাঁহাদের বিবাদের মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্রুসের বিচার অবলম্বন করেন। বাদী প্রতিবাদী আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক ব্যক্তিকে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি ক্রুসকাষ্ঠে যীশুর ন্যায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল। চারি দিকে বহু লোক সমবেত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি

এক পক্ষের—কতকগুলি অন্য পক্ষের জয় কামনা করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান রহিল। ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতিনিধির বাহু অগ্রে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেল, ইহাতেই ধর্ম্মাধ্যক্ষের পরাজয় হইল।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির ছিল না। পিতার সন্তানেরা অনেক স্থলে পিতার বিষয় সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইত, কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে কোনও সন্তান পুত্রাদি রাখিয়া মরিয়া গেলে এই পুত্রাদির স্বত্ব লইয়া গোলযোগ হইত। এক সময় এইরূপ এক বিবাদ মীমাংসারজন্য এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যবস্থা হইল। পিতৃহীন পৌত্রদিগের পক্ষীয় যোদ্ধা জয় লাভ করিল। সেই সময় হইতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইল যে, পিতৃহীন সন্তানেরা খুড়া জেঠাদিগের সহিত পৈতৃক বিষয়ের সমাধিকারী হইবে। একাদশ শতাব্দীতে দুইটী উপাসনা-পদ্ধতির কোন্‌টী অবলম্বনীয় ইহা লইয়া বিবাদ হয়। তখনি দুই পক্ষের দুই বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুসজ্জিত হইলেন এবং যে পদ্ধতির পক্ষীয় বীর জয়ী হইলেন, তাহাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইল। কোনও ভূমির সীমা লইয়া দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে জজের আজ্ঞানুসারে সীমানার এক চাপড়া মাটী আদালতে আনা হইত। পরে জজের আদেশে দুই পক্ষ ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্ব স্ব তরবারীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই মাটী স্পর্শ করিত। অতঃপর দ্বন্দ্বযুদ্ধ দ্বারা তাহাদের বিবাদের মীমাংসা হইয়া যাইত।

চোর ধরিবার অপূর্ব্ব উপায় ছিল। চুরি অপরাধে অপরাধী বলিয়া যাহার উপর সন্দেহ হইত, তাহাকে ধারণীর প্রস্তুত রুটী গিলিয়া ফেলিতে বলা হইত। সে যদি গিলিতে পারিত, তবে নির্দ্দোষী, নতুবা দোষী সপ্রমাণ হইত। রুটির সহিত খানিকটা পণির দিয়া এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। এই রুটী পবিত্র রুটী এবং পণির পবিত্র পণির নামে উক্ত হইত। এই রুটী ও পণিরের উপর সাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যবের পামরুটী বিনা তাড়িতে প্রস্তুত হইত এবং যে দুগ্ধে পণির হইত, তাহা মে মাসে ভেড়ীর স্তন হইতে দোহন করিয়া সংগ্রহ করা হইত। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, এইরূপ এক পরীক্ষায় রুটী গিলিতে না পারিয়া সুপ্রসিদ্ধ গডউইনের মৃত্যু হয়। এই প্রথা হইতে "এই রুটী যেন আমার কণ্ঠরোধ করে" ইংরাজীতে ইহা একটী প্রবচনরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সাধনা।

১

কে জানে এ কিসের সাধনা
সাধিতেছি জনম ভরিয়া,
চুম্বক উত্তর-মুখে, চেয়ে থাকে কোন্ সুখে,
সূর্য্যমুখী রহে কেন
তপনে চাহিয়া?

২

দিবা যায় নিশা আসে ফিরে,
আসে যায় মাস তিথি বার,
বিশ্বে আসে সেই প্রীতি, প্রাণে জাগে সেই স্মৃতি,
আমারি সে দিন শুধু
আসে না আবার!

৩

বসি সেই তরুর শাখায়
বিহগেরা গায় কত গান,
সেইতো সারাহ্ন-রবি, তেমনি রক্তিম ছবি,
ডুবায় সাগর-তলে
সোণার বয়ান!

৪

তেমনি হাসিয়া আসে শশী,
সাথে শত তারা সহচরী;
সেই বেলী যুঁই ফোটে, দক্ষিণ-অনিল ছোটে,
বসন্ত উছলে সেই
মোহন মাধুরী!

৫

তেমনি আনন্দরাশি মাখা,
প্রকৃতির সাধের আগার;
সেই কপোতাক্ষী-কূলে, ঢেউগুলি দুলে দুলে,
মৃদুল-সমীর-ভরে
চুম্বে দুই ধার।

৬

শুধু সেই আসে না মিশিতে,
জগতের আনন্দ শোভায়;
তারি পানে চেয়ে পাখী, হরষে উঠে না ডাকি,
মলয় বাতাস আজি
লাগে না সে গা'য়।

৭

শুধু সেই আসে না হাসিতে,
মরতে যে "মৃত সঞ্জীবনী"—
তাতেই সকলি শূন্য, সারা বিশ্ব অসম্পূর্ণ,
আলোক, উদ্যমহীন
যেন রে অবনী!

৮

তাই আমি ভাবি মনে মনে,
সে কেন এ অশরীরী প্রায়?—
কোথায় কেমনে রহে, একটী কথা না কহে,
মনে ভেসে উঠে শুধু
নব জ্যোছনায়?

৯

এত ডাকি, এত সাধি, তবু
শুনে না সে, এমনি নিদয়,
মহত্ত্ব—দেবত্ব, আর, কত কি যে আছে তার!
তবে কি বিধাতা তার
গড়েনি হৃদয়?—

১০

—না না সে হৃদয়-হীন নহে
জানি আমি, খুলিয়া বলিব;
ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে, মানসে লুকায়ে সেবে,
আমি কেন দেবতারে
বাহিরে দেখিব?

১১

এ ধরা যে ধূলা মাটী ভরা,
হেথা বহে কলুষ বাতাস,
এখানে অমর মূর্ত্তি, পারে কি পাইতে স্ফূর্ত্তি,
নিত্য হেথা স্বার্থ, দ্বেষ,
বিষাদ, হতাশ!

১২

কে পাষাণ, চাহে ফুটাইতে
মরুদেশে স্বরগ-মন্দার ?
লেগে সে তপত বায়, কুসুম শুকায়ে যায়,
থাকে না পবিত্র ছটা
ত্রিদিব-শোভার !

১৩

তবে,
দেবতা কি প্রাপ্য নয়নের ?
তা হ'লে "দেবত্ব" আর কই ?—
মোর সে পরমারাধ্য, ইন্দ্রিয়ার্থে নহে সাধ্য,*
হয় না সে দেব-পূজা
মনে মনে বই !

১৪

এমনি মরত-তলে তারে
পূজি যেন জনমে জনমে ;
যদি সে মানুষ হয়, মর ব্যবহার লয়,
তা হ'লে যে ম'রে যাব
দারুণ সরমে।

১৫

অকলঙ্ক চন্দ্রমার মত,
বিরাজে সে সুদূর আকাশে,
আমি চকোরের মত, এ ভূতলে অনাহত।—
পোহাই তাহারি আলো
মনের উল্লাসে !

১৬

অপূর্ণ ও অশান্ত মানব,
শুদ্ধসত্ত্ব, সম্পূর্ণ দেবতা ;
সেই পদ করি ধ্যান, দুর্ব্বল, চঞ্চল প্রাণ,
দেব-বলে বলী হবে,
নাহিক অন্যথা ;
বিভুর আশীষে তবে, এ তপস্যা পূর্ণ হবে,
মুছি যাবে মরমের
লুকানো হীনতা !
তখন এ ক্ষুদ্র হিয়া, বিশ্বে দিব মিশাইয়া,
পাব অনাসক্ত ভক্তি, পাব পবিত্রতা,
পাব সে নির্ব্বাণ মুক্তি, আর অমরতা।†

বঙ্গমহিলা।

অর্থই অনর্থের মূল।

১

অর্থ স্বর্গ সুধার ন্যায় সঞ্জীবনী শক্তিতে নির্জ্জীব জগতের সজীবতা সম্পাদন করে, অনাথ অনাথার নয়নাশ্রু বিমোচন করিয়া হৃদয়ে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত চির-সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করে ; আবার বিষম হলাহল স্রোতে জগৎকে জর্জ্জরিত করে, পরম আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, সোদর সোদরার সস্নেহ মূর্ত্তি বিষময় করিয়া তুলে।

মাধবনগরনিবাসী গৌরীশ-চন্দ্রের পিতা

*সাধ্য—সাধনীয়।

† এই কবিতাটি আমার ব্রহ্মচারিণী ভগিনীদিগের হস্তে প্রীতি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।
লেখিকা।

স্বার্থবুদ্ধি হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি কয়েক বিঘা জমি ও তৈজস পত্রাদি আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় সহোদর জয়হরিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। জয়হরি ভ্রাতার সহিত বিবাদ করা ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া প্রথমে সস্ত্রীক গ্রামস্থ এক ধনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন; পরে উক্ত ধনী মহোদয়ের অর্থসাহায্যে ও স্বীয় কায়িক পরিশ্রমে পৈতৃক বাস্তুর এক অংশে সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিয়া যৎসামান্য বাণিজ্যের উপস্বত্বে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

হরিভূষণ পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া মনে করিয়াছিল, সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে ; কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রতি বিমুখ, সে অচিরেই পীড়াক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। পৈতৃক সম্পত্তির যে আয় ছিল, তাহাতে সাংসারিক ব্যয় সংকুলান ও পীড়ার চিকিৎসা এতদুভয় হওয়া অসম্ভব, সুতরাং উহা প্রথমে বন্ধক দেওয়া হইল, পরে বিক্রীত হইয়া গেল। তৈজস পত্রাদি যাহা কিছু ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে বিক্রীত হইতে লাগিল। হরিভূষণের কষ্টের অবধি রহিল না। কোন দিন আহার জুটিত, কোন দিন বা স্ত্রী পুত্র সহিত অনশনে দিন কাটিত। জয়হরি ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু হরিভূষণ যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। জয়হরি ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতার দুর্গতি-হরণার্থ ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উপযুক্ত ঔষধ পথ্য না পাওয়াতে হরিভূষণের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। পত্নী ও একমাত্র অপগণ্ড পুত্রকে দুঃখ দারিদ্র্যে নিমগ্ন করিয়া হরিভূষণ ইহলোক ত্যাগ করিল। হরিভূষণপত্নী নিঃস্ব—তাহার পরিধেয় বস্ত্র নাই, ক্ষুধার অন্ন নাই, কিন্তু তাহাতেও সে তত দুঃখিত নয়—তাহার ভয়, পাছে স্বীয় দেবরের নিকট নীচতা স্বীকার করিতে হয়, পাছে তাহার অন্ন জল গ্রহণ করিতে হয়। সন্তান সমস্ত দিন উপবাস করিত, তবুও সে জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী খাইত না বা গৌরীশকে খাইতে দিত না। এক দিন মাতার অমতে গৌরীশ জয়হরি-প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মাতার নিকট এরূপ প্রহারিত হয় যে, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহার পর সে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া বরং আম্র বা পেয়ারার পত্র চর্ব্বণ করিত, তবুও খুল্লতাত-প্রদত্ত কোন খাদ্য দিলে স্পর্শও করিত না।

২

গৌরীশের মাতা বড়ই কলহপ্রিয়া ও দাম্ভিকা, এই হেতু কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। কিন্তু নিরাশ্রয় বিধবা ও বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কষ্ট দূর করণাভিপ্রায়ে জয়হরির আশ্রয়দাতা মহাত্মা বৈদ্যনাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী গৌরীর মাকে আপনার বাটীতে পাচিকা রাখিবার

প্রস্তাব করেন। গৌরীর মা ইহাতে অগ্নি অবতার হইয়া বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে আসিয়া "আমি কি বুনিয়াদী ঘরের মেয়ে নই? আমার স্বামী কি হাভেতে লক্ষীছাড়া ছিল, তাই আমি রাঁধুনী থাকিব" এই বলিয়া তুমুল কন্দল আরম্ভ করিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী স্বভাবসুলভ মিষ্ট ও নম্র বাক্যে কহিলেন,—"দিদি! তুমি রাগ করিও না। তোমাকে রাঁধুনী থাকিতে কে বলিতে পারে? তবে কি জান—আমার শরীর বড় অসুস্থ, তাহাতে অরুচি। তোমার রন্ধন বড়ই চমৎকার, একবার মুখে দিলে আর ভুলিতে পারা যায় না, তাই বলিতেছিলাম যদি দয়া করে দুই এক দিন রসুই করিয়া দেও, তবে বড় উপকার হয়।"

গৌরীর মা ভাল পাক করে বা সে বেশ শিল্প কার্য্য জানে, এ কথা বলিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সে বলিল, তাই বল না কেন, আমার রান্নার যে না সুখ্যাতি করে, সে মানুষই নয়। আচ্ছা, কাল থেকে যতদিন না তোমার অসুখ সারিবে, আমি পাক করিয়া দিব।

একদিন দুদিন এক মাস দু মাস করিয়া এক বৎসর গৌরীর মা বৈদ্যনাথ বাবুর বাটীতে রন্ধন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী অতি সহিষ্ণু ও মিষ্টভাষিণী, তাই তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিতে পরিয়াছিলেন। গৌরীর মাও বিলক্ষণ সুবিধা বুঝিয়া—পরোপকার-ব্যপদেশে সপুত্রে নির্ব্বিঘ্নে বৈদ্যনাথ বাবুর অন্নে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু গৌরীর মা এ সুবিধা বেশী দিন ভোগ করিতে পারিল না। অসময়ে বৈদ্যনাথ বাবুর স্ত্রী গতাসু হইলেন। গৌরীর মারও অন্ন উঠিল। বাবুর বাটীর আর কাহারও সহিত তাহার বনিবনাও হইল না। কেবল দুবেলা ঝগড়া বচসা গালাগালি হয় দেখিয়া বৈদ্যনাথ বাবু গৌরীর মাকে বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে সংস্কার না হওয়াতে গৌরীর মার গৃহখানির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। চালে খড় না থাকায় বৃষ্টির জলে দেওয়ালের অধিকাংশ স্থান ধসিয়া গিয়া ঘরখানি পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, ইহার উপর আবার মুষিকে মৃত্তিকা তুলিয়া গৃহখানিকে একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়াছে। গৌরীর মা গৃহের দুরবস্থা দেখিয়া প্রথমে দেবরকে গালি দিতে লাগিল, পরে স্বীয় পিতৃবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

জয়হরি রোরুদ্যমানা ভ্রাতৃজায়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক তাহাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন। এই সময় হইতে দেবরের সহিত গৌরীর মার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল। জয়হরি ও তাঁহার পত্নী প্রাণপণে গৌরীর মার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন।

জয়হরি গৌরীশকে আপন পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। আপনি কষ্ট সহ্য করিয়াও ভাল খাদ্য সামগ্রী গৌরীশকে খাইতে দিতেন, আপনি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়াও গৌরীশকে ভাল কাপড় পরাইতেন, আপনি ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিতেন, কিন্তু গৌরীশের জন্য সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করিতেন। বস্তুতঃ যাহাতে গৌরীশের কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, তজ্জন্য জয়হরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। গৌরীশের বয়স ৮।৯ বৎসর হইল দেখিয়া জয়হরি তাহাকে গ্রাম্য পাঠশালে প্রেরণ করিলেন। গৌরীশ বেশ বুদ্ধিমান্, কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিল।

৩

মাধব নগরের জমিদার গোবিন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীসদয় বাবুর মাধব নগরস্থ নায়েব হরমোহন বাবু জয়হরি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরীশকে আপনার অধীনে একজন সামান্য মোহরার নিযুক্ত করিলেন। গৌরীশ নানা প্রকারে তোষামোদপ্রিয় নায়েবের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। একদিন উক্ত নায়েব গৌরীশকে কহিলেন, "তুমি জামিন দিতে পারিলে আমি তোমাকে তহশীলদারী কার্য্য দিতাম।"

গৌরীশ এই কথা স্বীয় খুল্লতাতের নিকট ব্যক্ত করিল। গৌরীশ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাবী উন্নতির আশায় পরম পুলকিত হইয়া উক্ত নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমার স্বোপার্জ্জিত যে সামান্য বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা জামিন দিলে যদি গৌরীশের চাকরী হয়, তবে আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। হরমোহন বাবু জয়হরির বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখিয়া গৌরীশকে তহশীলদারী কর্ম্ম দিলেন।

গৌরীশ বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। আপনি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক মাতাপুত্রে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। জয়হরি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এক সুন্দরী পাত্রীর সহিত গৌরীশের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। যথাকালে বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে জয়হরির সহিত গৌরীশ ও তাহার মাতার বাক্যালাপ বন্ধ হইল।

জয়হরি যে গরীব তাহাই রহিলেন, কিন্তু গৌরীশ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। হরমোহন বাবু বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হওয়াতে কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। গৌরীশ সুযোগ বুঝিয়া লক্ষ্মীসদয় বাবুর সদর কাছারির প্রধান কর্ম্মচারীকে যথেষ্ট উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক মাধব নগরের নায়েবী পদ গ্রহণ করিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে জমিদারের নায়েব মফঃস্বলের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল। এক্ষণকার মত পুলিশের সুবন্দোবস্ত না থাকায় জমিদারের কর্ম্মচারিগণ নিরীহ প্রজাগণের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত।

৪

নায়েবীপদ প্রাপ্ত হইয়া গৌরীশ চন্দ্রের অর্থলালসা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান তাহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল। প্রজাদিগের দেয় খাজনা একবারের পরিবর্ত্তে পাঁচবার আদায় করিয়া লইয়াও আবার তাহার জমি জমা বাস্তবাটী প্রভৃতি বাকী খাজনার দায়ে বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিল। প্রজাগণ তাহার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু গৌরীশ একে দুষ্টবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়, তাহাতে আবার অর্থবান্ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে দণ্ডিত করিতে গিয়া অনেক সরলবুদ্ধি নিরীহ প্রজা আপনারাই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া আসিল। কোন কোন প্রজা তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মাধব নগর পরিত্যাগ করিল, কেহ জমি জমা বিক্রয় করিয়া তাহার সহিত নিঃসম্পর্ক হইল, কেহ বা অনন্যোপায় হইয়া ঈশ্বরকে জানাইয়া তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল।

গৌরীশ চন্দ্রের মাটির ঘরের পরিবর্ত্তে সুন্দর ইষ্টকালয় হইয়াছে, প্রচুর অর্থ সামর্থ্য হইয়াছে, লোকসমাজে বিলক্ষণ সম্ভ্রমও হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাহার মনে শান্তি নাই। অশান্তির একমাত্র কারণ,—জয়হরি আজিও গতাসু হয় নাই। জয়হরির অবস্থা নিতান্ত মন্দ, তাঁহার মাটীর ঘর, তিনি যার তার সহিত মিশিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কন; এই সকল কারণে গৌরীশ তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকা দূরে থাকুক, আদৌ তাঁহার সহিত কথা কহিত না। জয়হরি তাহার খুড়া, এ কথা কেহ বলিলে গৌরীশ তাহার উপর অন্তরের সহিত বিরক্ত হইত। জয়হরি মৃত বা দেশান্তরিত না হইলে স্বীয় ভূতপূর্ব্ব দুঃখ দারিদ্র্যের কথা লোকের মন হইতে অন্তর্হিত হইবে না, স্থির করিয়া গৌরীশ তাহাকে মাধব নগর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য স্থিরসংকল্প হইল। গৌরীশের আজ্ঞামতে কয়েকজন দুষ্ট লোক আসিয়া জয়হরির গৃহের একখানি চাল কাটিয়া দিল। জয়হরি প্রথমে নিবারণ করিল, পরে অনেক অনুনয় বিনয় করিল; কিন্তু কিছুতেই তাহারা চাল কাটিতে নিরস্ত হইল না। তাহারা বলিল,—বাবুর (গৌরীশের) পথ চলিবার অসুবিধা হয়, তাই চাল কাটিয়া দিলাম।

গৌরীশের এই অন্যায় আচরণের কথা তাহার মাতাকে জ্ঞাত করিবার জন্য জয়হরি গৌরীশের অট্টালিকায় পদার্পণ করিল। গৌরীশ-পত্নী বৃদ্ধকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, —"বুড় শাণের মেজেতে উঠলি কেন, খুর পিছলে যে পড়ে যাবি।" জয়হরি বধূর এই বিদ্রূপবাক্যে যুগপৎ বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি ব্যথিতস্বরে কহিলেন, "বাছা, তোমার কথা ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত নয়। আমি না তোমার শ্বশুর!"

গৌরীশের মাতা নিকটেই ছিল। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সে রোষ-কষায়িত স্বরে কহিতে লাগিল, "কি! আমার বৌ ভদ্রলোকের মেয়ে নয়। তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, যা মুখে আসে তাই বলিস্। লক্ষ্মীছাড়া হাভেতে, আমার বাড়ী থেকে দূর হ, তোরে দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়।"

জয়হরি বড় আশা করিয়াছিলেন গৌরীশের মাতার কাছে কিছু না কিছু সান্ত্বনা পাইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকতর বিমর্ষ ও ব্যথিত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

৫

গৌরীশ প্রতিদিনের ন্যায় বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কাছারি হইতে বাটী আসিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মুখে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতেছে। গৌরীশকে দেখিয়া তাহার মাতা সক্রোধে কহিতে লাগিল,—"আমরা আর এ বাটীতে থাকিতে পারিব না। তুমি যা হয় বন্দোবস্ত কর।" গৌরীশ ব্যগ্রভাবে কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে গৌরীশ-জননী সজলনয়নে কহিল, "হা! অদৃষ্ট আমার! আমার বৌমাকে যে সে যা তা বলিবে! এর চেয়ে আমার মরণ ভাল। ঐ জয়হরে বুড় আজ আমার বাড়ী এসে বৌমাকে কি না বলে গেল! অজেতের মেয়ে, অসৎ বংশ, লক্ষ্মীছাড়া, আর কত কি বল্‌লে—সব মনে হয় না। এমন কি মারিতেও উদ্যত। এর কোন ব্যবস্থা কর ত ভালই, নচেৎ আমরা শ্বাশুড়ী বৌ গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

গৌরীশের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বাবু রাগান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে কাছারিতে গেল। গৌরীশের মূর্ত্তি দেখিয়া কাছারির সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল, না জানি আজি কার সর্ব্বনাশ হয়! বাবু মছলন্দে উপবিষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়াবস্থার একমাত্র রক্ষক জয়হরিকে কান ধরিয়া কাছারিতে আনিবার আজ্ঞা প্রদান করিল। দুইজন দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ধরিয়া বাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিল। জয়হরিকে দেখিবামাত্র গৌরীশ হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া পঞ্চাশৎ পাদুকা প্রহারের আজ্ঞা দিল।

জয়হরি, যে গৌরীশ চন্দ্রকে অন্তরের সহিত স্নেহ করেন, যাহার মঙ্গলের জন্য সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করেন, যাহার সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন, সস্ত্রীক উদর জ্বালা সহ্য করিয়াও কষ্টোপার্জ্জিত অন্ন পানীয়ে যাহার জীবন রক্ষা ও দেহপুষ্টিসাধন করিয়াছেন, পৌষের দুরন্ত শীত ও ভাদ্রের প্রবল ধারা অক্লেশে সহ্য করিয়াও যাহাকে সুবেশ ভূষায় সুশোভিত করিতেন, অদ্য সেই গৌরীশ চন্দ্র তাঁহাকে পাদুকা প্রহারের অনুমতি করিল!

পড়িলে, আমাদিগের খাতার লাভ কিছু-মাত্র দাঁড়ায় না—ঋণ ও লোকসানের অঙ্কেই খাতা ভরিয়া যায়। রহস্যের ব্যাপার এই যে, আমরা নিজে খতাইতে গেলে সে লোকসানের অঙ্কটা প্রায়ই দেখিতে পাই না। নিজের ব্যাপরে ত নয়ই—কদাচিৎ পরের ব্যাপারে এ কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া আসিতেছে, অথচ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না, তাহাকে কি প্রকৃত ব্যাপারী বলিতে পারা যায়? তাই বলিতেছিলাম, এ ভবের বাজারে আমরা সকলেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত বটে, কিন্তু অনেকেই প্রকৃত ব্যাপারী নহি।

সুখদুঃখের হিসাব বড় শক্ত ব্যাপার—অথচ আমরা প্রত্যেকেই তাহা রাতদিন খতাইতেছি। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনবান্, মধ্যবিধ, দরিদ্র, কে না এই হিসাব খতাইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? সকলেই খতাইতেছি, সকলকেই খতাইতেও হয়, কিন্তু খতাইতে ভাল করিয়া কেহ শিখিতে পারিতেছি না। শিখিবই বা কিরূপে? ইহাত লেখা পড়ার কাজ নহে যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই দশ পনর টাকায় রাশি রাশি গ্রাজুয়েট, পণ্ডিত বা মুন্সী আসিয়া হাজির হইবে। এ শিক্ষার গুরু অতি কম মিলে—এ ব্যাপারে পরিপক্ক অতি কম লোকই দেখিতে পাই। আর যদিই বা গুরু পাইতে পারি, আমরা পাইতে যে চাহি না। সকলেই মনে করি, আমরা এ হিসাবে পাকা হইয়াছি—পরের কাছে এ হিসাব যে প্রাণান্তেও শিখিতে চাহি না, তাই গুরু থাকিতেও গুরুকে বরণ করিবার ইচ্ছার অভাবে এ শিক্ষা আমরা পাইতে পারিতেছি না। এমন একটা প্রধান বিষয়ের শিক্ষায় লোকে এমন উদাসীন—এ একটা বিশেষ রহস্যের ব্যাপার বটে। সম্প্রদায়বিশেষ ইহাকেই "অবিদ্যা"—বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যেমন বাজারের পণ্য দ্রব্যের, তেমনই এই সুখদুঃখের নানা প্রকার শ্রেণী আছে। যেমন আম. কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি সকলই ফল বটে, কিন্তু একজাতীয় ফল নহে, যেমন ল্যাংড়া,ফজলি, বোম্বাই, দেশী সকলেই আম বটে, কিন্তু এক রকমের আম নহে—সেইরূপ এক সুখ-দুঃখ কথার মধ্যে নানা প্রকার জাতি আছে—আবার এক জাতির মধ্যেই নানাপ্রকার 'রকম' আছে। যিনি আম কাঁঠালের বিভিন্নতা জানেন না, যিনি ল্যাংড়া, ফজলীর বিভিন্নতা বুঝেন না, তিনি কি ফলের কারবারে লাভবান্ হইতে পারেন? হয়ত দুই আনার কাঁঠালটীকে তিনি এক টাকা মূল্যের আমের সহিত বিনিময় করিলেন—হয়ত তিনি একটা দেশী টক আম পাইয়া একটা সুমিষ্ট বোম্বাই আম হারাইলেন। এমন করিয়া কি ব্যাপার চলে? আম কাঁঠালের তত্ত্ব আমরা অল্পাধিক সকলেই জানি বলিয়া, এমন ভুল হয় না সত্য, কিন্তু সুখদুঃখের ব্যাপারে এ ঘটনা অনুক্ষণই ঘটিতেছে। এ ব্যাপারে

কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাঁচ কয়জন না পাইতেছে? অমৃত উদ্গিরণ করিয়া কয়জন না হলাহল পান করিতেছেন! তাই বলিতেছিলাম, বড়ই শক্ত ব্যাপার এই সুখদুঃখের হিসাব খতান—বড়ই কঠিন কার্য্য এই লাভ লোকসানের নিকাশ করা।

সুখ-দুঃখের প্রকৃতি অতীব কঠিন। যিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই সংসারে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। যাহাকে আমরা 'পদস্খলন' বলিয়া থাকি, তাহার মূলে এই সুখদুঃখের প্রকৃতি বিষয়ক অনভিজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। সুখ ও দুঃখটাকে চিনিতে না পারাই লোকের প্রকৃত পতনের কারণ।

প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই সুখদুঃখের কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুখদুঃখের হিসাবে পরিপক্ক হইবার জন্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করায় হানি নাই। গীতার প্রামাণিকতা নাই বা মানিলাম, কথাগুলি যদি ভাল হয়, তাহা শুনিতে দোষ কি?

গীতাকার সুখকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) সাত্বিক, (২) রাজস, (৩) তামস। ক্রমান্বয়ে তাহার লক্ষণগুলি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাহা অগ্রে বিষতুল্য, পরিণামে অমৃত সদৃশ, আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ, সেই সুখকে 'সাত্বিক' সুখ বলে।"

"বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে উৎপন্ন, অগ্রে অমৃতোপম পরে বিষসদৃশ যে সুখ, তাহাকে রাজস সুখ বলে।"

"যাহার অগ্র ও অনুবন্ধ মোহজনক, নিদ্রালস্য প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখকে 'তামস' সুখ বলে।"

ইহাতে দেখিতে পাইতেছি গীতাকার দুই প্রকার অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিবিধ ভাগ করিয়াছেন।

(১) সুখপ্রাপ্তির পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ভাব।
(২) সুখের উৎপত্তিস্থল।

প্রথম হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাত্বিক সুখে অগ্রে কষ্ট, পরে সুখ; রাজস সুখে অগ্রে সুখ পরে কষ্ট; তামস সুখের অগ্রে মোহ, পরেও মোহ। দ্বিতীয় হিসাবে তিনি দেখাইয়াছেন, সাত্বিক সুখের উৎপত্তি আত্মবুদ্ধি হইতে, রাজস সুখের উৎপত্তি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে; তামস সুখের উৎপত্তি আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি হইতে।

এই সকল লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গেলে, একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

যিনি ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ, তিনি দুই চারি দিন কারবার করিয়াই সুখদুঃখের এই লক্ষণগুলি চিনিতে পারেন। চিনিয়া তিনি যথাসাধ্য রাজস ও তামস লক্ষণাক্রান্ত সুখগুলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাত্বিক লক্ষণাক্রান্ত সুখটীই বেশী আমদানী করিতে চেষ্টা করেন। এই আমদানি রপ্তানি ব্যাপারে আরও একটা রহস্য আছে। গুদাম প্রায়ই খালি রাখা যায় না।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রহস্যের ব্যাপার

এই যে, এইরূপ সাত্ত্বিক সুখের বেশী আমদানী করিতে করিতে, পরিপক্ক ব্যাপারী শেষে দেখিতে পান যে, রাজস ও তামস সুখের আমদানী অপেক্ষা সাত্ত্বিক সুখের আমদানী বেশী লাভজনক বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহার সকল দ্রব্যেই লোকসান দিতে হয়। খতাইয়া খতাইয়া যখন তিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তখন তিনি গুদাম একবারে বন্ধ করিয়া দেন—আর কোন প্রকার আমদানি রপ্তানির ধার ধারেন না। ক্রমে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মহাজন হইয়া পড়েন।

তাই বলিতেছিলাম যে, এ সুখ দুঃখের লাভ লোকসানটা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সুখটাকেই যদি লাভজনক দ্রব্য ধরা যায়, এবং দুঃখটাকেই যদি লোকসানের মধ্যে ধরা যায়, তথাপি দেখিতে পাই যে, সব দ্রব্যেই কিছু না কিছু লোকসান দিতে হয়। যে সুখের লক্ষণ দেখিলাম, তাহা ত দুঃখ ছাড়া নহে—বিবেচনা করিয়া দেখিলেও ত সুখের ভাগ নহে দুঃখেরই ভাগ—উহাতে সুখের লক্ষণ নাই, দুঃখেরই লক্ষণ। কিন্তু এ ত কথাতেই বুঝিতেছি। আমাদের এ সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস কই? এ বিশ্বাস যে দিন হইবে, সেই দিন একবারে এ ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া প্রকৃত ব্যাপারী হইতে পারিব। নতুবা যেমন করিয়া আমরা সুখ দুঃখের হিসাবটা খতাইতেছি, এমন করিয়া খতাইয়া যুগযুগান্ত কারবার করিলেও, আমরা প্রকৃত মহাজন হইতে পারিব না। তাই বলিতেছিলাম, সুখ দুঃখের হিসাবটা একটু ভাল করিয়া খতাইতে শিখিলে হয় না?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

রত্নমালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদিন শুক্লা রজনীর প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নায় বসিয়া সেফালি চিন্তা করিতেছিল। যদিও রজনীর শৈত্য আর শীতল শিশিরবিন্দুনিচয় তাহাকে স্নিগ্ধ করিতেছিল, তথাপিও তাহার নির্ম্মল ললাট-ফলকে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল মুক্তা-ফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। আজ তাহার পাণ্ডুমুখ উজ্জ্বল, মলিন নেত্র-পদ্ম বিস্ফারিত, হৃদয়ের সমুদয় শিথিল ভাব উচ্ছ্বসিত। সে আজ অজস্র অশ্রুজলে হৃদয়ের দুর্ব্বহ দুঃখভার প্রশমিত করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সহসা কে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল "সেফালি"! সেফালি মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

সম্মুখে সেই সন্ন্যাসী—একটা তড়িৎপ্রবাহ তাহার হৃদয় কম্পিত করিয়া তখনই চলিয়া গেল। তাহার সেই বিষণ্ণ ভাবের মধ্য দিয়া তাহার সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরে গিয়া নিপতিত হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন "সেফালি! চল, তেজকুমার তোমার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছেন।" সেফালি যেন নিজের অজ্ঞাতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তেজকুমারের নিকট দাঁড়াইল।

তেজকুমার কহিল "সেফালি! হরিবোলের পুত্র আবার আমাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছে, অতএব আবার আমাদিগকে দেশে যাইতে হইতেছে। সেফালির আরক্ত কপোল আরও রক্তাভ হইল। সে কষ্টে উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া অর্দ্ধ-স্ফুরিত-স্বরে কহিল "যাইব, কিন্তু সে পূর্ব্বের ভাব কোথায়?"

সাশ্রুনয়নে তেজকুমার কহিল—আর নাই—এ জীবনে আর সে সময় ফিরিবে না। বৃদ্ধ পিতার সেই শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভ্রাতা ভগ্নীর প্রাণ ফাটিতেছিল। তেজকুমার ও সেফালি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আপনাদের পূর্ব্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। হরিবোলের মৃত্যু হইয়াছে। জমীদার মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন।

তেজকুমারের পিতা জমীদারের নিকট হইতে ঋণস্বরূপ যে অগ্রিম অর্থ লইয়াছিলেন, জমীদার মরিবার সময় সে সমুদায় মাপ করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, তাঁহার ভূমি তেজকুমারকে চিরকালের জন্য বাস করিতে দিয়া গিয়াছেন।

হরিবোলও সেইরূপ করিয়াছে। আপনার গচ্ছিত ধনের অর্দ্ধাংশ তেজকুমারের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছে। তেজকুমার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মুকুলকে জিজ্ঞাসা করিল "একি?" অবনতমস্তকে মুকুল কহিল "যাহা দেখিতেছ তাহাই, অধিক আর কি?"

তেজ। তাহাদের হঠাৎ এত পরিবর্ত্তন কিসে হইল?

মুকুল। আমার অনুরোধে।

তেজ। সে মোকদ্দমার কি হইল?

মুকুল। আমি সে মোকদ্দমা করিতে দিই নাই। আপনারা মাঝে মাঝে যে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসীই আমি।

তখন সেফালির কথা তেজকুমারের স্মরণ হইল। সে বুঝিল মুকুল নিরুদ্দেশ হইয়া যথার্থই নিশ্চেষ্ট ছিল না, তাহাদের জন্য অনেক সময় দিয়াছে।

একদিন জ্যোৎস্না-প্রদীপ্ত মধুর কাননছায়াতলে মুকুল প্রস্তরাসনে অর্দ্ধ-শয়ানাবস্থায়, আর সেফালি এক অদূর শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট।

মুকুল কহিল "সেফালি!" সেফালির অশ্রুহীন-চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি মুকুলের অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিমিলিত হইল। মুকুল আবার ডাকিল "সেফালি"। সে সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া সেফালির সমস্ত প্রকৃতি ম্রিয়মাণ

হইয়াছে। মুমূর্ষু পিতার সে দৃঢ়স্বর সেফালির মনে বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। সে আর মুকুলকে কিছু বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে অঞ্চলে চক্ষু আবরণ করিয়া রহিল। সেফালির পিতার শেষ আজ্ঞা মুকুলের মনেও স্পষ্টরূপে জাগরূক ছিল। সে করুণকণ্ঠে কহিল "সেফালি, স্বর্গে উঠিয়া আবার নিপতিত হওয়া বড় কষ্টকর। তোমাকে পাইব বলিয়া কত না আশা ছিল, কিন্তু সে প্রাণভরা আশা ভরসা তীব্র নিরাশার গভীর কূপে নিমজ্জিত হইল। কালের কি চঞ্চল ভাব! সেফালি! একবার তুমি কথা বল, আমার ভগ্ন প্রাণে বল সঞ্চারিত হোক, এ যন্ত্রণা অসহ্য।" মুকুলের সেই করুণ কণ্ঠস্বর, সেই মর্ম্মোত্থিত কাতর বাণী মুহূর্ত্তকালের জন্য সেফালিকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল, সেফালি ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সংযত হইয়া কহিল "কি আর কহিব? তুমি অনেকানেক বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ, তোমাকে আর কি কহিব? এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমাদের উভয়ের এই সুন্দর ব্যবধান পরলোকের অনন্ত মিলনের কথা কহিয়া দিতেছে।"

মুকুল ক্ষত বিক্ষত শোণিতাক্ত হৃদয়ে কহিল "পরকাল সে দূর ভবিষ্যতের কথা, সে দূরবস্তু দর্শনে মানব চির-অন্ধ।"

সেফালি তখন মধুর বাক্যে মুকুলকে অনেক বুঝাইল। সেফালির তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুলের মনের প্রনষ্ট বল পুনরুজ্জীবিত হইল। মুকুল বুঝিল, এ জগৎ নশ্বর—এ জীবন নশ্বর; সেফালিকে পিতার আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে, নচেৎ ঘোর অধর্ম্ম হইবে—অধর্ম্মে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, আর ধর্ম্মপথে সুখ সুনিশ্চিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তেজকুমার হরিবোল-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিল, কিন্তু নিজের জন্য নহে, সে সমুদায় ধনই পরের সেবার জন্য ব্যয়িত হইল। তেজকুমার যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল—শ্রদ্ধার সহিত চিরজীবন সুভগাকেই পূজা করিয়া কাটাইল, আর কখনও দার-পরিগ্রহ করিল না। আর মুকুল কি করিল—মুকুল পিতার ধন সম্পত্তি সমুদায় ভগ্নীর নামে লিখিয়া দিয়া নিজে উদাসীনের ন্যায় দেশত্যাগ করিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা চিরকালের মত আমিত্বহীন ভাবে অণু-পরমাণুবৎ অনন্ত জগতের মধ্যে লুকাইয়া থাকিবে।

সেফালিরও তাহাই সঙ্কল্প—সে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল এবং চিরজীবন ভ্রাতার আশ্রয়েই কাটাইয়াছিল। কিন্তু দেশের সমস্ত স্থানে ভগিনী ডোরা হইতে তাহার পদমর্য্যাদা ন্যূন ছিল না। তাহার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় শ্রুত হইয়া আর কেহই তাহাকে বিবাহের

জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। আর সুভগার কি হইল?—তেজকুমার ফিরিয়া আসিলে কিছুদিন পরে তাহার মাতা পরলোকগত হইল। তাহার পর হইতে কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু স্বদেশবাসী পরিচিত লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কামাখ্যাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় একটি নির্ঝর-মুখরিত পর্ব্বতগুহায় একটী রমণীর কণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীতটী শুনিয়াছিল—

"সংসার অনলে, তাপিত হইয়ে,
এলাম শান্তি-নিকেতনে,
আমায় দাও শান্তিবারি, সে তাপ নিবারি,
শীতল করি আজ পাপজীবনে।
বিষয় বাসনা আশায়, ভুলায়ে তোমায়;
রাখে সদা নানা প্রলোভনে,
জান্‌লাম অনিত্য সংসার, তুমি সারাৎসার,
দেখা দাও সন্তানের হৃদাসনে।
নিজ-দাসের অভিলাষ, পূরাও স্ব-প্রকাশ,
প্রকাশ হয়ে একবার হৃদি ভবনে।
আমি অনুতাপাঞ্জলি, ধর পিতা বলি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে।" *

সকলেই সে রমণীকে দেখিত, কাহারও কাহারও আবার সেই গুহাবাসিনী বিদেশিনীকে সুভগা বলিয়া ভ্রম হইত।

অম্বুজা।

বশিষ্ঠ শিষ্য সংবাদ।

শিষ্য। দীর্ঘ রোগ কি?
বশিষ্ঠ। ভবব্যাধি।
শি। ইহার ঔষধ কি?
ব। সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ব বিচার।
শি। সকল ভূষণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কি?
ব। শীলতা।
শি। তীর্থ কি?
ব। বিশুদ্ধ মন।
শি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় কি?
ব। সৎসঙ্গ, ইন্দ্রিয়দমন, তত্ত্ববিচার ও সন্তোষ।
শি। সাধু কাহারা?
ব। অখিলভোগবাসনাত্যাগী মোহবিকার-হীন শিবতত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ।
শি। প্রাণীদিগের জ্বর কি?
ব। চিন্তা।
শি। মূর্খ কে?
ব। নির্ব্বিবেক ব্যক্তি।
শি। আমার কর্ত্তব্য কি?
ব। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরে ভক্তি।
শি। বিদ্যা কি?
ব। যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে।
শি। বোধ কি?
ব। যাহা মুক্তির হেতু।

* ব্রহ্মসঙ্গীত।

শি। লাভ কি ?

ব। আত্ম-স্বার্থত্যাগ।

শি। জগৎকে কে জয় করিয়াছে ?

ব। যে আপনার মনকে জয় করিয়াছে।

শি। সর্ব্বদা দুঃখী কে ?

ব। বিষয়ানুরাগী।

শি। কে ধন্য ?

ব। যিনি সর্ব্বদা পরোপকারে রত।

শি। সংসার মূল কি ?

ব। অবিদ্যা।

শি। দিব্য ব্রত কি ?

ব। সম্পূর্ণ দৈন্য ব্রত।

শি। প্রাণীদিগের পক্ষে দুস্ত্যাজ্য কি ?

ব। দুরাশা।

শি। পৃথিবীতে পশু কাহারা ?

ব। যাহারা বিদ্যাহীন।

শি। কাহাদের সহিত সঙ্গ অকর্ত্তব্য ?

ব। মূর্খ, পাপিষ্ঠ, খল ও নীচ যাহারা।

শি। মুক্তিপ্রার্থীদিগের ত্বরিত কর্ত্তব্য কি ?

ব। সৎসঙ্গ, ঈশ্বরভক্তি এবং সংসারে নির্ম্মমতা।

(ক্রমশঃ)

লবঙ্গলতা।

(চরিত্র-সমালোচন)

বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী" উপন্যাসখানি পাঠকালে পাঠকের মন এক সদানন্দময়ী গৃহিণীর চিত্রদর্শনে মোহিত হয়। সে চিত্র লবঙ্গলতার। লবঙ্গলতার মাধুরিতে আমরা হঠাৎ যতদূর আকৃষ্ট হই, গভীরতর প্রণয়ের বিচিত্র চিত্র "রজনীতে" ততটা হই না। বিচিত্রসৌন্দর্য্যশালিনী চিরানন্দময়ী লবঙ্গের চরিত্র আলোচনা করিতেও মনে এক প্রকার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

প্রণয়বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র প্রদর্শনার্থই বঙ্কিম বাবুর আখ্যায়িকাগুলির সৃষ্টি। প্রণয়ের জন্য-ভোগলালসা-বিবর্জিত উৎকৃষ্টতম চিত্রগুলিই বঙ্কিম বাবুর লক্ষ্য। "চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জনে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলে।" ইহাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণয়ের সংজ্ঞা। এই ভালবাসা-তুলিতে তাঁহার লবঙ্গচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

লবঙ্গ বহুমূর্ত্তিময়ী। লবঙ্গ গৃহিণী, জননী, লবঙ্গ সুরসিকা, লবঙ্গ দাতা, লবঙ্গ সুচতুর। আমরা একবার অন্ধ পুষ্পনারীর কথায় লবঙ্গের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

"রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর, ললিত-লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের

আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। * * শুনিয়াছি তিনি রূপসী। তা রূপ যাউক—গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটী এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহ তুল্য সেই বৃদ্ধ স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি ? আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন, মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রাগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত, লবঙ্গলতা তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চস্‌মাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গ আমাদের ফুল কিনিত। চারি আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত 'এমন কদর্য্য মালা আমায় দিস কেন ?' কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত ; ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত 'ও আমার টাকা নয়।' দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। * * * সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল—দর্পণের মত দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত।"

এই পরিচয়েই লবঙ্গচরিত্র বোঝা যায়। বহুমূর্ত্তিময়ী লবঙ্গের আর এক প্রধান মূর্ত্তি আছে—সেটী তিনি প্রেমিকা ! এই সকলের মূলে তাঁহার সেই অকপট ভালবাসা, তাই লবঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রেমিকা !

বাস্তবিক "শৈশবের ভালবাসায় একটা অভিশাপ আছে।" লবঙ্গ শৈশবে অমরনাথকে ভালবাসিতেন, সেই ভালবাসা কিন্তু সফল হইল না ; অমরনাথের সহিত বিবাহ না হইয়া বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। শৈবলিনী শৈশব-সখা প্রতাপের জন্য কুলত্যাগিনী পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর লবঙ্গ অমরনাথের কথা মুখে আনিলেন না—বরং এক সময়ে অমরনাথকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন।

ভালবাসা যে কি, লবঙ্গ তাহা বেশ জানিতেন, আর প্রকৃত মহত্ত্ব যে কিসে, লবঙ্গ তাহাও বুঝিতেন। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া,নিজ সুখের আশা পর্য্যন্তও পদদলিত করিয়া অপরের সুখবর্দ্ধনের জন্য আত্মত্যাগে যে কি সুখ, লবঙ্গ তাহা জানিতেন। তাই তিনি শৈশবের মোহময় প্রণয় হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া কঠিন পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া শৈশব-সখাকে ভুলিয়া, কর্ত্তব্যস্রোতে ধর্ম্মপথে গা ঢালিতে পারিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর-প্রথা-বিবর্জ্জিত প্রদেশে লবঙ্গের ন্যায় রমণীরত্ন বড়ই আদরের সামগ্রী এবং সর্ব্বতোভাবে আদর্শ-চরিত্র। যে বৃত্তি শৈবলিনীকে পরাস্ত করিয়াছিল, অমানুষিক হৃদয়বলে—ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্য্যে লবঙ্গ সেই বৃত্তিকে পদদলিতা দাসীর ন্যায় করিয়াছিলেন।

লবঙ্গলতা নিষ্কাম প্রণয়ের প্রতিকৃতি, আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত! শৈশবের সুখ-পূর্ণ প্রণয় পদদলিত করিয়া, ভোগে-চ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া, পিতামহ তুল্য বৃদ্ধ স্বামী লইয়া সুখী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে। সেই প্রতাপ আর এই লবঙ্গ। দুইটীই যেন এক বৃন্তের দুটী ফুল, সাহিত্য কানন আলো করিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে।

ঘাত প্রতিঘাতে লবঙ্গ-হৃদয়ের প্রণয় খুলিবার তত অবসর পায় নাই। কিন্তু সেই আনন্দ-প্রস্রবণ হৃদয়খানির মাঝে একখানি কালো বিষাদ-মেঘের অস্পষ্ট ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। সেই "কাণি, তুই ভালবাসার কি জানিস্? তুমি লবঙ্গলতা অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী"এই কথাগুলির মধ্যে লবঙ্গের হৃদয়-নিহিত প্রচ্ছন্ন বিষাদ ব্যক্ত হইয়াছে।

লবঙ্গলতা অমরনাথকে ভালবাসিতেন, তবে স্বহস্তে তাঁহাকে এমন শাস্তি দিলেন কেন? আমরা বলি এই শাস্তি-প্রদানেও লবঙ্গের অমরনাথের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা এবং গূঢ় ধর্ম্মানুরাগ পরিব্যক্ত হইতেছে। (১)*। আমার ভালবাসার পাত্র যে সামান্য বিরহযন্ত্রণায় অধীর ও ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া আমাকে পাইবার জন্য পাপ কার্য্য করিতে যাইবেন এবং কলুষিতচরিত্র হইবেন ইহা প্রকৃত প্রেমিকের অসহ্য। বিশেষতঃ নিজের ভালবাসার পাত্রকে অপরের দ্বারা দণ্ডিত করিতে রমণী প্রাণ থাকিতে পারে না। আর এই শাস্তি দ্বারা লবঙ্গ অমরনাথকে স্বীয় প্রকৃতি চিনাইয়া দিলেন, সেই গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রতিজ্ঞার ন্যায় পরস্পরের মন ফিরাইলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে মনকে দ্বিগুণ দৃঢ়তার সহিত নিযুক্ত করিলেন। প্রতিভাশালী কবি বড়ই কৌশলে এই শাস্তি ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন।

লবঙ্গ অমরনাথকে কতদূর পর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অমরের নিকট হইতে রজনী কাড়িবার ব্যাপারে

(১) এখানে সেই পতিপ্রাণা হিন্দু-পত্নী "ভ্রমরকে" মনে পড়ে।

প্রকাশিত। চিরদগ্ধ হৃদয় জুড়াইবার আশায় অভাগা অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। "চিরকাল যে অন্ধকারময় গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সে যদি চন্দ্রকিরণ-সমুজ্জ্বল তরু-পল্লব-কুসুম-শোভিত মনুষ্যলোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ" অমর-নাথ সেই আনন্দ উপভোগ করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু লবঙ্গ তাহাতেও বাদ সাধিলেন। অমরনাথ সুখী হইলে লবঙ্গের কত সুখ! কিন্তু লবঙ্গ সে সুখ অগ্রাহ্য করিলেন। অমরনাথ অপেক্ষা শচীন্দ্র এখন ধর্ম্মতঃ তাঁহার আপনার। শচীন্দ্র তাঁহার স্নেহের সপত্নীপুত্র। শচীন্দ্রের মঙ্গল তাঁহার অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয়। শচীন্দ্রের রক্ষার উপায় বিধান তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। তাই তিনি অমরনাথকে চির অসুখী করিয়া, রজনী কাড়িয়া লইয়া শচীন্দ্রের সহিত বিবাহ দিলেন। কর্ত্তব্যের শাণিত ছুরিকায় আত্মসুখের চরম আশা পর্য্যন্তও ছেদন করিলেন।

শৈশবের ভালবাসায় বাধা পাইয়া লবঙ্গের প্রেম একপ্রকার বিশ্বব্যাপিনী হইয়াছিল। ক্ষুদ্র স্রোতোমুখে বাধা পড়িলে স্রোতের জল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবেই লবঙ্গ পাকা গৃহিণী। সংসারের সকলকে স্নেহ করিতে না জানিলে প্রশংসা নাই। লবঙ্গ স্নেহময়ী জননী; শচীন্দ্রের পীড়ার সময় লবঙ্গের মুখে "আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।"—এ প্রকার কথাও সেই বিশ্বব্যাপিনী ভালবাসা প্রণোদিত। বৃদ্ধ স্বামীকে প্রফুল্লিত ও সুখী করিবার জন্য লবঙ্গের যে রসিকতা, তাহারও মূল—এই ভালবাসা। লবঙ্গ যে দয়াময়ী পরোপকারিণী, তাহাও এই বিশ্ব-ব্যাপিনী ভালবাসা প্রভাবে। অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর ন্যায় লবঙ্গের হৃদয়ে ভালবাসা স্রোত প্রবাহিত। সেই জন্যই বলিতেছি, প্রণয়বৃত্তিই লবঙ্গচরিত্রের মেরুদণ্ড।

বঙ্কিম বাবুর প্রধান লক্ষ্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চরিত্র চিত্রণ করা। তাই এক এক স্থলে লবঙ্গচরিত্র বুঝিতে আমাদিগকে একটু ভাবিতে হয়। লবঙ্গ যতই হৃদয় কঠিন করুন না কেন, তিনি মানবী। সাধারণ রমণীর অতিরিক্ত অনেক মানসিক বৃত্তির বিকাশ তাঁহাতে আছে বটে, কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিক মনোভাব দ্বারা সুন্দররূপে নিয়ন্ত্রিত।" এ প্রকার সামঞ্জস্য অসামান্য শিল্পকারের অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয়!

আমরা এখানে লবঙ্গ ও অমরনাথের বিদায়-দৃশ্যটি উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই দৃশ্যে লবঙ্গের হৃদয় যেমন ফুটিয়াছে —সমগ্র লবঙ্গচরিত্র এই দৃশ্যে যেমন পরিষ্কার হইবার অবসর পাইয়াছে, গ্রন্থ-মধ্যে আর কুত্রাপিও তদ্রূপ নহে।

"লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?'

অমর। যাইব।

লবঙ্গ। কেন?

অমর। যাইব না কেন? আমাকে বারণ করিবারত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি?

অ। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে?

ল। তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

অ। যদি লোকান্তর থাকে, তবে?

ল। আমি স্ত্রীলোক সহজে দুর্ব্বলা! আমার কত বল দেখিয়া তোমার কি হইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

অ। সে কথায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু একটী কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চির দিনের মত এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন? এ যে মুছিলে যায় না, কখন মুছিলে যাইবেও না।

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল 'তুমি কু-কার্জ করিয়াছিলে, আমিও বালিকা-বুদ্ধিতেই কু-কাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড বিধাতা বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার, কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?'

অমর। তুমি না বলিতেই ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি, উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না, আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু তুমি যদি কখন ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু অণুমাত্র স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী নহি। তোমার এই সমুদ্র তুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।" * * লবঙ্গ কাঁপিতে লাগিলেন। অতি কোমল সকরুণ কাতর ভিক্ষার প্রত্যুত্তরে কি কঠোর উক্তি! ধর্ম্মের কঠোরতা, কর্ত্তব্যের কঠোরতা, এমনই নির্ম্মল বটে। যে বাঁধ একবার শিথিল হইলেই সর্ব্বনাশ, তাহা এমনই কঠিন করিয়া কঠোর পাষাণ দিয়া বাঁধিতে হয় বটে।

উদ্ধৃতাংশ স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত চিত্রের উজ্জ্বল দৃশ্যপট। সেই নির্ব্বাণপ্রায় শৈশবের প্রণয়-পাবক সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া আবার নিবিল। সেই চির-সংযত হৃদয় সহসা প্রবৃত্তির প্রাবল্যে বিচলিত হইয়া আবার কর্ত্তব্য-পাষাণের গুরু চাপে স্থির হইল। হিন্দুনারীর ধর্ম্ম-জ্ঞান—ধর্ম্মভয় অসীম প্রভাবে লবঙ্গের আলোড়িত হৃদয়-সমুদ্র প্রশমিত করিল।

এমন লবঙ্গলতার চিত্র যে দেশের কবি চিত্রিত করিতে পারেন, সেই দেশ ধন্য! এমন চিত্র যে ভাষা সুশোভিত করে, সেই ভাষা ধন্য! আর যে চিত্রকর এমন চিত্র চিত্রিত করেন, তাঁহার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

ম।

গার্হস্থ্যপ্রবন্ধ।

(৩৯৭ সংখ্যা ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রাচীন কালের গৃহপ্রণালী যেরূপ শান্তিপ্রদ ছিল, সেইরূপ প্রীতিকরও ছিল। তৎকালে হিন্দুদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা অতিশয় আদরণীয় ছিল। হিন্দুগণ সকলেই একান্নভুক্ত হইয়া বাস করিতেন। সন্তানগণ সর্ব্বদা জনক জননীর সহিত মৃদু বাক্যে কথা কহিতেন, তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেন ও আজ্ঞাবহ থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য সমাদৃত হইতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জননীর ন্যায় সম্মান করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিতেন। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণ পিতামাতার ন্যায় পূজিত হইতেন। দাস দাসীবর্গ ছায়া স্বরূপ এবং পরম বিশ্বাসপাত্র ছিল।

গৃহস্থ যদি কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতেন, তবে গলবস্ত্র হইয়া যোড়হস্তে তিনি স্বয়ং আমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যেরূপ বিনীতভাবে সাদরে সম্ভাষণ করিতেন, তাহা ভাবিলে, আনন্দে প্রাণ পুলকিত হয়।

প্রত্যেক গৃহেই, সাদরে অতিথিসেবা সম্পাদিত হইত। তৎকালে অতিথি-সৎকার একটী প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। পাছে কোনও অতিথি বিমুখ হন, এই ভয়ে গৃহস্থগণ সতত সন্ত্রস্ত থাকিতেন। গৃহে কোনও অতিথি সমাগত হইলে, গৃহস্থ পরম আপ্যায়িত হইতেন। অভ্যাগত ব্যক্তিকে কোন্ শান্তিপ্রদ স্থানে উপবেশন করিতে দিবেন, কোন্ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা পরিতৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করাইবেন—তজ্জন্য ব্যাকুল হইতেন। নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূত হইত না। অভ্যাগত ব্যক্তিকে সাদরে সন্তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া এবং

তাহার বিশ্রামের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহস্থ শেষে স্নানাহার করিতেন। প্রাচীনকালে এদেশীয় ললনাগণও প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বদেশীয় নারীগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থলে অবস্থাপিত ছিলেন। তাঁহারা গুরুজনদিগের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তিপরায়ণা ছিলেন। আত্মীয়মণ্ডলী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি এরূপ প্রীতিপ্রদ ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহাদের গুণে সকলে বশীভূত হইত। তাঁহারা গৃহকার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহারা এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত গৃহ-কার্য্য সমাধা করিতেন যে, কোনও বস্তুর অভাব বোধ হইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা গৃহের লক্ষ্মীরূপে বিরাজমান থাকিতেন। তজ্জন্যই বোধ হয় "স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন"—স্ত্রীতে ও শ্রী (লক্ষ্মী)তে কোনও বিশেষ নাই—এই বাক্য প্রসিদ্ধ।

আর্য্যনারীগণ অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অত্যদ্ভুত ও জ্বলন্ত পতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন।

বিদ্যা ও তত্ত্বালোচনায় ইহাঁরা প্রাচীনকালে কত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাচীনতম মহাগ্রন্থসমূহ তাহার পরিচয় দান করিতেছে। অনেকানেক বিদুষী নারী বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে ঋগ্বেদ ও আর্য্যজাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন ইহাঁদের নাম বিলুপ্ত হইবার নহে।

তাঁহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রানুলোচনাতেও ন্যূন ছিলেন না। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্যামহিলা রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের ন্যায় রাজসভায় ও তপোবনে গভীর জ্ঞান ও শাস্ত্রানুলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। বস্তুতঃ ইহাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে রাজর্ষি ও মহর্ষিদিগের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুধু গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, সতীত্বে সর্ব্বদেশীয় ললনাগণের শীর্ষস্থানীয়া, বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনে পারদর্শিনী ছিলেন এমন নহে; তাঁহারা আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগিণীও ছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতব্রতে স্বকীয় অঙ্গ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ আপনাদের মস্তকের কেশগুচ্ছ অনায়াসে কাটিয়া দিতেন। তাঁহারা একমাত্র প্রিয়তম পুত্রকেও সমরক্ষেত্রে পাঠাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। পুত্রকে উদ্দীপনা-বাক্যে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক হস্তে করবাল দিয়া যুদ্ধযাত্রাকালে বলিতেন—"যাও পুত্র যাও, হয় যুদ্ধে জয়লাভপূর্ব্বক এই করবাল হস্তে জয়োৎসাহে জননীর পাদবন্দনা করিও; অথবা রণে হত হইয়া করবালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" কি আশ্চর্য্য স্বদেশানুরাগ! এই কার্য্যে বীরত্বের পরিচয় যত, স্বদেশ-

প্রেমের পরিচয়ও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। প্রকৃত বীরত্ব—পুরুষোচিত বীরত্ব ভারতরমণী যেরূপ দেখাইয়াছেন, এমন আর পৃথিবীর কোন্ জাতির রমণী দেখাইয়াছেন?

প্রাচীন কালের ভারতরমণীগণের কার্য্যসমূহের বিষয় চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞান, খনা ও লীলাবতীর গণিত ও জ্যোতিষ-জ্ঞান, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর পতি-প্রেম ইত্যাদি পূর্ব্বকালের ভারতললনা-গণের কীর্ত্তিকলাপ অবিনশ্বর নক্ষত্ররূপে মানবরাজ্যের হৃদয়াকাশে অনন্তকাল দেদীপ্যমান রহিবে। প্রাচীনকালে এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের সম্মান গৃহে ও বাহিরে একরূপ ছিল। তখন পুরুষগণ ভার্য্যা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইলে পূর্ব্বে স্বীয় জননী ও দুহিতাকে স্মরণ করিয়া তাহার দিকে চাহিতেন। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে ভারতে পারিবারিক ও নৈতিক উৎকর্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করিত। আহা! প্রাচীনকালের গৃহচ্ছবি কেমন পবিত্র ও সুন্দর ছিল। গৃহে গৃহে নিয়ত কীদৃশ সুখ শান্তি বিরাজ করিত। চিন্তা করিলে এক দিকে যেমন প্রাণ আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই আবার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রাণ দুঃখসাগরে ডুবিয়া যায় ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

পুরাণ জ্বর প্লীহা ও ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক পাঁচন।

চিরেতা	... ...	২০ তোলা।
মঞ্জিষ্ঠা	... ...	২০ তোলা।
রক্তচন্দন চূর্ণ	...	২০ তোলা।
অতইচ	... ...	১০ তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ইহাদের মধ্যে চিরেতা ও মঞ্জিষ্ঠাকে দা দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ৬ তোলা পরিমাণে ওজন লইয়া বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন, তৎপরে ভাল রক্ত-চন্দন কাষ্ঠকে দা দ্বারা চাঁচিয়া চাঁচিয়া, কিম্বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছেদন-পূর্ব্বক রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া হামামদিস্তা দ্বারা চূর্ণি করিয়া ঐরূপ পরিমিত ২০ তোলা লইয়া হাঁড়ির মধ্যে প্রদান করিবে। পরে অতইচ। ইহা হরিদ্রাবৎ মূল বিশেষ, চেষ্টা করিলে বণিকের নিকট প্রাপ্তব্য, দুষ্প্রাপ্য নয়, কিঞ্চিৎ বিষাক্ত; আর অধিক দিনের পুরাতন হইলে পোকা ধরে, ফলে পোক্কা ধরা অতইচ না হয়, এইরূপ উত্তম ১০ তোলা অতইচ লইবে। ইহাকে সামান্য আঘাতে কিঞ্চিৎ কুটা করিয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক ১৬ সের জলে

ভিজাইয়া ৬।৭ ঘণ্টা রাখিয়া পরে চুল্লির উপরি হাঁড়ি বসাইয়া পাক আরম্ভ করিবে। এইরূপ পাক হইতে হইতে যখন ৯ সের আন্দাজ জল থাকিবে, সেই সময়ে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ১২টী বোতলে পূরণ করিবে। তৎপরে "ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা), আর "ষ্ট্রং মিউরেটিক য়্যাসিড" ৩০ বিন্দু (ফোঁটা)—এই ৬০ বিন্দু য়্যাসিড দ্বারা ৪০ গ্রেণ "সলফেট্ অফ্ কুইনাইনকে" দ্রবীভূত করিয়া উহার মধ্যে একটি বোতলে ঢালিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে প্রতি বোতলে ষ্ট্রং নাইট্রিক ও মিউরেটিক্ য়্যাসিড্ এবং সলফেট্ অফ্ কুইনাইন যোগ করিয়া বোতলগুলি কর্ক ও গালা মোহর করিলেই পুরাতন জ্বর প্লীহা ও যকৃতাদি জঠররোগনাশক পাঁচন প্রস্তুত হইল। ইহা সেবনের ব্যবস্থা ও ফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক ছটাক পরিমাণে দুইবার; ৭ হইতে ১৪ বর্ষ বয়স্ক বালকের পক্ষে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দিবসে দুইবার; ৩ হইতে ৬ বর্ষ বয়স্ক-শিশুর পক্ষে দেড় কাঁচ্চা পরিমাণে দিবসে দুইবার; তদপেক্ষা অল্পবয়স্কের পক্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা; সকলকেই জ্বরবিরাম-কালে ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা জ্বরাদির নিবৃত্তি হইলেও কিছু দিন ইহা অর্দ্ধমাত্রায় সেবন করা বিধেয়। সেবনকালে বোতল নাড়িয়া কাঁচের বা প্রস্তরের কিম্বা মৃন্ময় পাত্রে ঢালিয়া পান করিবে।

ইহার আরোগ্যফল কলিকাতায় প্রচলিত ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ কয়েকটী অপেক্ষাও অধিক। এই অব্যর্থ মহৌষধ দ্বারা দুর্জ্জয় প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, শোথ, পাণ্ডু, কামল, হলীমক, গুল্ম ইত্যাদি রোগ সংযুক্ত জ্বর, কুইনাইনের পুনর্জ্জ্বর, একদিন বা দুইদিন অন্তর জ্বর, দ্বিকালীন বিষমজ্বর, এবং প্রমেহ পর্য্যন্ত অতি সত্বর, এমন কি তিন চারি দিনের মধ্যেই নিবৃত্ত হইবে। পরে দিন দিন যত সেবন করা হইবে, ততই ইহা পূর্ব্বোক্ত দুর্জ্জয় প্লীহাদি জঠররোগের বিশেষরূপে সঙ্কোচ বিধানপূর্ব্বক অগ্নি ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিসাধন করিবে। রোগীর মল অপরিষ্কার থাকিলে প্রতি বোতলে সল্‌ফেট অফ ম্যাগ্‌নিসিয়া ৫ আউন্স পরিমাণে যোগ করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধ বোতলমধ্যে সংস্থাপন-পূর্ব্বক কর্ক আঁটিয়া ও গালা মোহর করিয়া রাখিবে।

দ্রব্য পরিপাক।

যে খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইতে যে সময় লাগে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

দ্রব্য	সময়
এরারুট	২॥০ দণ্ড

দ্রব্য	সময়
খইয়ের মণ্ড	২॥০ দণ্ড
সাগুদানা	২॥০ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের মণ্ড	৩ ,,
যবের মণ্ড	৪ ,,
পাণিফলের পালো	৩ ,,
ধানের খই	৩ ,,
মুড়ি	৬ ,,
মুড়কি	৫ ,,
ভাজামুগের ডাইল	৬ ,,
মসুর ডাইল	৫ ,,
ছোলা মটর ও অড়হর ডাইল	৭॥০ ,,
মাসকলাইয়ের ডাইল	৫ ,,
পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন	৫ ,,
নূতন তণ্ডুলের অন্ন	৮ ,,
রুটী	৭॥০ ,,
লুচী, কচুরি, মিঠাই, জিলাপী ও মোহনভোগ	৯ ,,
গুড় ও সন্দেশ	৭॥০ ,,
মিছরী, বাতাসা ও চিনি	৫ ,,
বেগুন ও ডুমুর	৫ ,,
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপি	৮ ,,
পালং ও নটে শাকাদি	৭॥০ ,,
গোল আলু ও রাঙ্গা আলু	৭॥০ ,,
মূল, শালগাম ও গাজরাদি	৭॥০ ,,
পক্ক কাঁঠাল	৯ ,,

দ্রব্য	সময়
পটোল, ঝিঙ্গা, কাঁচকলা, থোড় ও কুষ্মাণ্ডাদি	৭ দণ্ড
তরমুজ ও ফুটি	৬ ,,
আতা ও নোনা	৪ ,,
নিচু ও গোলাপজামাদি	৭॥০ ,,
পক্ক আম্র	৬ ,,
কাঁচা আম্র ও শসা	৭॥০ ,,
ডাব নারিকেলের শস্য	৫ ,,
কিসমিস্	৫ ,,
বিল্ব বা শ্রীফল	৫ ,,
দাড়িম্ব	২॥০ ,,
আঙ্গুর	৪ ,,
বাদাম ও পেস্তা	৯ ,,
ছাগদুগ্ধ	৫॥০ ,,
গব্যদুগ্ধ	৫ ,,
ঐ ছানা	৮ ,,
ক্ষুদ্র মৎস্য	৫ ,,
গল্‌দাচিঙ্গড়ি ও অন্যান্য বৃহৎ মৎস্য	৭॥০ ,,
শামুক ও গুগ্‌লী	৮ ,,
সুসিদ্ধ ডিম্ব	৯ ,,
সুসিদ্ধ ছাগ, হরিণ, মেষ ও কচ্ছপাদির মাংস	৮ ,,
কপোত, হংস ও কুক্কুট মাংস	৮ ,,
কালিয়া (ঘৃত ও মসলা সংযোগে পাক)	১০ ,,
পলান্ন (পোলাও)	১২ ,,

মৃত্যু।

১

মরণের নামে কেন গো সকলে
সতত এমন শিহরে উঠে ?
কেন হয় মুখ মলিন তাদের
হৃদয়ে দারুণ আতঙ্ক ছুটে ?

২

মৃত্যু কভু নহে শত্রু মানবের,
মৃত্যু সে বিধির অমূল্য দান !
মৃত্যুর জনম—নর নারী সবে
শোক দুঃখ হ'তে করিতে ত্রাণ !

৩

মৃত্যু স্বরগের এক মাত্র দূত,—
বিধির আদেশে নিযুক্ত হেথা,
হাত ধরে সে যে নিয়ে যায় সবে
চির সুখ শান্তি বিরাজে যেথা !

৪

যার কেহ নাই হেথা আপনার,
সহায় সম্বল নাহিক ভবে,
যাহার হৃদয় জ্বলে যাতনায়,
যা'রে ঘৃণা করে জগতে সবে ;—

৫

তাঁরেও যে মৃত্যু করে না অবজ্ঞা,
যায় না ফেলিয়া দু পায় ঠেলে ;
সম্ভাষি যতনে ভালবেসে তায়
কোলে লয় যেন কোলের ছেলে।

৬

মুছায়ে তাহার নয়নের জল
শোক দুঃখ ভার করিয়া দূর,—
সাদরে সান্ত্বনা দিয়ে যায় লয়ে
চির সুখময় স্বরগপুর !

শ্রীষ, না, ম।

বৎসর শেষে চিন্তা।

অ নন্ত কাল সাগরে ডুবিল বৎসর,
আ ত্ম চিন্তা করিবার এই অবসর।
ই হ লোক ছায়া—পরলোক নিত্যধাম,
ঈ শ্বর সহায়, সদা জপ তাঁর নাম।
উ ন্নতি কল্যাণ শান্তি—প্রসাদ তাঁহার,
ঊ র্দ্ধ দৃষ্টি করি চাহ, মিলিবে অপার।
ঋ ষি মুনি ধ্যানযোগে সদা সচেতন,
৯ প্ত নন এ সংসারে প্রমুক্ত জীবন।
এ পারে মৃত্যুর রাজ্য, ওপারে অমৃত,
ঐ হিক ক্ষণিক সুখে হৈওনা ব্যাপৃত।
ও মন! আপন হিত করহ সন্ধান,
ঔ ষধ এ ভবরোগে নামসুধা পান।

ক বলে কপট ভাব করহ বর্জ্জন
খ ল সঙ্গে নরকেতে নিশ্চয় পতন।
গ তস্য শোচনা কেন বর্ত্তমান ভুলে ?
ঘ টনার স্রোতে ভেসে যেওনা অকূলে।
ঙ বলে ভাঙিয়া ঘুম দেখ আঁখি তুলে।

চ ঞ্চল সম্পদ সুখ জীবন যৌবন,
ছ লনায় ছাই লয়ে ভুল না কাঞ্চন।
জ প তপ মিছা যদি না জান মরিতে,
ঝ টিতি কর্ত্তব্য কাজ হইবে সাধিতে,
ঞ বলে গোঁসাঞ্ দড় হিসাব বুঝিতে।

ট লিলে পাপের পথে অশেষ দুর্গতি,
ঠ কিবে আপনি হবে পাপের মূরতি।
ড ঙ্কা মেরে সাধুজন ভবপারে যায়,
ঢ ক্কা রবে ধর্ম্ম তার সুচরিত গায়,
ণ বলে মরণে রণে সে কি ভয় পায় ?

ত পস্যায় সর্ব্ব সিদ্ধি নাহিক অন্যথা,
থ র হরি কাঁপে যম উগ্রতপা যথা,
দ য়া জীবে, নামে ভক্তি, সাধু সহবাস,—
ধ র্ম্ম-তত্ত্ব সার এই, জানিবে নির্য্যাস।
ন র নারী এই ধর্ম্মে করহ বিশ্বাস।

প র-হিতে আত্মস্বার্থ কর বলিদান,
ফ লাফল চিন্তা মনে দিওনাকো স্থান।
ব ল বুদ্ধি সুখ শান্তি উন্নতি কল্যাণ,
ভ গবান্ ভকতের করেন বিধান।
ম ঙ্গলময়ের কার্য্য মঙ্গলনিদান।

য তো ধর্ম্মস্ততো জয় নাহিক সংশয়,
র তন যতনে মিলে জানিও নিশ্চয়।
ল ক্ষ্য রাখি বিভুপদে হও আগুয়ান,
ব দন ভরিয়া কর তাঁর গুণগান।

শ ব করি ত্রিসংসার বসো যোগাসনে,
ষ ড় রিপু জয় করি লভ নিত্য ধনে।
স দানন্দ নাম গাও সদানন্দ মনে।
হ রি বল দিন গেল হও সচেতন,
ক্ষ ণেক বিলম্বে আয়ু গ্রাসিবে শমন।

সাধ্বী কৈলাসকামিনী।

চৈত্রের বামাবোধিনী এবার চৈত্রের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিলম্ব হইয়া পড়িল। তাহার একটী প্রধান কারণ উপরি-উক্ত মহিলার দেহত্যাগ ঘটনা। ইনি বামাবোধিনীর সম্পাদক-পত্নী। এত দিন পাঠিকাদিগের নিকট অপরিচিতা থাকিয়াও তাঁহাদের সেবায় অর্থ-সামর্থ্য অনেক ব্যয় করিয়াছেন। বামাবোধিনী-সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীন পাঠিকারা অবগত আছেন, অনেক কাল বামাবোধিনীর সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু আশুতোষ ঘোষের নামেই পত্রিকার কার্য্য চলিত, এ সময় এই মহিলাই তাঁহার কোন আত্মীয়ের সাহায্যে স্বয়ং কার্য্য সকল চালাইতেন। কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইলেও আমৃত্যু তিনি পত্রিকার কার্য্য সকলের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন।

আজি বামাবোধিনী গভীর শোকপূর্ণ হৃদয়ে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট শ্রীমতী কৈলাসকামিনীর পরলোকগমনের সংবাদমাত্র দিতেছেন, ইহাঁর জীবনবৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। ইনি সসত্ত্বাবস্থায় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকষ্ট কিছু দিন মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন। গর্ভাবস্থায় ঔষধসেবনে ইতিপূর্ব্বে একটী সন্তান নষ্ট হয়, এজন্য ঔষধাদি সেবনে নিতান্ত বিমুখ ছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সকল ক্লেশ দূর হইবে আশা করিতেছিলেন। গত ১৫ই চৈত্র হইতে রাত্রিকালে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইত, অধিকক্ষণ শয়ানাবস্থায় থাকিতে পারিতেন না, ভাল নিদ্রা হইত না—ঈশ্বরের নাম বা পরমার্থ সঙ্গীত করিয়া অনেক রাত্রি কাটাইতেন। প্রভাতে গৃহমার্জ্জনাদি কার্য্য করিয়া স্নানানন্তর স্বহস্তে যথাবিধি রন্ধনপূর্ব্বক পরিজনদিগকে খাওয়াইতেন এবং সমস্ত দিবস আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সকল পরিশ্রমসহ সম্পন্ন করিতেন। রাত্রিতে অসুখ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রজনী যাপন করিতেন। ইহাঁর আত্মীয়-গণ ইহাতে ইহাঁর পীড়ার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। গত ২৯শে চৈত্র রজনীতে শ্বাসকষ্টের অত্যন্ত আধিক্য হইয়া হঠাৎ প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার নাম করিতে করিতে ও ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে সে দিন প্রাণ রক্ষা হয়। ডাক্তারেরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন, যন্ত্রসাহায্যে শীঘ্র প্রসব না করাইলে মহা বিপদের সম্ভাবনা। রোগী তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন চৈত্র মাসের আর একদিন আছে যাউক, বৈশাখ পড়িলে যাহা হয় হইবে। ঈশ্বরেচ্ছায় ৩০এ চৈত্র সমস্ত দিন এবং কতক রাত্রি সচ্ছন্দে যায়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইতে হইতে আবার দারুণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, ডাক্তারদিগের প্রদত্ত ঔষধ সেবনে পূর্ব্বদিনের মত উপকার বোধ হইল না। রোগী রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রভাত হইলেই স্বামীকে বলিলেন ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া প্রসব করাও। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার জে, এন মিত্র এবং ধাত্রী থাকমণি ঘোষ ও অন্য এক প্রাচীনা ধাত্রী ১লা বৈশাখ বেলা প্রায় ৭॥ টার সময় উপস্থিত হইলেন এবং ৯টার সময় সুপ্রসব করাইলেন। ডাক্তারেরা যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও কৌশলপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া শেষ করা যায় না। প্রসবে কোনও কষ্ট হইল না এবং রোগী একটু সুস্থ হইলেন। আশা করা গেল এইবার একপ্রকার নিরাপদ হইলেন। কিন্তু শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়াতে আবার শ্বাসযন্ত্রের কষ্ট উপস্থিত হইল। ডাক্তারেরা ঔষধ ও

শুশ্রূষার যতদূর সাধ্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলেও রোগীর অবসন্নতা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অপরাহ্ণ ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও উচ্চারণ করিতে করিতে ইহাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল এবং অমর আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিল।

ইহাঁর স্বামীর নগরস্থ বন্ধুগণের অধিকাংশ ইহাঁর পীড়ার সংবাদ কিছু-মাত্র অবগত ছিলেন না, হঠাৎ ইহাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া দত্ত-প্রবাস ৯নং আণ্টনিবাগান গৃহে সমবেত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ৬০।৭০ জন লোক উপস্থিত। ইতিমধ্যে শবদেহের একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। পরে দেহ সধবোচিত সিন্দূর, অলক্তাদিতে বিভূষিত এবং নববস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইলে সময়োচিত ঈশ্বরোপাসনা হইল। রাত্রি ৯টার সময় দেহ শ্মশানঘাটে নীত হইল। অনেক কৃতবিদ্য গণ্যমান্য বন্ধুগণ আনন্দে শবদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যান, ইহা মহিলার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। শ্মশানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নিকার্য্য সম্পন্ন করেন। সৎকারের পূর্ব্বে ও পরে সময়োচিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। রাত্রি ৩টার সময় দেহ ভস্মাবশেষ হয়। তাঁহার চিতাভস্ম এবং মস্তকের কেশ যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

কৈলাসকামিনী স্বামী, ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা এবং দুইটী সহোদর রাখিয়া ৪০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর জন্য তাঁহারা এবং প্রতিবাসী ও আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শোকার্ত্ত। বামাবোধিনীও শোকার্ত্তহৃদয়ে ইহাঁর আত্মার চির শান্তি ও সদ্‌গতির প্রার্থনা করিতেছেন, বিশ্ব-জননী তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে ইহাঁকে রাখিয়া কৃতার্থ করুন। বামাবোধিনী ইহাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং ইহাঁর বিয়োগে ইহার যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবার নহে।

হেঁয়ালী।

ফাল্গুনের হেঁয়ালীর উত্তর।

(১) বেহাতী, (২) আকাশ, (৩) চাল্‌তা, (৪) পাগল, (৫) গোপাল।

চৈত্রের হেঁয়ালী।

মিষ্ট রস মধ্যে সদা করে বিচরণ,
কভু করিল না তার আস্বাদ গ্রহণ। ১

বাদ বিবাদেতে পাবে মম দরশন,
বিবাহক্ষেত্রেতে আমি মধ্যস্থ ব্রাহ্মণ,

বাসর আসরে আগে স্থান মোর হয়,
আমা ছাড়া বাবার অস্তিত্ব নাহি রয়। ২
আদি শেষ দু-অক্ষরে বাজী চমৎকার,
শেষ ছাড়ি আস্বাদনে বড়ই বেতার।
আদি বর্ণ ছাড়িলে মূল্যের নিরূপণ,
তিন বর্ণে কোন্ বস্তু বস্ত্রের বন্ধন ? ৩

অঙ্গে নই, বঙ্গে নই—কলিঙ্গেতে ঘর,
চারি সহোদরমধ্যে কনিষ্ঠ সোদর। ৪
রাজা প্রজা কাঁপে সবে প্রতাপে আমার,
আদি শেষ বর্ণে হই ওজনে ব্যাভার,
শেষ দুই বর্ণে হই ভীষণ ঘটনা,
তিন বর্ণে কিবা নাম আমার বলনা ? ৫

নূতন সংবাদ।

১। আলিগড়ের সার সায়েদ আমাদ খাঁ বাহাদুরের ৮১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। আলিগড় কলেজ ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতের মুসলমান সমাজ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২। মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের পীড়া অচিকিৎস্য বলিয়া ডাক্তারেরা জবাব দিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

৩। সার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জীর স্থলে সার জন উডবরন্ বঙ্গের ছোট লাট হইয়াছেন। ইনি একজন মহাশয় লোক।

৪। ব্রিষ্টল অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রেবরেণ্ড জর্জ মূলার নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৯৩ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌রোগই মৃত্যুর কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

৫। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম মেঃ বি এল গুপ্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন।

৬। মান্দ্রাজের ধনী নরসিংহ রাও মৃত্যুকালে বিশাখাপত্তনের কলেজের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৭। কানপুরের তামাক-বিক্রেতা হাজি হাসেন কানপুরের অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ ৫ হাজার টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

৮। ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট সেসন জজ বাবু যোগেশ চন্দ্র মিত্র পূর্ণিয়ার সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর দ্রুত পদোন্নতি ইহাঁর বিচারদক্ষতার পরিচায়ক।

৯। বরদার গুইকুমারের পুত্রকন্যাগণ জাপানদর্শনে গিয়াছেন।

বামারচনা।

সকলি স্বপন ॥

১

গুরুশ্রেষ্ঠ দেবোপম, সেই যে জনক মম,
ঠাকুর খুড়ার স্নেহ অমূল্য রতন !
আজি মম সকলি স্বপন !

২

সেই যে স্নেহের নদী, রাঙ্গা দিদি, মেজো দিদি
স্নেহের প্রতিমা সেই ভাই দুইজন,*
আজি মম সকলি স্বপন !

৩

শোভিত হৃদয়তল, সেই যে অতি উজ্জ্বল,
পবিত্র স্নেহের ফুল কালীপদ ধন,
আজি মম সকলি স্বপন !

৪

স্বর্নদীর ঢেউ সম, সেই যে পবিত্রতম,
প্রাণের জানকী ভাই হৃদয়রঞ্জন,
আজি মম সকলি স্বপন !

৫

স্বরগের দেবী সম, সেই যে শাশুড়ী মম,
স্নেহস্বরূপিণী বিশ্বজননীর মত,
সব আজ স্বপ্নে পরিণত !

৬

পবিত্র কুসুম থর, পদ্মপূর্ণ সরোবর,
সেই যে ভাগিনী হেম লক্ষ্মীর মতন,
আজি সব হয়েছে স্বপন।

৭

সেই যে দিদি-মা দেবী, শান্তি করুণার ছবি,
দয়াধর্ম্মে ছিল যাঁর মহৎ জীবন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

৮

কত ভাল বাসিয়াছে, তারাও ছাড়িয়া গেছে,
ছোট মামা, ছোট মাসী কত দিন যায়,
সব আজ স্বপ্ন সম হায়!

৯

পবিত্র ফুলের মত, সৌরভ ঢালিত কত
হৃদয়ের রক্ত সম শৈলজা রতন,
সব আজ স্বপ্নের মতন।

১০

এই যে ক'দিন হ'ল, বুকে মারি তীক্ষ্ণ শেল
গিয়েছেন ছোট দাদা† ভেঙ্গে দিয়ে মন,
তাও আজ হয়েছে স্বপন।

১১

সে কৃষ্ণ মথুর দাদা ‡ কহিত মধুর কথা,
যেমন আছিল দয়া ভক্তিও তেমন,
আজি মম সকলি স্বপন।

অম্বুজা সুন্দরী দাস।

পিসিমার উপহার।

(২৭শে ফাল্গুন—১৩০৪ সাল)

এস এস মা! আমার,
আজ দশ মাস ধরে
তোমার প্রতীক্ষা করে।
হৃদয় কুসুমময়
রয়েছে আকুল আঁখি
আগে হতে তব তরে

* ৺বরদা কান্ত সেন, বি, এ, ও ৺ কালী কুমার সেন, এম, এ, বি, এল।
† উমাশঙ্কর সেন, যাঁহার মৃত্যুতে 'বিষাদ ও বেদনা' লিখিত হইয়াছে।
‡ পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্যদ্বয়।

সাজায়েছে, সযতনে,
স্নেহফুল থরে থরে !
হাসায়ে হরষ-ইন্দু
শুভ আগমনী তোর
ঢালিছে জোছনারাশি
আজি এ মরমে মোর !
অন্তঃসীলা স্নেহনীর
উচ্ছ্বসিত, খুকুরাণি !
না হেরেই মা ! আমার
তোর ও আননখানি !
এ সুখ জলধি-জলে;
কিন্তু মম হৃদিতরী
কাঁপিতেছে, মাঝে মাঝে,
আতঙ্ক তরঙ্গ স্মরি—
পাছে মা ! আঁধারি ধরা
নন্দনেতে যা'স ফিরে,
স্নেহভরা বক্ষঃগুলি
ভাসায়ে নয়ননীরে !
কোথায় সে যাদুমণি ?
আজিরে পড়িছে মনে—
চিরবিসর্জ্জিত সেই
স্নেহের প্রতিমা-ধনে !
জনক জননী অঙ্ক
তুই মা জুড়ায়ে থাক্,
স্নেহের ত্রিদিবে তোর
ভাইটিরে পুনঃ ডাক্; ;
নিরখি কৃতার্থ হব
কুসুম আনন দুটি,
বিভুর মহিমা গাথা
গাবে এক বৃন্তে ফুটি ।
বিধাতার কৃপাকণা
পড়ুক্ তোমার পরে,
হওমা ! রমণী-মণি
করুণাময়ের বরে !
ধর মা ! কোমল হৃদে
স্বরগ ভূষণরাজি,
বিরাজ এ ধরামাঝে
মনোরম দেবী সাজি !
লভুক তোমার ক্রোড়ে
জীবগণ অসহায়
করুণ-আশ্রয়ভূমি
স্নেহের শীতল ছায়।
নির্ম্মল মানসখানি
হোক্ আরো নিরমল,
উদ্ভাসিত জ্ঞানে ধর্ম্মে,
প্রেমভরে সমুজ্জ্বল !
পিতার পরাণ-প্রিয়
আশার লতিকাচয়,
একক তোহতে বাছা
হোক্ কালে ফুলময় !
জননী-হৃদয়ে নিতি
নব নব প্রীতিজল
সেচি, সে তপত হিয়া
কর তুমি সুশীতল।
সুখে ভোর হোক্ তোর
সারাটি জীবন রাতি,
ছড়াক পুণ্যের শশী
ধরাময় যশোভাতি !
উদ্দেশে সস্নেহাশীষ,
পরম পিতায় স্মরে
দিনু তোর ক্ষুদ্র শিরে
সমগ্র হৃদিটি ভরে ;